বনফুলের
গল্পসমগ্র

তৃতীয় খণ্ড

গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড। কলকাতা—৭৩

প্রথম প্রকাশ ঃ ১৩৬০

সম্পাদক ঃ
ডঃ সরোজমোহন মিত্র
নিরঞ্জন চক্রবর্তী

প্রকাশক ঃ
আনন্দরূপ চক্রবর্তী
গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড
১১এ, বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট
কলকাতা-৭৩

মুদ্রাকর ঃ
দীপক কুমার ভুঞ্যা
শ্রীদুর্গা প্রিন্টার্স
৪/১এ, সনাতন শীল লেন
কলকাতা-১২

প্রচ্ছদ ঃ
এস স্কোয়ার
কলকাতা-৫

সূচীপত্র

প্রয়োজন ৩ কাঁচা রং খারাপ স্প্রিং ৩ তোয়ালে ৫ খোকনের প্রথম ছবি ৬ ফরেন মানি ৭ গল্প নয় ৮ তৃষ্ণা ৯ ভিক্ষুক ১০ মহারাজের দরবার ১০ নগেন ১২ রোদ-মেঘের খেলা ১৪ তুমি ও আমি ১৭ তিস্তা ১৮ হরু নিরক্ষর ১৯ বীরেনবাবুর গঙ্গাস্নান ২০ স্রষ্টা ২০ সিঁড়ি ২১ গল্প লেখার গল্প ২৪ সেকালের এক খোকনের গল্প ২৫ অতীতের রানী ২৭ দাবানল ২৮ আধো-ঘুমে ৩২ সভাপতি ৩২ রিক্‌সাওয়ালার আত্মকাহিনী ৩৫ মেয়েটি ৩৭ সেদিন ভোরে ৩৯ অবাক কাণ্ড ৪৩ আলোক পরী ৪৬ দুই তীরে ৫০ দুর্লভ ৫২ বিশুদ্ধ কৌতুক ৫৪ গহিন রাতে ৫৭ তার কথা ৬০ স্বপ্ন-কাহিনী ৬২ বিজ্ঞান ৬৪ হরবিলাসের মৃত্যু রহস্য ৬৭ বিজ্ঞাপন ৭২ দেশ-দরদী কেনারামের রোজ নামচা ৭৪ জীবন-দর্শন ৭৮ কেডলী সুপ ৮১ দেশী ও বিলাতী ৮৩ সত্য ৮৫ ছোট গল্পের গল্প ৮৭ উৎসব-দেবতা ৯১ স্বাধীনতার জন্ম ৯২ পক্ষী-পুরাণ ৯৪ উপকরণ-সংগ্রহ (১) ৯৭ উপকরণ-সংগ্রহ (২) ১০০ উপকরণ-সংগ্রহ (৩) ১০৪ উপকরণ সংগ্রহ (৪) ১০৭ উপকরণ সংগ্রহ (৫) ১১০ পরী ১১৩ গন্ধমূষিক শর্মার আত্মজীবনী ১১৬ দুই নারী ১১৯ নুড়ি ও তালগাছ ১২৩ টোপ ১২৪ ভূতের প্রেম ১২৬ মন্মথ ১৩০ বর্ণে বর্ণে ১৩৫ পক্ষী বদল ১৩৬ কার্য কারণ ১৩৯ মহীয়সী মহিলা ১৪২ পুকুরে ১৪৬ থাপ্‌পোড় ১৪৭ প্রেরণা ১৪৯ লাল-কালো ১৫২ নির্বাকের দুঃখ ১৫৪ আদর্শ ও বাস্তব ১৫৬ অলক্ষ্যে ১৫৯ অদ্ভুত বার্তা ১৬১ কপাল ১৬৪ ঘুঁটে ১৬৬ দুই রকম স্বাধীনতা ১৬৮ বহিরঙ্গ ১৭০ শ্রীহনুমান সিং ১৭২ হৃদয় রাজ্যের বিচার ১৭৪ চতুরীলাল ১৭৯ বাল্মীকি ১৮৩ দুইটি ছবি ১৮৬ অজ-প্রসঙ্গ ১৮৮ চঞ্চলা ১৯১ বিজয়িনী ১৯৯ দাবি ২২০ শূন্যের দান ২২৪ ভ্রাতৃপ্রেম ২২৯ বীরেন্দ্র নারায়ণ ২৩৩ বন্য মহিষ ২৩৫ নীলকণ্ঠ ২৩৯ চক্রবৎ পরিবর্তন্তে ২৪৩ পালোয়ান ২৪৭ কাক চরিত্র ২৫১ ছবি ২৫৩ দ্বিবিধ দৃষ্টিকোণ ২৫৪ শিল্পী ২৫৬ রূপান্তর ২৫৯ প্রারব্ধ ২৬১ চুনো পুঁটি ২৬৪ ভদ্রলোক ২৬৬ ঋণ শোধ ২৬৯ ভেক ২৭৩ সাগরের প্রতি ২৭৪ নারীর মান ২৭৬ সাঁতারের পোষাক ২৭৮ বন্দেমাতরম ২৮৩ অঙ্কুর ও বৃক্ষ ২৮৪ অন্তরালে ২২৭ হীরের টুকরো ২৯৯ সবিলা ৩০৬ অতিদূর ভবিষ্যতে ৩০৯ উচিত-অনুচিত ৩১০ দন্ত-কৌমুদী ৩১৩ আলোবাবু ৩১৫ ধনী-দরিদ্র ৩১৮ চম্পা ৩২২ রঘুবীর রডিত ৩২৬ কলার বিবর্তন ৩৩১ শ্রীনাথ সেনের ‘তুমি’ ৩৩৩ ভগবানের দয়া ৩৩৭ পৌরাণিক-আধুনিক ৩৪৩ নবজীবন স্তোত ৩৪৬ ঊর্মির পছন্দ ৩৪৯ ছবি ৩৫১ চম্পা শিশির ৩৫৪ ত্রি-ফলা ৩৫৯ অতি-ছোট গল্প ৩৬২ নাক ৩৬৩ বিশ্বাস মশাই ৩৬৫ পুত্র ৩৭৩ রূপ-রূপান্তর ৩৭৫ বিনোদ ডাক্তার ৩৭৭ স্মৃতির খেলা ৩৮০ ক্লিওপেট্রা ৩৮৩ রসময়ের অভিজ্ঞতা ৩৮৮ যাও ৩৯০

বনফুল গল্পসমগ্র

তৃতীয় খণ্ড

গল্প ও কাহিনী

প্রয়োজন

দুটি মাস ক্রমাগত ম্যালেরিয়ায় ভুগলাম। পেটজোড়া পিলে-লিভার—জরাজীর্ণ দেহ। শুনলাম নাকি ডাক্তারবাবু বলে গেছেন যে, যে-কোন মুহূর্তে একটা শক্ত ব্যারাম হয়ে আমার জীবনসংশয় হতে পারে। পিলে কিছুতেই সারবে না!

অসুখের আগে 'ম্যাট্রিকুলেশন' পরীক্ষা দিয়েছিলাম—ভাল হয়ে শুনলাম, 'ফেল' করেছি। গোপনে গোপনে পাড়ার একটি মেয়েকে ভালবাসতাম। তারও সেদিন বিয়ে হয়ে গেল। তার স্বামী আমার চেয়ে ঢের বেশী সুস্থ ও বিদ্বান। সুতরাং জীবনটা চারিদিক থেকেই ব্যর্থ হয়ে গেল। এমন অবস্থায় আত্মহত্যা করা উচিত কি না—এ চিন্তাও মাঝে মাঝে মনে হতো। কিন্তু আমি বরাবরই ভীতু গোছের, তাই আত্মহত্যা করা আমার দ্বারা সম্ভব হয় নি।

শুনেছিলাম পৃথিবীতে অ-দরকারী বাজে জিনিস কিছু নেই। কিন্তু আমি? আমার কি প্রয়োজন আছে? কিন্তু ছিল।

রোগা শরীর নিয়েই কোলকাতায় চাকরির সন্ধানে এসেছিলাম। কোন এক 'হিন্দু-হোটেলে' খাওয়া-দাওয়া চলছিল। সেদিন দুপুরে এক মার্চেণ্ট আপিসের সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি—সেই সময় রাস্তায় মোটরচাপা পড়লাম। তারপর কি হয়েছিল, ভাল মনে নেই।

এখন দেখছি, আমার দেহ নিয়ে মেডিকেল কলেজের ছাত্রেরা দেহতত্ত্ববিষয়ক জ্ঞান অর্জন করছেন। আমার জীর্ণ দেহকে কেটে চিরে তন্ন তন্ন ক'রে দেখছেন কোথায় কি আছে। যাক—তবু একটা কাজে লাগতে পেরেছি। এতে আমার আনন্দ ধরছে না!

বলা বাহুল্য, আমি এখন পরলোকে।

কাঁচা রং খারাপ স্প্রিং

বেশ বৃষ্টি পড়িতেছিল। স্কুলের শিক্ষক প্রবীণ রামলোচনবাবু একটি ছাতা মাথায় দিয়া আমার বারান্দায় আসিয়া উঠিলেন। দেখিলাম তাঁহার শুভ্র জামার চারিদিকে কালো দাগ লাগিয়াছে।

বলিলাম—"এ কি, নতুন ছাতা না কি!"

"হ্যাঁ, একটু আগেই কিনেছি।"

"রং উঠে যাচ্ছে দেখছি।"

"তাই তো দেখছি—"

"কোথা থেকে কিনলেন—"

"ভুনিবাবুর দোকান থেকে।"

"তিনি আজকাল ছাতা বিক্রি করেন না কি। আগে তো লজেনচুষ বেচতেন।"

"শুধু ছাতা বিক্রি করেন না। ছাতা তৈরি করেন। ছোট ফ্যাকটরি করেছেন একটা।"

"বাজারে এত ভাল ছাতা থাকতে আপনি ভুনিবাবুর ছাতা কিনতে গেলেন?"

"কারণ আছে। দাঁড়াও ছাতাটা মুড়ে একধারে রাখি। তোমার বারান্দার চারদিকটা না হলে কালিময় হয়ে যাবে।"

ছাতিটি বন্ধ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

"ও বাবা, এ যে বন্ধও হচ্ছে না। না, এবারও পাস মার্ক দিতে পারলুম না। এবারেও ফেল—"

"আপনি ওই দিকে রেখে দিন না।"

"তাই রাখতে হবে।"

রামলোচনবাবু খোলা ছাতিটাই এক ধারে নামাইয়া রাখিলেন। তাহার পর হাসিমুখে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "দুর্বুদ্ধি হয়েছিল। মাস্টারদের কাণ্ডজ্ঞান তো চিরকালই কম।"

"হয়েছিল কি—"

"তাহলে বসি। সোফায় বসব না দাগ লেগে যাবে। এই কাঠের চেয়ারটায় বসছি।"

সসংকোচে তিনি কাঠের চেয়ারটায় উপবেশন করিলেন।

"কি ব্যাপার বলুন তো—"

"এবার পরীক্ষায়, বুঝলে, 'বর্ষা' বিষয়ে একটা রচনা লিখতে দিয়েছিলাম। নানারকম ছেলে নানারকম লিখেছে দেখলাম। কেউ বর্ষা নিয়ে কাব্য করেছে, কেউ মেঘদূত, রবীন্দ্রনাথ নিয়ে আলোচনা করেছে, কেউ বা বর্ষায় গ্রামের শোভা বর্ণনা করেছে, কেউ বা গ্রামের দুর্দশা বর্ণনা করেছে, কলকাতার মতো শহরে বর্ষাকালে কি কাণ্ড হয় তাও লিখেছে অনেকে। বড়লোকদের বর্ষা আর গরীবদের বর্ষার কথাও লিখেছে কেউ কেউ। কিন্তু একটা রচনা পড়ে আমার তাক্ লেগে গেল। সে একটি ছোট্ট কবিতা লিখেছে, আর কিছু লেখে নি। লিখেছে—

বর্ষাকালে যাহার মাথায় নাই ছাতি
তাহার মুখে মার দু'-তিন লাথি।

আর কিছু লেখেনি। ডাকলাম ছেলেটিকে। এল। বললাম—এ কি লিখেছ? সে বললে, বর্ষা সম্বন্ধে আসল কথাটাই তো লিখেছি সার। বর্ষাকালে জল পড়ে, কাদা হয়, আকাশে মেঘ, বিদ্যুৎ হয়, ব্যাং ডাকে এ সব তো সবাই জানে। আমি ছাতির বিজ্ঞাপন দিয়েছি একটু। মুখ নীচু করে মুচকি মুচকি হাসতে লাগল। বললাম, ছাতির বিজ্ঞাপন দিয়ে তোমার লাভ। বলল, আমার বাবা যে ছাতি তৈরি করছেন আজকাল। মিত্র ছত্র কোম্পানি, দেখেন নি? খুব ভাল ছাতি হচ্ছে সার। জিজ্ঞেস করলাম, তা তো হচ্ছে। কিন্তু এতে তোমাকে তো পাস মার্ক দিতে পারছি না।

সে বলতে লাগল—দিয়ে দিন সার। ভাল ছাতা আপনাকে এনে দেব। বললাম, না ছাতা চাই না আমার। তোমার বাবার নাম কি? সে সগর্বে জবাব দিল—ডাক-

নাম ভুনিবাবু। ভালো নাম গন্ধরাজ মিত্র। ছেলেটিকে পাস মার্ক দিতে পারি নি। আজ রাস্তায় হঠাৎ বৃষ্টি নামল। তখন মনে পড়ল মিত্র-ছত্র কোম্পানির কথা। বৃষ্টির সময় একটা দোকানের বারান্দায় উঠে দাঁড়িয়েছিলাম। তাদেরই জিজ্ঞাসা করলাম কোথায় দোকানটা। তারা বলে দিল। সেইখান থেকেই ছাতাটা কিনে নিয়ে আসছি। ভাবলাম বাঙালী ভদ্রলোক ব্যবসা করছেন, ব্যাক করা উচিত। কিন্তু নাঃ—এবারও পাস মার্ক দিতে পারলাম না। জামার এ রং উঠবে তো ?"

বলিলাম—"কাঁচা রং একবার ধুলেই উঠে যাবে। কিন্তু ছাতাটা বন্ধ করতে পারবেন কি। স্প্রিংটা খারাপ। ওদের আমি চিনি। বলেন তো ফেরত দিয়ে দিতে পারি—"

"না, আর ফেরত দিতে হবে না। হাজার হোক বাঙালীর দোকান তো! ক্রমে ক্রমে কাঁচা রং পাকা হবে, খারাপ স্প্রিং ভালো হয়ে যাবে। না, ফেরত দিতে হবে না।"

তোয়ালে

কাল বিকেলে বাথরুমে গিয়ে হঠাৎ একটা খুব ছোট্ট গল্প পেয়ে গেলাম। ওখানে যে তোয়ালেটায় রোজ হাত মুছি সেটা কথা কয়ে উঠল।

"আপনি রোজ রোজ আমাকে এভাবে ময়লা করে দেন, লজ্জা করে না আপনার ?"

আমি একটু অবাক হয়ে গেলাম।

তারপর বললাম, "গায়ের ময়লা মোছার জন্যেই তো তোমাকে কিনেছি। তোমাকে দিয়ে আর কি করব ?"

"কিন্তু আমারও তো একটা সত্তা আছে, সেটাকে বার বার ময়লা করে দেওয়া কি আপনার উচিত ?"

"মাঝে মাঝে তোমাকে তো ধোপার বাড়িতে কাচিয়ে পরিষ্কারও করাই।"

"ধোপার বাড়িতে গিয়ে তাদের ভাটিতে যে নরকযন্ত্রণা সহ্য করি তা কি আপনি জানেন না ?"

"জানি। কিন্তু আমি নিরুপায়। আমাকে তোয়ালে একটা রাখতেই হবে। সেইজন্যেই তোমাকে আমি বাজার থেকে কিনে এনেছি—"

"আপনি আমার মনিব, আমি আপনার ক্রীতদাস তা জানি—সেইজন্যই আমার অন্তর্দাহ আরও বেশী—"

"তা এর জন্যে কি করছ তুমি ?"

"শক্তি সংগ্রহ করছি, আর ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছি—"

"কি প্রার্থনা—"

"যাতে আমি আপনার মনিব হই, আর আপনি আমার তোয়ালে হয়ে যান—"

খোকনের প্রথম ছবি

খোকন এখন বড় হয়েছে। ক্লাস টেন-এ পড়ে। ছবি আঁকার দিকে খুব ঝোঁক হয়েছে তার। সে যখন খুব ছোট ছিল কাগজের উপর রঙীন পেন্সিল দিয়ে হিজিবিজি কাটত। তারপর ক্রমশ বড় হল, স্কুলে গেল। স্কুলে ড্রইং শেখানো হত। ড্রইং শিখতে লাগল খোকন। টুল, টেবিল, চেয়ার, কলসী, কাপ এমন কি একটা গরুও এঁকে ফেললে একদিন। তারপর ড্রইং বুক থেকে কপি করে করে অনেক ছবি আঁকল সে। নানারকম ছবি। যেখানেই সে ছবি দেখত, দেখে দেখে এঁকে ফেলত। একদিন তার ড্রইংয়ের মাস্টার মশাই বললেন—প্রকৃতি থেকে ছবি আঁকো।

খোকন জিজ্ঞেস করলে—"প্রকৃতি থেকে ?"

"হাঁ, তোমার চারপাশে তো অনেক ছবি ছড়িয়ে আছে। সেইগুলো দেখে দেখে আঁক না এবার। তোমার বাড়ির সামনেই তো চমৎকার গাছ আছে একটি। তার ছবিটা এঁকে ফেল একদিন—"

খোকন সত্যি সত্যি এঁকে ফেলল একদিন ইউক্যালিপটাস গাছটাকে। মাস্টার মশাই বললেন—"চমৎকার হয়েছে। আরো আঁকো। তোমাদের বাড়ির ছাদ থেকে যে পুলটা দেখা যায়, সেটা আঁকতে পারবে ?"

"পারব—"

পুলের ছবিটা দেখেও খুব প্রশংসা করলেন মাস্টার মশাই। বললেন, "চারপাশে যা দেখবে এঁকে ফেলবে। খুব বড় চিত্রকর হবে তুমি।"

খোকন মহা উৎসাহে আঁকতে লাগল ছবি। কিন্তু কিছুদিন পরে সে নিজেই বুঝতে পারল—ঠিক হচ্ছে না। সূর্যের যে ছবিটা এঁকেছে সেটা তো সূর্যের মতো নয়। সূর্যের দীপ্তি তো ছবিতে ফোটেনি। গোলাপ ফুলের ছবিতে কি গোলাপ ফুলের সৌন্দর্য ফোটাতে পেরেছে সে ? পারেনি। প্রকৃতির ছবি ঠিক আঁকা যায় না। একদিন তো মেঘের ছবি আঁকতে গিয়ে বেকুব হয়ে গেল খোকন। একদিন সে দেখল আকাশে একটা মেঘ হাতীর মতো। ঠিক যেন একটা হাতী পিছনের দুপায়ে ভর করে শুঁড় তুলে আছে। খোকন তাড়াতাড়ি তার ড্রইং খাতায় ছবিটা আঁকতে লাগল। আঁকা শেষ হবার পর মিলিয়ে দেখতে গেল ঠিক হয়েছে কি না। গিয়ে দেখে—হাতী নেই, প্রকাণ্ড একটা কুমীর শুয়ে আছে। হাতী কুমীর হয়ে গেছে।

খোকনের বাবার একজন বন্ধু বিখ্যাত চিত্রকর। তিনি লক্ষ্ণৌ শহরে থাকেন। একদিন তিনি খোকনদের বাড়িতে এলেন।

খোকনের বাবা তাঁকে বললেন—"খোকনও ছবি আঁকছে।"

"তাই নাকি। দেখি দেখি—"

খোকন সগর্বে ড্রইংখাতাগুলো নিয়ে এল।

"ওরে বাস, অনেক ছবি এঁকেছো দেখছি—" একে একে উল্টে উল্টে ছবিগুলো দেখতে লাগলেন তিনি। প্রশংসা করলেন, কিন্তু বললেন—"তোমার ছবি কই ? এ সবই তো কপি করেছ। তুমি বড় হয়ে ক্যামেরা নিয়ে যদি এদের ফোটো তোল তা

হলে এগুলো আরও নিখুঁত হবে। এগুলো সব নকল করা ছবি। তোমার নিজের আঁকা ছবি কই ?”

খোকন অবাক হয়ে গেল।

“নিজের আঁকা ছবি ? তা কি করে আঁকব ?”

“চোখ বুজে বসে কল্পনা করো। কল্পনায় যা দেখবে সেটাই এঁকে ফেল।”

চিত্রকর চলে গেলেন।

খোকন একদিন নিজের ঘরে চোখ বুজে বসে রইল। অন্ধকার ছাড়া আর কিছু দেখতে পেল না সে। খোকন ঠিক করল এই অন্ধকারেরই ছবি আঁকবে। কালো রং আর তুলি নিয়ে শুরু করে দিল আঁকতে। ড্রইং খাতার একটা পাতা কালো রংয়ে ভরে গেল।

তারপর সেটার দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল খোকন। এটা কি রকম ছবি হোল ? এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল তবু।

তারপর হঠাৎ দেখতে পেল ওই কালোর ভিতরই একটা মুখ রয়েছে। চোখও আছে। অদ্ভুত হাসি সে চোখে।

নিজের প্রথম সৃষ্টির দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইল খোকন।

ফরেন মানি

গোবর্ধন ভালো ছেলে। প্রমথ তার বন্ধু। প্রমথর কপালটা একটু ভালো, খুঁটির জোর আছে। চাকরি পেয়েছে একটা। গোবর্ধন পায়নি। গোবর্ধনের আরও মুশকিল, সে বিবাহিত। বউটি সুন্দরী। স্বামীর কাছে নানারকম জিনিস চায়।

একদিন গোবর্ধন এসে প্রমথকে বলল, “আজ ভাই বউয়ের সামান্য একটা আবদার মেটাতে পারলাম না। সে আজ বললে অনেকদিন চিংড়ি মাছ খাইনি, আজ চিংড়ি মাছ কিনে এনো। যোগেনের কাছ থেকে দশটা টাকা ধার করে বাজারে গেলাম। চিংড়ি মাছ পেলাম না। শুনলাম সব চিংড়ি মাছ বিদেশে চলে যাচ্ছে ‘ফরেন মানি’ আর্ন করতে। এ দেশের সব ভালো জিনিসই বিদেশে গিয়ে ‘ফরেন মানি’ আর্ন করছে। ভালো কাপড়, ভালো চাল, ভালো ভালো ফল সব আজ বিদেশের বাজারে। আমাদের খনিগুলো তো খালি হয়ে গেল। এমন কি বড় বড় ব্যাং পর্যন্ত চালান হচ্ছে। এ দেশের ভালো ভালো ছেলে মেয়েরাও বিদেশে গিয়ে ‘ফরেন মানি’ রোজগার করছে। কিছু ছোট পোনা মাছ কিনে এনে বউকে ‘ফরেন মানি’র রহস্য বোঝালাম। বউ বললে, ‘অত ছোট মাছ আমি খেতে পারি না, গলায় কাঁটা বেঁধে—’, কি মুশকিল বল তো—”

এর প্রায় মাসখানেক পরে গোবর্ধন হন্তদন্ত হয়ে প্রমথর কাছে এল একদিন। চুল উসকো-খুসকো, চোখের দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত।

“কি রে কি হল—”

“আজ বাড়ি ফিরে দেখি—বউ নেই। এই চিঠিখানা লিখে রেখে গেছে।”

চিঠিতে লেখা আছে—আমিও 'ফরেন মানি' আর্ন করতে চললাম—

"কি করি বল্ তো ? থানায় যাব ? তোর মেসোর সঙ্গে হোম মিনিস্টারের আলাপ আছে—তুই একটু চেষ্টা করে দেখবি ?"

প্রমথ নির্বাক হয়ে রইল।

গল্প নয়

অতি সাধারণ ছেলে। পরনে আড়-ময়লা ছেঁড়া-ছেঁড়া হাফ শার্ট আর চোং প্যাণ্ট। পায়ের স্যাণ্ডালও ছেঁড়া। মুখে গোঁফ দাড়ি আর জুলফির জঙ্গল। মাথায় পিছন দিকে চুলের থোপনা। মুখটি কিন্তু শুকনো। চোখের দৃষ্টি চতুর, লোলুপ কিন্তু নিষ্প্রভ।

লেখা-পড়া তেমন শেখেনি। মোটামুটি বাংলা ইংরেজি জানে। কিন্তু নির্ভুল-ভাবে লিখতে পারে না, প্রায়ই বানান ভুল হয়। চাকরির চেষ্টা করছে, কিন্তু এখনও পায় নি। বেকার।

রোজ বিকেলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে। এসে দাঁড়ায় চৌমাথার একটা কোণে। রাস্তার জনতার দিকে চেয়ে থাকে, কল্লোলিনী কোলকাতাকে দু নয়ন ভরে দেখে। তার বুকে কত আশা, কত আকাঙ্ক্ষা, কত স্বপ্ন। একটাও সফল হয় নি। ভীড়ের মধ্যে মেয়েরাও যাচ্ছে দলে দলে, তাদের মধ্যে অনেকে সুন্দরী, অনেকে যুবতী। তাদের দিকেও হ্যাংলার মতো চেয়ে থাকে সে। মাঝে মাঝে ওদের নিয়ে কবিতাও লেখে। কাগজে পাঠায়, ছাপা হয় না।

একটি মনোহারি দোকানের সামনেই সে দাঁড়ায় রোজ। দোকানের সামনে একটু ফাঁকা জায়গা আছে, খরিদ্দারও অনেক, বিশেষ করে মেয়ে খরিদ্দার।

জায়গাটি তার বেশ পছন্দ।

হঠাৎ একদিন সেই দোকানের মালিক বললেন, "রোজ আপনি আমার দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে থাকেন কেন বলুন তো মশাই ?"

"এমনি—"

"এমনি কি রোজ রোজ এক জায়গায় কেউ দাঁড়ায় ? নিশ্চয় কোনও মতলব আছে আপনার—"

"না, না—এখানে জায়গাটা একটু ফাঁকা কি না—"

"ফাঁকা জায়গা আরও অনেক আছে। দয়া করে অন্য জায়গায় সরে যান—"

তার বলতে ইচ্ছে করল—"ফুটপাথ কি আপনার বাবার ?"

সে কিন্তু তা বলতে পারল না। সসংকোচে সরে গেল।

এরাই কি দেশের ভবিষ্যৎ ?

কেন জানি না আমার চোখে জল এসে পড়ল। লেখা শেষ করে চোখ তুলে চাইলাম।

আমার ঘরের দেওয়ালে বিবেকানন্দ, ক্ষুদিরাম, কানাইলাল, শ্রীঅরবিন্দ, বংকিমচন্দ্র, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ—সকলেরই ছবি টাঙানো আছে। দেখলাম সকলের চোখেই জল।

তৃষ্ণা

বৈশাখ মাস। দ্বিপ্রহরের প্রখর রৌদ্রে চারিদিক ঝলসাইয়া যাইতেছে। প্রকাণ্ড ফাঁকা মাঠের উপর দিয়া আমি হাঁটিয়া চলিয়াছি। এই বিরাট মাঠের ওপারে কান্তিপুর গ্রামে আমাকে যত শীঘ্র সম্ভব পেঁছাইতে হইবে। আমার নিকট আত্মীয় সেখানে খুব অসুস্থ। কিছুদূর 'বাস'-এ আসিয়া তাহার পর পদব্রজে এই বিশাল মাঠটা পার হইলে তবে কান্তিপুর পেঁছানো যায়। অন্য পথ নাই। খুব ভোরে উঠিয়া যাত্রা করিয়াছিলাম। তবু মাঠে পেঁছাইতে দ্বিপ্রহর হইয়া গেল। আর একটা ভুল করিয়াছিলাম, ছাতা আনিবার কথা মনে ছিল না। প্রচণ্ড রৌদ্রে হনহন করিয়া পথ হাঁটিতেছি। তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে।

কিছুক্ষণ হাঁটিবার পর দাঁড়াইয়া পড়িলাম। চারিদিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিলাম, কাছাকাছি একটা গাছও কি নাই! সহসা কিছুদূরে ঝোপের মতো কি একটা দেখা গেল। গাছ কি? সেই দিকে অগ্রসর হইলাম।

গিয়া দেখি সত্যই একটি ঝাঁপড়ালো গাছ। নীচে সুশীতল ছায়া। শুধু তাই নয়, গাছের নীচে অনেকগুলি ডাব লইয়া একজন বৃদ্ধ বসিয়া আছে। পাশে কয়েকটি কাঁচের গ্লাসও রহিয়াছে। বিস্মিত হইলাম।

"এই মাঠের মাঝখানে ডাবের দোকান করেছ?"

বৃদ্ধ কোন জবাব দিল না।

"আমাকে একটা ডাব দাও—"

বৃদ্ধ ডাব কাটিয়া একটি গ্লাসে করিয়া আমাকে ডাব দিল।

ঢকঢক করিয়া এক নিশ্বাসে সেটা খাইয়া ফেলিলাম।

"আর এক গ্লাস দাও—"

মনে হইল বুকটা যেন জুড়াইয়া গেল। এই মাঠে এমন শীতল ডাব পাইব আশা করি নাই।

"কত দাম দেব?"

প্রশ্নটি করিবামাত্র অদ্ভুত জিনিস ঘটিল একটি। সমস্ত ব্যাপারটাই অন্তর্হিত হইয়া গেল। গাছ, ডাব, গ্লাস, সেই বৃদ্ধ—সব যেন শূন্যে মিলাইয়া গেল।

ভাবিলাম—"দিনদুপুরে ভূত দেখিলাম নাকি।"

কানের কাছে কে যেন বলিল—"না, ভূত নয়। তোমার কল্পনা। তোমার কল্পনাই মূর্ত হইয়াছিল এখানে।"

"তা হলে আমি ডাব খাই নি?"

"খেয়েছিলে। কাল্পনিক ডাব! তৃপ্তি হয় নি?"

রৌদ্রতপ্ত নির্জন মাঠে একা দাঁড়াইয়া রহিলাম। তাহার পর আবার তৃষ্ণায় কণ্ঠ শুকাইয়া গেল। তৃষ্ণার অসহ্য যন্ত্রণা আবার ভোগ করিতে লাগিলাম।

ভিক্ষুক

হঠাৎ চেয়ে দেখলাম একটি গোঁফ-দাড়ি-ওয়ালা লোক আমার সামনে এসে হাঁটু-গেঁড়ে হাত জোড় ক'রে বসে পড়ল।

"কে তুমি ?" কোন উত্তর নেই।

আবার প্রশ্ন করলাম, "কে তুমি ?" এবারও কোন উত্তর নেই।

তারপর একটু ধমকের সুরেই প্রশ্ন করলাম—"কে তুমি ? কি চাই ?"

তখন সে ধীরে ধীরে আমার মুখের দিকে তাকাল। আমার চোখের উপর চোখ রাখল।

এবার আমি চমকে উঠলাম। যে আমার সামনে হাঁটু গেঁড়ে বসে আছে সে আর কেউ নয়, আমিই। তার ছেড়া মলিন কাপড়, তার গোঁফ-দাড়ি ঢাকা মুখ, তাকে আড়াল করে রেখেছে। তাকে আমি এতক্ষণ চিনতে পারিনি। আমি নির্বাক, সবিস্ময়ে তার দিকে চেয়ে আছি। সে তখন ধীরে ধীরে বলল—"তোমার কাছে একটি প্রার্থনা, তুমি এমনভাবে ভিক্ষে করে বেড়িও না।"

"আমি ভিক্ষে করছি ?"

"হ্যাঁ করছ, সর্বদা করছ, মনে মনে।" বলেই সে অন্তর্ধান করল।

মহারাজের দরবার

মহারাজের দরবারের কথা বেশী লোক জানে না। আমার বাবা তাঁর ঠাকুরদার কাছে এ দরবারের কথা শুনেছিলেন। আমি শুনেছি আমার বাবার কাছ থেকে। বাবা বলেছিলেন তাঁর ঠাকুরদা নাকি স্বচক্ষে এ দরবার দেখেছিলেন। ঘনা গ্রামে আগে আমাদের বাড়ি ছিল। তার পাশে প্রকাণ্ড মাঠ ছিল একটা। সেখানে মাঝে মাঝে গভীর রাত্রে মহারাজের দরবার বসত। জমজমাট দরবার। বহু মশাল জ্বলত। মখমলের বিরাট গালিচা পাতা হোত। গালিচার উপর পাতা হোত মহারাজের সিংহাসন। স্বর্ণ-খচিত সিংহাসন। তার উপর থাকত বিরাট রাজছত্র। মহারাজের দাড়ি ছিল, গোঁফ তো ছিলই। মুখখানা সিংহের মতো। তিনি কিন্তু রাজার মতো পোশাক পরতেন না। একটা ধপধপে সাদা উড়ুনি গায় দিয়ে সিংহাসনে বসতেন। বাবার ঠাকুরদা বলেছিলেন উড়ুনিও হয়তো গায়ে দিতেন না তিনি, কিন্তু তাঁর সমস্ত বুকে ছিল লোমের জঙ্গল। বাবার ঠাকুরদা বলতেন সেইটে ঢাকবার জন্যে উড়ুনি গায়ে দিতেন তিনি। দামী কাপড়-চোপড়ের দিকে মোটেই ঝোঁক ছিল না। দণ্ডমুণ্ডের কর্তা ছিলেন ও অঞ্চলে। সবাই তাঁর ভয়ে থরথর করে কাঁপত। দেখতেও যেমন সিংহের মতো, গলার স্বরও সিংহের মতো। এক দাবড়ানিতে কাঁপিয়ে দিতেন চারদিক। খুব রাশভারী লোক ছিলেন। কিন্তু যেদিন তিনি দরবার করতেন সেদিন তিনি দয়ার অবতার। যে যা চাইত তাই দিতেন তাকে। দরিদ্ররা টাকা পেত, প্রচুর খেতে পেত, কাপড়-জামা পেত। দরবারের পাশেই দরিদ্র ভোজনের বিরাট আয়োজন থাকত। গুণীরাও সম্মানিত হতেন। দরবারে বড় বড় ওস্তাদরা আসতেন, বাইজীরা

আসতেন, কবিরাও আসতেন। সকলকে পুরস্কৃত করতেন মহারাজা। বাবার ঠাকুরদা বড় সেতারী ছিলেন, তাঁর তবলচী ছিলেন তুফান আলী। দুজনেই মহারাজের দরবারে বাজিয়ে ছিলেন। বাজিয়ে দুজনেই দুটো দামী শাল আর একশো এক মোহর উপহার পেয়েছিলেন নাকি।

এসব অনেকদিন আগেকার কথা। মহারাজের অনেক দিন আগে মৃত্যু হয়েছে। আমরাও ঘনা গ্রাম ছেড়ে চলে এসেছি অনেকদিন আগে। আমি সেখানে যাই নি কখনও। আমাদের এক দূরসম্পর্কের আত্মীয় থাকতেন সেখানে। বাবা তাদের সংগে দেখা করতে যেতেন মাঝে মাঝে।

বাবা একটা আশ্চর্য কথা বলেছিলেন। এখনও নাকি মহারাজের দরবার বসে। একবার তিনি অন্ধকার রাতে ঘনা গ্রামে তাঁর আত্মীয়ের সংগে দেখা করতে যাচ্ছিলেন। নৌকো থেকে নেমে পাঁচ ক্রোশ পথ হেঁটে ঘনা গ্রামে পৌঁছতে হয়। বাবা অন্ধকারে হেঁটে যাচ্ছিলেন। তাঁর সংগে ছিল গ্রামের একটি লোক। বাবা জিজ্ঞেস করলেন—"ওখানে কি হচ্ছে?"

"মহারাজের দরবার বসেছে। ওদিকে যাবেন না। ও দরবার মাঝে মাঝে বসে। তারপর আপনি মিলিয়ে যায়।"

বাবা বললেন—"চল না, একটু এগিয়ে দেখি—"

"ও ভুতুড়ে কাণ্ড মশাই। যাবেন না—"

"দেখিই না—"

"তবে আপনি যান, আমি চললাম।"

বাবা সেই আলোকিত দরবারের দিকে এগুতে লাগলেন। কিন্তু সরে সরে যেতে লাগল সেটা। কিছুতেই তার কাছে আর পৌঁছতে পারলেন না বাবা। শেষে মিলিয়ে গেল সেটা।

এ গল্প বাবার মুখ থেকে শুনেছিলাম। এও অনেকদিন আগেকার কথা। আমার বাবা ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে মারা গেছেন। আমি ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের কথা বলছি। তখন আমার বয়স বত্রিশ বছর। এম. এ. পাস করে ভ্যারাণ্ডা ভেজে বেড়াচ্ছি। চারটি বোনের বিয়ে দিয়ে সর্বস্বান্ত হয়েছি। কলকাতায় বাবা যে বাড়িটি করেছিলেন সেটি বিক্রি করতে হয়েছে। আমি নিঃস্ব অবস্থায় এক দূরসম্পর্কের পিসীর বাড়িতে আছি। তাঁর এক বোম্বেটে ছেলেকে পড়াই। আর দিনরাত চেষ্টা করি কি করে একটা চাকরি জোটে। কিছুতেই জুটছিল না। আমার মুরুব্বি আমার বাবার বন্ধু সনাতনবাবু। তিনি মাড়োয়ারি মহলে ফাটকা খেলে বেড়ান। মাড়োয়ারি বন্ধুও আছে অনেক। তিনি হঠাৎ একদিন বললেন—"তুই যদি পাঁচ হাজার টাকা যোগাড় করতে পারিস তাহলে রামঅওতারবাবুর গদিতে তোকে কেশিয়ার করে দিতে পারি। পাঁচ হাজার টাকা জমা না দিলে ও চাকরি তাঁরা দেবেন না। তাঁদের কেশিয়ারটি মারা গেছেন। তাঁরা একজন বিশ্বাসী লোক খুঁজছেন। আমি বললে তোর চাকরিটি হয়ে যাবে। তুই পাঁচ হাজার টাকা যোগাড় কর—। মাইনে দুশো টাকা। ভালো চাকরি। রামঅওতার সুতোর ব্যবসা করে। খুব ভালো লোক।"

আমার হাতে তখন পাঁচটি টাকাও নেই। পাঁচ হাজার টাকা কোথায় পাব। ধারের চেষ্টা করতে লাগলাম। আমাকে ধারই বা দেবে কে। অত টাকা ধার দেবার মতো

বন্ধুও আমার ছিল না। একজন ছিল। তাকে বললাম, মাসে একশ টাকা করে দিয়ে শোধ করে ফেলব। সে মিছে কথা বলল—এখন আমার হাতে অত টাকা নেই। একজন কুশীদজীবী বললেন, গহনা বন্ধক না রাখলে তিনি টাকা দেবেন না। বাবার বন্ধু সনাতনবাবুকে বললাম। তিনি বললেন—"মহারাজের দরবার থাকলে পেতিস টাকা। কিন্তু সেসব দরবার আর নেই। মহারাজের দরবারের গল্পটা জানিস তো ?"

"জানি।"

সেদিন রাতে যখন শুলাম তখন মহারাজের দরবারের কথাই বারবার মনে পড়তে লাগল। বাবার কাছে যে সব গল্প শুনেছিলাম, তাই মনে পড়তে লাগল। মনে হোল সত্যি কি মহারাজের দরবার ছিল ?

ভোরের দিকে স্বপ্ন দেখলাম একটা—যেন আমি মহারাজের দরবারে গেছি। চারিদিকে মশালের আলো। কোথাও অন্ধকার নেই। রাজছত্রের তলায় বসে আছেন সিংহ-প্রতিম মহারাজ। তাঁর সামনে একজন ওস্তাদ দরবারী কানাড়া আলাপ করছেন। অনেক লোক নিস্তব্ধ হয়ে শুনছে। মাঠের একধারে ভুরিভোজন হচ্ছে। সারি সারি লোক খাচ্ছে। দীয়তাং ভুজ্যতাং কাণ্ড। আর একটু দূরে দুজন পালোয়ান কুস্তি লড়ছে। চারদিক কিন্তু নীরব নিস্তব্ধ। ওস্তাদজির ডানদিকে সারি সারি বসে আছে প্রার্থীর দল। তাদের মধ্যে আমিও আছি। ওস্তাদজির আলাপ যখন শেষ হল, তখন আমি এগিয়ে গিয়ে অভিবাদন করে বললাম—আমার পাঁচ হাজার টাকার নিতান্ত প্রয়োজন। টাকা জমা না দিলে চাকরি হবে না। মহারাজ ইঙ্গিত করলেন। তার নায়েব প্রকাণ্ড একটা খেরোর থলি আমার হাতে এনে দিলেন। খুব ভারী।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙল সনাতনবাবুর ডাকে।

"উঠে পড়। বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ে গেছে। তোমার নামে একটা লটারির টিকিট কিনেছিলাম। পেয়ে গেছি পাঁচ হাজার টাকা। নিয়ে এসেছি টাকাটা। চল রামঅওতারের কাছে যাই।"

সবিস্ময়ে দেখলাম স্বপ্নে যে খেরোর থলি দেখেছিলাম ঠিক সেই রকম থলি সনাতনবাবুর হাতে। তিনি আমার বিমূঢ় দৃষ্টি দেখে বললেন, "পরশু দিন 'চেক' পেয়েছিলাম। কাল ক্যাশ করিয়ে নগদ টাকা এনেছি। রামঅওতার নগদ টাকাই পছন্দ করে। চল—"

আমার মনে হল এ টাকা মহারাজের দরবার থেকেই এসেছে।

নগেন

নগেন আমার বাল্যবন্ধু। বাবা-মা ছেলেবেলাতেই মারা গিয়েছে। এক বিধবা মাসীর কাছেই মানুষ। অর্থাভাবে লেখাপড়া বেশি দূর শিখতে পারে নি। পৈতৃক বাড়ি বিক্রি করে একটা খোলার ঘরে উঠে গিয়েছিল। তার বাড়ি বিক্রির টাকাটা আমিই একটা ব্যাঙ্কে জমা করে দিয়েছিলাম। কিন্তু সে টাকাও শেষ পর্যন্ত সব খরচ হয়ে গিয়েছিল। অতি কষ্টে দিন চলত নগেনের। আমার কাছে মাঝে মাঝে আসত। আমি

যথাসাধ্য সাহায্য করতুম তাকে। মাঝে অনেকদিন আসে নি সে। হঠাৎ সেদিন এসে হাজির। মাথার চুল উসকো খুসকো। গায়ে ছেঁড়া জামা, পায়ে ছেঁড়া চপ্পল। মুখ হাস্যোদ্ভাসিত। এসেই বললে, "ওরে ভুতো, এতদিনে ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন। আমি ভারতের সম্রাট হয়েছি—"

আমি তো অবাক।

সে আমার দিকে সহাস্য দৃষ্টি তুলে মুচকি হেসে বললে, "তোর দুঃখ আমি আগে দূর করব।"

পকেট থেকে একটা চেকবুক বের করে বললে, "এই নে, তোকে পঞ্চাশ লাখ টাকা দিলাম এখন। পরে আরও দেব—"

আমি জানি তার ব্যাঙ্কে কিছু নেই। কিন্তু চেকবুকে একখানি মাত্র পাতা ছিল। দেখলাম তাতেই সে আমার নামে পঞ্চাশ লাখ টাকার একটা চেক লিখে এনেছে। চেকটা আমার হাতে দিয়ে সে আবার বলল, "তুই এবার বিয়ে কর, ভাল বাড়ি কর একটা। তোকে এ বাড়িতে মানায় না। তোর বিছানার চাদর এত ময়লা? তোকে মখমলের বিছানার চাদর কিনে দেব আমি। তোর ব্যবস্থা করে তারপর সারা ভারতের ব্যবস্থা করব। সব ঠিক করে দেব। একটা গরীব থাকবে না, সব্বাই চাকরি পাবে। বিছানার চাদরটা বিশ্রী দেখাচ্ছে, উঠিয়ে ফেল এটা।"

আমার বিছানার চাদরটা টেনে বিছানা থেকে তুলে ফেললে।

আমি পাশের ঘরে গিয়ে ডাক্তার সেনকে ফোন করলাম। ভাগ্যক্রমে তিনি বাড়িতে ছিলেন। আমার বাড়ির কাছেই তাঁর বাড়ি।

"আপনি এখুনি একবার আসুন। মহা বিপদে পড়েছি—"

তিনি বললেন, "যাচ্ছি। কী হয়েছে?"

"এলেই বুঝতে পারবেন।"

ফিরে এসে দেখি নগেন আরও উত্তেজিত হয়েছে। আমার ফুলদানীটা দেখিয়ে বলল, "এ ফুলদানী কি তোর ঘরে মানায়? আমি সোনার ফুলদানী করিয়ে দেব তোকে। সোনার—রিয়েল গোল্ডের—তুই ফোনে কথা কইছিলি কার সঙ্গে?"

"ডাক্তারবাবুকে ডাকলাম। তোর শরীরটা ভাল নয়। বস ওই চেয়ারটায়—"

"আমার শরীর খুব ভাল আছে। আমি সম্রাট। ভারতের সম্রাট, সব ঠিক করে দেব। সোনার ভারত গড়ব—"

"বস না একটু—"

"আমি সম্রাট, আমি সিংহাসনে বসব—"

ডাক্তারবাবু এসে পড়লেন। তিনি এসেই বুঝলেন নগেন পাগল হয়ে গেছে। বললেন, "ওকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে।"

চীৎকার করে উঠল নগেন।

"হাসপাতালে? আমি দিল্লী যাব।"

"আপনার চাকরটাকে ডাকুন—"

ডাক্তারবাবু নিজের ড্রাইভারকে ডাকলেন। তারপর তাকে জোর করে ধরে কাপড় দিয়ে হাত-পা বেঁধে নিজের মোটরে করে নিয়ে চলে গেলেন হাসপাতালে।

নগেন ক্রমাগত চীৎকার করতে লাগল, "আমি যাব না—যাব না, কিছুতেই যাব না—"

পরদিন ডাক্তার সেনকে ফোন করলাম, "নগেন কেমন আছে ?"

"ভাল আছে ; ইনজেকশন দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। মনে হয় ওটা টেম্পোরারি ইনস্যানিটি। মাসখানেকের মধ্যেই ভাল হয়ে যাবে। চিন্তার কোন কারণ নেই—"

মাসখানেক পরে নগেন ফিরে এল একদিন। এসেই আমার পায়ে উপুড় হয়ে পড়ে হু হু করে কাঁদতে লাগল।

"কেন আমায় সারিয়ে দিলি তুই। আমি সম্রাট হয়েছিলাম। ফের গরীব হয়ে গেলাম। কেন আমাকে সারিয়ে দিলি। কেন আমাকে সারিয়ে দিলি—"

রোদ-মেঘের খেলা

ভাদ্র মাস। রোদ আর বৃষ্টির খেলা চলছে। সকালবেলা চমৎকার রোদ উঠেছিল। আশা হয়েছিল মনে—তাহলে ও আসতে পারবে ঠিক। গড়িয়া থেকে আসা সহজ নয় তো। আমি শ্যামবাজারে তিনতলায় একটা ফ্ল্যাট নিয়ে একাই থাকি। একটা ঠিকে চাকর ছাড়া আমার আর কেউ নেই। বাল্যকালে পিতৃমাতৃহীন হয়েছি। মামারা মানুষ করেছিলেন। মাতুল বংশও ধ্বংস হয়েছেন। দুই মামা মারা গেছেন ব্রিটিশ আমলে পুলিসের গুলিতে। আন্দামান জেলে। আমি তখন সবে কলেজ থেকে বেরিয়েছি এম. এ. পাস করে। মীনা তখন স্কুলে পড়ে। মীনার সঙ্গে আমার তখন আলাপ হয় নি। ও যখন বি. এ. তে ইংলিশ অনার্স নিলে তখনই আমি ওর প্রাইভেট টিউটার হয়ে নিযুক্ত হলাম। আমার মামারা টেরারিস্ট তাই আমি ইংরেজিতে প্রথম শ্রেণীর প্রথম হয়েও চাকরি পাই নি। একটি টিকটিকি (স্পাই) সর্বদা আমার পিছু পিছু ঘুরত। শুনেছিলাম সেও মামাদের দলে ছিল, কিন্তু ধরা পড়ে রাজসাক্ষী হয়ে যায়। অনেক লোকের ফাঁসী এবং দ্বীপান্তর এর তদ্বিরেই হয়েছে। লোকটি আমার পিছনেও ঘোরে। নানা রকম বেশে দেখেছি ওকে। ছুঁচাল ফ্রেঞ্চকাট্ দাড়ি। লম্বা গোঁফ-দাড়ি, কখনও মাথায় বাবরি, গলায় কণ্ঠী, কখনও ক্লীন সেভড। কিন্তু একটি জিনিস ও লুকোতে পারত না। ওর নাকের ডগাটি বাঁকা ছিল। বোধহয় কারো ঘুষি খেয়ে বেঁকে গিয়েছিল। ওর নাম কি জানতাম না। নিজেই নাম দিয়েছিলাম —বি. এন.—বক্রনাসা।

এ লোকটার কথা এসে পড়ল কেন ? ও, আমার মাতুল বংশের পরিচয় দিতে। হ্যাঁ, আমার তিনকুলে কেউ নেই। উঞ্ছবৃত্তি করে জীবনধারণ করি। অপরের নামে নোট বুক লিখে দি, কাগজে প্রবন্ধ লিখে মাঝে মাঝে কিছু টাকা পাই। বাংলাদেশের বাইরের কাগজেই প্রায় আমার লেখা ছাপা হয়। বাংলাদেশে আমি কলকে পাই নি। কারণ কোন সম্পাদক মণ্ডলীর চামচে হতে পারি না। বিলেতের কাগজেও

মাঝে মাঝে লেখা ছাপা হয়েছে। ভাল টাকাও দিয়েছে তারা। এদেশে প্রাইভেট টিউশনি করি, নোট বুক লিখি। স্বপাকে রান্না করে খাই। মোটামুটি চলে যায় এক রকম। মীনাকে ভালবাসি। কিন্তু তাকে বিয়ে করবার কথা মনে হয় নি কখনও। আমার টানাটানির সংসারে ওকে আনলে কষ্ট দেওয়া হবে, এই কথাই মনে হয়েছে বার বার। মীনা গরীবের মেয়ে। মা-বাবার অবস্থা তেমন ভাল নয়। মীনার রূপেরও জোলুষ নেই তেমন। বিদ্যার জোলুষ কিন্তু আছে। এম. এ., পি. এইচ. ডি। ও যদি ফ্লাট গোছের মেয়ে হত তাহলে ওর পাত্র বহু আগেই জুটে যেত। কিন্তু মুখচোরা লাজুক মেয়ে। অকারণে পুরুষদের কাছে গিয়ে যৌবন হিল্লোলিত করে না। তাই বিয়ে হয় নি। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। কলেজে চাকরি করে। ওর এক ভাই থাকে কাশীতে। ওর মা-বাবা কাশীতে গিয়েই থাকতে চান, কিন্তু মীনাকে কে দেখবে—ও একা কি ভাবে বাড়িতে থাকবে—এইসব সমস্যা তাদের কাশী যাওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি করেছে। মীনা বলছে—আমি হস্টেলে থাকব তোমরা দাদার কাছে চলে যাও। কিন্তু তার বাবা-মা তাতেও রাজী নন। তাদের ইচ্ছা মেয়েকে একটি সৎপাত্রে দান করে তবে কাশী যাবেন, কিন্তু মনোমত পাত্র জুটছে না। কারণ এদেশে সৎপাত্র নেই। সবাই চায় রূপ, রূপিয়া, গাড়ি, বাড়ি। পাত্রটির খবর নিলেই দেখা যায় সে হয় মাতাল না হয় চরিত্রহীন। লেখাপড়ায় মীনার সমকক্ষ নয়। অধিকাংশই চালিয়াত গোছের।

ইস্ এ কি হল। চারদিক মেঘে ঢেকে এল যে আবার। মেঘ ডাকতে লাগল। তারপরই শুরু হয়ে গেল বৃষ্টি। বেশ জোর বৃষ্টি। ঘড়িতে দেখলাম সাড়ে এগারোটা বেজেছে। মীনা বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছে কি ? প্রতি রবিবার সে আমার এখানে খায়। আমি তার প্রিয় কোনও তরকারি রেঁধে রাখি, সেও আমার জন্যে আমার প্রিয় কোন তরকারি রেঁধে আনে। তারপর ও এলে ভাত চড়িয়ে দিই। দুজনে খাই এক সঙ্গে। এ-রকম অনেকদিন থেকেই চলছে। এ রবিবার সে আসবেই। কারণ একটা দরকারী কথার আলোচনা করতে হবে আজ। কিছুদিন অগে রাঁধতে গিয়ে আমার কাপড়ে আগুন ধরে যায়। কিছুদিন হাসপাতালে থাকতে হয়। বেশী কিছু হয় নি। তবু দিন সাতেক হাসপাতালে থাকতে হয়েছিল। মীনা রোজ আমাকে দেখতে যেত হাসপাতালে।

একদিন বলে বসল—"আর আমি আপনাকে একা থাকতে দেব না।"

"দোকা হব কি করে ?"

"আমি থাকব আপনার কাছে—"

"সে কি।"

"হ্যাঁ, আমি ঠিক করে ফেলেছি। বাবা-মা কাশী চলে যান—"

তার কণ্ঠস্বরে সেদিন যে দৃঢ়তা লক্ষ্য করলাম তাতে অবাক হয়ে গেলাম আমি।

"আমার মত না নিয়েই তুমি ঠিক করে ফেললে—"

"আপনি যদি আপত্তি করেন তাহলে অবশ্য হবে না—"

মাথা হেঁট করে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে রইল সে। একটু পরে লক্ষ্য করলাম সে কাঁদছে। মীনাকে কখনও কাঁদতে দেখি নি।

বললাম—"আচ্ছা, কাল তো বাড়ি ফিরছি, তখন ভেবে দেখব। আসছে রবিবার তুমি এসো। সেই দিনই আমার উত্তর তোমায় জানাব।"

আজ সেই রবিবার। মীনা নিশ্চয় আসবে! কিন্তু এত বৃষ্টিতে একেবারে ভিজে যাবে যে। একটু পরেই কিন্তু বৃষ্টিটা থেমে গেল। আর একটু পরে রোদও উঠল একটু।

তারপরই সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম। আপাদমস্তক ভিজে মীনা এসে ঘরে ঢুকল। তার হাতে একটি বাটি খবরের কাগজ দিয়ে মোড়া।

"আপনি এখনও খান নি ?"

"তুমি না এলে কি করে খাব ? ইস, একেবারে ভিজে গেছ। পাশের ঘরে গিয়ে কাপড়টা ছাড়। আমার শুকনো ধুতি আছে। ইনি কে ?"

একটি নুব্জ দেহ বৃদ্ধও কাশতে কাশতে তার সঙ্গে এসেছিল।

"ইনি আপনার বাড়ির নম্বর খুঁজছিলেন। আমাকে জিজ্ঞেস করাতে আমি বললাম আমি সেইখানেই যাচ্ছি, চলুন। তখন উনি আমাকে ওর মোটরে তুলে নিলেন।" মীনা পাশের ঘরে কাপড় ছাড়বার জন্য চলে গেল।

ভদ্রলোক ভিতরে এসে বসতেই লক্ষ্য করলাম তাঁর নাকটা বাঁকা। বি. এন. কে মনে পড়ল। জরার প্রভাবে গাল টাল তুবড়ে গেছে। গলার চামড়া ঝুলছে।

"আপনি কে ?"

"আমি একজন মহাপাপিষ্ট—"

"ঠিক বুঝতে পারছি না। আপনার পরিচয় দিন—"

"ওই আমার সত্য পরিচয়।"

"আমার কাছে কি প্রয়োজন ?"

"আপনার কাছে মার্জনা ভিক্ষা করতে এসেছি—"

"কেন ?"

"আমি এককালে অনুশীলন সমিতির সদস্য ছিলাম। শ্রীঅরবিন্দের সামনে বুকের রক্ত দিয়ে মা কালীর সামনে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম—যে স্বদেশ উদ্ধারের জন্য প্রাণ পণ করলাম। আপনার দুই মামাও আমাদের সঙ্গে ছিল। তারা দুজন পুলিস ইন্‌সপেকটারকে হত্যা করেছে। আদালতে কিন্তু সেটা প্রমাণ হয় নি। আমিও ছিলাম তাদের সঙ্গে। আমি প্রলোভনে পড়ে এবং মারের চোটে রাজসাক্ষী হয়ে গেলাম। আমার জন্যেই তারা আন্দামানে চালান হয়ে গেল। বীর ছিল তারা। সেখানেও তারা ব্রিটিশ পুলিসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। তাদের সেখানে গুলি করে মারা হয়। আমি কিন্তু টেগার্ট সাহেবের খুব প্রিয় পাত্র হয়ে গেলাম। অনেক স্বদেশী ছেলেকে ধরিয়ে দিয়েছি। অনেক বাড়িতে হাহাকার তুলেছি। অনেক টাকা কামিয়েছি। টেরারিস্টরা আমাকে শাস্তি দিতে পারে নি। একজনের ঘুষিতে আমার নাকটা বেঁকে গেছে খালি। কে সে জানেন ? আপনার বড় মামা। তবে ভগবান কিন্তু আমায় রেহাই দেন নি। আমার চারটি উপযুক্ত ছেলে একে একে মারা গেছে। আমার স্ত্রী গলায় দড়ি দিয়েছে।" এই পর্যন্ত বলে ভদ্রলোক খুব কাশতে লাগলেন।

"এত কাশছেন কেন ?"

"লাংসে ক্যানসার হয়েছে। আমি অনেক কষ্টে আপনার ঠিকানাটা যোগাড় করেছি—"

শুনতে পেলাম পাশের ঘরে মীনা স্টোভ জ্বেলে ভাতের জল চড়াচ্ছে।

"আমি আপনার কি করতে পারি বলুন—"

"এই মহাপাপিষ্ঠকে ক্ষমা করুন। আপনার পা দুটো আমার মাথায় চাপিয়ে দিন। আর বুকে। বুকে বড় ব্যথা—"

ভদ্রলোক হঠাৎ আমার পা দুটো জড়িয়ে ধরলেন।

বিব্রত হয়ে পড়লাম খুব।

"ছি ছি, ও কি করছেন। বসুন, উঠে বসুন—"

ভদ্রলোক আমার পায়ে মাথা ঠুকতে লাগলেন। অনেক কষ্টে অনেক সান্ত্বনা দিয়ে ভদ্রলোককে তাঁর গাড়িতে তুলে দিয়ে এলাম।

"আপনার নামটি তো বললেন না?"

"আমার নাম হওয়া উচিত ছিল কুলাঙ্গার। কিন্তু আমার বাবা নাম রেখেছিলেন কুলপ্রদীপ। গভর্ণমেণ্টের খাতায় কিন্তু আমার অনেক নাম। সত্যিই ক্ষমা করেছেন তো? বলুন, বলুন—"

ভদ্রলোক আমার দুহাত ধরে কাঁদতে লাগলেন।

বললাম, "করেছি। মানুষ অবস্থার বিপাকে পড়ে অনেক সময় অনেক কুকাজ করে—"

"না, না, আমি ইচ্ছে করে পয়সার লোভে করেছি। আমি মহাপাপিষ্ঠ।"

ঠাস ঠাস করে নিজের গালে চড় মারলেন। অতি কষ্টে তাকে মোটরে তুলে দিলাম। দেখলাম একজন বলিষ্ঠ পাঞ্জাবী ড্রাইভার তার গাড়ি চালাচ্ছে।

উপরে উঠে এলাম।

"আমার জন্যে কি তরকারি এনেছ আজ?"

"সুক্তো। আপনি তো সুক্তোই ভালবাসেন—"

"আমিও তোমার প্রিয় তরকারি রেঁধে রেখেছি।"

"কি?"

"পোস্ত।"

মীনার সঙ্গে বিয়ের একমাস পরে এটর্নির বাড়ি থেকে একটা চিঠি পেলাম। তিনি লিখেছেন শ্রীযুক্ত কুলপ্রদীপ রায় পনেরো দিন আগে মারা গেছেন। তিনি আমাকে তাঁর সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করে গেছেন। বালিগঞ্জের একখানা বাড়ি, ব্যাঙ্কের দশহাজার টাকা, আর লাইফ ইনসিওরেন্সের পঞ্চাশহাজার টাকা আমাকে উইল করে দিয়ে গেছেন তিনি।

তুমি ও আমি

তোমার চিঠি এসেছে। উত্তপ্ত চিঠি। "তুমি প্রতিজ্ঞা করেছিলে—দেবেই, নিশ্চয় দেবে। এখনও পেলাম না। তুমি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করবে ভাবতে পারি নি—।"

তুমি একটা ছোট গল্প চেয়েছিলে। ছোট গল্প কিন্তু মাথায় আসছে না। মহা

মুশকিলে পড়েছি । ভাবছিলাম বসে যদি একটা প্লট এসে যায় মাথায় । প্লট এল না । এল আমার চাকর অর্জুন । বলল—পুরোনো ট্রাংকটা কি এখুনি পরিষ্কার করব ?

বললাম—কর ।

পুরোনো ট্রাংকে পুরোনো বাজে চিঠি আছে অনেক । অর্জুনকে বলেছিলাম ওগুলো ফেলে দিয়ে ট্রাংকটা খালি কর ।

অর্জুন ট্রাংকটা আমার সামনে এনে খুলে বার করতে লাগল গোছা গোছা চিঠি । তার মধ্যে হঠাৎ নজরে পড়ল তোমার একটা পুরোনো চিঠি রয়েছে । সেই বেগুনী রঙের কালী আর ফিকে নীল রঙের খাম—ভুল হবার নয় । খুলে পড়লাম । দেখলাম এ চিঠিও বেশ উত্তপ্ত ।

“তোমার জন্যে নিজের হাতে মোগলাই পরোটা করেছিলাম । তোমার অপেক্ষায় বসেছিলাম রাত দশটা পর্যন্ত । কিন্তু তুমি এলে না । প্রতিজ্ঞা করলাম— আর কখনও তোমাকে নিমন্ত্রণ করব না, চিঠিও লিখব না ।”

চিঠিটা বছর তিনেক আগে লেখা ।

তারপর তুমি বহুবার নিমন্ত্রণ করেছো আমাকে । বহুবার চিঠিও লিখেছ । অর্থাৎ তুমিও প্রতিজ্ঞা রাখতে পার নি । প্রতিজ্ঞা সব সময় রাখা যায় না । সমস্ত ব্যাপারটা টুকে তোমাকে পাঠাচ্ছি । জানি না এটা ছোট গল্প হল কি না । এবং তোমার রাগ কমল কি না ।

তিস্তা

তিস্তা কিছুতে খাবে না । দুধ খাবে না, ভাত খাবে না, লুচি, রুটি, সন্দেশ কিছু খাবে না । তার লোভ কেবল আচারে । চাকর অর্জুন তাকে ভয় দেখায়—ওই কোলা ব্যাঙ আসছে শিগ্‌গির খেয়ে নাও । তিস্তার বয়স দু'ছর ।

সে আধো-আধো কথায় জিজ্ঞেস করে—কই কোলা ব্যাঙ ?

ওই জানলা দিয়ে আসবে ।

তিস্তা ছুটে পালিয়ে যায় । দুধ খায় না । ভাত খাওয়াতে বসে অনিমা দি । তিস্তা কিছুতেই মুখে তোলে না ভাত । অনিমাদি বলে—ওই জুজুবুড়ী আসছে । শিগ্‌গির খেয়ে নাও—

তিস্তা জিজ্ঞেস করে—কই জুজু বুড়ী ?

ওই জানলা দিয়ে আসবে ।

তিস্তা উঠে পালিয়ে যায় । ভাত খায় না । তিস্তার মা মোহনভোগ নিয়ে সাধাসাধি করছে ।

খা না একটু—

তিস্তা মুখ ফিরিয়ে নেয় ।

খাবে না—

হালুম বুড়ো আসবে এখুনি—

কই হালুম বুড়ো ?

ওই জানলা দিয়ে আসবে।

ভাঙা জানলাটা দেখায় তার মা।

পালিয়ে যায় তিস্তা। খায় না।

কোলা ব্যাঙ, জুজু বুড়ী আর হালুম বুড়ো এই তিনটে জীব কি রকম? ওই ভাঙা জানলাটার ওপারে তারা থাকে? কেমন দেখতে? কৌতুহল হয় তিস্তার। ভয়ও করে। একদিন ছবি টাঙাবার জন্যে অর্জুন একটা ছোট টেবিল নিয়ে এল জানলাটার ধারে। ওই ভাঙা জানলাটার ওপরই ছবি টাঙানো হল একটা। টেবিলটা কিন্ত অর্জুন তখনই সরিয়ে নিয়ে গেল না। দুপুর বেলা। সবাই ঘুমোচ্ছে। তিস্তার ঘুম ভেঙে গেল। তার পিসি সেইদিনই তাকে একটা খেলার বন্দুক কিনে দিয়েছে। সেইটে নিয়েই ঘুমেয়েছিল সে। পিসি তাকে বলেছিল—এই বন্দুক দিয়ে তুমি কোল ব্যাঙ, হালুম বুড়ো, জুজু বুড়ী সবাইকে তাড়িয়ে দিতে পারবে।

বন্দুকটি হাতে নিয়ে আস্তে আস্তে উঠল তিস্তা। ভাঙা জানলার কাছে গিয়ে টেবিলটার পাশে দাঁড়াল। ভয়ে বুকটা কেঁপে উঠল একটু। তবু সাহস সঞ্চয় করে সে উঠে পড়ল টেবিলের উপর বন্দুকটা নিয়ে। ভাঙা জানলাটার ফাঁক দিয়ে দেখল দেওয়ালের উপর গুটিসুটি হয়ে একটা বেড়াল বসে আছে।

তুমি কি কোলা ব্যাঙ?
তুমি কি জুজু বুড়ী?
তুমি কি হালুম বুড়ো?
বিড়াল বলল—মিউ।

হরু নিরক্ষর

স্থান একটি পল্লীগ্রাম। গ্রামের মুকুটমণি বিলাসবাবুর বাড়ি। রাজনীতি ক্ষেত্রে, বাণিজ্যের জগতে তাঁহার বিরাট নাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ. উপাধিও আছে তাঁহার। দোর্দণ্ড প্রতাপ ব্যক্তি। সেদিন তাঁহার বাড়িতে অনেক বন্ধু-বান্ধব আসিয়াছেন। একটি ঘরে খিল দিয়া আড্ডা জমাইয়াছেন তাঁহারা। একটি সুকণ্ঠী যুবতী রবীন্দ্র সঙ্গীত গাহিতেছেন। মদ চলিতেছে।

বাহিরের ঘরে ইলেকট্রিক বেল বাজিয়া উঠিল। দারোয়ান কপাট খুলিয়া দেখিল—হরু গোয়ালা আসিয়াছে।

"আজ বাবুর সঙ্গে দেখা হবে না।"

"বাবু কিন্তু আজ আমাকে আসতে বলেছিলেন।"

"আজ দেখা হবে না।"

হরু চলিয়া গেল।

হরুর বউ উৎসুক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

"টাকা পেলে?"

"না আজ দেখা হ'ল না।"

"তিন মাসের দুধের দাম বাকি। আমাদের চলবে কি করে ?"

হরু চুপ করিয়া রহিল।

হরুর বউ বলিল—"কাল থেকে দুধ বন্ধ করে দেব।"

হরু মৃদু হাসিয়া বলিল—"পাগল। তা কি হয়। বাড়িতে তিনটে শিশু। তারা খাবে কি। কারো মায়ের বুকে দুধ নেই—"

"আমাদের টাকা না দিলে চলবে কি করে—"

"দেবে, দেবে, টাকা দেবে। ব্যস্ত হও কেন—" হরু হাসি মুখে স্ত্রীর দিকে চাহিল।

হরু নিরক্ষর।

বীরেনবাবুর গঙ্গাস্নান

বীরেনের সঙ্গে বাল্যকালে এক স্কুলে পড়েছিলাম। তারপর আর তার সঙ্গে দেখা হয়নি। ত্রিশ বছর পর শিলং শহরে হঠাৎ শুনলাম বীরেন এখানকার স্কুলে মাস্টার হয়ে এসেছে। আমি শিলং শহরে ওকালতি করছি তখন। খোঁজ নিয়ে একদিন সন্ধ্যাবেলা তার বাড়ি গেলাম। শুনলাম সে বাড়িতে নেই। পরদিন স্কুলে ফোন করলাম। ফোনে পেলাম তাকে। পরিচয় দিতে সে আমাকে চিনতে পারল, দেখলাম আমাকে ভোলেনি সে। বললাম—"আজ সন্ধ্যায় তোমার বাড়িতে যাব। বাড়িতে থেকো।"

"সন্ধ্যার সময় এসো না। সে সময় আমি গঙ্গাস্নান করতে যাই। রবিবার সকালে এসো—"

"গঙ্গা-স্নান ? শিলং-এ গঙ্গা কোথায় ?"

"আমি যে গঙ্গায় স্নান করি সে গঙ্গা সব দেশে আছে—"

"তার মানে ?"

"আমি রোজ সন্ধ্যায় লাইব্রেরীতে গিয়ে পড়াশুনা করি। গঙ্গাস্নানের পুণ্য এবং আনন্দ লাভ হয়—"

এর উত্তরে কি যে বলব ভেবে পেলাম না।

স্রষ্টা

গোল করে পাকানো সাদা কাগজটি আলমারির ভিতর অনেকদিন ছিল। বেশ নিশ্চিন্ত আরামে ছিল সে। একদিন হঠাৎ চিত্রকর বার করল তাকে। রবার ব্যান্ডটা খুলে ফেলে গোল করে পাকানো কাগজটা চওড়া করে রাখল টেবিলে।

এ কি—এ কি করছেন আপনি ? চীৎকার করে উঠল কাগজটা। কিন্তু সে চিৎকার চিত্রকরের কানে গেল না। কাগজের ভাষা মানুষে শুনতে পায় না। চিত্রকর কাগজটা তুলে নিয়ে একটা কালো বোর্ডের উপর সেটাকে রেখে চার কোণে কাঁটা মেরে টান করে আটকে দিল সেটাকে। তারপর !

চীৎকার করতে লাগল কাগজটা।

চিত্রকরের ভ্রূক্ষেপ নেই।

তারপর একটা তুলিতে খানিকটা কালো রং নিয়ে মাখিয়ে দিল কাগজের উপর।

কাগজ প্রতিবাদ জানাল—আমার সাদা রংকে তুমি কালো করছ কেন ?

প্রতিবাদ শুনতে পেল না চিত্রকর।

সে আর একটা তুলিতে বাদামী রং নিয়ে ছপ্ ছপ্ করে লাগাতে লাগল আবার।

এ কি—এ কি কাণ্ড !—আর্তনাদ করে উঠল কাগজ।

চিত্রকর নির্বিকার।

তারপর সে নীল, সবুজ, হলুদ, গোলাপী নানা রকম রং পরপর লাগিয়ে যেতে লাগল।

কাগজের আর্ত হাহাকার তার কানেই এল না। ঘণ্টা দুই ধরে ছবি আঁকা চলল। কাগজের হাহাকার, অনুনয়, আবেদন—কোন কিছুই বিচলিত করল না স্রষ্টাকে। আঁকা যখন শেষ হোল তখন একটু দূরে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল সে ছবিটাকে। পছন্দ হল না। ছবিটা বোর্ড থেকে নামিয়ে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে দিল সে।

তারপর আর একটা কাগজ নিয়ে এল।

সিঁড়ি

সৌরভ সেন অদ্ভুত প্রকৃতির লোক ছিলেন এবং তাঁর অদ্ভুত প্রকৃতির খেয়ালে চলবারও সুযোগ পেয়েছিলেন জীবনে। কারণ তাঁর টাকার অভাব ছিল না। তাঁর বাবা মা দুজনেই যখন মারা গেলেন এক বছরের মধ্যে তখন সৌরভের বয়স দশ বছর। অভিভাবক হবার মতো নিকট আত্মীয় স্বজন কেউ ছিল না। সৌরভকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছিল তাদের চাকর জগনু। জগন্নাথের এ সংক্ষিপ্ত নামকরণ সৌরভই করেছিল। সেই নামটিই টিঁকে গেছে। সৌরভের বাবা-মায়ের মৃত্যুর পর জগনুই গিয়ে পিতৃবন্ধু জজ যোগেনবাবুকে খবর দেয়। তিনিই এসে সৌরভের বিশাল সম্পত্তির ব্যবস্থা করে দেন। একজন প্রবীণা গৃহ-শিক্ষয়িত্রী নিয়োগ করেন। তিনি ছিলেন সন্তানহীনা বিধবা, সেকালের এম. এ. পাস। একটি কলেজে প্রফেসারি করতেন। প্রফেসারি থেকে রিটায়ার করে বসেছিলেন, যোগেনবাবু তাঁকে মাসিক পাঁচশো টাকা বেতনে নিযুক্ত করলেন এবং বললেন, আপনি ওই বাড়িতে গিয়ে থাকুন। সৌরভকে মানুষ করুন। ওকে এখন স্কুলে দিতে চাই না। ও প্রাইভেটে আপনার কাছে পড়েই ম্যাট্রিক পাস করুক। তারপর একেবারে কলেজে পড়বে।

ভদ্রমহিলার নাম ছিল স্নেহপূর্ণা দেবী। তিনি যোগেনবাবুকে শুধু একটি প্রশ্ন করেছিলেন, আইনত আপনি কি ওর অভিভাবক ?

যোগেনবাবু উত্তর দিয়েছিলেন, হ্যাঁ। ওর বাবা গৌরব আমার সহপাঠী ছিল। ওর স্ত্রী যখন মারা গেল এবং তারপর যখন ওর নিজের ক্যানসার ধরা পড়ল তখন ও একটি উইল করে আমাকে ওর অভিভাবক করে গেছে। সৌরভের বয়স যখন চব্বিশ বছর হবে তখনই ও বাবার সম্পত্তি পাবে। তার আগে পর্যন্ত আমি অভিভাবক

থাকব। আপনি ওর ভালর জন্য যা উচিত মনে করেন করবেন। টাকার অভাব নেই ওর। ওর বাবা যথেষ্ট রেখে গেছেন, মাসে প্রায় একলাখ টাকা সুদই পায়। তাছাড়া কলকাতায় বাড়িও আছে চার-পাঁচটা। বর্ধমানে ধানের জমিও অনেক। ওর টাকার অভাব নেই। আপনার ওপর ভার দিচ্ছি আপনি ওকে মানুষ করে তুলুন। আপনি ওর মা-বাবার স্থান অধিকার করুন। জগনু তো আছেই।

স্নেহাপূর্ণা দেবী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যথাসাধ্য চেষ্টা তিনি করবেন। এবং যথাসাধ্য চেষ্টাও করেছিলেন তিনি। সৌরভ আঠারো বছর বয়সে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করল তিনটে লেটার এবং স্কলারশিপ নিয়ে। ও লেখাপড়ায় বরাবর ভাল ছেলে ছিল। বরাবর প্রথম বিভাগেই পাস করেছে। ইংরেজীতে এম. এ দিয়েছিল। ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছিল। কিন্তু প্রথম বা দ্বিতীয় হতে পারেনি। স্নেহপূর্ণা আশা করেছিলেন ও প্রথম হবে। স্নেহপূর্ণা রোজ ডাইরি লিখতেন। সেই ডাইরিতে একটি আশ্চর্য কথা লিখেছিলেন তিনি—

আমি আজ সৌরভের একটা কথা শুনে বড় বিস্মিত হলাম। ওকে যখন বললাম, আমি আশা করেছিলাম তুই আরও উঁচুতে উঠবি। কিন্তু এ কি হল! সৌরভ উত্তর দিয়েছিল, আমি অনেক উঁচুতে উঠব কিন্তু ঠিক সিঁড়িটা খুঁজে পাচ্ছি না। আমি শুনে আশ্চর্য হয়ে গেলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, সিঁড়ি? কিসের সিঁড়ি? সৌরভ বলল, তা আমিও জানি না ঠিক—

এর পরই স্নেহপূর্ণা দেবী মারা যান। যোগেনবাবু তখনও বেঁচে ছিলেন। তিনি সৌরভকে তার পিতার বিশাল সম্পত্তির মালিক করে দিলেন তারপর। তারপর তিনিও মারা গেলেন।

সৌরভ যখন তার সম্পত্তির পুরোপুরি মালিক হল তখন নানা খেয়ালে মেতে উঠল সে। দিনকতক মাতল ফুল নিয়ে। নানারকম ফুল নিয়ে চমৎকার বাগান করল একটি। তাই নিয়ে মেতে রইল দিনকতক। কিছুদিন পরে কিন্তু তা আর ভাল লাগল না। বেরিয়ে পড়ল দেশ ভ্রমণে। প্রায় বছর দুই ঘুরে বেড়ালো নানা জায়গায়। ইয়োরোপ আমেরিকা চীন জাপান মিশর পারস্য তুর্কিস্থান আরো অনেক জায়গায়। শেষ পর্যন্ত কিন্তু তাও ভাল লাগল না। বাড়ি ফিরে এসে সংস্কৃত পণ্ডিত রেখে শাস্ত্র অধ্যয়নে মন দিল। তাও ভাল লাগল না কিছুদিন পরে। সে সিঁড়ি খুঁজছিল। পাচ্ছিল না। তারপর পুরাতন শিলালিপি আর পুরাতন ছবি সংগ্রহ করতে যখন সে ব্যস্ত তখন তার দেখা হল ছবিওয়ালা রতনলাল মুস্তাফির সঙ্গে। রতনলাল একজন গুণী লোক। অশ্লীল ছবি চড়া দামে বিক্রি করাই তার প্রধান ব্যবসা। কিন্তু পৃথিবীর অনেক ভাল ছবির, আশ্চর্য ছবির, অদ্ভুত ছবির খবরও সে রাখে। ভাল ছবির সমঝদার সে একজন। সৌরভ প্রায়ই তার দোকানে যেত। একদিন গিয়ে দেখে তার ঘরে প্রকাণ্ড একটা ছবি রয়েছে। ছবিটা ঘরের মেঝে থেকে ঘরের ছাদ পর্যন্ত লম্বা। চওড়াও প্রায় হাত দুয়েক হবে। আর সেটা আপাদমস্তক কাগজ দিয়ে কাপড় দিয়ে ঢাকা।

নতুন ছবি এসেছে দেখছি একটা—

রতন সসম্ভ্রমে উত্তর দিল, আজ্ঞে হ্যাঁ, কাল বিকেলে এসেছে—

খোল, দেখি কি রকম ছবি?

খোলা যাবে না স্যার। যিনি চিত্রকর তিনি একজন তিব্বতী লামা বলে মনে হল। এ-ও মনে হল তিনি শুধু চিত্রকর নন, হয় বড় গণৎকার নয় যাদুকর। মোট কথা সাধারণ লোক নন তিনি। তিনি বললেন এ ছবিটা আপনার কাছে রেখে যাচ্ছি। এ ছবির ক্রেতা নিজেই আপনার কাছে আসবেন। দাম বললেন—পাঁচ হাজার টাকা। কিন্তু ছবিটি মোড়ক সুদ্ধ কিনতে হবে। কেনার আগে ছবি দেখতে পাবেন না। বাড়ি গিয়েই দেখবেন। ছবি না দেখেই ছবিটি কিনতে হবে তাঁকে। এ ছবি বিক্রি করে পাঁচ হাজার টাকা যদি পান তাহলে সেটা গরীব দুঃখীদের দান করে দেবেন, তাহলেই আমি পাব—এই বলে সেই অদ্ভুত লোকটা আমাকে নগদ একশো টাকা দিয়ে গেলেন। বললেন, এটা হচ্ছে আপনার কমিশন। আমি আর আসব না। এর ক্রেতা কিন্তু আসবেন এবং এই শর্তেই, অর্থাৎ ছবি না দেখেই ছবিটা কিনে নিয়ে যাবেন। এই বলে সেই গেরুয়া জোব্বা পরা লোকটি চলে গেল।

আশ্চর্য তো! কি ভাষায় কথা বললেন তোমার সঙ্গে?

ইংরেজি—

দেখতে কেমন?

মঙ্গোলিয়ান চেহারা। অনেকটা চীনাম্যানের মতো। চোখ মুখের ভাব কিন্তু গম্ভীর, আর পবিত্র। দেখলে ভক্তি হয়।

সৌরভ দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ ভ্রূকুঞ্চিত করে। তারপর বলল, ওটা আমিই কিনব। আমার বাড়িতে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা কর। আমি তোমাকে চেক লিখে দিচ্ছি। সৌরভ চেক লিখে দিয়ে বাড়ি চলে গেল।

রতনলালের কাছে সৌরভ অনেক মূর্তি অনেক ছবি কিনেছে। সৌরভের বাড়ির ঠিকানা তার জানা ছিল।

সৌরভের পাঁচতলা প্রকাণ্ড বাড়ি। লিফ্‌ট আছে। একটু পরে স্বয়ং রতনলাল হাজির হল ছবিটা নিয়ে।

কোথায় রাখবেন? আমি ঠিক করে টাঙিয়ে দিয়ে যাচ্ছি।

পাঁচতলায় আমি শুই। আমার খাটের পায়ের দিকের দেওয়ালটা সম্পূর্ণ ফাঁকা আছে। সেইখানেই টাঙাব ভাবছি।

বেশ তো—

ছবির মোড়ক খুলে দুজনেই মুগ্ধ হয়ে গেল। ছবিটি একটি সিঁড়ির ছবি। পৃথিবী থেকে একসারি সিঁড়ি উঠে গেছে আকাশের দিকে এঁকে বেঁকে, তারপর মিলে গেছে মহাশূন্যে। ওপরে উঠবার জন্য এই রকম সিঁড়িই কি খুঁজছিল সৌরভ? খুঁজছিল। কিন্তু জানত না যে খুঁজছিল। তার অবচেতন মনের ছবিটি অদ্ভুত নিপুণতা সহকারে এঁকেছেন শিল্পী। তার মনে হল এমন অপূর্ব ছবি সে আগে দেখেনি। বাড়ির ঝি চাকর সবাই এসে দেখল ছবিটি। সবাই মুগ্ধ হল। সবাই যখন চলে গেল সৌরভ গেল না।

রাঁধুনি এসে বললে, খাবার দেওয়া হয়েছে বাবু—

খাবার এইখানেই নিয়ে আয়—ছবির সামনে বসেই সে খাবার খেল। তারপর ছবির দিকে চেয়েই বসে রইল সে। সমস্ত দিন বসে রইল। ছবির ভিতর আরও কি যেন প্রত্যাশা করছিল সে। সন্ধ্যার একটু আগে উত্তেজিত হয়ে সে দাঁড়িয়ে উঠল চেয়ার

থেকে। সিঁড়ি যেখানে শেষ হয়েছে, সীমা যেখানে অসীমে হারিয়ে গেছে, ঠিক সেইখানেই একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে মনে হল। ধরা-অধরার মাঝখানে অপরূপ মেয়ে একটি। তার দিকে চেয়ে হাসছে। সন্ধ্যার আঁধার ঘনিয়ে আসতে লাগল ক্রমশ। সৌরভ উঠে আলমারি থোক পাঁচশো ওয়াটের বড় বাল্ব বার করে লাগিয়ে দিলে একটা টেবিল ল্যাম্পে, তারপর সেটাকে বেঁকিয়ে দিলে যাতে সমস্ত আলোটা ছবির ওপর পড়ে।

উদ্ভাসিত হয়ে উঠল ছবিটা। সৌরভ লক্ষ্য করল মেয়ের মূর্তিটি আর একটু বড় হয়েছে। তার মনে হল মেয়েটি যেন সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছে।

রোমাঞ্চিত হয়ে বসে রইল সে। মেয়েটি সত্যিই নেমে আসছিল, সিঁড়ির বাঁকে যখন আসছিল তখন লুপ্ত হয়ে যাচ্ছিল খানিকক্ষণের জন্য। বাঁক ঘুরলেই দেখা যাচ্ছিল। আরো স্পষ্টতর হয়ে উঠছিল মূর্তিটা।

চাকরটা এসে প্রশ্ন করল, খাবার আনব ?

না। আমি রাতে কিছু খাব না। তোমরা কেউ ওপরে এসো না এখন। সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে সে আলোকিত ছবিটির দিকে চেয়ে নেমে গেল। কপাটটা ভেজিয়ে দিলে সৌরভ, তারপর চেয়ারে এসে বসে চেয়ে রইল ছবিটার দিকে। হ্যাঁ, নামছে। আরও অনেকখানি নেমেছে। কি চমৎকার রূপ। মনে হয় নারী নয়, যেন দেবী। একটু পরে সে আরও নেমে এলো। তারপর দেখতে দেখতে নেমে এলো তার ঘরের মেঝেতে।

এসেই বলল, চল—

কোথায়—

ওই সিঁড়ি বেয়ে ওপরে যাবে না ? তোমাকে যে অনেক ওপরে উঠতে হবে। তুমি তো মনে মনে এই সিঁড়িই খুঁজছিলে। চল—

চলুন—

মেয়েটি ঘুরে আবার সিঁড়ির ওপর উঠতে শুরু করল। তার অনুসরণ করল সৌরভ। সে আর ফেরেনি।

পরদিন সকালে খবরটা জানা গেল। চাকর খাবার দিতে এসে দেখে সৌরভ নেই। বাল্বটা জ্বলছে। ছবিতে সিঁড়ির ছবিটাও নেই। একটা সাদা ক্যানভাস রয়েছে খালি।

গল্প লেখার গল্প

গল্প কি কৌশলে লিখি তা আমি নিজেই জানি না। আকাশে যেমন মেঘ ভেসে আসে, গাছে যেমন ফুল ফোটে, তেমনি গল্পও মনে আপনি জাগে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, এ হচ্ছে ঊনপঞ্চাশ বায়ুর লীলা। একটা বিশেষ মুহূর্তে কেন একটা গল্পের প্লট হঠাৎ মাথায় আসে তা বলা খুবই শক্ত। আমার মনে হয় যিনি আসল গল্পলেখক তিনি নেপথ্যে বাস করেন। তাঁর যখন গল্প লেখার ইচ্ছা হয়, তিনি আমাকে দিয়ে গল্পটা লিখিয়ে নেন। এইটুকু শুধু বলতে পারি, গল্পের প্লটটা হঠাৎ মাথায় আসে এবং কে যেন ঘাড় ধরে সেটা লিখিয়ে নেন। কে সেই নেপথ্যবাসী জানি না। সমাজে যখন ঘোরাফেরা করি তখন নানারকম নর-নারী দেখতে পাই, তাঁদের ছাপ আমার

মনের উপর পড়ে। শুধু পড়ে না, কল্পনা-রসে জারিত হয়ে সেগুলি চিত্ররূপে রাখা থাকে আমার মনের অবচেতনলোকে। এই নেপথ্যবাসী কবি যখন গল্প সৃষ্টি করতে চান তখন সেই চিত্রশালা থেকেই তিনি চিত্র সংগ্রহ করেন। তিনি খেয়ালী কবি। সব সময়ে যে বাস্তব চিত্র ব্যবহার করেন তা নয়। কাল্পনিক অবাস্তব চিত্রও ব্যবহার করেন অনেক সময়। এর প্রমাণ আমরা কালজয়ী গল্পে দশমুণ্ড রাবণের, রক্তপায়ী ভীমের, সিন্দ্‌বাদ নাবিকের, পারসিউসের, মেডুসার এবং আরও অনেক অদ্ভুত অবাস্তব চরিত্রের দেখা পাই। শুধু দেখা পাই না, দেখা পেয়ে অবাক হই, আনন্দিত হই। মনের নেপথ্যবাসী সেই কবি-সত্তার মর্জির উপরই নির্ভর করতে হয় আমাকে। তাঁর সম্পূর্ণ পরিচয় কি তা জানি না। তাঁকে প্রতিভা বলতে পারেন, ভগবানও বলতে পারেন। তাঁর যখন ইচ্ছা হয় তখন ভালো গল্প লিখতে পারি। তাঁকে উপেক্ষা করে পরের ফরমাসে জোর করে যখন লিখতে যাই, গল্প ওতরায় না। কি যেন একটা অভাব থেকে যায়। কৌশল করে প্লট ভেবে ছক্ এঁকে অঙ্ক কষে প্রথম শ্রেণীর গল্প লেখা যায় না। প্রথম শ্রেণীর গল্প বিদ্যুৎ-চমকের মতো, স্বতঃস্ফূর্ত শতদলের মতো। যখন হয় আপনিই হয়। সেই বিদ্যুৎ-চমকের বা শতদলের রূপটিকে ভাষায় রূপান্তরিত করার নিপুণতাই লেখকের কৃতিত্ব। মনে রাখা উচিত অনাবশ্যক বাগাড়ম্বরে শিল্পের সুষমা নষ্ট হয়।

কপালেতে ছোট্ট টিপ—মানানসই দুল
খোঁপায় গোঁজা টাটকা চাঁপা ফুল
হাত দুটিতে হালকা চুড়ি,
চোখে ভরা লাজ
সত্যিকার সুন্দরীর
আর কি চাই সাজ!

সেকালের এক খোকনের গল্প

সেকালের যে খোকনের গল্পটি আজ লিখছি সে যদি বেঁচে থাকত তাহলে তার বয়স আজ বিরাশী বা তিরাশী হত। লর্ড কার্জন তখন বাংলা দেশকে দু'ভাগ করেছেন। বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনে সমস্ত দেশ আলোড়িত। 'বিদেশী জিনিস বয়কট্' আন্দোলনে স্কুলের ছেলেরা পর্যন্ত যোগ দিয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্' গান তখন জাগিয়ে তুলেছে দেশকে। বঙ্কিমচন্দ্র দেশের লোককে বুঝিয়েছেন আমাদের দেশই আমাদের মা, তিনিই দুর্গা। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে মেতে উঠেছে দেশ। বিশেষ করে মেতে উঠেছে স্কুল কলেজের ছেলেরা। বৃটিশ গভর্ণমেণ্টও ক্ষেপে উঠেছেন খুব। তাঁরা স্কুলে কলেজে নোটিশ পাঠিয়েছেন, যে সব ছেলেরা স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেবে—তাদের শাস্তি দেওয়া হবে। অনেক ছেলের জরিমানা হল। অনেক ছেলের স্কুল থেকে নাম কেটে দেওয়া হল, অনেক ছেলেকে বেত মারা হল, কিন্তু ফল কিছুই হল না। সমানে চলতে লাগল আন্দোলন।

খোকনের বয়স তখন দশ বছর। তাদের মেলায় অনেক রকম মাটির পুতুল বিক্রি

হত। সেই মেলা থেকে খোকন একটি মাটির দুর্গা-প্রতিমা কিনেছিল। ছোট্ট মাটির প্রতিমাটি চমৎকার দেখতে। খোকন তার মাকে এসে বলল—"মা, আমাদের পণ্ডিত মশাই বলেছেন—দুর্গাই দেশমাতা। তাকে রোজ পুজো করতে হয়। আমি কাল দেশমাতাকে পুজো করব মা, তোমার ঠাকুর ঘরে—"

মা বললেন, "ঠাকুর ঘরে অত জায়গা কোথা? বাড়ির সামনে যে উঠোনটি রয়েছে—ওই খানেই কর না। আমি সাজিয়ে দেব এখন।"

সামনে রাস্তা, তার পরই খানিকটা উঠোনের মতো জায়গা, তার পরই খোকনদের বাড়ি। সেই উঠোনেই খোকন চারখানা ইট দিয়ে ছোট্ট বেদী করে ফেলল একটা। সেই বেদীর উপর বিছাল একটা আসন। সেই আসনের উপর বসানো হ'ল দেশমাতাকে তার বন্ধুরা চারটে কঞ্চি কেটে এনে বেদীর চার পাশে পুঁতে দিয়ে তার উপর টাঙিয়ে দিল একটা রঙীন কাপড়। মা গেঁথে দিলেন ফুলের মালা। খোকনের আবদারে ছোট্ট একটি থালায় ভোগও রেঁধে দিলেন। পাড়ার ছেলে মেয়েরা সবাই জুটে 'বন্দেমাতরম্' গান গাইতে লাগল। খোকনের মা তাদের মিষ্টান্ন বিতরণ করলেন—ঘরে অনেক নারকেল—নাড়ু আর মোয়া তৈরি করেছিলেন তিনি। 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনিতে পাড়া মুখরিত হয়ে উঠল। মা বললেন—"আমি এক হাঁড়ি ভাত চড়িয়ে দিচ্ছি, তোরা এখানে খেয়ে যা—"

ছেলেরা চীৎকার করে উঠল—'বন্দেমাতরম্'—একজন ছেলে তাদের পুকুর থেকে পদ্মফুল তুলে এনে দেশমাতার প্রতিমাকে আরও সাজিয়ে দিলে।

এমন সময় এক কাণ্ড ঘটল। সেই রাস্তা দিয়ে হাফ্ প্যাণ্ট পরা একটা লম্বা-চওড়া সাহেব মশ্ মশ্ করে কোথা যাচ্ছিল।

'বন্দেমাতরম্' শুনে দাঁড়িয়ে পড়ল সে।

"হোয়াট্স্ দিস্? কেয়া হ্যায়—"

"দেশমাতার পুজো করছি আমরা। বন্দেমাতরম্—"

সাহেবরা তখন 'বন্দেমাতরম্' শুনলে ক্ষেপে যেত। সাহেব হঠাৎ রেগে গিয়ে—"ডাম্ ইওর দেশমাতা—" বলে বুটসুদ্ধ এক লাথি মারল দুর্গাপ্রতিমার পুতুলের উপর। পুতুল ছিটকে পড়ে ভেঙে গেল।

হাফ্-প্যাণ্ট-পরা সাহেব পিছন ফিরতে না ফিরতেই খোকন তার হাঁটুর পিছন দিকটা কামড়ে ধরল। সাহেব পা ছুঁড়তে লাগল, খোকনকে হাতের বেতটা দিয়ে মারতে লাগল, খোকনকে কিন্তু ছাড়াতে পারল না সে কিছুতে। খোকনের দাঁত সাহেবের মাংসের মধ্যে ঢুকে গিয়ে টাইট হয়ে বসে গেছে। খানিকক্ষণ পরে দেখা গেল খোকনের দু'কস্ বেয়ে রক্ত পড়ছে। সাহেব আর্তনাদ করতে লাগল, খোকন কিন্তু কামড়েই রইল। সাহেব শেষে তাকে টানতে টানতে নিয়ে থানায় গিয়ে হাজির হলেন। তিনি পুলিশেরই বড় সাহেব একজন। থানায় গিয়ে অনেক লোকে মিলে টানাটানি করে খোকনকে ছাড়িয়ে নিল। দেখা গেল খোকনের মুখে খানিকটা মাংস উঠে এসেছে। হাঁটু থেকে হুহু করে রক্ত পড়ছে। কনেষ্টবলরা খোকনকে বেত মেরে মেরে অজ্ঞান করে ফেলল। সর্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেল তার। থানায় গারদে আটকে রেখে দিলে তাকে। গ্রামে হাসপাতাল ছিল না। সাহেবকে ভাল করতে পাঠানো হল দূরের স্টেশনে। ট্রেনে চড়ে তিনি শহরের বড় হাসপাতালে গেলেন।

খোকন তার পর দিনই মারা গেল প্রবল জ্বরে।

সাহেবও নিস্তার পায় নি। যে পা দিয়ে সে খোকনের 'দেশমাতা'-র মুখে লাথি মেরেছিল সে পা কেটে ফেলতে হয়েছিল। সেপ্‌টিক হয়ে গিয়েছিল সমস্ত হাঁটু। এখনও তো অনেকে 'দেশমাতার' মুখে লাথি মারছে। তেমন খোকন আর জন্মাচ্ছে কি?

অতীতের রাণী

কলকাতার একটা বড় রাস্তার মোমাথায় একটা রাস্তার একধারে বসে ছিল বৃদ্ধা ভিখারিণীটা। সামনে একটা টোল-খাওয়া অ্যালুমিনিয়মের বাটি। মাঝে মাঝে করুণ নাকি সুরে বলছে, দু'দিন খাইনি বাবা। দয়া করে কিছু দিন। আশেপাশে সামনে জনস্রোত বয়ে চলেছে। কেউ তার কথায় কর্ণপাতও করছে না। সামনে সিনেমার প্রকাণ্ড একটা বিজ্ঞাপন। সুন্দরী একটি মেয়ের ছবি। ছবিটি নাকি দশম সপ্তাহ চলছে। সিনেমার সামনে তবু এখনও প্রচুর ভীড়।

এই মাগী, সরে বস না। ফুটপাথের মাঝখানে বসে আছে—

দু'দিন খাইনি বাবা। দয়া করে দিন কিছু—

ভদ্রলোকের দয়া হল না। গজগজ করতে করতে চলে গেলেন তিনি।

তারপরই সাইরেন বেজে উঠল। সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল পুলিশরা। মুখ্যমন্ত্রীর মোটর সোঁ করে পার হয়ে গেল। পুলিশতাড়িত একদল লোক উঠে পড়ল ফুটপাথে। বুড়ীর পা মাড়িয়ে দিল। বাটিটা উলটে গেল তার। বুড়ী ফোঁস করে উঠল, আ মর মুখ পোড়া। চোখের মাথা খেয়েছিস নাকি—

রাস্তার মাঝখানে বসেছিস কেন হারামজাদী—

কোথা বসব। বসবার জায়গা দিবি তুই। ফুটপাথ কি তোর বাপের—

লোকটা কোন উত্তর দিল না। সিনেমার টিকিট কিনেছিল সে, তাড়াতাড়ি সিনেমা হাউসের দিকে চলে গেল।

রাস্তার গোলমাল থিতিয়ে গেল কিছুক্ষণের জন্য।

দু'দিন খাইনি বাবা। দয়া করে দিন কিছু—

আবার শুরু করল বুড়ী। কিন্তু পরক্ষণেই এলো একটা বিয়ের প্রসেশন। বাজনা বাজিয়ে বর যাচ্ছে বিয়ে করতে ফুল-দিয়ে-সাজানো মোটরে চড়ে। বুড়ীর ক্ষীণ কণ্ঠ চাপা পড়ে গেল সে গোলমালে। বুড়ী তবু বলতে লাগল, দয়া করে কিছু দিন বাবা।

কেউ তার কথায় কর্ণপাত করল না। প্রসেশন চলে গেল। বুড়ীর নাকি সুর শোনা যেতে লাগল আবার।

এই বুড়ীর যে এককালে রূপ-যৌবন ছিল, সে যে এককালে অনেকের লোলুপ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল তা এখন অনুমান করা শক্ত। তখন তার একজন প্রণয়ী তাকে রাণী বলে ডাকত।

দু'দিন কিছু খাইনি বাবা। দয়া করে কিছু দিয়ে যান বাবা—

সত্যিই সে দু'দিন খায়নি। গলার স্বরটা আর একটু চড়িয়ে চেঁচাতে লাগল সে। হঠাৎ খট করে তার বাটিতে একটা পাঁচ পয়সা পড়ল। বুড়ী ভাবলে পাঁচ পয়সায় কি কিনে খাবে সে? আজকাল পাঁচ পয়সায় পেট ভরে না—

আবার সে নাকি সুরে শুরু করল, দু'দিন কিছু খাইনি বাবু—

আবার রাস্তায় পুলিশরা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। মিছিল আসছে একটা। নেতাদের জিন্দাবাদ ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠল চারদিক। মাঠে সর্বহারাদের একটা বিরাট মিটিং হচ্ছে না কি। বুড়ী ফুটপাথ থেকে মিছিলের দিকে এগিয়ে গেল একটু। ওদের মধ্যে যদি দয়া করে কেউ। কেউ করল না। জিন্দাবাদের গর্জ্জনে ডুবে গেল তার ক্ষীণ আর্তকণ্ঠ। সে পাঁচ পয়সাটা কোমরে গুঁজে তবু চেঁচাতে লাগল বাটিটা উঁচু করে ধরে। কেউ কর্ণপাতও করল না। মিছিল পেরিয়ে গেল।

তখন পুলিশের নজর পড়ল তার ওপর।

তুমি কি করছ এখানে, সর, সরে যাও—

বুড়ীর ধৈর্য্য সীমা অতিক্রম করেছিল। সে বাটিটা ছুঁড়ে দিল পুলিশের মুখের দিকে। পুলিশের মাথার টুপিতে লেগে পড়ে গেল বাটিটা ছিটকে। পুলিশের ব্যাটনের এক ঘায়ে বুড়ীও লুটিয়ে পড়ল পুলিশের পায়ের কাছে। পুলিশের পা দুটো জড়িয়ে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল সে, আমায় জেলে পুরে দাও সার্জেণ্ট সাহেব। আমাকে জেলে পুরে দাও—

জেলে যাবার শখ কেন?

সেখানে রোজ দুটি খেতে পাব। ক্ষিধেয় আমার পেট জ্বলে যাচ্ছে—।

দাবানল

চার বছরের নাতনী তিস্তার ফরমাসে প্রায় রোজই গল্প বলতে হয় আমাকে।

সেদিন সে এসে বলল—দাদা আজ রাজার গল্প বল একটা। তাকে সেদিন যে গল্পটা বলেছিলাম সেইটেই বলছি তোমাদের।

এক ছিল রাজা—তাঁর নাম ছিল ভুনাথ। অত্যন্ত ভালোমানুষ ছিলেন। কাউকে বকতে বা ধমকাতে পারতেন না। তাঁর রাজ্য শাসন করতেন তাঁর মন্ত্রী। রাজার একটি শিবমন্দির ছিল। সেই মন্দিরের ভিতর ছিল ধবধবে শাদা পাথরের তৈরি চমৎকার একটি শিবমূর্তি, রাজা সেই শিবমূর্তির পুজো করতেন।

রাজার দুই রাণী। বড় রাণী আর ছোট রাণী। এদের নিয়ে রাজার মনে বড় অশান্তি। রাজরাণী হলে কি হবে ছোটলোকের মতো ঝগড়াটে আর হিংসুকে। ছোটলোকের মতো গালাগালি, মারামারি, খামচাখামচি, চুল-টানাটানি পর্যন্ত করত তারা। অন্দরমহলে সর্বদা চীৎকার চেঁচামেচি। বাড়িতে কাক চিল পর্যন্ত বসত না। চাকর-বাকররা সন্ত্রস্ত হয়ে থাকত সর্বদা।

বড় রাণী যদি দুল পরলেন কানে ছোট রাণী ছুটে গিয়ে দুল ধরে টান দিলেন—

“এ তো আমার দুল, তুই পরেছিস কেন—” লেগে গেল দুজনে ঝাটাপাটি

মারামারি। ছোট রাণী যদি হার পরলেন গলায় বড় রাণী তক্ষুণি ছুটে এসে ছিনিয়ে নিলেন সেটা তার গলা থেকে।

"আমার হার তুই পরছিস কেন—"

শুরু হয়ে গেল চীৎকার চেঁচামেচি, কান্না।

এই রকম প্রত্যহ।

তুচ্ছ তুচ্ছ কারণে রোজ রোজ এই রকম তুলকালাম কাণ্ড। রাজা ভুনাথ ভালোমানুষ। রাণীদের কিছু বলতে পারতেন না। মন্ত্রীদের পরামর্শ নিতেও লজ্জা হয় তাঁর। ঘরের কেলেঙ্কারির কথা কি বাইরের লোককে বলা যায়? তিনি তাঁর মনের দুঃখ নিবেদন করেন মহাদেবকে।

"হে মহেশ্বর তুমি এর উপায় কর একটা। দয়া কর আমার উপর—"

মহাদেবের মূর্তি নীরব থাকেন। কোন উত্তর দেন না। একদিন রাজা মহাদেবের পায়ের উপর মাথা রেখে কাঁদতে লাগলেন। অনেকক্ষণ কাঁদবার পর হঠাৎ কথা কয়ে উঠলেন মহাদেব।

"ভুনাথ, দুটি বিয়ে করে তুমি নিজের অশান্তি নিজেই ডেকে এনেছ। যাই হোক, আমি ভেবে চিন্তে এর একটা উপায় বের করেছি। দাবানল বলে আমার এক ভক্ত আছে। খুব ক্ষমতাবান লোক সে। অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে। তাকে আমি পাঠিয়ে দেব তোমার কাছে। সে এককালে জাদুবিদ্যায় খুব নাম করেছিল। এখন সে সব ছেড়ে দিয়ে তপস্যা করছে। তপস্যাতেও সিদ্ধিলাভ করেছে সে। আমার মনে হয় সে গিয়ে তোমার সমস্যার সমাধান করতে পারবে। সে একটু উগ্র প্রকৃতির লোক, কিন্তু খুব ক্ষমতাবান। সে যা করবে তাতে বাধা দিও না।"

কিছুক্ষণ পরেই মহারাজ শুনতে পেলেন তাঁর প্রাসাদের সিংহদরজার সামনে দাঁড়িয়ে মোটা বাজখাই গলায় কে যেন খুব জোরে চেঁচিয়ে উঠল—"বোম মহাদেও।"

মহারাজ জানলা দিয়ে দেখলেন জটাজুটধারী প্রায় উলঙ্গ দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ এক সন্ন্যাসী দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর হাতে প্রকাণ্ড এক ত্রিশূল। মুখ-ভরতি দাঁড়ি গোঁফ। প্রকাণ্ড লাল লাল চোখ। মনে হয় মানুষ নয়, প্রকাণ্ড একটা জ্বলন্ত শিখা।

ভুনাথ নিজেই তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলেন এবং ছুটে গিয়ে নিজেই সিংহদরজা খুলে প্রণাম করলেন দাবানলকে।

"তুমিই কি মহারাজ ভুনাথ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"বাবা মহাদেবকে রোজ দিক করছ কেন? কি পিণ্ডি চটকেছ?"

"সব বলছি। ভিতরে আসুন—"

"আগে আমার খাবার যোগাড় কর। আমি সাতদিন অন্তর খাই। আজ আমার খাবার দিন ছিল, কিন্তু বাবার হুকুম—তুমি এখনই যাও। তাই চলে এসেছি। আগে খাই তারপর তোমার কেচ্ছা শুনব—"

"তাই হবে। আপনি ভিতরে চলুন—"

ভিতরে নিয়ে গিয়ে রাজা তাঁকে সোনার সিংহাসন এগিয়ে দিলেন।

"আমি ওসবে বসি না, মাটিতে বসব।" বলেই তিনি ধপ করে মেঝের উপর বসে পড়লেন।

"আগে খাবার আনাও কিছু—"

"কি খাবার আনব বলুন—"

"এক কাঁদি ভালো মর্তমান কলা আনাও, আর ভালো ক্ষীর এক গামলা।"

রাজার আদেশে এক কাঁদি কলা আর ক্ষীর এসে পড়ল।

রাজভৃত্য একটি ভালো মখমলের আসনও এনে বিছিয়ে দিচ্ছিল—

দাবানল বললেন—"মখমলের উপর বসা আমার অভ্যেস নেই। তুমি একঘড়া জল এনে রাখ। আর একটা গামছা—"

দাবানল নিজেই কলার কাঁদি থেকে কলাগুলি ছিঁড়ে নিয়ে ছাড়িয়ে খেতে লাগলেন ক্ষীরে ডুবিয়ে ডুবিয়ে। অনেকক্ষণ সময় লাগল। তাঁর দাড়ি গোঁফ ক্ষীরে মাখামাখি হয়ে গেল।

বললেন— আমি জঙ্গলে একা থাকি। বিশ্বকর্মা আমার আশ্রমের চারদিকে প্রচুর মর্তমান কলার গাছ লাগিয়েছেন। আর কামধেনু আমাকে সাতদিন অন্তর এক গামলা ক্ষীর পাঠিয়ে দেন। তোমার কলা ও ক্ষীর চমৎকার। খুব ভালো লাগল।"

খাওয়া শেষ করে দাবানল ঘড়া থেকে জল নিয়ে নিজের দাড়ি গোঁফ ধুয়ে গামছা দিয়ে হাত মুখ মুছে ফেললেন।

"এইবার বল কি হয়েছে তোমার? বাবাকে অত দিক করছ কেন—"

ভুনাথ সব বললেন তাঁকে। শুনে খেঁকিয়ে উঠলেন দাবানল।

"তুমি দুটো বিয়ে করেছিলে কেন? একটা বিয়ে করেই লোক হিমসিম খায়, তুমি দুটো বিয়ে করতে গেলে! আচ্ছা আহাম্মক লোক তো তুমি। সতীনে সতীনে ঝগড়া তো করবেই। ওই তো নিয়ম—"

ভুনাথ হাত জোড় করে বললেন—"আপনি আমায় উদ্ধার করুন।"

"কোথায় তারা—"

"অন্দরমহলে।"

"চল দেখি—"

দাবানলকে নিয়ে অন্দরমহলে প্রবেশ করা মাত্র নিদারুণ চীৎকার শোনা গেল একটা। ছোট রাণী বড় রাণীর হাত কামড়ে ধরেছে, আর বড় রাণী তার চুল ধরে টানছেন। দাবানল গিয়ে তাদের ঘরের সামনে দাঁড়ালেন। তারপর জোর গলায় আদেশ করলেন—"চুপ কর তোমরা।"

দুই রাণী কেউ গ্রাহ্য করল না তাঁর কথা।

"এখুনি চুপ কর বলছি।"

চুপ করল না রাণীরা। সমানে চেঁচিয়ে যেতে লাগল।

তখন দাবানল তাঁর ত্রিশূল উঁচিয়ে—"চুপ কর বলছি, তা না হলে অভিশাপ দেব।"

জ্বলজ্বল করে উঠল দাবানলের চোখ দুটো।

রাণীরা কিন্তু মোটেই গ্রাহ্য করল না তাঁর কথা। সমানে চেঁচাতে লাগল। তখন দাবানল চিৎকার করে অভিশাপ দিলেন—"তোরা এখুনি পুতুল হয়ে যা।" সঙ্গে সঙ্গে দুই রাণী দুটি পুতুল হয়ে গেল। সব চিৎকার থেমে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

দাবানল তখন রাজা ভুনাথের দিকে চেয়ে বললেন—"আর ওরা ঝগড়াও করবে না, চিৎকারও করবে না। পুতুলরা ঝগড়া করে না। চল, বাইরে যাই এবার।"

বাইরে গিয়ে ভুনাথ প্রশ্ন করলেন—"ওরা কি বরাবরই পুতুল হয়ে থাকবে ?"

"বরাবর। ওদের তাকের উপর তুলে রেখে দাও।"

ভুনাথ তখন বললেন—"আমার গতি কি হবে তাহলে ? আমি কি দুটো পুতুল নিয়ে সারাজীবন থাকব ?"

"তাই থাকো। থাকলে শান্তি পাবে। দুটো খাপ্রাণী বউ নিয়ে এতদিন তো জ্বলে পুড়ে মরছিলে, আর বাবার পায়ে ধরে অতিষ্ঠ করে তুলেছিলে তাঁকে।"

ভুনাথ হঠাৎ দাবানলের পা দুটো জড়িয়ে ধরলেন—"আপনি ওদের আবার মানুষ করে দিন। আমার অদৃষ্টে যা হবার তাই হবে। দয়া করুন—"

হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগলেন ভুনাথ।

দাবানল জ্বলন্ত দৃষ্টি দিয়ে চেয়ে রইলেন তার দিকে। তারপর বললেন—"ওফ্‌ জ্বালালে !"

"আপনি ইচ্ছে করলেই এর একটা সমাধান করে দিতে পারেন। দয়া করুন—"

"চল ভিতরে চল। আর আমাকে একটা চাদর দাও—"

আবার অন্দরমহলে গেলেন তাঁরা।

"বড় চাদর আনো একটা—"

প্রকাণ্ড একটা শাল বার করে দিলেন ভুনাথ।

মহারাণীরা যে ঘরে পুতুল হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল সেই ঘরে ঢুকলেন আবার দাবানল। তাঁর ত্রিশূল উঁচিয়ে বললেন—"আবার তোমরা মানুষ হও, মানুষ হও, মানুষ হও—"

সঙ্গে সঙ্গে মানুষ হয়ে গেল পুতুল দুটি।

দাবানল প্রশ্ন করলেন—"আর তোমরা ঝগড়া করবে ?"

দুই রাণী সমস্বরে বলে উঠল—"না, আর আমরা ঝগড়া করব না। ককখনো না—"

"বেশ তাহলে ওই খাটের উপর দু'জনে পাশাপাশি শোও, দুজন দু'জনকে জড়িয়ে ধরো, গালে গাল ঠেকিয়ে—"

তাই করল রাণীরা।

দাবানল তখন শালটা দিয়ে ঢেকে দিলেন তাঁদের। তারপর ত্রিশূল উঁচিয়ে বললেন—"তোমরা এক হও, এক হও, এক হও—"

তারপর তুলে ফেললেন শালটা। দেখা গেল—দু'জন রাণী নেই। একজন রয়েছেন। তার মুখের আধখানা বড়রাণীর মতো আর আধখানা ছোট রাণীর মতো। দেহ দুটো মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে।

"একি হল !"

বলে উঠলেন ভুনাথ।

"তোমার দুই রাণীই রইল। কিন্তু এক দেহে। ওরা আর ঝগড়া করবে না।"

এই বলেই দাবানল হন হন করে বেরিয়ে গেলেন এবং অদৃশ্য হয়ে গেলেন সঙ্গে সঙ্গে।

আধো-ঘুমে

রিক্‌শায় চড়ে যাচ্ছি। পথ দুর্গম। জল কাদা। মাঝে মাঝে গর্ত। রিক্‌শাওলাটা রোগা। আমার বিশাল বপু। তার উপর আমার কোলের উপর রয়েছে আমার নাতি। রিক্‌শাওলার জামাটা ছেঁড়া। কিন্তু সে দেখলাম একটা শৌখীন প্ল্যাস্‌টিকের মালা পরে রয়েছে। চমৎকার দেখতে মালাটি। আমার নাতি প্রলুব্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে মালাটির দিকে।

একবার আমার কানের কাছে মুখ এনে বললে—"আমাকে ওই রকম একটা মালা কিনে দাও না।"

রিক্‌শাওলাকে জিজ্ঞাসা করলাম—"এ মালা কোথায় কিনেছ?"

"এক বছর আগে কিনেছিলাম চাঁদনিচক থেকে। আমার নাতির জন্যে। এখন ঠিক এই রকম মালা আর পাওয়া যাবে না বোধহয়।"

"তোমার নাতির জন্যে কিনেছিলে, তুমি পরে আছ কেন—"

রিক্‌শাওলা চুপ করে রইল একটু। তারপর বলল—"আমার নাতি মারা গেছে—।"

আমার নাতি আবার আবদার ধরল—"আমাকে একটা ওই রকম মালা কিনে দাও না দাদু।"

"আজ নয়। আর একদিন কিনে দেব। আজ চল বাড়ি যাই আগে। বৃষ্টি পড়ছে।"

বাড়ি পৌঁছে রিক্‌শাওলাকে ভাড়া দিলাম। সে হঠাৎ গলা থেকে মালা খুলে বলল—"খোকা নাও তুমি এটা—"

আমি বললাম—"না, না—সে কি। ও মালা নিতে হবে না।"

"কেন?"

আমি চুপ করে রইলাম।

সে বলল—"আমি গরীব মানুষ, কিন্তু আমি কি উদার হতে পারি না—"

চট্‌ করে ঘুমটা ভেঙে গেল।

স্বপ্ন দেখছিলাম।

সভাপতি

উদীয়মান সাহিত্যিক নীলগোপাল বসাক নকুলগঞ্জ সুশীল গ্রন্থাগারের উদ্বোধন করতে আসছেন। তাঁকে অভ্যর্থনা করবার জন্য স্থানীয় যুবকেরা স্টেশনে সমবেত হয়েছেন। ট্রেন থেকে নামবামাত্র তাঁর গলায় যে মালাটা পরানো হবে সে মালাটাতে মাঝে মাঝে জল ছিটিয়ে সেটাকে টাটকা-ফুলে-গাঁথা মালার গৌরব দান করবার চেষ্টা করছেন অনিল বসু। অনিল বসু আগের দিন মালাটি কোলকাতা থেকে এনেছেন। এ রকম মালা এখানে পাওয়া যায় না। ট্রেন লেট আসছে। উৎসুক চিত্তে প্রতীক্ষা করছেন সবাই।

অনিলবাবু নরেশবাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন, "নীলগোপালবাবুকে আপনি চেনেন তো ? তাঁর লেখা অবশ্য পড়েছি কিন্তু তাঁকে দেখিনি।"

যাঁর নামে সুশীল গ্রন্থাগার তাঁরই পুত্র নরেশ। তিনি বললেন—"আমিও দেখি নি তাঁকে। চিঠিপত্রেই আলাপ হয়েছিল।"

অনিলবাবু চৌকস করিৎকর্মা লোক। ওভারশিয়ারি করেন। তিনি প্রশ্ন করলেন,—"আমাদের মধ্যে কে চেনে তাঁকে ? ট্রেন এলে কি করে বোঝা যাবে তিনি এসেছেন—"

বাবরিচুলওলা ঢিলে-হাতা পাঞ্জাবী গায়ে অমিয় মৃদু হেসে বললে—"যদি আসেন বুঝতে বাকি থাকবে না। এত অচেনাকে যিনি চিনিয়েছেন তাঁকে চিনতে কি দেরি হবে—"

বিষ্ণু বললে—"আমাদের বাটুলো ভালো করে চেনে তাঁকে। পাশাপাশি বাড়িতে বহুদিন ছিল—"

হাওয়াই শার্ট পরা ঘাড় একদম চাঁছা কাবুলী চপ্পল পায়ে বাটুল কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল। অনিল বসু তার দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাতেই সে মৃদু হেসে বললে—"খুব চিনি। উনি রাবড়ি খেতে ভালবাসেন বলে পিসিমাকে দিয়ে ভালো রাবড়িও করিয়েছি আজ—"

ট্রেন এসে পড়ল একটু পরে। প্রথম শ্রেণীর কামরায় একটি মাত্র যাত্রীই ছিলেন। সকলে সেই দিকে গেলেন।

বাটুল নমস্কার করে মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করলে, "চিনতে পারছেন ? আপনার পাশের বাড়িতেই ছিলাম অনেকদিন—"

"পারছি বই কি, তবে চেহারাটা আপনার বদলেছে—"

"আপনার জিনিসপত্র কই—"

"জিনিসপত্র বেশী নেই। ওই সুটকেশটা আর বিছানাটা—"

সুটকেশের উপর ইংরেজীতে নাম লেখা—এন. জি. বসাক। মালা পরিয়ে দেওয়া হল তাঁকে। তারপর সমারোহ করে নিয়ে গিয়ে বসানো হল নরেশবাবুর মোটরে।

সেদিন সভাপতির পদ সত্যিই অলঙ্কৃত হয়েছিল। চমৎকার বক্তৃতা দিয়েছিলেন বসাক মশাই। তাঁর সব বক্তৃতাটা উদ্ধৃত করা সম্ভব নয়। কিন্তু তিনি সেদিন যা বলেছিলেন তার সারমর্ম হচ্ছে "যাঁরা মনে করেন আজকাল বাংলা সাহিত্যের অধঃপতন হয়েছে তাঁদের সাধারণতঃ তিন ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম, যাঁরা পরশ্রীকাতর। তাঁরা কারও ভালো কখনও দেখতে পারেন না। আয়নায় নিজের মুখ দেখেও তাঁরা বিমর্ষ হয়ে যান। সাহিত্যের ভালো তারা সহ্য করবেন কি করে ; দ্বিতীয় দল হচ্ছে মুখ-মেরে যাওয়ার দল। ক্রমাগত ভালো খাদ্য খেতে খেতে মুখ মেরে যায়, ভালো খাদ্যকেও তখন আর ভালো বলে মনে হয় না। এঁদের অনেকটা সেই দশা হয়েছে। এ অবস্থায় অনেক সময় অখাদ্যে কুখাদ্যেও রুচি হয়। এঁরা অনেক সময় বাজে ইংরেজি বই পড়ে বাহবা বাহবা করেন। আর যাঁদের তৃতীয় শ্রেণীতে ফেলেছি—তাঁরা প্রায়ই বৃদ্ধ এবং অসুস্থ। চোখে দেখতে পান না, বাত, বহুমূত্র, ব্লাড প্রেসার প্রভৃতি নানা রোগে সর্বদা পীড়িত হয়ে থাকেন। এঁদের একমাত্র সম্বল অতীতের স্বপ্ন। বর্তমান এঁদের কাছে তুচ্ছ।

বাংলা ভাষায় যা লেখা হচ্ছে তাই যে উৎকৃষ্ট সাহিত্য তা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি এইটেই শুধু বলতে চাইছি বাংলা ভাষাতেও এখনও অনেক ভালো বই লেখা হচ্ছে, হতাশ হবার কোন কারণ নেই।

প্রতিভা-পোষাক প্রকাশনী নামে নূতন একটি প্রতিষ্ঠান হয়েছে। আসবার ঠিক আগেই তাঁরা আমাকে একখানি ক্যাটালগ দিলেন। সেটি আমার সঙ্গেই আছে। আপনাদের গ্রন্থাগারে সেটি দিয়ে যাচ্ছি। এটি ভালো করে পড়ে দেখলেই বুঝতে পারবেন বাংলা ভাষায় কত ধরনের কত রকমের বই লেখা হচ্ছে।…”

বক্তৃতাটি সত্যিই হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল। সভা শেষ করে সেইদিন রাত্রেই ফিরে গেলেন সভাপতি মশাই, গলায় আর এক প্রস্থ মালা পরে। বহুলোক অনুরোধ করেছিল অন্তত আর একবেলা থেকে যাওয়ার জন্য। কিন্তু তিনি থাকলেন না, জরুরী কাজ ছিল।

দিন কয়েক পরে নীলগোপালবাবু নিজের বৈঠকখানায় ভ্রূকুঞ্চিত করে বসেছিলেন খবরের কাগজের দিকে চেয়ে। এ কি খবর বেরিয়েছে! দ্বারপ্রান্তে খুট করে শব্দ হ’ল। নীলগোপাল ঘাড় ফিরিয়া দেখলেন।

“আরে আসুন আসুন। আপনার কাছেই যাব ভাবছিলাম। আপনি নকুলগঞ্জে যান নি?”

“গিয়েছিলাম। দুদিন পরে—”

“আমার চিঠিটা তাদের দিয়েছিলেন?”

“না। আমিই আপনার হয়ে সভাপতিত্বটা করে এসেছি। আপনিও এন. জি. বসাক, আমিও এন. জি. বসাক। হঠাৎ মাথায় বুদ্ধিটা খেলে গেল। প্রতিভা-পোষাক প্রকাশনীর ক্যানভাসিংটাও সেরে এলাম। যাতায়াত ফার্স্টক্লাস ফেয়ার, তাছাড়া জামাই আদর—এ কখনও ছাড়তে আছে!”

নীলগোপালবাবু রসিক লোক। তাঁর চোখ দুটিতে হাসি উপচে পড়ল।

“বলেন কি! যদি ধরা পড়ে যেতেন—”

“সেখানে বাঁটুল ছিল, ভালো নাম প্রমথ।”

“সে আবার কে?”

“সে নাকি আপনার ঘনিষ্ঠ বন্ধু?”

নীলগোপালবাবুর ভ্রূ আবার কুঞ্চিত হ’ল।

“কই মনে পড়ছে না তো—”

“না পড়ুক। আমি কিন্তু ছোকরার কাছে কৃতজ্ঞ। এ বছরের এই ক্যালেণ্ডারখানা রাখুন। সব লেখকদের ছবি দিয়েছি। বঙ্কিম চাটুজ্যে থেকে আরম্ভ করে কঙ্কু বরাট পর্যন্ত—”

নীলগোপাল হাসিমুখে চেয়ে রইলেন।

রিক্‌শাওয়ালার আত্মকাহিনী

আমি সামান্য রিক্‌শাওয়ালা। আমার নাম ঝকসু। জন্মের আগেই আমি পিতৃহীন হই। বিহার দেশে আমার বাড়ি। আমার বয়স কত তাহা ঠিক জানি না। আমরা গরীব মানুষ, আমাদের জন্ম সময়ে কেহ আমাদের জন্মতারিখ টুকিয়া রাখে না। শুনিয়াছি যে বৎসর বিহারে ভূমিকম্প হয় সেই বৎসর আমি মাঠে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম। আমার মা একজন মজুরণী ছিলেন, তখন তিনি মাঠেই কাজ করিতেছিলেন। সেই সময় তাহার মৃত্যু হয়। ছেলেবেলাটা আমার বড় কষ্টে কাটিয়াছে। আমার মামী আমাকে মানুষ করিয়াছিলেন। তাঁহাকেই আমি মা বলিয়া জানি। আমার এক কাকা ছিলেন, কিন্তু তিনি সঙ্গদোষে তাড়িখোর হইয়া উঠিয়াছিলেন। শেষ পর্যন্ত একটা মারামারিতে জড়াইয়া পড়িয়া তাঁহার জেল পর্যন্ত হইয়া যায়। কাকা আমার জীবনে কোন কাজে লাগেন নাই, তবু কিন্তু আমি তাঁহাকে ভালোবাসিতাম। তিনি যেদিন জেল হইতে ছাড়া পাইয়া বাড়ি ফিরিলেন সেদিন সত্যই আমার বড় আনন্দ হইয়াছিল, আমি যখন ছোট ছিলাম তখন মামীর সঙ্গে সঙ্গেই থাকিতাম। মামী 'বাবুভাইয়াদের' বাড়িতে চাকরাণীর কাজ করিতেন। আমিও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে থাকিতাম। প্রথম প্রথম আমি তাঁর কাজে সাহায্য না করিয়া বাধাই সৃষ্টি করিতাম বেশী। কিন্তু যখন আমার বয়স একটু বাড়িল, যখন আমি আট দশ বছরের হইলাম, তখন আমিও কাজে লাগিয়া গেলাম একটা বাড়িতে। বেতন হইল মাসে দুই টাকা। বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে আমার বেতনও বাড়িতে লাগিল। অনেক ভদ্রলোকের বাড়িতে আমি চাকরের কাজ করিয়াছি। আমার বয়স যখন আঠারো-উনিশ তখন আমার বেতন পনেরো টাকা হইল—তাহা ছাড়া খাওয়া-পরা। জিনিস পত্রের দাম যেরূপ বাড়িতেছিল তাহাতে পনেরো টাকাতেও কুলানো সম্ভব হইতেছিল না। মামী খুব বুড়া হইয়া গিয়াছিলেন, মামাও একটা মোটর দুর্ঘটনায় চাপা পড়িয়া মারা গেলেন, আমার দুইটি মামাতো বোনের বিবাহে অনেক ধার হইয়া গিয়াছিল, মহাজন প্রতিমাসে আসিয়া তাগাদা দিতে লাগিল. আমার একটি ছোট মামাতো ভাই ছিল চুনুয়া। একরূপ বিনা চিকিৎসায় সে মারা গেল টাইফয়েড রোগে। সমস্ত সংসারের ভার আমার উপর পড়িল। পনেরো টাকায় আর কুলানো সম্ভবপর হইতেছিল না। আমার কাকা মজুর খাটিয়া কিছু উপার্জন করিতেন, কিন্তু সবটাই খরচ করিয়া ফেলিতেন মদে আর তাড়িতে। সেই সময় আমার একজন ফুফা (পিসামশায়) আমাকে বলিলেন—রিক্‌শা টানিলে বেশী রোজগার করিতে পারিবে। তিনি ভাগলপুর শহরে রিক্‌শা টানিতেন। তিনি বলিলেন—রিক্‌শা টানিতে যদি চাও আমার কাছে আসিয়া দিনকতক কাজ শেখ। ওখানে একটা খাটাল আছে। সেই খাটালে গিয়া আমি প্রথম কাজ শিখি। দৈনিক দু-টাকা রোজগার করিতাম। দিনে খাইতাম এক পোয়া ছাতু, রাত্রে কয়েকখানা রুটি। মাঝে মাঝে ভাতও খাইতাম। আমার ফুফা সেখানে একটা বস্তিতে মাসিক চার টাকা ভাড়ার একটি খোলার ঘর ভাড়া লইয়াছিলেন। সেইখানেই আমরা কোনক্রমে থাকিতাম। মামীও সেখানে আসিয়া হাজির হইলেন একদিন। তাঁহার চোখে ছানি পড়িয়াছিল, ভালো দেখিতে পাইতেন না।

তবু তিনি বসিয়া থাকিতেন না, এক জনের বাড়িতে দাইগিরিতে বাহাল হইয়াছিলেন। সেখানে বাসন মাজিতে হইত। এবং একটি শিশুর রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইত। মাইনা পাইতেন মাত্র দশ টাকা। কিছু খাবারও পাইতেন। এই ভাবেই তখন সুখে দুঃখে দিন কাটিতে লাগিল।

ইহার পর একটি বিপর্যয় ঘটিয়া গেল। আমাদের বস্তিতে কলেরার মড়ক লাগিল। আমাদের সকলেরই কলেরা হইয়াছিল, কেবল আমিই বাঁচিয়া গেলাম। পাড়ার লোকেরা আমাদের সকলকেই হাসপাতালে দিয়া আসিয়াছিল। ডাক্তারবাবুরা হয়তো ভালো চিকিৎসাই করিয়াছিলেন কিন্তু আমি ছাড়া আর কেহ বাঁচিল না।

তাহার পর আমি কলিকাতায় চলিয়া আসি। আমাদের এক দূর সম্পর্কের আত্মীয় কলিকাতায় রিক্‌শা টানিত, সেই আমাকে ডাকিয়া লইল।

তাহার পর হইতেই এই শহরে বরাবর রিক্‌শা টানিতেছি। নিদারুণ গ্রীষ্মের রৌদ্রে, প্রবল বর্ষায়, মিছিলের হট্টগোলের মধ্যে 'বাস' 'ট্রাম' 'মোটর' হইতে আত্মরক্ষা করিয়া প্রত্যহ রিক্‌শাই টানিয়া চলিয়াছি। কত রকম লোকই যে আমার রিক্‌শায় রোজ চড়ে। তাহারা বাঙালী, না বিহারী, না পাঞ্জাবী, না মাড়োয়ারি এ কথাটা আমার নিকট বড় নয়, তাহারা আমার আরোহী, তাহারা আমায় পয়সা দেয় এইটেই আমার নিকট বড় কথা। আমার আরোহীদের মধ্যে ভদ্রলোক, অভদ্রলোক, কৃপণলোক, দুই চারিটি পয়সার জন্য ছোটলোকের মতো দরদস্তুর করে এমন লোক, দিলদরিয়া লোক—সব রকম লোকই দেখিয়াছি। মানুষ নানা রকম হয়। একটি আরোহিনীর কথা কিন্তু আমার বরাবর মনে আছে, কখনও বোধহয় ভুলিব না। একদিন একজন বৃদ্ধা হাওড়া স্টেশনে আমার রিক্‌শায় চড়িয়া বলিলেন, আমাকে লেকটাউন পেঁছাইয়া দিতে হইবে। কত ভাড়া চাও? বৃদ্ধার মুখটি দেখিয়া আমি চমকাইয়া উঠিলাম। অবিকল আমার মামীর মতো দেখিতে। বলিলাম আগে আপনাকে পেঁছাইয়া দিই, তাহার পর ভাড়ার কথা হইবে। বৃদ্ধা উঠিয়া বসিলেন। হাওড়া হইতে লেকটাউন অনেক দূর। সেদিন আবার কি একটা হাঙ্গামা ছিল শহরে, পুলিশের গুলিগোলা চলিতেছিল চৌরঙ্গী অঞ্চলে। চারিদিকে ভীড় আর হৈ-হল্লা। অনেক জায়গায় ট্রাফিক জাম। অনেক কষ্টে বৃদ্ধাকে আমি তাঁহার ঠিকানায় পেঁছাইয়া দিলাম। বৃদ্ধা জিজ্ঞাসা করিলেন—কত দেব তোমাকে? তুমি বাবা এত কষ্ট করে ভীড় বাঁচিয়ে নিয়ে এসেছ আমাকে, যা চাইবে তাই দেব। আমি মনে মনে ঠিক করিয়া ছিলাম কি বলিব।—বলিলাম আপনার কাছে কোন ভাড়া নেব না।

কেন?

আমার যে মামীমা আমাকে মানুষ করেছিলেন যিনি এখন আর বেঁচে নেই, আপনি ঠিক তাঁর মতো দেখতে। আপনি আমার সেই মামী। আপনার কাছে ভাড়া নেব কি করে?

বৃদ্ধা সবিস্ময়ে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন—না, সে হয় না। তিনি জোর করিয়া আমার হাতে একটা দশ টাকার নোট গুঁজিয়া দিলেন। আমি তখন লোভ সামলাইতে পারিলাম না, টাকাটা লইলাম। আমার টাকার তখন বড় প্রয়োজন ছিল।

এখন মনে হয় টাকাটা না লইলেই পারিতাম। কিন্তু হায়, গরীব মানুষরা অভাবের তাড়নায় উদারতা প্রকাশ করিতেও অক্ষম। তাঁহার নামটি সংগ্রহ করিয়াছিলাম—জগত্তারিণী দেবী। এবার ভোটের সময় যখন সকলে ভোট সংগ্রহ করিবার জন্য আমার কাছে আসিল তখন আমি বলিলাম—আমি জগত্তারিণী দেবীকে ভোট দিব। তাঁহারা বলিল—ও নামের কোন প্রার্থী নাই। আমি কাহাকেও ভোট দিলাম না, কারণ প্রার্থী হিসাবে যাহাদের নাম ছিল তাহাদের কাহাকেও আমি চিনিতাম না। আমি রাজনীতি বুঝি না, কে মন্ত্রী হইলেন তাহা লইয়া আমার মোটেই মাথা ব্যথা নাই। নির্বিঘ্নে আমাদের কাজকর্ম চলিলেই আমি খুশী। দুইবেলা যদি পেট ভরিয়া খাইতে পাই তাহা হইলে আরও খুশী হই। কিন্তু এত মেহনত করিয়াও দুইবেলা ভালো খাবার খাইতে পাই না। জিনিসপত্র দুর্মূল্য। আমার মামীর একটি নাতী আমার কাছে আসিয়াছে। তাহাকে স্কুলে পড়িতে দিয়াছি। যদি সে লেখা পড়া শিখিয়া ভালো চাকরি পায়, হয়তো আমাদের দুঃখ ঘুচিবে। সবই ভগবানের হাত।

মেয়ে

সেদিন আমি যখন ট্রাম থেকে নামলাম তখন মেয়েটি রাস্তার একটি থামে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। আমাকে দেখে একটু হেসে নমস্কার করল। আমিও নমস্কার করলাম। কিন্তু চিনতে পারলাম না। মনে হল হয়তো আমার কোনও ছাত্রী। মেয়েটি বেশ রূপসী। ফুটপাথ দিয়ে হেঁটে চলে গেল কিছুদূর। সামনের ডান হাতি গলিতে আমার বাসা। কিছুদূর গিয়ে পিছু ফিরে চাইলাম আবার। দেখলাম মেয়েটি আমার পিছু পিছু আসছে। মনে হল সে আমাকে কিছু বলবে হয়তো। গলিতে ঢোকবার মুখে দাঁড়িয়ে রইলাম একটু। মেয়েটি আমার দিকে চেয়ে আর একটু হাসল। তারপর দাঁড়াল এসে আমার পাশে। সত্যিই রূপসী।

"এই গলির ভিতর আপনার বাড়ি নাকি?"

"হ্যাঁ—"

"আপনার সঙ্গে যদি আপনার বাড়ি যাই আপত্তি করবেন কি?"

প্রশ্ন শুনে আশ্চর্য হলাম, একটু বিব্রতও হলাম। তবু বলতে হল,"—না, আপত্তি আর কি—কিন্তু আপনাকে ঠিক চিনতে পারছি না।"

"আমি কিন্তু চিনি আপনাকে। আমাকে 'আপনি' বলবেন না। আমি সব বিষয়েই আপনার চেয়ে ছোট। আপনি যখন প্রেসিডেন্সি কলেজে বি. এ. পড়তেন, আমি তখন আই. এ. পড়ি। আপনি নামকরা ছেলে ছিলেন, সবাই আপনাকে চিনত, আমিও চিনতাম।"

"আমার বাড়িতে এসে কি করবে।"

"এমনি কৌতূহল, আর কিছু নয়।"

"বেশ, এস।"

আমি অবিবাহিত লোক। এক তলায় ছোট একটা ফ্লাট নিয়ে থাকি। ঘরের তালা খুলে ভিতরে ঢুকলাম। মেয়েটিও এল আমার পিছু পিছু।

"তুমি ওই চেয়ারটায় বস। আমি জামা কাপড় ছেড়ে আসি। চা খাবে ?"

"না।"

আমি পাশের ঘরে চলে গেলাম। পোষাক বদলে ফিরে এসে দেখি মেয়েটি আমার ঘরের চারিদিকে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

আমাকে দেখেই বলল—"আপনার রুচির প্রশংসা করি। প্রত্যেকটি জিনিস সুন্দর।"

তারপর হঠাৎ ঘাড় ফিরিয়ে বলল—"একটা কথা বললে বিশ্বাস করবেন ?"

"বিশ্বাসযোগ্য হলে করব না কেন !"

"আপনার সঙ্গে আমার বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছিল।"

এ খবরের জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। বললাম—"তাই নাকি !"

"হ্যাঁ। আমার বাবা আপনাকে আমার একটা 'ফোটো' পাঠিয়েছিলেন। সেটা কিন্তু আপনি ফেরত দেন নি। সেটা এখনও আছে কি ?"

"আমি হঠাৎ বিলেতে চলে যাই। তখন আমার কিছু চিঠিপত্র গোলমাল হয়ে গিয়েছিল। হয়তো তার মধ্যে আছে সেটাও। আমি দেখিনি।"

"ও। আচ্ছা, যাই তবে। আপনার একটু সময় নষ্ট করলাম।"

"তুমি এখন কোথায় আছো ?"

মেয়েটি চুপ করে রইল। তারপর হাসল একটু। সহসা প্রসঙ্গান্তরে চলে গেল সে। "আপনাকে একটা অনুরোধ করছি। সেই ফোটোটা যদি পান, পুড়িয়ে ফেলবেন।"

"পুড়িয়ে ফেলব ? কেন ?"

আবার চুপ করে গেল মেয়েটি।

বললাম—"সে যা হয় করা যাবে। তুমি এখন কিছু খেয়ে যাও। ভালো বিস্কুট আছে,—দাঁড়াও নিয়ে আসি—"

ভিতরে গিয়ে আলমারি খুলে বিস্কুট বার করে নিয়ে এলাম। এসে দেখি সে নেই। বিস্মিত হলাম। এ ব্যবহার প্রত্যাশা করিনি। কপাট খোলাই ছিল। উঁকি দিয়ে দেখলাম গলিতে কেউ নেই।

মেয়েটির এই অদ্ভুত আচরণ সত্ত্বেও, কিম্বা হয়তো এই অদ্ভুত আচরণের জন্যেই, মেয়েটিকে খুব ভালো লেগে গেল। রোজই তার কথা মনে করতাম। মেয়েটি শুধু রূপসী নয়, রহস্যময়ীও।

একদিন পুরনো চিঠিপত্র খুঁজতে খুঁজতে পেয়ে গেলাম তার ফোটো আর তার বাবার চিঠিখানা। দেখলাম খামটা খোলাই হয়নি। ফোটোটির দিকে চেয়ে কিন্তু মেয়েটিকে রূপসী মনে হল না। হঠাৎ আমার কানের কাছে ফিস ফিস করে কে যেন বলল—"পুড়িয়ে ফেলুন ও ফোটো। ফোটোগ্রাফার ভালো তুলতে পারেনি। পুড়িয়ে ফেলুন"—ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম, কেউ নেই। মনে হল—তাহলে আমার কল্পনা ওটা।

মেয়েটি কিন্তু ক্রমশ আমার মন অধিকার করে বসল। ফোটোটা এনলার্জ করিয়ে ঘরে টাঙিয়ে রাখলাম। ভাবলাম ফোটোর জন্য সে নিশ্চয় আবার আসবে। কিন্তু সে এল না।

তার বাবাকেও একটা চিঠি লিখলাম। লিখলাম—"আমি হঠাৎ বিলেতে চলে

গিয়েছিলাম। তাই আপনার পত্র পেতে বিলম্ব হয়েছে। আপনার মেয়েকে পছন্দ হয়েছে আমার। আপনি একদিন আসুন।"

রোজই প্রত্যাশা করতাম সাড়া পাব। কিন্তু পেলাম না।

একদিন কলেজ থেকে ফিরে দেখি এনলার্জ ফোটোটা মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছে। চারদিকে কাঁচের টুকরো। একটা ফ্রেম খোলা। ছবিটা নেই।

কয়েকদিন পর তার বাবার চিঠি পেলাম। "আপনার পত্রের জন্য ধন্যবাদ। দুঃখের সহিত জানাচ্ছি আমার মেয়ে বাস একসিডেণ্টে মারা গেছে। সে আপনাকে খুব ভক্তি করত। আপনাকে স্বামী রূপে পেলে তার জীবন ধন্য হয়ে যেত। কিন্তু ভগবানের ইচ্ছা তা ছিল না। সবই নিয়তি। নমস্কার ইতি—"

সেদিন ভোরে

খোকনের সেদিন খুব ভোরে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল।

এতে ভোরে যে তখনও কেউ জাগেনি—ঠাকুমা পর্যন্ত না।

জানলা দিয়ে খোকনের প্রথমেই চোখে পড়ল বকুল গাছের আড়ালে চাঁদ অস্ত যাচ্ছে, আর চাঁদের ঠিক পাশেই দৈত্যের মতো প্রকাণ্ড একখানা কালো মেঘ বিশাল হাঁ করে আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে চাঁদের দিকে।

চাঁদের সেদিকে ভ্রূক্ষেপও নেই। তার মুখের হাসি এতটুকু কমেনি। কাছে শুকতারাটিও জ্বল জ্বল করে জ্বলছে। তারও এতটুকু ভয় নেই।

খোকন বিছানা ছেড়ে আস্তে আস্তে বেড়িয়ে এল। আস্তে আস্তে দরজাটি খুলে বাগানে এসে দাঁড়ালো। কি সুন্দর ভোরের আধফোটা আলো। চতুর্দিক যেন স্বপ্ন দেখছে।

"নমস্কার"

খোকন ঘাড় ফিরিয়ে এদিক ওদিক চেয়ে দেখলে। কেউ তো নেই। তবে নমস্কার করলে কে?

"নমস্কার—"

এ তো অদ্ভুত ব্যাপার কোথাও কেউ নেই অথচ—"নমস্কার—"

হঠাৎ খোকন দেখতে পেলে বাগানের বেড়ার গায়ে একটি অপরাজিতা ফুল ফুটেছে—আর তার ভেতর থেকে সুন্দর ছোট, একখানি মুখ তার দিকে চেয়ে মুচকি মুচকি হাসছে।

"নমস্কার—"

প্রতি নমস্কার করে খোকনও এগিয়ে গেল। এ রকম আশ্চর্য ব্যাপার যে ঘটতে পারে, তা সে কখন ভাবেও নি।

ফুলের ভেতর মানুষ থাকে নাকি।

ছোট্ট সুন্দর মুখখানি তো।

একটু ঝুঁকে খোকন অবাক হয়ে দেখতে লাগলো।

ফুলের ভেতর থেকে হাসি শোনা যাচ্ছে— কি মিষ্টি হাসি।

ছোট্ট, মুখখানি হাসিতে ভরে গেছে।

খোকন একটু ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলে—"আমাকে ডাকছিলেন ?"

"হ্যাঁ—"

বলেই আবার হাসি।

খোকন জিজ্ঞেস করলে—"আপনি অত হাসছেন কেন ?"

"আমি ?"

আবার মুখখানি তার হাসিতে ভরে গেল।

খোকনের এবার একটু রাগ হ'ল। কথাবার্তা নেই খালি হাসি।

"অত হাসছেন কেন শুধু শুধু ?"

"তোমাকে দেখে! কি প্রকাণ্ড বড় তুমি। মাথার চুলগুলোও তোমার কি অদ্ভুত! সামনের দিকটা লম্বা—পেছনে মোটে নেই! ওটা পরেছো কি তুমি ?"

"এটা জাঙ্গিয়া—"

"জাঙ্গিয়া ?"

হেসে লুটিয়ে পড়ল সে।

তার হাসির ধমকে অপরাজিতা ফুলটা পর্যন্ত দুলতে লাগল।

খোকন তো অবাক!

অমন সুন্দর করে তার চুল ছেঁটে দিয়েছে হীরু নাপিত—অমন চমৎকার জাঙ্গিয়া করে দিয়েছেন মাসীমা নিজে হাতে—আর তাই দেখে হাসছে এ! পাগল না কি ? খোকন প্রথমটা ভদ্রতা করে 'আপনি' বলে কথা শুরু করেছিল—কিন্তু এখন বুঝতে পারলে, খাতির করবার মতো লোক নয় এ!

খোকন জিজ্ঞেস করলে—"তোমার নাম কি ?"

"নাম ? নাম মানে কি ?"

"নাম নেই তোমার ? তুমি ছেলে না মেয়ে ?"

"জানি না তো।"

"কোথা থাক তুমি ?"

"এই ফুলের ভেতর।"

এই অদ্ভুত লোককে আর কি প্রশ্ন করা চলতে পারে—খোকন ভাবতে লাগলো। এরকম সে দেখেওনি ভাবেওনি।

একটু ভেবে খোকন জিজ্ঞেস্ করলে—

"জাঙ্গিয়া পর না বুঝি তোমরা ? কি পর তাহলে ?"

এই শুনে তার মুখে আবার হাসি ফুটে উঠল।

উত্তর না দিয়ে সে শুধু হাসতে লাগলো!

খোকন যেন একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেল!

কিছুক্ষণ চুপ্চাপ্।

খোকন ভাবতে লাগলো একে আর কি বলা চলে। কিছু বল্লেই তো খালি হাসতে থাকবে।

এমন সময় ঘটল এক কাণ্ড!

শূন্য থেকে সুতো বেয়ে একটা মাকড়শা তর তর করে নেমে এসে পড়ল অপরাজিতা ফুলটার ওপর।

"ওগো-মা গো—"

ছোট মুখখানি ফুলের ভেতর পুট্ করে ঢুকে গেল।

খোকন ভাবতে লাগলো—"ওর মা আছে নাকি ?"

"টিট্ হড়মড়, টিট্টু খড়মড়—"

মাকড়শা কথা বলছে !

"চিং চিং খট্ খট্ হুড়মুড় টিট্টু—"

কিছু বোঝা যাচ্ছে না তো।

খোকন্ বল্লে—"তুমি কি বলছ, কিছু বুঝতে পারছিনা। এ কোন্ দেশী ভাষা ?"

বড় বড় চোখ বার করে মাকড়শা বললে—

"ও তুমি বাঙ্‌লা ছাড়া আর কিছু বোঝনা বুঝি। আমি যা বলছি এ তালগাছি ভাষা! আমি ট্রেনিং নেবার জন্যে আকাশমুখী তালগাছের ডগায় ছমাস ছিলাম কিনা !

"সে আবার কোথায় ?"

ও তা জানোনা বুঝি ! অপ্সরী নদীর ধারে প্রকাণ্ড এক মাঠ আছে। সেই মাঠের ঠিক মধ্যিখানে আকাশমুখী তালগাছ একা দাঁড়িয়ে আছে। শিকারী চিলের সেখানে বাসা। সেইখানে আমরা ট্রেনিং নিতে যাই। সেই তালগাছি ভাষা বলছি। কি সুন্দর ভাষা সেখানকার—

"টিট্টু খট্ মট্ মড় মড় টিট্টু, খন খট্ ঝন্ ঝন্ হড়মড় টিট্টু—"

খোকন তাড়াতাড়ি বললে—"চুপ কর তুমি—আর শুনতে চাইনা। ওর মানে কি ?"

"মানে ?"

মাকড়শার ড্যাবডেবে চোখ দুটো মিট্‌মিট্ করতে লাগল ! তারপর হেসে বললে—"ওর মানে—

মাছি কই মাছি কই পোকা কই পোকা কই
দিন রাত জাল পেতে পথ পানে চেয়ে রই—

আমি কবিতা লিখতে পারি, জালও বুনতে পারি। কেমন সুন্দর জাল বুনেছি দেখেছো ? ওই দেখো।"

এই বলে সে ওপর দিকে চাইলে।

খোকন দেখলে জবাফুলের গাছটার দুটো ডালের ফাঁকে সুন্দর একখানি মাকড়শার জাল। তাতে বিন্দু বিন্দু শিশির পড়েছে। মনে হচ্ছে সূক্ষ্ম রেশমের জালে কে যেন মুক্তো আর জড়ির কাজ করে দিয়েছে। এমন চমৎকার।

"কিন্তু কিছু হয়না—"

খোকন জিজ্ঞেস করলে, "কি হয় না ?"

"একটা মাছি বা পোকা আজ পর্যন্ত ধরতে পারিনি। জায়গা বদলাব ভাবছি !"

"ফ্যাস্—ফোঁস্—খবরদার—"

খোকন চমকে উঠল।

মাকড়শা তো সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্ধান !

খোকন দেখলে, একটা কালো বেরাল লোম ফুলিয়ে পিঠটাকে বাঁকিয়ে ধনুকের মতো করে হাস্নাহানার ঝোপটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

হাস্নাহানা ঝোপের তল থেকে একটা প্রকাণ্ড বহুরূপী গিরগিটি গলা ফুলিয়ে চোখ ঘুরিয়ে বলছে—

“চোপ্ রও—”

“বেরাল বললে, “জানিস্ আমি বাঘের মাসী—”

গিরগিটি সগর্বে ঘাড় নেড়ে জবাব দিলে—

“তোর বাঘের আমি থোড়াই কেয়ার করি—কুমীর আমার মামা—”

“খবরদার”

“চোপ রও।”

খোকন দেখলে নির্ঘাৎ এইবার ভীষণ দাঙ্গা হবে একটা।

সে একটা ছোট ইঁট তুলে নিলে।

ইঁট তুলতেই বেরালটা ল্যাজ তুলে পালালো।

গিরগিটিও হাস্নাহানার ঝোপে সুট্ করে ঢুকে পড়ল।

টুম্ টুমা টুম্ টুম্
এ কি রাগের ধুম।
ইঁট ফেলে দাও খোকনমণি
ইঁট ফেলে দাও চাঁদ সোনা—
ও ইঁট গায়ে লাগলে পরে
বাঁচবো না রে বাঁচবো না।
ছোট্ট, আমি টুনটুনি।

খোকন দেখলে ছোট্ট একটা টুনটুনি পাখী হাস্নাহানার ডালে নাচছে আর গাইছে।

আজ এসব হচ্ছে কি!

হঠাৎ টুনটুনি ফুড়ুৎ করে উড়ে গেল।

টুনটুনির কথামত খোকন ইঁটটা দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিলে।

খোকনের গায়ে জোর তো কম নয়।

ইঁটটা কদমগাছটা ভেদ করে বোঁ করে পাঁচিল টপকে চলে গেল।

“কুহু, কুহু—কুহু—কুহু”

কোকিল ডাকছে।

খোকনের মনে হতে লাগলো যেন বলছে—

“উহু—উহু—উহু, উহু”

ইঁটটা লাগল না কি কোকিলটার ?

কুড়-কুড়-কুড়-কড়াৎ—

মেঘ ডেকে উঠল।

খোকন চেয়ে দেখলে সেই দৈত্যের মতন মেঘটা সমস্ত আকাশ দখল করে হুঙ্কার ছাড়ছে।

চতুর্দিক কালোয় কালো।

বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে।

চাঁদ নেই—শুকতারাও নেই।

"আচ্ছা খোকন, এই ভোরে খালি পায়ে শিশিরে শিশিরে একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছিস কেন? অসুখ করবে যে! বিষ্টি আসছে। ভেতরে যা। বিড়বিড় করে আপন মনে কি বকছিস্ তুই এত?"

ঠাকুমা বাগানে পুজোর ফুল তুলে বেড়াচ্ছেন।

খোকন চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল।

সত্যি, কোথায় এতক্ষণ ছিল সে?

যেন অন্য রাজ্যে!

ঠাকুমা ডাকতেই সব যেন মিলিয়ে গেল।

সে তাড়াতাড়ি বেড়ার কাছে দিয়ে দেখলে অপরাজিতা ফুলটি নেই।

"ঠাকুমা এইখানে যে ফুলটা ছিল—কি হল?"

"এই যে পুজোর জন্যে তুলেছি।"

খোকন একদৃষ্টে ছিন্ন অপরাজিতাটার পানে চেয়ে দাঁড়িয়ে। তার কেমন যেন কান্না পেতে লাগলো।

— সোনার কাঠ
—নরেন্দ্রদেব ও রাধারাণী দেবী সম্পাদিত।
—আশ্বিন ১৩৪৪।
—দেব সাহিত্য কুটীর।

অবাক কাণ্ড

॥ এক ॥

মনি ছেলে খুব ভাল, যেমন পড়াশোনাতে, তেমনি খেলাধুলোয়। গ্রামের এক হাই স্কুলে পড়ে সে, বোর্ডিঙে থাকে। স্কুলে পড়াশোনা ভাল হয়, কিন্তু খেলাধুলোর তেমন ব্যবস্থা নেই। গরীব স্কুল। এক ফুটবল ছাড়া অন্য কোনও খেলার সরঞ্জাম রাখতে পারেন নি স্কুলের কর্তৃপক্ষ। মনি যখন গ্রামের পাঠশালাতে পড়ত, তখন থেকেই তার স্বপ্ন, হাইস্কুলে যখন পড়তে যাবে তখন টেনিস খেলা শেখবার সুযোগ পাবে। স্কুলে সে ফার্স্ট হয়ে স্কলারশিপ পেয়েছে। টেনিস চ্যাম্পিয়ন হবারও শখ তার। কিন্তু বাবা তাকে এমন স্কুলে পাঠালেন যেখানে টেনিস দূরে থাক ব্যাডমিন্টন খেলারও ব্যবস্থা নেই। একটা ছেঁড়া ফুটবলের পেছনেই দৌড়চ্ছে স্কুলসুদ্ধ ছেলে।

মনি কিন্তু দমবার ছেলে নয়। তাদের বোর্ডিঙের সামনে খানিকটা মাঠ পড়ে ছিল, মনি বই দেখে মেপেজুপে দেখলে, চমৎকার টেনিস বোর্ড হয় ওখানে। মনি তার বন্ধু বীরেনের সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করে ফেলল, চাঁদা তুলবে। স্কুলের প্রত্যেক ছেলে যদি কিছু কিছু করে দেয়,—বল, র‍্যাকেট আর নেট হয়ে যাবে। স্কুলের থার্ড মাস্টার মশায়ও উৎসাহ দিলেন। তিনি নিজে নগদ দু-টাকা চাঁদা দিলেন এবং বললেন, মাস্টারদের কাছ থেকে আরও কিছু তুলে দেবেন। খুব উৎসাহিত হল মনি আর

বীরেন। কিন্তু চাঁদার খাতা হাতে করে ছেলেদের কাছে দিনকয়েক ঘুরে বেড়াবার পর তারা নিঃসংশয়ে হৃদয়ঙ্গম করলে যে, ছেলেদের কাছে চাঁদা তুলে টেনিস খেলার ব্যবস্থা করা যাবে না। নিচের ক্লাসের ছেলেরা চাঁদা দিলে না, কারণ টেনিস খেলার বয়সই হয় নি তাদের। টেনিস খেলার বয়স হয়েছে যাদের, সেরকম ছেলে স্কুলে চল্লিশটির বেশি নেই। তাদের মধ্যে জন পাঁচেক মাত্র চার আনা করে চাঁদা দেবে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। বাকি সব দু আনা করে, তাও কেবল প্রতিশ্রুতি, নগদ কেউ দিলে না। আরও দিনদশেক ঘোরাঘুরির পর মাত্র আড়াইটি টাকা উঠল। থার্ড মাস্টার মশাই আরও পাঁচ টাকা তুলে দিলেন। কিন্তু মাত্র সাড়ে সাত টাকায় টেনিস খেলার ব্যবস্থা হয় না। খুবই নিরুৎসাহিত হয়ে পড়ল মনি। বীরেন তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললে, কিছু ভাবিস নি, হয়ে যাবে আস্তে আস্তে ঠিক। ভগবান আছেন। আমরা তো কোন খারাপ কাজ করছি না ভাই।

মনির মন খুবই খারাপ হয়ে গিয়েছিল। সে বলে উঠল, আরে দুত্তোর ভগবান-টগবান! ভগবান বলে কিছু নেই; থাকলে, একজন বড়লোক আর একজন গরীব হয় কি করে? আর বড়লোকগুলো দেখবি প্রায় পাজি হয়; ভগবান থাকলে কি পাজি লোকদের অত বাড়-বাড়ন্ত হয়?

বীরেন অবাক হয়ে গিয়েছিল। মনি বলে কী! ভগবান নেই? তবে এত মন্দির, মসজিদ, পুজো, মানত সব বাজে! বীরেন একটু ভীরু-গোছের, সে ফ্যালফ্যাল করে মনির মুখের দিকে চেয়ে রইল। এমন সময় থার্ড মাস্টার মশাই এলেন। বীরেন বললে, মনি বলছে কী জানেন স্যর? বলছে, ভগবান নেই—

থার্ড মাস্টারমশাই দাঁড়িয়ে পড়লেন।

বলেছ তুমি?

মনির কানের কাছটা লাল হয়ে উঠল।

ভগবান আছেন তা জানব কী করে? এখনও তো দেখি নি।

থার্ড মাস্টার হাসলেন একটু। জ্যামিতি পড়াতেন তিনি। বললেন, বিন্দু বলে একটা কিছু আছে, তা বিশ্বাস কর তো?

করি।

কী করে কর? বিন্দু তো দেখা যায় না! বিন্দুর সংজ্ঞাটা হচ্ছে, যার অবস্থান আছে কিন্তু পরিমাপ নেই। ও জিনিস আঁকা যায় না, কল্পনা করে নিতে হয়। রেখাও তাই। যার দৈর্ঘ্য আছে কিন্তু প্রস্থ নেই, এও কল্পনা করে নিতে হয়, আঁকা যায় না বা দেখানো যায় না। ভগবানও সেই রকম। আছেন, কিন্তু দেখা যায় না, কল্পনা করে নিতে হয়।

থার্ড মাস্টারমশাই তারপর মনির মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, তুমি ভগবানে বিশ্বাস করো ঠিকই, কিন্তু সেটা ঠিক জান না। তোমার চাঁদা কতদূর হল?

কিছু হয় নি স্যর। মোটে সাড়ে সাত টাকা হয়েছে।

হবে আরও। হেড মাস্টারমশাই কিছু দেবেন বলেছেন।

থার্ড মাস্টারমশাই চলে গেলেন।

॥ দুই ॥

সেইদিন রাত্রে মনি নিজের বিছানায় মশারির ভিতর শুয়ে যখন অঘোরে ঘুমোচ্ছিল সেই সময় পাশের ঘরের হরি এসে তাকে টেনে তুলল। মনি, ওঠ্ ওঠ্ একজন ভদ্রলোক খুঁজছেন তোকে।

মনি তাড়াতাড়ি উঠে দেখলে, একজন সৌম্যদর্শন বৃদ্ধ তার ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন।

ও, তুমিই বুঝি মনি? আমি তোমার বাবার বন্ধু। এখানে একটু কাজে এসেছিলাম, আর রাত্রে তোমার কাছেই থাকব। ভোরে উঠে চলে যাব আবার। শোবার জায়গা হবে একটু?

হ্যাঁ হবে, আসুন।

মনি তাকে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে বিছানাটি দেখিয়ে দিলে। এখানেই শোন আপনি। আপনার খাওয়া দাওয়া হয়েছে?

হ্যাঁ। এটা তো তোমার বিছানা, তুমি শোবে কোথায়?

আমি কারও কাছে গিয়ে শোব এখন। আপনি শুয়ে পড়ুন।

তাঁকে শুইয়ে, মশারিটি ভাল করে মুড়ে দিয়ে মনি বেরিয়ে গেল। খুব আনন্দ হল তার। কিন্তু কারও ঘরেই সে শোবার জায়গা পেল না। অবশেষে কমনরুমের টেবিলে গিয়ে শুয়ে পড়ল সে। কিন্তু ঘুম এল না। ভয়ানক মশা। মশার কামড়ে ছটফট করতে লাগল বেচারা। সমস্ত রাত এ-পাশ ও-পাশ করে ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়ল অবশেষে।

বোর্ডিঙের চাকরটা এসে ঘুম ভাঙাল তার। আর বললে, একটি বুড়ো বাবু আপনাকে এই চিঠিটি দিয়ে গেছেন, আর এই বাক্সটা রেখে গেছেন।

মনি দেখল, কমন-রুমের এক কোণে প্রকাণ্ড একটা প্যাকিং কেস রয়েছে। চিঠিতে লেখা ছিল, কাল আড়াল থেকে তোমাদের কথাবার্তা আমি শুনেছিলাম। থার্ড মাস্টারমশাই ঠিক কথাই বলেছিলেন। ভগবানে তোমার বিশ্বাস আছে, কিন্তু তুমি সেটা জান না। কাল পরীক্ষা করে দেখলাম। তোমার ভদ্রতায় মুগ্ধ হয়েছি। যার ভগবানে বিশ্বাস নেই, সে ভদ্র হতে পারে না। কারণ, একটু ত্যাগ না করলে, একটু পরার্থপর না হলে ভদ্র হওয়া যায় না। আর, যে পরের জন্য ত্যাগ করতে শিখেছে সে তো পশুত্বের স্তর ছাড়িয়ে ওপরে উঠে গেছে। সে সেই রাস্তায় চলতে শুরু করেছে, যে-রাস্তায় চললে ভগবানের দেখা পাওয়া যায়। পরার্থপরতার মূলে আছে ভগবানের আকর্ষণ, সব সময় সেটা আমরা বুঝতে পারি না। কারও জন্য নিঃস্বার্থ-ভাবে কিছু ত্যাগ করলে সঙ্গে-সঙ্গে আনন্দলাভ হয়, মানে, সঙ্গে-সঙ্গে ভগবানের দেখা পাওয়া যায়, কারণ ভগবানই তো আনন্দস্বরূপ। তোমার ব্যবহারে খুব খুশি হয়েছি। এ বাক্সে কিছু উপহার রেখে গেলাম তোমার জন্য।

চিঠিতে কারও নাম নেই। হাতের লেখা মুক্তোর মতো। মনি তাড়াতাড়ি গিয়ে বাক্সটা খুলে ফেলল। অবাক হয়ে গেল। বাক্সের ভিতরে রয়েছে ছটা টেনিস বল, চারটে কালো র‍্যাকেট, আর চমৎকার একটি নেট।

আলোক পরী

॥ এক ॥

সুধাংশু আর অনিল দুই বন্ধু। গতবার ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে দুজনেই কলেজে ঢুকেছে। দুজনেই ভাল ছেলে। পড়াশোনায় ভাল, খেলাধুলোয় ভাল, সব বিষয়ে ভাল। দুজনের মনের মিলও খুব। একটি বিষয়ে কেবল অমিল ছিল। সুধাংশুর ধারণা, পরার্থপরতাটা একটা সদ্‌গুণ বটে, কিন্তু স্বার্থপরতাটা আরও বড় গুণ, নিজের উন্নতিটা আগে দরকার। আত্মরক্ষাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। এ নিয়ে প্রায়ই তাদের তর্ক হত। দুজনেই নানারকম নজির দেখিয়ে নিজের নিজের মত প্রমাণ করবার চেষ্টা করত। কিন্তু তর্কের কোন মীমাংসা হত না।

একদিন কিন্তু অদ্ভুত উপায়ে মীমাংসা হয়ে গেল। এক পরী মীমাংসা করে দিলে। সেই গল্পই আজ তোমাদের বলব। তোমরা হয়তো মুচকি মুচকি হাসছ, ভাবছ, পরী বলে কিছু আছে নাকি! আছে বৈকি। পিঠে ডানা লাগানো যেরকম পরীর ছবি আমরা রূপকথার বইয়ে সাধারণত দেখি সেরকম পরী আছে কি না জানি না—আমি অন্তত দেখি নি কখনও—কিন্তু পরী আছে। তারা আমাদের আশেপাশে অনেক সময় নানা বেশ ধরে ঘুরে বেড়ায়, আমরা চিনতে পারি না। এই যে প্রজাপতির দল নানারঙের পাখা দুলিয়ে উড়ে বেড়ায়, ওর সবাই প্রজাপতি নাও হতে পারে। কেউ কেউ হয়ত পরী। নির্জন অরণ্যে বা গভীর রাত্রে যেসব সূক্ষ্ম সুর বা শব্দ আমরা শুনতে পাই, তা হয়তো পরীদের আলাপ। এই যে গাছে গাছে প্রত্যহ অসংখ্য ফুল ফুটছে, কত রঙের কত ধরনের ফুল, ওরা সবাই যে ফুল, তার অকাট্য প্রমাণ আছে কোন? কোন কোন ফুল হয়তো পরী, ফুলের ছদ্মবেশে আছে; কিছুক্ষণের জন্য পৃথিবীর আলো বাতাস উপভোগ করে, তারপর টুপ্ করে ঝরে পড়ে। স্বপ্নের দেশে চলে যায়। আবার আসে!

সুধাংশু আর অনিল যে পরীটিকে দেখে ছিল তার চেহারা প্রথমে মানুষের মতো ছিল না, আলোর সূক্ষ্ম রেখা একটি। গঙ্গার ধারে যে গুহাটি আছে, তার ভিতর ঢুকেছিল তারা একদিন। গুহাটির সম্বন্ধে নানা রকম প্রবাদ প্রচলিত ছিল। কেউ বলত ওটা নবাবী আমলের সুড়ঙ্গ। বিপদের সময় নবাবরা ঐ গুপ্তপথ দিয়ে পালিয়ে নাকি আত্মরক্ষা করতেন। কেউ বলত ওখানে পুরাকালে এক মুনির আশ্রম ছিল। তাঁর তপস্যায় বিচলিত হয়ে নাগরাজ বাসুকি নাকি পাতাল থেকে উঠে এসেছিলেন। মাটি ফুঁড়ে এসেছিলেন, এসে তপস্বীবরকে সসম্মানে নিজের রাজ্যে নিয়ে গিয়েছিলেন। কারও কারও মতে, ওটা কতগুলো ফিরিঙ্গির কীর্তি। বহুকাল আগে আমাদের দেশে পর্তুগীজ বণিকরা এসেছিল। তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, যেন তেন প্রকারেণ টাকা রোজগার করা। তারা ডাকাতি, রাহাজানি, মানুষ চুরি, সব রকম করত। অনেকে বলেন, কয়েকটা ফিরিঙ্গি বণিক ঐখানে কিছু গুপ্ত ধনরত্নের সন্ধান পেয়েছিল, ঐ জায়গাটায় মোগল আমলের এক বড়লোকের বাড়ি ছিল নাকি এককালে। ফিরিঙ্গিরা নাকি ঐ জায়গাটা খুঁড়ে অনেক টাকা, অনেক হীরাজহরৎ পেয়েছিল। তারাও তাদের লুটপাট করা টাকা নাকি ঐ গুহার মধ্যে লুকিয়ে রাখত।

এই ধরনের নানা গল্প প্রচলিত ছিল গুহাটা সম্বন্ধে। কিছুদিন আগে শোনা যায় দুজন ডানপিটে সাহেব নাকি গুহার মধ্যে ঢুকেছিল, আর ফেরে নি। গুহার ভিতর থেকে একটা প্রকাণ্ড সুড়ঙ্গ মাটির নিচে কোথায় যে চলে গেছে তা কেউ জানে না। শোনা যায় সুড়ঙ্গটা ভিতরের দিকে গিয়ে দু-ভাগ হয়ে গেছে, কেউ কেউ বলে, তিন ভাগ। মোট কথা, গুহাটা সম্বন্ধে নানারকম গল্পগুজব প্রচলিত ছিল।

অনিল আর সুধাংশুর অনেকদিন থেকে ইচ্ছা ছিল গুহাটার ভিতর ঢুকে দেখে ব্যাপারটা কী। সুযোগও হয়ে গেল একদিন। সামনে কিসের যেন ছুটিও পড়ে গেল একটা। শহর থেকে গঙ্গার তীর, যেখানে সেই গুহা আছে, প্রায় দু-ক্রোশের উপর। খুব ভোরে উঠে হেঁটেই রওনা হল দুজনে। চলে যেতে যেতে সেই পুরাতন তর্কটা উঠে পড়ল আবার। হেতুও জুটে গেল একটা। দুজনেই একটা করে পাঁউরুটি নিয়ে গিয়েছিল সঙ্গে। গুহার ভিতর থেকে বেরিয়ে আসতে যদি দেরি হয়ে যায়, কিংবা তার ভিতরে ঢুকে যদি পথ হারিয়ে ফেলে, তাহলে ও দুটো কাজে লাগবে। কিন্তু রাস্তায় কিছুদূর এগিয়েই দেখা হয়ে গেল এক ভিখারীর সঙ্গে। জীর্ণ শীর্ণ চেহারা, কোটরগত চক্ষু, গায়ে শতছিন্ন একটা আলখাল্লা। পোড়া কাঠের মতো হাতদুটো বার করে সে বলতে লাগল, বড্ড খিদে পেয়েছে বাবু, আট-দশ দিন কিছু খেতে পাই নি, দয়া করে কিছু ভিক্ষা দিন আমাকে হুজুর, ভগবান আপনাদের মঙ্গল করবেন—

সুধাংশু দাঁড়িয়ে পড়ল।

অনিল বলল, থামলি কেন, চল—

ভাবছি আমাদের তো দুটো পাঁউরুটি আছে, একটা ওকে দিয়ে দিলে কেমন হয়—

পাগল নাকি! ওকে দিলে আমরা খাব কী?

একটাতেই আমাদের দুজনের চলে যাবে না? কতই বা খাব আমরা—

খিদের মুখে একটা পাঁউরুটি তো নস্যি? জোর খিদে পেলে দুটোতেই কুলুবে কি না সন্দেহ।

ভিখারীটা নাকি সুরে আবার শুরু করল, বড্ড খিদে পেয়েছে বাবু, দোহাই আপনাদের একটা রুটি দিন আমাকে!

যাও যাও, খেটে খাও গিয়ে। ভিক্ষে করে পেট ভরে কখনও?

ধমকে উঠল অনিল।

সুধাংশুর কিন্তু সত্যিই কষ্ট হচ্ছিল খুব। অনিলের দিকে কাচু-মাচু ভাবে চেয়ে সে বললে, দিয়েই দি আমার রুটিখানা, কী বল। সত্যিই বেচারার—

দিতে হয় দাও, কিন্তু খিদে পেলে আমারটা নিয়ে যেন টানাটানি কোরো না। আমি একটি টুকরো দেব না, তা বলে দিচ্ছি।

সুধাংশু হাসল একটু। তারপর দিয়ে দিল পাঁউরুটিটা ভিখারীকে।

এই সূত্র ধরে আবার শুরু হল সেই পুরাতন তর্কটা। তর্ক করতে করতেই তারা পৌঁছল গিয়ে গুহার মুখে।

॥ দুই ॥

গুহার ভিতর কিছুদূরে গিয়েই তারা বুঝতে পারল, টর্চ না এনে তারা ভুল করেছে। গুহার ভিতর ভীষণ অন্ধকার। মাথাটাও ঘুরতে লাগল তাদের। আস্তে আস্তে হাতড়ে হাতড়ে তবু তারা এগুতে লাগল। মনে হতে লাগল ক্রমশই যেন তারা নিচের দিকে নামছে। কিছু সিঁড়িও পাওয়া গেল কিছুদূর গিয়ে। সিঁড়ি পেয়ে নামবার কিছু সুবিধে হল যদিও, কিন্তু অন্ধকারের জন্য অসুবিধেও হতে লাগল খুব। সামনে কিছু আছে কিনা দেখা যায় না। হোঁচট খেলে কয়েকবার, তবু তারা আরও কিছুদূরে গেল। যতদূর সিঁড়ি পাওয়া গেল ততদূর কোনক্রমে নেবে গেল তারা। কিন্তু কিছুদূরে গিয়েই দেখা গেল সিঁড়ি আর নেই, একটা ঘরের মতো জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে তারা। কিছুক্ষণ হাতড়ে হাতড়েও কিন্তু ঘর থেকে বেরোবার রাস্তা আর খুঁজে পাওয়া যায় না। যেদিকেই যায় সামনে দেয়াল।

অনিল বললে, আজ ফিরে যাই চল। টর্চ নিয়ে আর একদিন আসা যাবে। আমার কেমন যেন দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। দুজনেই বসে পড়ল। সুধাংশুরও ফিরে যাবার ইচ্ছে করছিল, তারও মাথা ঘুরছিল, কিন্তু এমন সময় এক কাণ্ড ঘটল। ছাদের ওপর থেকে একটা সরু আলোর রেখা প্রবেশ করল ঘরের মধ্যে। মনে হল টর্চের অভাবটা কেমন পূর্ণ করে দিলে।

সুধাংশু বললে, কোনও ফাটল দিয়ে সূর্যের আলো ঢুকল বোধ হয়।

অনিল উত্তর দিলে, তাছাড়া আর কী, ভালই হল। ঐ যে ওদিকে আর একটা সুড়ঙ্গের মতো দেখা যাচ্ছে। আর একটু এগিয়ে চল, দেখাই যাক—

দেখা গেল, ঘরের মেঝেতে এক কোণে সুড়ঙ্গ আছে আর একটা। সেটা কিন্তু এত ছোট যে তাতে দুজনে একসঙ্গে ঢোকা যাবে না। একে-একে ঢুকতে হবে।

অনিল জিগ্যেস করল, ঢুকবি ওর ভিতর ?

ঢুকব বলেই তো এসেছি।

তুই তাহলে আগে ঢোক।

সুধাংশু ঢুকে পড়ল তার ভিতর। একটু পরে অনিলও ঢুকল।

॥ তিন ॥

দুজনে কিন্তু হাজির হল দু-জায়গায় গিয়ে।

অনিল একটি ঘরের ভিতর গিয়ে পড়ল। ঘরটি একটি মৃদু আলোয় ঈষৎ আলোকিত, কার যেন মৃদু হাসি সমস্ত ঘরখানিতে ছড়িয়ে রয়েছে। অনিলের অবশ্য এ কথা মনে হল না। কারণ আলোকে সে পরী বলে চিনতে পারে নি। তার এবং সুধাংশুর দুজনেরই মনে হয়েছিল যে, কোনও ফাটল দিয়ে রোদ ঢুকেছে। সুধাংশুকে না দেখতে পেয়ে কিন্তু ভয় হল তার। ঘরের চারিদিকে চেয়ে দেখলে, কেউ কোথাও নেই, অন্য কোথাও যাবার রাস্তাও নেই। ডাকাডাকি করেও কোন সাড়া পাওয়া গেল না। অনিল যদি আলোর ভাষা বুঝতে পারত, তাহলে অনুভব করত নীরব ভাষায়

আলো মৃদু হেসে তাকে যেন বলছে—সুধাংশু না থাকাতে ভালই তো হয়েছে। সমস্ত রুটিটা একাই তো খেতে পারবে, ওকে আর ভাগ দিতে হবে না—

অনিলের কিন্তু এসব কথা মনে হল না। আলোর ভাষা বোঝবার মতো বুদ্ধি তার ছিল না। সে সুধাংশুর নাম করে আরও কয়েকবার ডেকে বসে পড়ল ঘরের মেঝেতে। ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, খিদেও পেয়েছিল বেশ। পাঁউরুটিটা খেতে গিয়ে কিন্তু অবাক হয়ে গেল সে। একী কাণ্ড! পাঁউরুটি পাথর হয়ে গেছে, ছেঁড়া যাচ্ছে না, ভারীও বেশ। একী! দাঁত বসাবার চেষ্টা করতেই পাঁউরুটি কথা কয়ে উঠল—

অনিল, তোমার নীতি অনুসরণ করে আমি স্বার্থপর হয়েছি, আত্মরক্ষার জন্য বর্ম পরেছি। আমাকে সহজে ঘায়েল করতে পারবে না।

অনিলের সমস্ত শরীর ভয়ে কেঁপে উঠল। তারপর সে অজ্ঞান হয়ে গেল।

॥ চার ॥

সুধাংশু গিয়ে হাজির হয়েছিল আর একটা ঘরে। খুব ছোট্ট ঘর, আর তার সমস্ত মেঝেটা জুড়ে চিত্র-বিচিত্র করা প্রকাণ্ড পাথরের মতো কি যেন একটা। সুধাংশুও কম ক্লান্ত হয় নি, তারও খুব খিদে পেয়েছিল। কিন্তু সে তো তার নিজের পাঁউরুটি দান করে ফেলেছে। অনিল তাকে পাঁউরুটির ভাগ দেবে না জেনেও করেছে। সুতরাং ক্ষুধা সহ্য করা ছাড়া উপায় কী। অনিলের ঘরের মতো এ ঘরটি মৃদু আলোয় ভরা। আলো নয়, যেন হাসি! সুধাংশুর পাদুটো ব্যথা করছিল খুব। সেই চিত্র-বিচিত্র পাথরটার ওপর সে বসে পড়ল। বসেই কিন্তু লাফিয়ে উঠতে হল তাকে। পাথরটা জীবন্ত, নড়ছে! তারপর ভাল করে চেয়ে দেখলে—ওটা পাথর নয়, বিরাট একটা সাপ, কুণ্ডলী পাকিয়ে বসে আছে বিরাট অজগর। শেষে মানুষের ভাষায় কথাও কইল। সুধাংশু অবাক হয়ে গেল যখন অজগর তাকে সম্বোধন করল।

অজগর বললে, সুধাংশু, তোমারই জন্যে বহুকাল থেকে অপেক্ষা করছি।

আমার জন্যে? কেন?

তোমাকে খাব বলে।

আমাকে খাবে! সেকি!

তুমি পরার্থপর ত্যাগী লোক, একটু আগেই নিজের খাবার একজন ক্ষুধার্ত ভিখারীকে দান করেছ। দাতাকর্ণ, দধীচি, শিবি প্রভৃতির উদাহরণ দেখিয়ে অনিলকে তর্কে হারিয়ে দিয়েছ বারবার। সেজন্য আশা করে আছি আমার ক্ষুধা তুমিই নিবারণ করবে। আমি হাঁ করছি, এস আমার মুখের মধ্যে ঢুকে পড়। বহুদিন অনাহারে আছি। চলে এস, আর দেরি কোরো না।

এই বলে অজগর প্রকাণ্ড হাঁ করে এগিয়ে আসতে লাগল সুধাংশুর দিকে। সুধাংশু ভয়ে থর থর করে কাঁপতে লাগল। তারপর সেও অজ্ঞান হয়ে গেল।

॥ পাঁচ ॥

দুজনের যখন জ্ঞান হল তখন দুজনেই দেখলে তারা পাশাপাশি শুয়ে আছে, আর একটি ফুটফুটে মেয়ে তাদের দিকে চেয়ে মুচকি-মুচকি হাসছে। রঙ যেন ফেটে পড়ছে! একমাথা কালো কোঁকড়ানো চুল, কালো চোখের তারা দুটি নাচছে আর তা থেকে উপছে পড়ছে আলো।

কী কাণ্ড! এখানে ঢুকেছিলে কেন তোমরা! এই গুহায় ঢুকে কত লোক মারা গেছে জান? ভাগ্যে আমি কাছাকাছি ছিলাম! গোঁ গোঁ শব্দ শুনে দৌড়ে এলাম। এসে দেখি, তোমরা দুজন অজ্ঞান হয়ে পড়ে রয়েছ। গঙ্গা থেকে আঁচল ভিজিয়ে এনে তোমাদের চোখেমুখে জল দিলাম, তবে তোমাদের জ্ঞান হল। আর কখনও এস না এখানে, এই গুহার ভিতর থেকে মাঝে মাঝে বিষাক্ত হাওয়া বের হয়। চল বাইরে চল—

মেয়েটির সঙ্গে আস্তে আস্তে তারা গুহা থেকে বেরিয়ে এল। বেরিয়ে এসে দেখে, গুহায় ঢোকবার দ্বারের কাছে তিনটি বড়-বড় পাকা আম রয়েছে। দুজনেরই খুব খিদে পেয়েছিল, দুজনেই আমগুলির দিকে লুব্ধ দৃষ্টিতে তাকাতে লাগল। মেয়েটি মুচকি-মুচকি হাসছে।

অনিল জিগ্যেস করলে, এখানে আম এল কী করে?

মেয়েটি বললে, আমার আম। আমি রেখে গেছি এখানে। খেতে ইচ্ছে করছে নাকি?

খুব।

সুধাংশু বললে, আমারও খুব খিদে পেয়েছে।

মেয়েটি হেসে বললে, তা বলে সবগুলো দিচ্ছি না। ভাগাভাগি করে নি। তোমরা দুজনে একটা একটা করে নাও, আমার জন্যে একটা থাক। বেশি স্বার্থপরতাও ভাল নয়, পরার্থপরতাও ভাল নয়। কী বল? এই নাও।

মেয়েটি দুজনকে দুটি আম দিলে, তারপর নিজের আমটি নিয়ে ছুটে চলে গেল। হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল। আলোক-পরীকে ওরা চিনতে পারলে না। ওদের তর্কের কিন্তু মীমাংসা হয়ে গেল। ঐ ছোট মেয়েটি ওদের বুঝিয়ে দিয়ে গেল, কোনও কিছুরই বাড়াবাড়ি ভাল নয়, সামঞ্জস্য করে না চলতে পারলেই দুঃখ পেতে হয়।

দুই তীরে

শতজীর্ণ বাড়িটা। তবু কিন্তু চিনতে পারলাম। উঠোনে ঘাস গজিয়েছে। অধিকাংশ ঘর পড়ে গেছে। দক্ষিণ দিকের ঘরেই আলো জ্বলছে দেখলাম। এগিয়ে গেলাম সেই দিকে। ঘরের কপাট নেই, ঝাঁপ রয়েছে একটা। কেরোসিনের ডিপে জ্বলছে ঝাঁপের ভিতর দিয়েই দেখতে পেলাম।

"কেউ আছ এখানে?"

"কে?"

"আমি।"

ঝাঁপ খুলে বেরিয়ে এল সে।

"বিধুর কেউ আছে এখানে?"

"আমি তার স্ত্রী।"

আমার বয়স তখন যদিও পঞ্চাশ তবু মনটা দুলে উঠল। বুড়ির মুখের দিকে নির্নিমেষে চেয়ে রইলাম। পলিত কেশ, দাঁত নেই, মুখময় বলি-রেখা, কোটরাগত চক্ষু। তবু তার দিকে চেয়ে দ্রুততর হ'য়ে উঠল হৃৎস্পন্দন। অবাক হ'য়ে চেয়ে রইলাম। এই সেই? চকিতে মানসপটে একটি ঢলঢলে মুখের আভাস যেন ভেসে উঠল। উঠেই মিলিয়ে গেল আবার। পল্লীগ্রামের ঝিল্লীমুখরিত অন্ধকারকে বিক্ষত করে পেচকের কর্কশ কণ্ঠ ধ্বনিত হয়ে উঠল সহসা।

হঠাৎ প্রশ্ন করলাম—"বাড়ির পিছনে বিধু যে তালগাছটা লাগিয়েছিল সেটা এখনও আছে কি?"

আমার আকস্মিক অভ্যাগমে এবং অদ্ভুত আলাপে এমনিই একটু বিব্রত হ'য়ে পড়েছিল সে। এই প্রশ্নে আরও একটু হ'ল। একটু চুপ করে থেকে বললে, "আছে! বছর দুই আগে ঝড়ে পড়ে গিয়েছিল। বেঁকে চুরে বেঁচে আছে তবু এখনও।"

বারান্দা থেকে নেমে খিড়কি দুয়ার দিয়ে বেরিয়ে গেলাম বাড়ির পিছনের পুকুর ধারে। দেখলাম ন্যুব্জদেহ তালগাছটা দাঁড়িয়ে রয়েছে বিরাট একটা জিজ্ঞাসা চিহ্নের মতো।

ফিরে এসে বললাম, "আচ্ছা চললাম আমি।"

"কে তুমি পরিচয় তো দিলে না। হঠাৎ এলে, হঠাৎ চলে যাচ্ছ—"

"আমি? আমি বিদেশী একজন। বিধুর সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিল তাই খোঁজ নিতে এসেছিলাম। এই নাও।"

গোটা কয়েক টাকা তার কম্পিত প্রসারিত হাতের উপর রেখে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলাম। আর দাঁড়ালাম না। সোজা চলে এলাম বিয়ে বাড়িতে।

আমার বাল্যবন্ধু যতীনের ছেলের বিয়েতে বরযাত্রী হয়ে যখন এসেছিলাম তখন কল্পনাও করিনি যে এই সোনাপুর গ্রামে এসে বিস্মৃতির যবনিকা এমনভাবে স'রে যাবে। স'রে যাওয়া যে সম্ভব তা-ও ভাবিনি কখনও। অসম্ভব কিন্তু ঘটল। স্টেশনে নেমে গরুর গাড়ি চড়ে কিছুদূর এসেই আশ্চর্য হয়ে গেলাম। মনে হ'ল এ সব যেন আমার চেনা। কিছুদূর গিয়েই সেই বিরাট বটগাছটা আছে, তারপর একটু গিয়েই বাঁ হাতেই আছে একটা পুকুর—পদ্ম-দীঘি—তার পাড়ে আছে বুড়ো শিবের মন্দির। ঠিক মিলে যেতে লাগল। সোনাপুর গ্রামের সমস্ত ছবিটা ফুটে উঠল তার সামনে। মাখন তেলির বাড়িটা, কোন দিক দিয়ে সেখানে যেতে হবে—সব।

"তুমি এসেই কোথা ডুব মেরেছিলে বল তো হে", যতীন প্রশ্ন করলে। বিয়ে বাড়ি থেকে হঠাৎ আমার অন্তর্ধানে সবাই চিন্তিত হয়ে পড়েছিল।

"গ্রামটা ঘুরে ফিরে দেখছিলাম"—অবিশ্বাস্য সত্য কথাটা বলতে পারলাম না।

"এই রাত্রে? আচ্ছা সখ তো। অন্ধকারে পথ চিনলে কি করে?"

"টর্চ ছিল।"

এক কাপ চা এগিয়ে দিয়ে কন্যাপক্ষীয় একটি যুবক বললেন—"কাল সকালে সব দেখিয়ে আনব আপনাকে। সেকেলে গড় আছে এখানে একটা। আরও দ্রষ্টব্য জিনিস আছে কিছু কিছু। যেমন ধরুন…"

দ্রষ্টব্য জিনিসের তালিকা বলে যাচ্ছিলেন তিনি কিন্তু আমার কানে কিছুই ঢুকছিল না। বিধুর স্ত্রীর চেহারা আর কথাগুলোই মনে হচ্ছিল আমার বারবার।

"বংশে তো কেউ বেঁচে নেই। নিজের কাজ করবার সামর্থ্যও গেছে। ভিক্ষে করি, কি আর করব।"

অথচ আমি এখন লক্ষপতি।

সেই গুহাটা ভেসে উঠল মানস-পটে। আর সেই সাধুর চোখ দুটো।…সে অনেক দিনের কথা। তখন আমি স্কুলে পড়ি। একদিন শুনলাম গঙ্গার ধারের গুহাটায় একজন সাধু এসেছেন। তখন জটাধারী সাধু-মাত্রকেই ভণ্ড বলে মনে করা শিক্ষিত সমাজের রেওয়াজ ছিল। সুতরাং খবরটা শুনে বিশেষ বিচলিত হয়নি। তাঁকে দেখতে যাবার প্রবৃত্তিও হয়নি। অশিক্ষিত জনতা অবশ্য ভীড় করে তাঁকে দেখতে যেত। একদিন শুনলাম সাধুর নাকি অলৌকিক ক্ষমতা আছে। তবু আমি যাইনি। আমি বোর্ডিংয়ে থাকতাম, বোর্ডিংয়ের দু-চারজন ছেলে গেল, আমার কিন্তু যেতে ইচ্ছে হল না তবু। আমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে। সেদিন রবিবার। গঙ্গার ধারে লুকিয়ে মাছ ধরতে গেছি। হঠাৎ দেখতে পেলাম জটাধারী সাধু স্নান করছেন। মনে হ'ল সেই-সাধুই বোধ হয়। স্নান করতে করতে সাধু তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে দু-একবার চাইলেন আমার দিকে। যদিও অস্বস্তি হচ্ছিল তবু আমি বসেই রইলাম।

স্নান শেষ করে আমার দিকে ফিরে সাধু বললেন, "উঠে আয়—"

আদেশ অগ্রাহ্য করতে পারলাম না।

গুহার ভিতরে ঢুকে সাধু আমার দিকে ফিরে বললেন, "পূর্বজন্মের সুকৃতির জোরে তেলি থেকে ব্রাহ্মণ হয়েছিস। মাছ ধরছিস কেন? পরের জন্মে জেলে হবার সখ হয়েছে নাকি।"

"তেলি ছিলাম?"

"হ্যাঁ, পূর্বজন্মে তুই সোনাপুর গ্রামে তেলি ছিলি। তোর নাম ছিল বিধু, তোর বাপের নাম ছিল মাখন।"

হেসে ফেলেছিলাম মনে পড়ছে।

দুর্লভ

রাজকন্যা ষোড়শ বর্ষে পদার্পণ করবেন।

তাঁর জন্মোৎসব উপলক্ষে রাজ্যে বিপুল সাড়া পড়েছে। রাজা-রাণী সেনাপতি পাত্র-মিত্র প্রজাবৃন্দ সকলেই এই শুভদিনটিকে সার্থক করবার আগ্রহে আকুল হয়ে উঠেছেন। গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে বসবে সভা। এই বিশেষ দিনের বৈশিষ্ট্যকে স্মরণীয় ক'রে তুলতেই হবে। জয়ধ্বনি-মুখরিত শোভাযাত্রার আয়োজন শেষ হবে

সর্বত্র। বিচিত্র-বর্ণদীপ্ত আলোকোৎসবের জল্পনা চলছে সারা দেশ জুড়ে। সজ্জিত হবে গ্রাম, অলঙ্কৃত হবে নগরী। নানাবর্ণের আলোকচ্ছটায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে দশদিক। লক্ষ লক্ষ আতসবাজী মূর্ত ক'রে তুলবে রাজকন্যার যৌবনশ্রীকে বিস্ময়কর ঊর্ধ্বোৎক্ষেপে অন্ধকার আকাশে।

ভূরি-ভোজনের ব্যবস্থা হবে অমিত প্রাচুর্যে। দীনদুঃখীরা পাবে মিষ্টান্ন, পরিধেয়, পুরস্কার। সম্মানিত হবেন পূজনীয়গণ। সর্বশ্রেণীর পুরবাসীগণের অপরিমেয় আনন্দলাভের আয়োজনে উন্মুক্ত থাকবে রাজকোষ।

কবিরা রচনা করবেন কাব্য, চিত্রকর খুলে বসবে রঙের পসরা। মুখরিত হয়ে উঠবে গায়কের কণ্ঠে সপ্তসুর, বাদকের হস্তে বাদ্যযন্ত্র। হর্ম্য-শিল্পী, পথ-শিল্পী, আলোক-শিল্পী, সভা-শিল্পী আমন্ত্রিত হবেন সকলেই। প্রতিভার উৎসমুখ হবে অবারিত। অর্থসচিব আশ্বাস দিয়েছেন উদ্দীপ্ত প্রতিভার মর্যাদা রক্ষিত হবে রাজকীয় বদান্যতার অকুণ্ঠিত ঔদার্যে।

রাজকুমারীর জন্মদিনটি রূপে রসে রঙে সার্থক হয় যেন।

রাজ-অন্তঃপুরের একটি বিশেষ কক্ষে ছোট একটি মন্ত্রণা সভা বসেছে। রাজকন্যাকে সেদিন যে হার উপহার দেওয়া হবে সভার আলোচ্য বিষয় তাই।

রাজকবি ও রাজশিল্পী পরামর্শ করে ঠিক করেছেন হারটি হবে সূর্য-হার। ষোলটি সুবর্ণ-সূর্য গাঁথা থাকবে সাতনরী রত্নহারে। রাজ্যের ষোলজন বিখ্যাত কবি এই উপলক্ষে রচনা করবেন ষোলটি দ্বিপদী। সেগুলি লেখা থাকবে প্রত্যেকটি স্বর্ণ-সূর্যের উপর বিচিত্র বর্ণ রত্ন-অক্ষরে। নিযুক্ত হবেন ষোলজন নিপুণ শিল্পী—প্রত্যেকে প্রস্তুত করবেন এক একটি স্বর্ণ-সূর্য।

মন্ত্রী বললেন—এত কাণ্ড অত অল্প সময়ের মধ্যে হয়ে উঠবে কি? মৃদুহাস্য করে উত্তর দিলেন অর্থ সচিব—দক্ষিণার কার্পণ্য করব না আমরা, সম্ভব হবে নিশ্চয়ই।

রাজকবি ও রাজশিল্পীর এ পরিকল্পনা সমর্থন করলেন সবাই। একটি বিষয়ে কেবল মতভেদ হল দুজনের। হারের মধ্যমণি কি হবে? রাজকবির মতে হীরক নির্মিত একটি শঙ্খ হওয়া উচিত। রাজশিল্পীর মতে পদ্মরাগ মণির তৈরি একটি পদ্ম হলেই বেশি মানাবে।

ধৈর্যসহকারে উভয় পক্ষের যুক্তি শ্রবণ করে রাজা বললেন—রাজকন্যাকে জিজ্ঞাসা করুন। তার যা পছন্দ তাই হোক।

রাজকন্যা ছিলেন সে সভায়। আনত-নয়নে শুনছিলেন সব। পিতার কথায় আরক্তিম হয়ে উঠল তাঁর কর্ণমূল।

রাজকবি বললেন—আপনার কি ইচ্ছা বলুন রাজকন্যা।

রাজশিল্পী বললেন—হ্যাঁ, বলুন।

ক্ষণকাল নীরব থেকে রাজকন্যা বললেন—আমার ইচ্ছা একটু অন্য রকম—

কি বলুন—সমস্বরে বলে উঠলেন কবি ও শিল্পী।

রাজকন্যা বললেন—আমার ইচ্ছা রত্ন না দিয়ে আমার বাগানে যে চাঁপা গাছটি আছে তারই একটি ফুল দুলিয়ে দেওয়া হোক মাঝখানে।

এর জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না কেউ।

কিছুক্ষণ নীরবতার পর রাজা শেষে বললেন—বেশ তাই হোক।

নির্দিষ্ট দিনে সমস্ত রাজ্য মেতে উঠল উৎসবে।

নগরে গ্রামে জয়ধ্বনি-মুখরিত শোভাযাত্রা বেরুল আনন্দ কলরবে, ভাট-বৈতালিক-গায়কগণ নিজেদের অন্তর উজাড় করে দিলেন বিবিধ বন্দনার বিচিত্র সুরে। তোরণে তোড়ণে বাজল নহবৎ, মণ্ডপে মণ্ডপে বসল সভা। নৃত্যপরা হলেন নর্তকী, অভিনয় করলেন নট, প্রশস্তি পাঠ করলেন পুরোহিত, ছন্দে ভাবে বিগলিত হলেন কবি। আনন্দধ্বনি করে উঠল অভাব-মুক্ত দরিদ্রগণ, আশীর্বাদ বর্ষণ করলেন পূজনীয়বর্গ। পথে ঘাটে নদীতে প্রান্তরে পর্বতে সমুদ্রে মূর্ত হয়ে উঠল রাজৈশ্বর্যের অনবদ্য মহিমা-লীলা।

সূর্যহারের প্রত্যেকটি সূর্য জ্বলজ্বল করে উঠল বিচিত্র শিল্পীদের অক্লান্ত চেষ্টায়।

একটি জিনিস কিন্তু হ'ল না। চাঁপা ফুলটি ফুটল না। কারণ অর্থের লোভে বা প্রয়োজনের তাগিদে ফুল ফোটে না। ফোটে সময় হ'লে আপন খুশিতে।

গভীর রাত্রি।

পূর্ণিমার আলোয় আকাশ বাতাস স্বপ্নাতুর। থেমে গেছে জনতার কোলাহল, নিষ্প্রভ হয়ে গেছে ঐশ্বর্যের আড়ম্বর। ধীর মন্থর পদে রাজকুমারী এসে বসলেন চাঁপা গাছটির তলায়। অঙ্গে নেই অলঙ্কারের ঝনৎকার, সাধারণ কাপড় পরা, সাধারণ মেয়ে যেন। সামান্য উদ্ভিদটি তুচ্ছ করেছে সমস্ত ঐশ্বর্য-আড়ম্বরকে আজ। রাজকন্যা ভিখারিণীর মতো এসে বসলেন গাছতলায়। ধীরে ধীরে মাথা নত হ'ল, নিমীলিত হল আঁখি-পল্লব! উদ্ভিদের নিগূঢ় সত্তার সঙ্গে নিজের সত্তাটি মেলাবার আকুল আগ্রহ স্তব্ধ করে দিলে তাঁর বাইরের চাঞ্চল্যকে। স্তব্ধ হয়ে নতশিরে বসে রইলেন তিনি। অনেকক্ষণ কেটে গেল। কতক্ষণ তা খেয়াল নেই। টুপ করে উপর থেকে কি যেন পড়ল। চেয়ে দেখেন কোলের উপর পড়ে আছে একটি চাঁপা ফুল।

বিশুদ্ধ কৌতুক

পৃথিবীর বহু জিনিস ঠেলা যায় না (এই যেমন ধরুন হিমালয়), বন্ধুবর পরিমলের অনুরোধও তেমনি আমার পক্ষে ঠেলা কঠিন। তাঁহারই অনুরোধে একটি বিশুদ্ধ কৌতুকরসের গল্প আপনাদের প্রীত্যর্থে লিপিবদ্ধ করিতেছি।

…বেশী দিনের কথা নয়। সেদিন চমৎকার দখিনা হাওয়া বহিতেছে, হাতেও বিশেষ কাজকর্ম নাই, দিবানিদ্রাটি বেশ মনোমত হইয়াছে, বেড়াইতে বাহির হইলাম। কলেজ স্কোয়ারের বেঞ্চিতে বসিয়া সবে সিগারেটটি ধরাইয়াছি এমন সময় লোকটি আসিয়া হাজির হইল। চেহারাটি চমৎকার, সাজসজ্জাও মনোরম। পরিধানে গিলা-করা আদ্দির পাঞ্জাবী, গায়ে চকচকে পাম-শু, অনামিকায় পাথর-বসানো আংটি।

পান চিবাইতে চিবাইতে আসিয়া আমার দিকে একবার চাহিয়া দেখিল। তাহার পর ঈষৎ কাত হইয়া পানের পিচাটি ফেলিয়া মৃদু হাসিয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

"আমাকে কিছু 'হেল্প' করতে পারেন সার? বেশী নয়, গোটা পাঁচেক টাকা। বড় বিপদে পড়ে গেছি—"

এইবার গল্প সুরু হইয়া গেল।

গম্ভীরভাবে বলিলাম,—"মাপ করবেন।"

"আপনার কাছে পাঁচটা টাকা নেই?"

"আছে কিন্তু দেবো না। কারণ আপনাকে দেখে দরিদ্র বলে মনে হয় না।"

"এককালে বড়লোক ছিলাম, এসব তারই চিহ্ন। বাইরের পোশাক দেখে আমাকে বিচার করবেন না সার। এখন সত্যিই আমি গরীব।"

"আপনি যে মিথ্যে কথা বলছেন না তার প্রমাণ কি?"

"আমার বাড়ি গিয়ে দেখে আসুন।"

"কোথায় আপনার বাড়ি?"

"মেটিয়াবুরুজে।"

কেমন যেন রোখ চড়িয়া গেল।

"বেশ আপনি আমাদের মেসে গিয়ে অপেক্ষা করুন তাহলে। আপনার ঠিকানাটি দিন, সত্যিই যদি দেখি আপনার অবস্থা খারাপ, অবশ্যই সাহায্য করব।"

"কিন্তু মেটিয়াবুরুজ যেতে-আসতে অনেকক্ষণ সময় লাগবে যে সার। আমি কতক্ষণ আপনার মেসে বসে থাকব। তার চেয়ে চলুন না আপনার সঙ্গে যাই।"

আমি যে বুদ্ধিমান ব্যক্তি আমার জবাব হইতেই বাছাধন সেটি টের পাইয়া গেলেন।

"আপনি যদি গুণ্ডা হন? আমাকে আয়ত্তের মধ্যে পেয়ে যদি কিছু করেন? তখন? সেটি হবে না! আমাদের মেসে গিয়ে অপেক্ষা করতে হবে আপনাকে।"

"কিন্তু আসতে যেতে বড্ড বেশী সময় লাগবে যে সার।"

"আমি ট্যাক্সি করে যাব আর আসব। বেশী দেরি হবে না।"

সত্যই আমার রোখ চড়িয়া উঠিয়াছিল।

* * *

কিছুদূর গিয়া ট্যাক্সি আর যাইতে চাহিল না। কারণ, যাইতে পারিল না। গলির গলি তস্য গলির পরও সংকীর্ণতর গলি আর একটা ছিল। ট্যাক্সি সেখানে ঢুকিতে পারিল না। আমাকে নামিতে হইল। সেই আঁকা-বাঁকা অন্ধকার গলি বাহিয়া যতদূর পারিলাম গেলাম; তাহার পর দেখিলাম আমিও আর যাইতে পারিতেছি না। সম্মুখে একটা রুদ্ধ দ্বার পথরোধ করিতেছে। কয়েকবার করাঘাত করিবার পর রুদ্ধদ্বার উন্মুক্ত হইল। লণ্ঠন লইয়া এক বৃদ্ধ বাহির হইয়া আসিলেন।

"কি চান?"

"ওয়ান-হানড্রেড-ফরটি-ফোর-বাই-থারটিন-এ কোন্ বাড়িটা হবে বলতে পারেন?"

বৃদ্ধ কয়েক মুহূর্ত কোন কথাই বলিলেন না।

তাহার পর প্রশ্ন করিলেন,—"মুক্তেশ্বরের বাড়িটা?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"এই দুটো বাড়ির পাশ দিয়ে যে সরু গলিটা গেছে সেইটে ধরে সোজা চলে গেলে একটা কাঠের গুদোম পাবেন, তার পিছনে ওর বাড়ি।"

নির্দেশ অনুসরণ করিতে উদ্যত হইয়াছি এমন সময় বৃদ্ধ পুনরায় বলিলেন, "ইচ্ছে করেন তো ফেরবার পথে আর একবার দেখা করে যাবেন।"

কেন বলিলেন বুঝিলাম না। তবু প্রতিশ্রুতি দিলাম।

…কাঠের গুদামের পুঞ্জীভূত অন্ধকারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া একটু দিশাহারা হইয়া পড়িতে হইল।

"মুক্তেশ্বরবাবু বাড়ি আছেন ? মুক্তেশ্বরবাবু—"

কয়েকবার এই ধরনের চীৎকার করাতে ফল ফলিল। গুদামের পশ্চাৎভাগ আলোকিত হইল এবং একটু পরেই কেরোসিনের ডিবা হস্তে প্রায়-উলঙ্গ একটি শীর্ণকায় বালক বাহির হইয়া আসিল।

"কাকে খুঁজছেন ?"

"মুক্তেশ্বরবাবুকে।"

"তিনি বাড়িতে নেই।"

"কোথা গেছেন ?"

"নিরুদ্দেশ হয়ে গেছেন।"

"সে কি ! কেন ?"

"পাওনাদারের তাগাদার চোটে।"

(আপনাদের মনে কৌতুকরস সঞ্চারিত হইল বোধহয় !)

"আপনি কোথা থেকে আসছেন ?" বালকটি প্রশ্ন করিল।

আমি হতভম্ব হইয়া পড়িয়াছিলাম, সহসা কোনও জবাব দিতে পারিলাম না। সহসা দেখিতে পাইলাম, ছেলেটির পিছনে একটি নারীও আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন এবং সম্ভবত লজ্জা নিবারণার্থেই বুকের সামনে একটা গামছা ধরিয়া আছেন। পরনের কাপড় শতছিন্ন।

"ওঁর কোনও বিপদ-টিপদ হয়নি তো ?"

কম্পিত নারীকণ্ঠে এই উক্তি শুনিয়া আমি বড়ই অপ্রস্তুত হইয়া পড়িলাম।

"না। আমার সঙ্গে ওঁর আলাপ ছিল, তাই খবর নিতে এসেছি।"

"আসুন।"

না গেলেই বোধহয় ভাল করিতাম ! দিয়া দেখিলায়, একশত টাকার ধাক্কা। একঘর ছেলে-মেয়ে। প্রত্যেকেই ক্ষুধার্ত, কাহারও অঙ্গে কাপড় নাই। দুইজন জ্বরে শয্যাশায়ী। কেমন যেন অসহায় বোধ করিতে লাগিলাম। ক্ষীণভাবে একটু অনুতাপ হইল। তখনই যদি পাঁচ টাকা দিয়া দিতাম, এত হাঙ্গামায় পড়িতে হইত না।

* * *

এই পর্যন্ত শুনিয়াও যদি আপনাদের মনে কৌতুক-সঞ্চার না হইয়া থাকে, তাহা হইলে আর একটু শুনুন।

গলি হইতে বাহির হইয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বৃদ্ধের সহিত দেখা করিলাম এবং বলিলাম—"যা দেখলাম তা তো ভয়ংকর মশাই।"

বৃদ্ধ মাত্র দুইটি কথা বলিলেন।

"সব সাজানো।"

"অ্যাঁ, বলেন কি।"

"আজকাল লোকে চালাক হয়েছে, চাইলেই ভিক্ষে দেয় না। ভিক্ষুকরাও চালাক হয়েছে। আপনার মতো দু'একজন দয়ালু বিবেকী লোক খোঁজ-খবর নিয়ে ভিক্ষে দিতে চান। মুক্তেশ্বর তাই কতকগুলো রেফিউজিকে তার কাঠের গুদামের পিছনটায় আশ্রয় দিয়েছে আর শিখিয়ে রেখেছে যে, কেউ খোঁজ করতে এলে যেন বলে যে, দেনার দায়ে সে বিবাগী হয়ে গেছে।"

"বলেন কি?"

বৃদ্ধ স্বল্পভাষী। আর একটি কথা মাত্র বলিলেন।

"কোকেন।"

তাহার পর স্মিতমুখে কপাটটি বন্ধ করিয়া দিলেন।

* * *

এখনও কি আপনাদের মনে কৌতুক উপজে নাই। যদি না উপজিয়া থাকে আসল ব্যাপারটা শুনুন তাহা হইলে। গল্প যেখান হইতে আরম্ভ করিয়াছি, তাহা গল্পই। আসল ঘটনা এই। লোকটি যখন দেখিল আমি কিছুতেই তাহাকে সাহায্য করিব না, তখন সে পকেট হইতে একটি হোললাইফ শেফার্স বাহির করিয়া বলিল—"এই কলমটা রেখে তাহলে পাঁচটা টাকা দিন।"

বুঝিলাম চুরি করিয়া আনিয়াছে। কিন্তু সেজন্য তাহাকে পুলিশে দিলাম না। নিজ অদৃষ্টকে ধন্যবাদ দিলাম এবং মনে করিতে চেষ্টা করিলাম সকালে কাহার মুখ দেখিয়া উঠিয়াছি। কলমটি সত্যই চমৎকার। ওই কলম দিয়াই আজকাল চোরা বাজারের বিরুদ্ধে চুটাইয়া প্রবন্ধ লিখিতেছি।

গহিন রাতে

সেদিন ট্রেনটি লেটও ছিল। পুরন্দর টর্চ জ্বালিয়া রিস্ট ওয়াচ দেখিল। বারোটা বাজিয়া গিয়াছে। বেশ একটু কাতর হইয়া পড়িল। কেবল বিরহে নয়, দুই মাইল দীর্ঘ মাঠটির কথাও তাহার মনে পড়িল। এই রাত্রে একা অন্ধকারে ওই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিতে হইবে। শ্বশুর বাড়ির লোকেরা জানেনা যে সে যাইবে। শ্বশুর বাড়ির কর্তৃপক্ষকে সে ইচ্ছা করিয়াই খবর দেয় নাই। বিবাহিতা স্ত্রীর উদ্দেশ্যেও গোপন অভিসার করার মধ্যে একটু মজা আছে বই কি। তা ছাড়া তাহার শ্বশুর বাড়ির লোকগুলি কেমন যেন একটু কাঠখোট্টা বেরসিক গোছের। তাহারা ধনী এবং ভিতরে ভিতরে ক্রমশই আরও ধনী হইয়া উঠিতেছে এই তাহাদের একমাত্র পরিচয়। লেখাপড়ার ধার কেহ ধারে না। শ্বশুরের বয়স ষাটের কাছাকাছি, কিন্তু এখনও একটা দৈত্য যেন। বড় ওজনের আড়াই সের খাঁটি মহিষের দুধ প্রত্যহ হজম করেন। দাঁত একটিও পড়ে নাই। জুলফি এবং গুম্ফ সহযোগে মুখের উপর এমন একটা কান্ড করিয়া রাখিয়াছেন যে স্বয়ং সিংহও তাহা দেখিলে ভড়কাইয়া যাইবে। তাহার পুত্রগুলিও (অর্থাৎ পুরন্দরের শালারা) পিতৃপথ অনুসরণ করিতেছেন। প্রত্যেকেরই বিদ্যা গ্রামের পাঠশালা পর্যন্ত। ডন কুস্তি লাঠি খেলার চর্চাই তাহারা

অধিক পরিমাণে করিয়া থাকেন। প্রত্যেকেরই বড় বড় গোঁফ। বেশ বড় গৃহস্থ। হাজার বিঘা জমি আছে। কিন্তু বাহিরে কোনও বড়মানুষী চাল নাই। এরোপ্লেন কিনিবার সামর্থ্য রাখেন। কিন্তু মোটরটি পর্যন্ত কেনেন নাই। খান কয়েক মহিষের গাড়ী আছে। মহিষের গাড়ী ছাড়া অন্য কোনও প্রকার যান ওসব রাস্তায় অচলও।

পুরন্দর ঘড়ি দেখিয়া বাহিরের দিকে চাহিল। ঘোর অন্ধকার। এখনও দুইটি স্টেশন বাকি। ব্রাঞ্চ লাইনেরও ব্রাঞ্চ লাইন এটি, ধাপধাড়া গোবিন্দপুর ইহার নিকট শিশু, এই ধরনের দুই চারিটি অসংলগ্ন চিন্তা করিবার পর সুভদ্রার কথাই তাহার মনে স্থায়ী হইল আবার। সুভদ্রা নিশ্চয়ই তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে। হয়তো বাতায়ন পার্শ্বেই। বিবাহের পর সুভদ্রাকে সামান্য বাঙলা লেখাপড়া সে-ই শিখাইয়াছিল চিঠিপত্র লিখিবার জন্য। সুভদ্রার বড় বড় অক্ষরে লেখা চিঠিগুলি কি মধুর। এবার পুরন্দর এক কাণ্ড করিয়াছে। সহজবোধ্য কবিতায় চিঠি লিখিয়াছে সুভদ্রাকে। তাহার আসিবার খবরটি এমনকি তারিখটি সময়টি পর্যন্ত কবিতায় গাঁথিয়া দিয়াছে।

দিন কাটে হায় প্রিয়ে মিনিট গুণে।
যাইব গহিন রাতে আটাশে জুনে।

আর একবার সে হাত ঘড়ি দেখিল। হায় কবে সে যে সুভদ্রাকে লইয়া গিয়া নিজের কাছে রাখিতে পারিবে! বি-এ পরীক্ষাটা পাশ করিয়া ফেলিতে পারিলে তাহার বাবা তাহাকে একটা চাকুরী নিশ্চয় যোগাড় করিয়া দিতে পারিবেন, কারণ তিনি নিজে একজন বড় চাকুরিয়া। কিন্তু বি-এ টা সে কিছুতেই পাশ করিতে পারিতেছে না। আর বাবারও ধনুর্ভঙ্গ পণ উপার্জনক্ষম না হইলে কিছুতেই সুভদ্রাকে তিনি বাড়ি আনিবেন না। হস্টেল হইতে পালাইয়া কাঁহাতক আর এ ভাবে শ্বশুর বাড়ি আসা যায়।

স্টেশনে নামিয়া পুরন্দর দেখিল একটা বাজিয়াছে। দুই মাইল দুস্তর মাঠটি এইবার পার হইতে হইবে। স্টেশনের বাহিরে কোন প্রকার যানবাহনও নাই। সুতরাং হাঁটিয়া পার হইতে হইবে। টর্চটা অবশ্য আছে আর আছে ধ্রুবতারা সুভদ্রা। স্টেশন হইতে নামিয়া বেশ হন হন করিয়াই চলিতে সুরু করিয়া দিল সে।

…একাগ্র চিত্তে সুভদ্রার মুখ ধ্যান করিতেছিল বলিয়াই হউক কিম্বা তমিস্রার সূচীভেদ্যতার জন্যই হউক তাহার যে প্রাণ সংশয় হইয়া আসিয়াছে ইহার আভাস ঘুণাক্ষরে সে পূর্বে জানিতে পারিল না। পারিলে ছুটিত কিংবা চীৎকার করিতে পারিত। লাঠিটা হাতে লাগিয়া যখন টর্চটা পড়িয়া গেল তখন আর কিছু করিবার সময় ছিল না। কারণ পরমুহূর্তেই একজন তাহাকে পিছন হইতে ধরিয়া মুখটা বাঁধিয়া ফেলিল। তারপর নিমেষের মধ্যে চার পাঁচ জনে মিলিয়া যে কাণ্ডটা করিল তাহা অর্থনীতির দিক দিয়া শোচনীয় তো বটেই মনস্তত্ত্বের দিক দিয়াও ভয়ানক। তাহার হাত ঘড়ি, সোনার আংটি, সোনার বোতাম, সিল্কের পাঞ্জাবী, এমন কি ধুতিটা পর্যন্ত তাহারা খুলিয়া লইল। লোকগুলি খুবই তৎপর। নিমেষের মধ্যে কাজ শেষ করিয়া নিমেষের মধ্যে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

স্বপ্ন নয় তো? কিংকর্তব্যবিমূঢ় উলঙ্গ পুরন্দর এই ধারণাটাকে আঁকড়াইয়া কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা লাভ করিবার প্রয়াস পাইল। তাহার পর সহসা তাহার মনে হইল

তার কথা

তার কথা মনে হ'লে এখনও দুঃখ হয় আমার। মনে হয় যদিও আমরা নিজেদের সভ্য বলে আস্ফালন করি (ওই আস্ফালনটার মধ্যেই অসভ্যতা নিহিত নেই কি?) তবু আমরা এখনও ঠিক—মানে, এখনও আমরা গাছ থেকে ফুল ছিঁড়ে ফুলদানি সাজাই এবং পরের দিন যখন সেটা ফেলে দিই তখন একটুও দুঃখিত হই না।

…তার কথা মনে হলে—'তার কথা' বলছি, কারণ ওই শবদেহটা সে নয়—সে চলে গেছে। এসেছিল চলে গেছে। ফুলের দল যে দেশ থেকে আসে এবং এসেই চলে যায় সেই দেশেরই লোক সে। পথ ভুল করে এসেছিল, এসেই চলে গেছে। ওই সব দেহটা 'সে' নয়, ওটা তার বাসা ছিল। আমি, অতি-আধুনিক বৈজ্ঞানিক ডাক্তার একজন, আমি বলছি যে ওটা বাসা মাত্র। ওটা ছোট জানালা একটা, যার সামনে সে এসে দাঁড়িয়েছিল ক্ষণকালের জন্য।

…আমার ডাক্তারি জীবনে এ কথাটা আরও বহুবার মনে হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু হয়নি। আজ মনে হচ্ছে।…ডাক্তার হিসেবেই প্রথম পরিচয় আমার সঙ্গে। তখন আমি প্যাথোলজি ডিপার্টমেণ্টে ছিলাম। (সরকারী ডাক্তারদের একাধারে সবরকমই হতে হয়, কখনও প্যাথোলজিস্ট, কখনও ধাত্রী-বিদ্যা-পারঙ্গম, কখনও সার্জন, কখনও চক্ষু-বিদ্যাবিশারদ, কখনও কেরানী, কখনও অ্যানিস্থেটিস্ট, কখনও সিভিল সার্জন!) প্যাথোলজিস্ট হিসাবেই প্রথম পরিচয় তার সঙ্গে। সে আমার কাছে রক্ত পরীক্ষা করাবার জন্যে এসেছিল। যে চিকিৎসকটি তার চিকিৎসা করছিলেন তিনি জানতে চেয়েছিলেন ওর রক্তে সিফিলিসের বিষ আছে কি না। আমরা, মানে ডাক্তারেরা যখন হালে পানি পাই না, তখন সিফিলিস সন্দেহ করি। রোগী বা রোগিনীর অস্বীকৃতিকে অবিশ্বাস করি। বিশ্বাস করি আতুর মাংসপিণ্ডটার চিরন্তন দুর্বলতার উপর। মানুষের মধ্যে যে মহত্ত্ব, সংযম বা শ্লীলতা থাকতে পারে এ কথা আমাদের বিশ্বাস করতে মানা। আমরা সেটা যাচিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চাই—তাও হই না অনেক সময়, কারণ আমাদের কষ্টিপাথরটাও নিখুঁত নয়।

তাকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম। কারণ এত রূপ সচরাচর দেখা যায় না। খুব যে ফরসা ছিল তা নয়; কিন্তু তার আঁখিপল্লবে, গ্রীবাভঙ্গীতে, তনুদেহের লাবণ্যলীলায় এমন একটা সলজ্জ মাধুরী ছিল যা দুর্লভ। বর্ণ, ছন্দ এবং লালিত্যের এমন সমন্বয় চোখে পড়েনি আমার কখনও। ক্ষুব্ধ হলাম সে বাইজি শুনে। স্বচ্ছ জলটা ঘোলা হয়ে গেল যেন সহসা। রক্ত নিলাম। পরীক্ষা করে যা পাওয়া যাবে সে সম্বন্ধে আগে থাকতেই নিঃসংশয় হয়েছিলাম। পরীক্ষা করে কিন্তু সংশয় কমল না। বাড়ল। রক্তে সিফিলিসের কোনও চিহ্ন পাওয়া গেল না! বিস্মিত হলাম একটু। কিন্তু তা ক্ষণকালের জন্য! পরমুহূর্তেই মনে পড়ল—আমাদের পরীক্ষাগুলোও তো খুব নির্ভরযোগ্য নয়। সিফিলিস নিশ্চয়ই। হয়তো—। খানিকটা 'সিরাম' বেশী ছিল, আবার পরীক্ষা করলাম। আবার নেগেটিভ হল। সব চেয়ে বিস্মিত হলাম সে যখন রিপোর্ট নিতে এল। রক্তে সিফিলিসের বিষ পাওয়া যায় নি একথা শুনে সাধারণত লোকে আনন্দিত হয়, সে কিন্তু দুঃখিত হল। সমস্ত মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেল তার। রিপোর্ট নিয়ে চলে গেল নিঃশব্দে। যিনি তার চিকিৎসা করছিলেন তিনি

নিশ্চয়ই রিপোর্ট'টা বিশ্বাস করেন নি। আমিও করি নি। তার কোমর ব্যথার কারণ যে সিফিলিস অথবা গনোরিয়া—অথবা দুইই—এ সম্বন্ধে আমারও কোনও সন্দেহ হল না। 'কুসুমে-কীট' জাতীয় কয়েকটা শস্তা উপমা মনে এল। তার পর ভুলে গেলাম সব।

…ছ' মাস পরে আবার সে এল আমার কাছে। রূপ তার তখনও অম্লান। বাইরের ঐশ্বর্য কিন্তু কিছু কমেছে মনে হল। ওড়নাখানা যেন তত সুন্দর নয়। শাড়ীটা আধ-ময়লা। গায়ে গয়নার অভাবও লক্ষ্য করলাম। তার কোমরের ব্যথা তখনও সারে নি। বহু ডাক্তারের কাছে ঘুরেছে সে। দিল্লী, বম্বে, কোলকাতা, পাটনা ঘুরে আবার এসেছে সে এখানে। এখানে এক বিলেত-ফেরৎ ডাক্তারের খুব নাম-ডাক শুনে তাঁর কাছে গিয়েছিল। তিনি আবার রক্ত পরীক্ষা করতে বলছেন।

করুণ কণ্ঠে বললে—"একটু ভাল করে দেখুন ডাক্তারবাবু রক্তে যদি কিছু থাকে…।"

এবারও রক্তে কিছু পাওয়া গেল না সিফিলিসের বিষ তার শরীরে নেই।

"নেই ?"

"না।"

"কিচ্ছু পাওয়া গেল না ?"

"না।"

চোখ দুটি ছল ছল করতে লাগল তার।

আমি না জিগ্যেস করে আর পারলাম না—"এর জন্যে দুঃখ কেন তোমার এত ? ও বিষ শরীরে নেই এটা তো ভালই।"

"সব ডাক্তারবাবুই বলেছেন যে কোমরের ওই বেদনাটার কারণ যদি সিফিলিস হয় তাহলে সারবার আশা আছে। সিফিলিস না হলে ও আর সারবে না। আমি সেইজন্যে প্রায় সর্বস্বান্ত হ'য়ে বহু জায়গায় রক্ত পরীক্ষা করিয়েছি—কিন্তু সকলেই বলেছে নেগেটিভ। একজন ডাক্তারবাবু আমাকে কয়েকটা ইন্‌জেকসন দিয়েছিলেন, কিন্তু তবু কিছু হ'ল না। কি যে করব—"

"কোমরে ব্যথাটা কি খুব বেশী ?"

"এমন খুব বেশী নয়, কিন্তু ও নিয়ে নাচা চলবে না। নাচাই যে আমার পেশা ডাক্তারবাবু। এ পেশা যদি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে আমাকে—"

লজ্জায় মুখ নীচু করলে সে। চোখ থেকে জল ঝরে পড়তে লাগল।

প্যাথোলজিস্ট হিসাবে তার উপরোক্ত ইতিহাসটুকু জানতাম। পুলিশ সার্জন হিসাবে কিছুক্ষণ আগে তার শবদেহ থেকে তিনটে বুলেট বার করলাম। শুনলাম দুজন যুযুধান প্রণয়ীর মাঝখানে পড়ে তাদের কলহ থামাতে গিয়ে সে প্রাণ দিয়েছে।

স্বপ্ন-কাহিনী

খবরের কাগজ পড়িতে পড়িতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। একটা স্বপ্ন দেখিলাম। অদ্ভুত স্বপ্ন।

আণবিক যুগের এক অদ্ভুত যানে চড়িয়া যেন আকাশ-যাত্রা করিয়াছি। কোনরূপ অসুবিধা হইতেছে না। মনে হইতেছে যেন নিজের বৈঠকখানায় সোফায় বসিয়া আছি। বিজ্ঞানের সহায়তায় বাংলা দেশের আবহাওয়াকেই যেন আমার চতুর্দিকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছি। পাশে বাতায়নটি খোলা আছে। নানাবিধ দৃশ্য দেখিতে দেখিতে চলিয়াছি। দেখিতে দেখিতে পৃথিবী ছাড়িয়া উপরে উঠিয়া গেলাম। উর্ধ্বে, নিম্নে, দক্ষিণে, বামে নানা আকৃতির নানা বর্ণের মেঘ ভাসিতেছে। ক্রমশ মেঘলোকও ছাড়াইয়া গেলাম। তাহার পর একটু অন্ধকার, একটু পরে সহসা আবার সর্বাঙ্গ জ্যোৎস্নায় ভরিয়া গেল। চন্দ্রলোকের কাছাকাছি আসিয়াছি। যে চন্দ্রকে দূর হইতে ছোট একটা থালার ন্যায় দেখিতাম সহসা তাহার বিরাট মূর্তি দেখিতে পাইলাম। সমস্ত দৃষ্টিমণ্ডল আবৃত করিয়া তুষারাবৃত প্রকাণ্ড একটা গোলক আবর্তিত হইতেছে। দেখিতে দেখিতে চন্দ্রলোকও পার হইয়া গেলাম। তাহার পর আবার অন্ধকার। কিছুক্ষণ পরে বাতায়ন দিয়া দেখিলাম অতি দ্রুতবেগে আমরা আর এক জ্যোতির্ময় লোকের সমীপবর্তী হইতেছি।

চালক বলিলেন, "নীচের দিকে দেখুন।" দেখিলাম সবুজাভ গোলকের ন্যায় কি যেন একটা আকাশপটে শোভা পাইতেছে। এমন শ্যামোজ্জ্বল বর্ণ ইতিপূর্বে কখনও দেখি নাই।

"কি ওটা ?"—প্রশ্ন করিলাম।

চালক বলিলেন, "আমাদের পৃথিবী। আরও খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকুন, আর একটা জিনিস দেখিতে পাইবেন।"

চাহিয়া রহিলাম। দেখিলাম জ্যোতির্ময়লোক হইতে মাঝে মাঝে এক একটা কিরণ-রেখা আসিয়া পৃথিবীকে স্পর্শ করিতেছে। স্পর্শ করিবামাত্র সেই শ্যামগ্রহের অঙ্গে যেন শিহরণ জাগিতেছে, তাহার শ্যাম দ্যুতি প্রতি স্পর্শে উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিতেছে।

পুনরায় প্রশ্ন করিলাম,—"ব্যাপার কি, কিছুই তো বুঝিতে পারিতেছি না।"

চালক বলিলেন, "আমরা ওই যে জ্যোতির্ময়লোকের নিকটবর্তী হইয়াছি তাহার নাম সম্ভবলোক। যে কিরণ-রেখা আসিয়া পৃথিবীকে স্পর্শ করিতেছে তাহার নাম জন্মধারা, ওই আলোকধারা বাহিয়া অসংখ্য জড় ও জীবের সম্ভাবনা পৃথিবীতে নামিয়া আসিতেছে। কালক্রমে তাহারা সৃষ্টি-বৈচিত্র্যে মূর্ত হইবে।"

"আমরা কি সম্ভবলোকেই যাইতেছি ?"

"না, আমরা চলিয়াছি মহাকালের উদ্দেশে।"

শুনিয়া একটু ভীত হইলাম।

"মহাকাল তো ধ্বংসের দেবতা। আমরা কি ধ্বংসের অভিমুখে চলিয়াছি ?"

"ধ্বংসই তো নবজীবনের ভূমিকা। ভয় পাইতেছেন কেন ?"

"সম্ভবলোকটা একটু দেখিয়া গেলে হয় না।"

সানুনয়ে অনুরোধ করিলাম।

"বেশ, আপনার কৌতূহল থাকে, চলুন। আমার কৌতূহল নাই। আমি তাড়াতাড়ি গন্তব্যস্থানে পেঁছিতে পারিলেই বাঁচি!"

চালক সুইচ টিপিলেন। আমাদের যান সম্ভবলোক অভিমুখে দ্রুততর বেগে ছুটিতে লাগিল।

"ওই দেখুন।"

দূর হইতে যাহাকে সূক্ষ্ম কিরণ-রেখা মনে হইতেছিল তাহারই বিস্তৃততর রূপ দেখিতে পাইলাম। একটা আলোকের প্রপাত নিঃশব্দে অবতরণ করিতেছে এবং সেই আলোক নির্ঝরে ক্ষুদ্রায়িত রূপে নিখিল বিশ্বের সব কিছুই যেন মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া ধীরে ধীরে নামিতেছে। ভবিষ্যৎ-হিমালয়-ভ্রূণকে বল্মীক-স্তূপের আকারে দেখিলাম; বিরাট বিরাট জীবজন্তু, ওষধি বনস্পতি যেন ছোট ছোট পুতুলের মতো, সম্পূর্ণ অথচ ক্ষুদ্র, মানুষের চিহ্ন কিন্তু দেখিতে পাইলাম না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দুবৎ কোটি কোটি আরও কি যেন সব ভাসিয়া চলিয়াছে, উহারাই হয়তো মানুষ।

দেখিতে দেখিতে সেই আলোক-প্রপাতকে দূরে রাখিয়া আমরা আরও অগ্রসর হইয়া গেলাম।

সম্ভবলোক।

অবতরণোন্মুখ আর একটি আলোক-প্রপাত বিরাট নিস্তরঙ্গ তরঙ্গিণীবৎ দিগন্ত-বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে। তাহার দুই তীরে শুভ্র কুজ্ঝটিকার প্রাকার। অসংখ্য কাশ ফুল যেন আকাশ পর্যন্ত স্তূপীকৃত রহিয়াছে। মনে হইতেছে পুঞ্জীভূত হইয়া কিসের যেন প্রতীক্ষা করিতেছে। এক অত্যুজ্জ্বল আলোক পরিমণ্ডলী সমস্ত জ্যোতির্ময়-লোককে বেষ্টন করিয়া যেন স্বপ্ন দেখিতেছে। সেই বিশাল পরিমণ্ডলীর একপ্রান্তে আমাদের যান ক্ষুদ্র একটি পতঙ্গের ন্যায় মহাশূন্যে স্থির হইয়া আছে। আমার দৃষ্টিও স্বপ্নাতুর। রূপকথালোকের রূপসাগরে সমস্ত মন যেন ডুবিয়া গিয়াছে। অবতরণোন্মুখ আলোক-প্রপাতের আরও নিকটবর্তী হওয়াতে অতিক্ষুদ্র মানব শিশুদেরও এবার দেখিতে পাইতেছি। অসংখ্য পশু-পক্ষী, হস্তী-ব্যাঘ্র, অরণ্য-পর্বত, জনপদ-মহাদেশ আরও স্পষ্টভাবে নয়নগোচর হইতেছে। সমস্ত আচ্ছন্ন করিয়া মানবশিশুদের আনন্দ কলরব মর্মরধ্বনির মতো শুনিতে পাইতেছি। আলোক-প্রপাত তখনও গতিহীন, তখনও তাহার অবতরণ আরম্ভ হয় নাই। রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করিতেছি কখন কি ঘটে।

সহসা মহাশূন্য যেন কথা কহিয়া উঠিল। গভীর মধুর কণ্ঠে কে যেন কহিল —"সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, তোমার এইবার সময় হইয়াছে, তোমাকে এইবার মর্তলোকে অবতরণ করিতে হইবে। তোমার জীবনব্যাপী সাধনায় পিতামহ সন্তুষ্ট হইয়াছেন। তোমার অকৃত্রিম দেশপ্রেমে প্রীত হইয়া তিনি তোমার কামনা পূর্ণ করিয়াছেন। তোমার সাধ ছিল—যদি পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতেই হয়, বাংলা দেশেই আবার যেন ফিরিয়া আসি। আদিজনক চতুরানন তোমার সে সাধ পূর্ণ করিবেন। তুমি যে রূপে যে গৃহে বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করিতে চাও, বল, সেই রূপে সেই গৃহেই

তোমাকে প্রেরণ করা হইবে। তোমার কর্মফলে প্রীত হইয়া ভগবান ব্রহ্মা এ স্বাধীনতাটুকুও তোমাকে দিয়াছেন। তোমার অভিমত ব্যক্ত কর।"

শুভ্র কুজ্ঝটিকা জাল ভেদ করিয়া সুরেন্দ্রনাথের, আমাদের সেই অতিপরিচিত সুরেন্দ্রনাথের, সৌম্য জ্যোতির্ময় মূর্তি ধীরে ধীরে বাহির হইয়া আসিল।

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া স্পষ্ট পরিষ্কার কণ্ঠে তিনি বলিলেন, "আমি আর বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করিতে চাহি না।" আকাশবাণী পুনরায় ধ্বনিত হইল—"তুমি না চাহিলেও তোমাকে বঙ্গদেশেই যাইতে হইবে। পিতামহের বিধান অমোঘ, তোমাকে কেবল এই স্বাধীনতাটুকু দেওয়া হইয়াছে, তুমি যে রূপে যেখানে যাইতে চাইবে সেই রূপেই তোমাকে সেখানে পাঠান হইবে। অভিমত ব্যক্ত করিতে বিলম্ব করিও না, জ্যোতির্ময়ী জন্মধারা তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। কি রূপে সেখানে যাইতে চাও, বল।"

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া সুরেন্দ্রনাথ উত্তর দিল—"পাথর।"

চালক সুইচ টিপিলেন।

আমাদের যান আবার দ্রুতপদে মহাকালের উদ্দেশ্যে ছুটিতে লাগিল।

বিজ্ঞান

বিজ্ঞান বিষয়ে আলোচনা হচ্ছিল।

একজন উৎসাহী যুবক টেবিলের উপর প্রচণ্ড ঘুসি মেরে বললেন, "নিশ্চয়ই, বিজ্ঞানেরই জয় হয় শেষ পর্যন্ত।"

কর্ণেল মুখার্জি এতক্ষণ কিছু বলেন নি! তিনি ঘরের কোণে একটি চেয়ারে বসে সিগার টানতে টানতে পৌত্র ও দৌহিত্রদের তর্কটা উপভোগ করছিলেন। এইবার তিনি কথা বললেন। সিগারে মৃদু একটি টান দিয়ে বললেন, "সব সময়ে হয় না। আমি অন্তত একটা ঘটনা জানি হয় নি, বিজ্ঞানকে হার মানতে হয়েছিল।"

"কি রকম?" তাঁর বি-এসসি পাশ নাতিটি প্রশ্ন করলে।

"তাহলে গল্পটা শোন, গল্প নয় সত্যি কথা।"

সিগারের ছাইটি সন্তর্পণে ঝেড়ে শুরু করলেন কর্ণেল মুখার্জি।

"তখন বাংলায় ডাক্তারি পড়া হত, বুঝলে, অনেক দিন আগের কথা। আমি তখন সবে আই. এম. এস পাশ করে সার্ভিসে ঢুকেছি। সদরে কাজ করা ছাড়া আমাদের আর একটা কাজ ছিল, মফস্বলে দাতব্য চিকিৎসালয়গুলোর তদারক করা। স্টেশনের কাছে-পিঠে যে সব ডিস্পেনসারি থাকতো সেগুলোতে যথারীতি যেতাম আমরা। কিন্তু স্টেশন থেকে যেগুলো অনেক দূর সে সব জায়গায় প্রায়ই যাওয়া ঘটতো না। সেখানে ডাক্তারবাবুরাই রাম-রাজত্ব করতেন।"

সিগারে একটি টান দিয়ে কর্ণেল মুখার্জি সামনের দেওয়ালের দিকে চেয়ে রইলেন ক্ষণকাল স্মিতমুখে। যেন তিনি অতীতের ঘটনাটাকে প্রত্যক্ষ করছেন আবার।

"তারপর?"

পৌত্রের উগ্র প্রশ্নে স্বপ্নলোক থেকে নেমে এলেন আবার।

"বলছি। আমি একবার ঠিক করলাম যে স্টেশন থেকে যে সব ডিস্‌পেনসারিগুলো অনেক দূরে আছে সেগুলোতে হানা দিতে হবে। অন্তত একবার করে। ডিস্‌পেনসারির নামটা ঠিক মনে পড়ছে না, কিরণপুর, না হরিণপুর, যাই হোক, ঠিক করলাম যাব সেখানে। তিন বছরের মধ্যে সেখানে যায়নি কেউ। স্টেশন থেকে ত্রিশ মাইল দূরে। কিছু দূর যেতে হবে নৌকায়, কিছুদূর ঘোড়ায় চড়ে। দুর্গম মেঠো পথ। যাই হোক ব্যবস্থা ট্যবস্থা করে বেরিয়ে পড়লাম একদিন। ডিস্‌পেনসারিতে গিয়ে যখন পেঁছলাম তখন বেলা বারোটা। গ্রীষ্মকাল। ডাক্তারবাবু দেখি ডিস্‌পেনসারিতে নেই। দেখলাম একটু দূরে একটা বিরাট বটগাছের নীচে খুব ভীড় হয়েছে। শুনলাম ডাক্তারবাবু ওখানেই আছেন। কম্পাউণ্ডারবাবু খবরটা দিলেন। তিনি ডাক্তারখানায় ছিলেন। ভিড়ের দিকে অগ্রসর হলাম আমি। গিয়ে দেখি ডাক্তারবাবু খালি গায়ে বসে আছেন। ভদ্রলোকের পিঠে বুকে প্রচুর চুল, ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া কাঁচা-পাকা এক ঝুড়ি গোঁফ। আমি ভীড় ঠেলে যখন তাঁর কাছে গেলাম তখনও তিনি আমাকে লক্ষ্য করলেন না। তন্ময় হয়ে তিনি প্রেসক্রিপশন লিখে যাচ্ছিলেন। আমার কোটপ্যাণ্ট-পরা চেহারা দেখে একজন রুগী তাঁর কানে কানে কি বললে। বলতেই তিনি চোখ তুলে চেয়ে দেখলেন আমার দিকে।

"কি চান?"

"ইন্‌স্‌পেক্‌শন। আমি সিভিল সার্জন এ জেলার।"

শুনেই ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন এবং লম্বা এক সেলাম করলেন আমাকে।

"ইনেস্‌পেকশন করতে চান চলুন দেখাই আপনাকে। এই এরা সব আমার পেশেণ্ট।"

"চলুন ডিস্‌পেনসারিতেই যাওয়া যাক।"

এলেন আমার সঙ্গে সঙ্গে।

ডিস্‌পেনসারিতে গিয়ে সার্জিকাল যন্ত্রপাতি যে আলমারিটায় থাকে সেইটে খুলতে বললাম। হঠাৎ নজরে পড়ল এককোণে থার্মোমিটার রয়েছে একটি।

বললাম—"ওটা এখানে কেন? ব্যবহার করেন না?"

"আজ্ঞে না"

"কেন?"

"দরকার হয় না।"

কেমন যেন সন্দেহ হল ভদ্রলোক এর ব্যবহার জানেন না ঠিক। থার্মোমিটার জিনিসটার তখনও ছড়াছড়ি হয় নি এমন।

"ও জিনিসটা কি তা জানেন আশা করি!"

"জানি। তাপমান যন্ত্র।"

"ওদিয়ে কি করা হয়?"

"শরীরের তাপ নিরূপণ।"

"সাধারণ মানুষের শরীরের তাপ কত?"

"কার?"

"এই ধরুন আপনার।"

"আটানব্বই।"

"আপনার স্ত্রীর?"

"আশী।"

"আপনার ছেলের?"

"ওর আর কত হবে—ষাট।"

বুঝলাম এ বিষয়ে ভদ্রলোক কিছুই জানেন না। শরীরের তাপ সম্বন্ধে আমি যা যা জানতাম বুঝিয়ে বললাম। থার্মোমিটারের ব্যবহার কি তাও বুঝিয়ে দিলাম। চুপ করে ভদ্রলোক সুবোধ বালকের মতো আমার প্রত্যেকটি কথা ঘাড় নেড়ে নেড়ে শুনলেন। আর দু'চার কথার পর আমি বললাম—"কই আপনার ভিজিটার্স বুক বার করুন। আমার মন্তব্য লিখে দিয়ে যাই এবার।"

একটু কড়া মন্তব্যই লিখলাম।

লিখলাম—"ডাক্তার অত্যন্ত সেকেলে। আপ-টু-ডেট চিকিৎসার তেমন কিছু জানেন না। মাইনে দিয়ে এরকম লোক রাখার অর্থ গভর্ণমেণ্টের পয়সার অপব্যয় করা।"

ইংরেজীতে লিখছিলাম। লেখা শেষ করতেই ডাক্তারবাবু বললেন—"কি লিখলেন, বলুন, আমি ইংরেজী জানি না।"

তর্জমা করে শুনিয়ে দিলাম।

শুনেই ডাক্তারের মুখ লাল হয়ে উঠল। চোখও লাল হল। চোখের দৃষ্টি থেকে স্ফুলিঙ্গ ছুটে বেরুতে লাগল যেন।

"আমি ঐ কাঁচের কাঠিটার বিষয়ে তেমন কিছু জানি না দেখেই আপনি ঠিক করলেন যে চিকিৎসার আমি কিছু জানি না? কত হাজার হাজার রোগী আমার হাতে ভাল হয়েছে, কত বড় বড় অপারেশন আমি করেছি তা জানেন? দু'শ রোগী উপস্থিত আছে তাদের কথা তো আপনি কিছুই জিগ্যেস করলেন না? আমার পরিচয় তো তাদের কাছেই পাবেন। ঐ কাঁচের তাপমান যন্ত্র দিয়েই কি আপনি আমার বিদ্যাটাও মেপে ফেললেন? কেটে দিন ওটা, পাতাটা ছিঁড়ে ফেলুন।"

"তার মানে? কি ছিঁড়ব!"

"ঐ যা লিখেছেন ছিঁড়ে দিন। তারপর ঐ রোগীদের কাছে গিয়ে আমার কথা জানুন, ওরা যা বলবে তাই লিখে যান।"

"আমি আশ্চর্য হচ্ছি আপনার স্পর্ধা দেখে।"

"আমি যা বলছি তা যদি না করেন এখান থেকে যেতে পারবেন না। ওরে কে কোথায় আছিস্ আয় এদিকে—"

সঙ্গে সঙ্গে একদল লোক ছুটে এসে ঘিরে ফেলল আমায়। গতিক খারাপ দেখে আমি খাতার পাতাটা ছিঁড়েই ফেললাম। ছিঁড়ে ফেলে বেরিয়ে এলাম ডিস্পেনসারি থেকে। আর দ্বিতীয় বাক্য ব্যয় না করে ঘোড়ার পিঠে লাফিয়ে উঠে সরে পড়লাম।

"তারপর।"

"তারপর সদরে ফিরে গিয়ে ডিস্মিস্ করলাম সে ডাক্তারকে, পাঠালাম আর একজন। কিন্তু কিছু করতে পারলাম না সে ডাক্তারের। সে পাশেই ডিস্পেনসারি ফেঁদে শুরু করল প্র্যাক্টিস। দুর্দান্ত প্র্যাক্টিস। আমি যে ডাক্তার পাঠিয়েছিলাম

তার নামে দরখাস্ত আসতে লাগল ঘন ঘন। শেষকালে তাকে ধরে মার দিল একদিন সবাই। পালিয়ে গেল ছোকরা।"

"তারপর ?"

"তারপর আর কি, বিজ্ঞানের হার হল, জিত হল মানুষের।"

হরবিলাসের মৃত্যুরহস্য

হরবিলাসের মৃত্যু হইয়াছে। এ মৃত্যু সুখের অথবা দুঃখের, তাহার বিচার নীতিবিদেরা করিবেন। একদল নীতিবিদ বলিবেন, যে পাষণ্ড পর-স্ত্রী হরণ করিয়া কেবল টাকার জোরে সমাজের বুকে এতদিন বসিয়া তাহার দাড়ি উপড়াইতেছিল, তাহার মৃত্যুতে ভু-ভার লাঘবীকৃত হইয়াছে। আর একদল বলিবেন (ইহারাও নীতিবিদ) যে, আইনতঃ ললিতা হয়তো পর-স্ত্রী ছিল, কিন্তু ধর্মতঃ হরবিলাসই তাহার স্বামী, কারণ ললিতা যতদিন জীবিত ছিল, হরবিলাস নিখুঁত নিষ্ঠার সহিত স্বামীর সমস্ত কর্তব্য পালন করিয়াছে। আইনতঃ যিনি ললিতার স্বামী ছিলেন, তিনি ছিলেন একটি মনুষ্যরূপী দানব। ললিতার পিঠের উপর তাঁহার কত জোড়া জুতো যে ছিঁড়িয়াছে, তাহার হিসাব কেহ রাখে নাই; রাখিলে তাহা নিঃসন্দেহে ভদ্রলোকমাত্রেরই চিত্তে বিস্ময়, আতঙ্ক ও সহানুভূতির উদ্রেক করিত। মোট কথা ললিতার স্বামী বক্কেশ্বর বক্সী অত্যন্ত ক্রোধী, ক্রূর ও নীচমনা ব্যক্তি ছিলেন। উহার কবল হইতে ললিতাকে উদ্ধার করিয়া হরবিলাস সৎসাহসেরই পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার এই সৎকর্মের জন্য কেহই তাঁহাকে বাহবা দেন নাই, আজীবন তাঁহাকে ভয়ে ভয়ে একঘরে হইয়া বাস করিতে হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার কর্মটি যে একটি অসাধারণ-রকম সৎকর্ম, তাহাতে সন্দেহ নাই। সমাজসংস্কারের জন্য হরবিলাসের মতো সাহসী লোকেরই তো প্রয়োজন। এরূপ লোকের তিরোভাব নিতান্তই দুঃখের।

হরবিলাসের একমাত্র বন্ধু সিদ্ধেশ্বর কিন্তু এসব লইয়া মাথা ঘামাইতেছিল না। সে কেবল ভাবিতেছিল, হরবিলাসের মৃত্যুর কারণ কি। লোকটা কাল রাত্রি দশটা পর্যন্ত সুস্থ ছিল, খোসমেজাজে কত রকম গল্প করিল, সহসা কয়েক ঘণ্টার মধ্যে কি হইল! অসুখের কোনও লক্ষণই তো তাহার মধ্যে সে লক্ষ্য করে নাই। ব্যাপারটা বেশ একটু রহস্যময় বলিয়া মনে হইল। বিশেষতঃ হরবিলাসের একটি কথা মনে হওয়াতে সিদ্ধেশ্বরের ধারণা হইল যে এ মৃত্যু স্বাভাবিক মৃত্যু নয়। হরবিলাস কথাপ্রসঙ্গে তাঁহাকে একদিন বলিয়াছিলেন: "ললিতাকে নিয়ে যখন এখানে চলে আসি, তার কিছুদিন পরে বক্কেশ্বরবাবু আমাকে একটা চিঠি লেখেন। কি লিখেছিলেন জান? লিখেছিলেন,—এর প্রতিশোধ আমি নেবই। জীবন দিয়ে আপনাকে এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। দূরে পালিয়ে গিয়ে নিস্তার পাবেন না। আদালতে নালিশ করে ললিতাকে আপনার কাছ থেকে ছিনিয়ে আনতে পারি। কিন্তু ও কুলটার মুখ-দর্শন করবার ইচ্ছে নেই। ওকেও আমি শাস্তি দেব, দেখে নেবেন।"

হরবিলাসের ম্লান হাসিটা সিদ্ধেশ্বরের চোখের উপরে ভাসিয়া উঠিল। ভীত ম্লান হাসি। সহসা তাহার মনে হইল, ললিতার মৃত্যুটিও ঠিক স্বাভাবিকভাবে হয় নাই।

কে একজন অপরিচিত সন্ন্যাসী আসিয়া কি একটা প্রসাদ তাহাকে স্বহস্তে খাওয়াইয়া গিয়াছিল। সেইদিনই কলেরা হইয়া তাহার মৃত্যু হয়। সত্যই কি তাহার কলেরা হইয়াছিল ? সেই সন্ন্যাসী যে বক্কেশ্বরের চর নয়, তাহাও তো নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। হয়তো প্রসাদের সহিত বিষ ছিল···

বন্ধুর মৃত্যু সংবাদে সিদ্ধেশ্বর শোকাকুল হইয়াছিল, এসব কথা চিন্তা করিয়া একটু উত্তেজিতও হইল। তাহার মনে হইল, ললিতার মৃত্যু সম্বন্ধে কোনও তদন্ত করিবার কথা কাহারও মনে হয় নাই। কিন্তু হরবিলাসের এই রহস্যময় মৃত্যুতে যখন তাহার মনে খটকা লাগিয়াছে তখন তদন্ত না করিয়া সে ছাড়িবে না। হরবিলাসের আত্মীয়-স্বজন কেহ নাই। তাহাকেই সব করিতে হইবে। উত্তেজনাভরে সে উঠিয়া দাঁড়াইল। যে ভৃত্যটি হরবিলাসের মৃত্যু সংবাদ বহন করিয়া আনিয়াছিল, তাহার দিকে চাহিয়া বলিল ঃ "তুই যা আমি আসছি এখনি। বাড়িতে আর কোনও লোক যেন না ঢোকে। বুঝলি ?"

ভৃত্য সম্মতিসূচক মাথা নাড়িয়া চলিয়া গেল। একটু পরে সিদ্ধেশ্বরও বাহির হইয়া পড়িল। প্রথমেই গেল থানায়।

শব-ব্যবচ্ছেদ করিয়া বিশেষ কিছুই পাওয়া গেল না। হৃদযন্ত্র বিকল হইয়া হরবিলাসের মৃত্যু হইয়াছে, ইহাই ডাক্তারদের অভিমত হইল।, হরবিলাসের হৃদযন্ত্র যে দুর্বল ছিল, তাহা আর একজন ডাক্তারও বলিয়াছিল। ইহা লইয়া হরবিলাসের খুঁতখুঁতানিরও অন্ত ছিল না, সামান্য একটু কিছু হইলেই তাহার বুক ধড়ফড় করিত। কিন্তু এতদিন তো ওই হৃদযন্ত্র লইয়াই সে বেশ বাঁচিয়াছিল। সহসা এমন কি হইল···। থানার দারোগা হরবিলাসের মৃত্যুতে সন্দেহজনক কিছুই আবিষ্কার করিতে পারিলেন না। সিদ্ধেশ্বরের কিন্তু সন্দেহ ঘুচিল না। সে বাড়ির চাকরটাকে প্রশ্ন করিতে লাগিল।

"তুই প্রথমে কি করে টের পেলি যে বাবু মারা গেছেন ?"

"বাবু রোজ ভোরে ওঠেন, কিন্তু সেদিন যখন বেলা দশটা পর্যন্ত উঠলেন না, ডাকাডাকি করেও সাড়া পেলাম না, তখন জানলার সেই ফোকরটা দিয়ে উঁকি মেরে দেখলাম···"

"ও—"

ফোকরটার ইতিহাস সিদ্ধেশ্বরের মনে পড়িয়া গেল। হরবিলাসের দেশ হইতে একজন দূর সম্পর্কের আত্মীয় আসিয়াছিলেন। হরবিলাস তাঁহাকে ভাল করিয়া চিনিতে পারে নাই, কিন্তু তিনি যখন আত্মীয় বলিয়া পরিচয় দিলেন তখন তাঁহাকে বাড়িতে স্থান দিতে হইল। ভদ্রলোক ব্যবসায়-সংক্রান্ত কোনও ব্যাপারে এ অঞ্চলে আসিয়াছিলেন, হরবিলাসের বাড়িতে দিন সাতেক ছিলেন, সেই সময়ে তিনি নাকি লক্ষ্য করেন যে, ঘুমের ঘোরে হরবিলাস প্রত্যহ গোঁ গোঁ করিয়া শব্দ করে, মনে হয় যেন দম বন্ধ হইয়া আসিতেছে। হরবিলাস ব্যাপারটা তত গ্রাহ্যের মধ্যে আনেন নাই, ভদ্রলোক কিন্তু ইহাতে খুবই চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি একজন ডাক্তারই ডাকিয়া আনিলেন। তিনি আসিয়া যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা সিদ্ধেশ্বরের এখনও মনে আছে। একজন অপরিচিত ব্যক্তিকে সঙ্গে করিয়া আনিয়া তিনি

বলিয়াছিলেন : "সৌভাগ্যক্রমে ডাক্তার ঘোষের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল এখানে। ইনি পশ্চিমে প্র্যাকটিস করেন, এখানে একজন মাড়োয়ারী রোগীর কল পেয়ে এসেছেন। আমার সঙ্গে আলাপ ছিল, তাই এঁকে ডেকে নিয়ে এলাম। তুমি একবার বুকটা দেখাও তো এঁকে! রাত্রে ঘুমের ঘোরে যে রকম কর, ভয় হয়—"

ডাক্তার ঘোষ হরবিলাসের বুক পরীক্ষা করিয়া বলিলেন : "আপনার হার্ট খারাপ তাই শ্বাসকষ্ট হয়—"

হরবিলাস বলিল : "আমি তো তেমন টের পাই না।"

"আর কিছুদিন পরে পারেন।"

"কি করব তাহলে ?"

"মাথার কাছের জানলাটা খুলে শোবেন। সাফ হাওয়া দরকার—।"

"ও বাবা, আমি ভীতু মানুষ, তা পারব না মশাই।"

"জানলা সবটা খুলতে না পারেন, ছোট একটা ফোকর করিয়ে নিন জানলায়। বাইরের অক্সিজেন ঘরে খানিকটা ঢুকলেই হল।"

হরবিলাস চুপ করিয়াছিল।

আত্মীয়টি বলিলেন : "আচ্ছা, সে আমি করিয়ে দিয়ে তবে যাব।"

হরবিলাসের মাথার শিয়রের জানলায় গোল ছিদ্রটি তিনিই করাইয়া দিয়াছিলেন। পরদিন নিজে গিয়া মিস্ত্রী ডাকিয়া ছিদ্রটি করাইয়া তবে তিনি অন্য কাজ করেন। তাহার পর বেশীদিন তিনি ছিলেনও না।

সিদ্ধেশ্বর ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ভাবিতে লাগিল। ওই ছিদ্রপথেই মৃত্যু আসে নাই তো! কিন্তু কিরূপে ?

"আচ্ছা, হরবিলাসের সেই আত্মীয়টি চলে যাবার পর আর কেউ কি এসেছিল ?"

"আজ্ঞে না, তবে সেদিন একটি পাঞ্জাবী জ্যোতিষী এসেছিল।"

"পাঞ্জাবী জ্যোতিষী ? কবে ?"

"দিন পনর আগে।"

"কি বললে সে ?"

"তাতো জানিনে বাবু। তবে অনেকক্ষণ ছিল।"

সিদ্ধেশ্বর ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া বসিয়া রহিল! হরবিলাসের মৃত্যু-রহস্যের সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ থাকিতে পারে বলিয়া তাহার মনে হইল না।

মৃত্যুর ছয়মাস পূর্বে হরবিলাস একটি উইল করিয়াছিল! উইলে ছিল যে, তাহার মৃত্যুর পর তাহার সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়কে দেওয়া হইবে। 'ললিতা বৃত্তি' নাম দিয়া বিশ্ববিদ্যালয় নারী শিক্ষা-প্রসারের জন্য উক্ত টাকার সুদ হইতে একটি বৃত্তির ব্যবস্থা করিবেন। তাহার মৃত্যুর পর সিদ্ধেশ্বর যদি জীবিত থাকেন, তাহা হইলে সিদ্ধেশ্বরই তাঁহার বিষয় প্রভৃতি বিক্রয়ের ভার লইবেন। সিদ্ধেশ্বর যদি জীবিত না থাকেন, গবর্ণমেন্টের উপর এই ভার অর্পিত হইবে।

বিষয়-সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য সিদ্ধেশ্বর হরবিলাসের খাতাপত্র দেখিতেছিল। সহসা কতকগুলি ডায়েরি তাঁহার হাতে পড়িল। হরবিলাস যে এমন নিয়মিতভাবে ডায়েরি

লিখিত, তাহা সিদ্ধেশ্বরের জানা ছিল না। মৃত্যুর পূর্বদিন পর্যন্ত হরবিলাস ডায়েরি লিখিয়া গিয়াছে।

ডায়েরির পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে একস্থানে সিদ্ধেশ্বরের দৃষ্টি আটকাইয়া গেল। একস্থানে লেখা ছিল: আজ একজন পাঞ্জাবী জ্যোতিষী আসিয়াছিল। সে আমার হস্তরেখা বিচার করিয়া একটি অদ্ভুত কথা বলিল। খানিকক্ষণ আমার হাতের দিকে চাহিয়া থাকিয়া আমাকে প্রশ্ন করিল—"আপনাকে যদি একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, রাগ করিবেন না তো ?"

বলিলাম, "না রাগ করিব কেন, কি জানিতে চান বলুন।"

সে বলিল, "আপনি কি কখনও পর-স্ত্রী হরণ করিয়াছিলেন ?"

আমি প্রথমটা অবাক হইয়া গেলাম, তাহার পর মনে হইল এ খবর কাহারও নিকট হইতে সংগ্রহ করা অসম্ভব নয়। বলিলাম, "ধরুন যদি করিয়াই থাকি…।" জ্যোতিষী বলিল, "তাহা হইলে একটি বিষয়ে আপনাকে সাবধান করিয়া দিতেছি। সর্পাঘাতে আপনার মৃত্যু হইবে। এমন স্থানে কখনও যাইবেন না, যেখানে সাপ থাকিতে পারে।"

এই কথাগুলি বলিয়া জ্যোতিষী চলিয়া গেল।

জ্যোতিষীর কথাটা বড়ই অদ্ভুত বলিয়া মনে হইল। যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, ললিতার ব্যাপারটা সে আমার হস্তরেখা হইতেই নির্ণয় করিয়াছে, তাহা হইলে তাহার ক্ষমতা আছে স্বীকার করিতে হইবে। তাহা যদি হয়, তাহা হইলে তাহার দ্বিতীয় ভবিষ্য বাণীটি তুচ্ছ করিবার মতো নয়, সাবধানে থাকা উচিত। সাবধানেই আছি, বাড়ি হইতে পারতপক্ষে কখনও বাহির হই না। নিজের ঘরটিতেই বসিয়া থাকি। কাল কিছু কার্বলিক এসিড আনাইব। শুনিয়াছি, ঘরের চারিদিকে কার্বলিক লোশন ছিটাইলে সাপ আসে না।…

সিদ্ধেশ্বর ডায়েরির পাতাটার দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। হরবিলাস যে কিছুদিন পূর্বে কার্বলিক এসিড আনাইয়া ঘরের চতুর্দিকে ছিটাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিল, তাহা সিদ্ধেশ্বর জানিত। সহসা তাহার এ খেয়াল হইল কেন, জিজ্ঞাসাও করিয়াছিল, কিন্তু কোনও উত্তর পায় নাই। হরবিলাস একটু হাসিয়াছিল মাত্র। সিদ্ধেশ্বর ভাবিতে লাগিল, জানলার ওই ছিদ্রপথে সত্যই কি সাপ ঢুকিয়াছিল ? সর্পাঘাতে যদি তাহার মৃত্যু হইত, তাহা হইলে শব-ব্যবচ্ছেদের সময় কি তাহা ধরা পড়িত না ? সিদ্ধেশ্বর ডায়েরি বন্ধ করিয়া উঠিয়া পড়িল। যিনি শব-ব্যবচ্ছেদ করিয়াছিলেন, সোজা তাঁহার কাছে চলিয়া গেল।

"আচ্ছা ডাক্তারবাবু, হরবিলাসের যদি সর্পাঘাতে মৃত্যু হত, তাহলে সেটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারতেন আপনি, না ?"

"তা পারতাম বই কি। হঠাৎ একথা মনে হচ্ছে কেন এতদিন পরে ?"

"না, এমনি—"

সিদ্ধেশ্বর ব্যাপারটা ডাক্তারবাবুর কাছে ভাঙিল না।

"হার্ট ফেল করে মারা গেছেন ভদ্রলোক, এতে কোন সন্দেহ নেই। আর ও নিয়ে এখন মাথা ঘামিয়ে লাভই বা কি ?"

"তা বটে।"

একটু অপ্রস্তুত হাসিয়া সিদ্ধেশ্বর চলিয়া আসিল, কিন্তু তাহার মনে একটা খটকা লাগিয়াই রহিল।

মাস খানেক পরে।

হরবিলাসের বসতবাটি বিক্রয় করিবার জন্য সিদ্ধেশ্বর তাহার চৌহুদ্দিটি মাপিতেছিল। সেই সময় একটি জিনিস তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। জিনিসটি কিছুই নয়, একটি বড় কার্ডবোর্ডের বাক্স। হরবিলাস যে ঘরে শুইত, সেই ঘরের পাশেই একটি ঝোপের ভিতর বাক্সটি পড়িয়াছিল। খালি বাক্স, ভিতরে কিছুই নাই। তবে বাক্সের উপর একটা নম্বর এবং একটা দোকানের ঠিকানা লেখা ছিল। রোদে জলে অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছিল বটে, কিন্তু পড়া যাইতেছিল। কি মনে করিয়া সিদ্ধেশ্বর বাক্সটি তুলিয়া লইল।

কি ছিল এ বাক্সে? নানারূপ আন্দাজ করিতে করিতে অবশেষে তাহার মনে হইল, বাক্সের গায়ে যে ঠিকানাটা লেখা আছে, বাক্সটা সেই ঠিকানায় পাঠাইয়া দিয়া যদি লেখা যায় যে, এই বাক্সে যাহা ছিল, ঠিক তেমনি একটি জিনিস ভি. পি. করিয়া আমার নামে পাঠাইয়া দিন, তাহা হইলে কি হয়? হয়তো কিছুই হইবে না। কিংবা হয়তো একটা গেঞ্জি বা কয়েক জোড়া মোজা বা ওই ধরনের কিছু একটা আসিয়াও পড়িতে পারে। দেখাই যাক না কি হয়।...

সিদ্ধেশ্বর বাক্সটি প্যাক করিয়া এবং উপরোক্ত মর্মে একটি পত্রও তাহার ভিতর দিয়া সেটি পাঠাইয়া দিল। কেবল কৌতূহলের বশবর্তী হইয়াই যে সে এ কার্য করিল, তাহা নয়, কেমন যেন নিগূঢ়ভাবে তাহার মনে হইতে লাগিল যে, এই বাক্সটির সহিত হয়তো হরবিলাসের মৃত্যুর কোনও সংস্রব আছে।

দিন দশেক পরে সিদ্ধেশ্বর হরবিলাসের বাড়িতে বসিয়া জিনিসপত্রের একটা ফর্দ করিতেছিল। সম্মুখের দেওয়ালে টাঙানো ছিল ললিতার একখানি ছবি। পিওন আসিয়া প্রবেশ করিল।

"আপনার নামে একটা ভি. পি. আছে বাবু।"

"ভি. পি.? ক'টাকার?"

"দশ টাকা পনের আনা।"

সিদ্ধেশ্বর সবিস্ময়ে দেখিল সেই দোকান হইতেই ভি. পি. আসিয়াছে। ভি পি. ছাড়াইয়া লইল। পিওন চলিয়া যাইবার পর সহর্ষে স্বগতোক্তি করিল: "দেখা যাক কি এসেছে।" অবিকল সেই রকম কার্ডবোর্ডের বাক্স। বাক্স খুলিয়া কিন্তু সিদ্ধেশ্বর লাফাইয়া উঠিল। বাক্সের ভিতর একটা সাপ রহিয়াছে। কয়েক মুহূর্ত আতঙ্কিত দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া ঘরের কোণে যে লাঠিটা ছিল সেই লাঠিটা আনিয়া দূর হইতে সাপটাকে স্পর্শ করিল। সাপ নড়িল না। তখন সাহস করিয়া খোঁচা দিল একটা। খোঁচা দিতেই সাপটা আঁকিয়া বাঁকিয়া বাক্স হইতে বাহির হইয়া পড়িল। সাপটা যে রবারের এবং স্প্রিং-এর একটা কারসাজি, তাহা বুঝিতে সিদ্ধেশ্বরের দেরি হয় নাই। তবু সে সাপটার দিকে সভয়ে চাহিয়া রহিল। অবিকল একটা গোক্ষুর!

নিমেষের মধ্যে হরবিলাসের মৃত্যুরহস্যটা তাহার কাছে যেন পরিষ্কার হইয়া গেল। হরবিলাসের সেই আত্মীয়, সেই ডাক্তার, সেই জ্যোতিষী সকলেই রক্ষেশ্বর

বক্সীর লোক। সহসা একটা শব্দে সিদ্ধেশ্বর চমকাইয়া উঠিল। ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল, ললিতার ছবিখানা মেঝেতে পড়িয়া চুরমার হইয়া গিয়াছে।

বিজ্ঞাপন

ভূতি সাণ্ডেলের ছেলে অপূর্ব সানিয়েল সত্যই অপূর্ব ব্যক্তি। অভিব্যক্তি বলিলে আরও লাগ-সই হয়। শোনা যায় ভূতি সাণ্ডেলের পত্নী এই পুত্ররত্নকে দশ মাস দশ দিন গর্ভে ধরিয়া রাখিতে পারেন নাই, সাত মাসেই প্রসব করিয়া ফেলিয়াছিলেন। এমন তেজীয়ান সন্তানকে সাত মাসই যে রাখিতে পারিয়াছিলেন তাহা নিশ্চয়ই বঙ্গদেশের পূর্বসঞ্চিত পুণ্যবশতই, কারণ এমন ছেলে সাধারণত বাঁচে না। অপূর্ব কিন্তু বাচিয়া গেল। অপূর্বের বাল্যলীলার সহিত শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার যাঁহারা মিল দেখিতে পান (বলা বাহুল্য, তাঁহাদের অধিকাংশই অপূর্বের মাসি পিসি ঠাকুমা-দিদিমার দল) তাঁহারা অপূর্ব চরিত্রের বৈশিষ্ট্যটি ধরিতে পারেন নাই। বাড়িতে ননীর অভাব ছিল না, কিন্তু অপূর্ব চুরি করিত সিগারেট। বাজারে নানারকমের বাঁশী চিরকালই আছে, অপূর্ব কিন্তু 'সিটি' মারিত; গোপীদের বস্ত্রহরণ করিবার চেষ্টা সে করে নাই, স্কুল কলেজের মেয়েদের জুতার ফিতা কিন্তু সুবিধা পাইলেই সে চুরি করিত; নাগকেও সে দমন করিয়াছিল, কিন্তু তাহা কালীদহের সর্পরূপী দানব নহে, বেলতলার নাগ পণ্ডিত, তাহার প্রাইভেট টিউটার। অভিনবত্বই অপূর্ব চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। বাল্যকাল হইতেই এ পরিচয় সে দিয়া আসিতেছে।

অভিনব উপায়ে পরীক্ষাগুলিও সে পাশ করিয়া ফেলিল। আর কিছুই নয়, হাত-সাফাই। একবার প্রশ্নপত্র চুরি করিল, আর একবার পরীক্ষার খাতা বদল করিল। তৃতীয়বারে পরীক্ষককে ঘুস দিবার সময় সে অভিনব হাত-সাফাইয়ের যে পরিচয় দিল তাহা সত্যই অপূর্ব। সোজা পরীক্ষকের নিকটে গিয়া সে দশখানি দশ টাকার নোট বাহির করিয়া তাঁহার হাতে দিল এবং হাসিয়া বলিল—"যোগেনবাবু আপনার পাওনা টাকাটা পাঠিয়ে দিয়েছেন। বললেন, কোনও রসিদ দিতে হবে না।"

"যোগেনবাবু? কোন্ যোগেনবাবু?"

বিস্মিত পরীক্ষক প্রশ্ন করিলেন।

অপূর্বের দন্তপাঁতি আরও বিকশিত হইল।

"তাতো জানি না সার। তিনি আমাকে ডেকে আপনার বাড়িটা দেখিয়ে বললেন, এই একশ টাকা ওঁকে দিয়ে এস তো বাবা। অনেকদিন আগে ধার নিয়েছিলাম। শোধ দিতে পারি নি। নিজে লজ্জায় তাই যেতে পারছি না। তুমি গিয়ে বল যোগেনবাবু দিলেন, তাহলেই বুঝতে পারবেন উনি।"

বিস্মিত পরীক্ষক আরও বিস্মিত হইলেন। তিনি নিজেই বহুলোকের নিকট ঋণী হইয়া আছেন। পাওনাদার এড়াইতে গিয়াই কলিকাতার বহু গলির নাম তাঁহার মুখস্থ হইয়া গিয়াছে। তিনি আবার উত্তমর্ণ হইলেন কবে? কে এই রহস্যময় যোগেনবাবু? আশ্চর্য কাণ্ড!

"তোমার নাম কি?"

"আমার নাম অপূর্ব সানিয়াল। এবার বি এ. পরীক্ষা দিয়েছি, রোল নম্বর বাহাত্তর।"

এক নিশ্বাসে বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল! ফল যে ফলিয়াছিল তাহা সকলেই জানে। অপূর্ব সত্যই সসম্মানে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিল।

এই অপূর্বতাই অপূর্ব সানিয়ালের বৈশিষ্ট্য।

অপূর্ব দুই চোখেই সমান দেখিতে পায় কিন্তু বাঁ চোখটা সর্বদাই এমন কায়দা করিয়া বুজিয়া থাকে যে মনে হয় বাঁ চোখে কিছু পড়িয়াছে বুঝি! সকলে যাহাতে হাসে অপূর্ব তাহাতে হাসে না। যাহা শুনিয়া সকলের মুখ গম্ভীর হইয়া যায়, অপূর্ব সেখানে ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলে। বিবাহ না করাটাই আজকালকার ফ্যাসন বলিয়া অপূর্ব বিবাহ করিয়াছে, একটা নয় দুইটা। দুইটাই গোপনে, কারণ প্রকাশ্যে বিবাহ তো সকলেই করে, তাহাতে আর অপূর্বতা কি!

এই যুগ্ম বিবাহের চাপেই কিন্তু অপূর্বকে শেষে চিরাচরিত পথে পা বাড়াইতে হইল! কিন্তু তাহাতেও সে নিজের বৈশিষ্ট্য দেখাইতে ছাড়িল না।

চ্যানাচুররর—

দোকানের নাম বড় অক্ষরে সাইনবোর্ডে লেখা আছে। চানাচুরের দোকান নয়, ধর্মগ্রন্থের দোকান। বলাবাহুল্য, দোকানের সত্ত্বাধিকারী অপূর্ব সানিয়াল। তাহার ধারণা সত্যযুগ আসন্ন, তাই সকলের মধ্যেই ধর্মভাব প্রবল হইয়াছে। এখন ধর্মগ্রন্থেরই চাহিদা বেশী হইবে। অপূর্ব বলে—একটি কথা কিন্তু ভুলিলে চলিবে না। ধর্মভাব প্রবল হইলেও লোকে তাহা এখন প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত। পূর্বে লোকে কাম-বিষয়ক পুস্তক যেমন গোপনে খরিদ করিত এখন ধর্ম-বিষয়ক পুস্তকও তেমনি গোপনে খরিদ করে। সুতরাং দোকানের নাম 'ধর্মগ্রন্থালয়' বা 'ধর্মমন্দির' রাখিলে প্রকৃত খরিদ্দার সেখানে আসিতে ইতস্ততঃ করিবে। লোকে কোকেন খাইতে চায়, কিন্তু পানের ভিতর লুকাইয়া। তাই কোকেনখোরদের ভীড় ঔষধের দোকানে হয় না, হয় পানের দোকানে। দোকানের নাম 'চ্যানাচুররর—' রাখিলেই ধর্মপ্রাণ খরিদ্দারেরা হু হু করিয়া আসিবে ইহাই অপূর্ব সানিয়ালের বিশ্বাস।

ঢিলা পাজামা, বুশ শার্ট, নীল চশমা, ফ্রেঞ্চকাট গোঁফদাড়ি লইয়া অপূর্ব দোকানে দিনের পর দিন বসিয়া থাকে খরিদ্দারের আশায়। প্রথমে কয়েকদিন ছোট ছেলে মেয়ে আসিয়াছিল চানাচুর কিনিবার জন্যই। কিন্তু অপূর্ব যখন চানাচুরের বদলে 'শ্রীশ্রীচণ্ডী মাহাত্ম্য' আগাইয়া দিল তখন তাহারা অবাক হইয়া গেল। এমন কি 'বৃহদারণ্যক' অথবা 'গীতা-রহস্য' দেখাইয়াও তাহাদের মুগ্ধ করা গেল না। তাহারা মুচকি হাসিয়া সরিয়া পড়িল। অপূর্ব সানিয়ালও মনে মনে মুচকি হাসিল—"ঠিক লোকে সন্ধান পায়নি এখনও, যখন পাবে তখন তাদের ঠেকাবার জন্যেই লোক রাখতে হবে আমাকে হয়তো। পাবলিসিটিটা দরকার—।"

'চ্যানাচুররর—' বিদ্যুতায়িত হইয়া উঠিল একদিন রক্তবর্ণ আলো বিকীর্ণ করিয়া। একবার নেবে আবার জ্বলিয়া ওঠে। জ্বলিয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে ভিতর হইতে শব্দ হয় "চ্যানাচুররর—"।

ঠিক লোকেরা কিন্তু সন্ধান পায় না তবু। ধর্মপিপাসুদের সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরির দিকেই লক্ষ্য! আশ্চর্য!

অপূর্ব কিন্তু দমিবার ছেলে নয়। সে বিদ্রোহী, সে দুর্দম, সে অপূর্ব, সে অভীক। দেখা গেল ঠিক লোকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য সে যাহা শুরু করিয়াছে তাহাকে কৃচ্ছ্র-সাধন আখ্যা না দিলে সংস্কৃত ভাষার মান থাকে না! দেখা গেল সে তাহার বুশ শার্টের একটি হাত সম্পূর্ণ কাটিয়া ফেলিয়াছে। আস্কন্ধ তাহার রোমশ দক্ষিণ বাহুটি সম্পূর্ণ উন্মুক্ত। বাম বাহুতে কেবল হাতা আছে। মাথায় পরিয়াছে মৌলবীর টুপি, মুখে ঝুলিতেছে পাইপ। বাম চক্ষুটি বুজিয়া টেবিল চাপড়াইয়া গান ধরিয়াছে—"একলা চলরে!"

দোকানের সামনে ভীড় করিয়া লোক দাঁড়াইল। পুলিশ আসিল। আসিল না কেবল খরিদ্দার। ঠিক লোকেরা বেঠিক পথেই চলিতে লাগিল। এসব সত্ত্বেও। আশ্চর্য!

হঠাৎ একদিন অপূর্ব একদিকের গোঁফটা কামাইয়া ফেলিল। বাকি সব পূর্ববৎ। এবারও লোক জমিল, হৈ হল্লা হইল, কিন্তু ধার্মিক ক্রেতারা আসিল না।

"কোথায় তারা, কোথায় তারা"—গানই বাঁধিয়া ফেলিল অপূর্ব। তবু তারা আসে না। আশ্চর্য!

অবশেষে একদিন সকলে চমকিত হইয়া দেখিল অপূর্ব সানিয়াল তাহার বৃদ্ধ পিতা ভুতি সাণ্ডেলকে ধরিয়া জুতাইতেছে। তাঁহার টাক বাহিয়া রক্ত পড়িতেছে, মারের চোটে বৃদ্ধ মুক্তকচ্ছ হইয়া থরথর করিয়া কাঁপিতেছেন।

সকলে অপূর্বকে বলিল—"ছি ছি একি করছ তুমি! বাপকে জুতো মারছ কেন?"

অপূর্ব অট্টহাস্য করিয়া উত্তর দিল—"কেউ মারে না বলে মারছি। আমার দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই বলে মারছি। তারা আসছে না কেন, আমার দিকে ফিরে চাইছে না কেন। এইবার আমি ল্যাংটো হয়ে নাচব রাস্তায়, চরম পাবলিসিটি কোরব, চ্যানাচুররর—"

সত্যসত্যই উদ্বাহু হইয়া অপূর্ব সানিয়াল অপূর্ব ভঙ্গীতে ফুটপাথের উপর দাঁড়াইয়া নাচিতে লাগিল।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—

উক্ত অপূর্ব সানিয়াল আমাদের 'বায়ুদমন' ঔষধ সেবন করিয়া সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছেন। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

ঠিকানা—বায়ুদমন কার্যালয়।
বড়াখাম্বা রোড,
নিউদিল্লী।

দেশ-দরদী কেনারামের রোজনামচা

৮-২-৫০

আপনারা কখনও দেশের দুর্দশার কথা চিন্তা করিয়াছেন কি না জানি না। হয়তো করেন নাই, হয়তো করিয়াছেন। মাঝে মাঝে সবিস্ময়ে আমি ভাবি, আমি যেভাবে দেশের দুঃখ প্রত্যহ অনুভব করি তেমনভাবে আর কেহ করে কি না। আমি

প্রত্যহ তিনখানি সংবাদপত্র আদ্যন্ত পাঠ করিয়া বিচলিত হই, বিগলিত হই, বিহ্বল হই। ইচ্ছা করে চীৎকার করিয়া কাঁদি। কিন্তু কাঁদিতে পারি না। মনে হয় আমার অশ্রুর উৎস বোধহয় শুকাইয়া গিয়াছে। কিন্তু না, সেদিন চোখে কাঁকর পড়িয়াছিল, অনেক জল তো বাহির হইল! তাহা হইলে বোধহয় দেশের দুর্দশার কথা ভাবিবামাত্র অশ্রু জমাট হইয়া যায়, ঝরিয়া পড়িতে পারে না। হয়তো আমার মর্মলোক উত্তর-মেরু হইয়া গিয়াছে। কে জানে…।

খবরের কাগজ পড়িতে পড়িতে সত্যই অন্যমনস্ক হইয়া যাই। আজ সহসা লক্ষ্য করিলাম চা ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে। শুধু তাহাই নয়, চা-য়ে একটি মাছি পড়িয়া ছটফট করিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে মনে একটা উপমা জাগিল। মনে হইল স্বাধীনতা-কাপে পড়িয়া দেশও ওইরূপ হাবুডুবু খাইতেছে। দেশও মাছি হইয়া গিয়াছে। মনটা হু হু করিয়া উঠিল।

চাকরকে আর এক কাপ চা আনিতে বলিলাম।

তাহার পর আর এক কাপ।

তাহাতেও শানাইল না, তৃতীয় কাপের ফরমাস দিয়া পায়ের পাতা নাচাইতে নাচাইতে পুনরায় সংবাদপত্রে মনোনিবেশ করিলাম। ইচ্ছা হইল সম্পাদকের পদধূলি চাঁছিয়া আনিয়া সর্বাঙ্গে মাখি। আহা, কি লেখাই লিখিয়াছে। বাসনা জাগে সম্পাদক হইব। কিন্তু হায় পরক্ষণেই মনে হয় বামন হইয়া চাঁদে হাত কি করিয়া দিব? তাহা যে অসম্ভব!

যন্ত্রণায় ছটফট করিতে লাগিলাম।

মনে হইল দেশ গেল যে, আমি কি করিতেছি!

এক কাপ কফি প্রস্তুত করিতে বলিলাম।

১০-৭-৫০

সন্ধ্যাবেলা ক্লাবে যাইতেছিলাম। পথে দেখিলাম একটি বালিকা ম্লানমুখে দাঁড়াইয়া আছে। মনে হইল নিশ্চয়ই দুঃখিনী, নিশ্চয়ই পাকিস্থান হইতে আসিয়াছে! আমার হৃদয়-গামছাকে কে যেন নিঙড়াইতে লাগিল। ইচ্ছা হইল কিছু অর্থ সাহায্য করি। পয়সা বাহির করিবার জন্য পকেটে হাত দিয়াছি এমন সময় বিবেক বলিল—পয়সা দিয়া কি তুমি উহার দুঃখ দূর করিতে পার? ভিক্ষা দিলে উহাকে অপমানই করা হইবে। বেচারী যথেষ্ট অপমানিত হইয়াছে, আর কেন। পয়সা বাহির করা হইল না, তাহার দিকে আর ফিরিয়াও চাহিলাম না। গটগট করিয়া সোজা ক্লাবে চলিয়া গেলাম। গিয়াই প্রথমে ভুতনাথের সহিত দেখা হইল। ভুতনাথ বলিল, "কেনারামবাবু, আপনার গা থেকে চমৎকার গন্ধ বের হচ্ছে তো! সেন্ট মেখেছেন না কি?"

সত্য কথাই বলিলাম।

"হ্যাঁ, ইভনিং ইন প্যারিস।"

বিশ্বনাথ পাশে দাঁড়াইয়াছিল!

সে বলিল—"আপনার আন্ধির পাঞ্জাবিটিও চমৎকার মানিয়েছে আপনাকে—"

কম্পিতকণ্ঠে আবেগভরে বলিলাম—"ভাই বিশ্বনাথ, আমাদের দেশেই এককালে

ঢাকাই মসলিন হ'ত সে কথা ভুলে যেও না। এ আদ্ধি তার কাছে চট। আমি চট পরে বেড়াচ্ছি ভাই। আমার দুঃখ তোমরা বুঝবে না।"

"চলুন, এক হাত ব্রীজে বসা যাক"—ভূতনাথ বলিল। রাত্রি দশটা পর্যন্ত ব্রীজ খেলিলাম। ব্রীজ খেলার ফাঁকে ফাঁকেও দেশের দুর্দশা সম্বন্ধে দুই চারিটা কথা না বলিয়া পারিলাম না। উদ্বাস্তুদের অসীম দুর্দশা, ঘন ঘন ট্রেন কলিশন, খাদ্য সংকট, কর্তৃপক্ষদের অপটুতা, অসাধুতা প্রভৃতি চিত্তকে এমন উদ্বেলিত করিল যে উপর্যুপরি দুইবার হারিয়া গেলাম।

বাসায় ফিরিয়া মাংসের কোর্মা-সহযোগে লুচি আহার করিতে করিতে বারম্বার মনে হইতে লাগিল, আহা, কত লোক যে অনাহারে আছে। খাদ্যমন্ত্রীর সম্বন্ধে সংবাদপত্রে যে সব মন্তব্য বাহির হইয়াছে সেগুলি মনে পড়িল। অমন একটা নামজাদা লোকের এই ব্যবহার? ছিঃ ছিঃ! অত্যন্ত কষ্ট হইতে লাগিল। অন্যমনস্ক ভাবে অনেকগুলি লুচি গলাধঃকরণ করিয়া ফেলিলাম। নেটের মশারি-আবৃত দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ন করিতে গিয়া আরও কাতর হইলাম। মনে পড়িল কত লোক ফুটপাথে শয়ন করিয়া আছে। শিয়ালদহের দৃশ্য মনে পড়িল। তাহারা কি আমার ভাইবোন নয়? চক্ষু সজল হওয়া উচিত ছিল কিন্তু হইল না। একটা চাপা কষ্টে যেন দম বন্ধ হইবার মতো হইল! অনেকক্ষণ গুম হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। তাহার পর নজর পড়িল আমার বালিশের উপর প্রত্যহ যে রোমশ তোয়ালেখানি বিছানো থাকে, তাহা নাই। গৃহিণী সেকেন্ড শো-য়ে সিনেমায় গিয়াছেন, আমার বালিশের উপর তোয়ালে দেওয়া হইয়াছে কি না দেখিবার অবসর পান নাই। এই দেশেই কি সীতা-সাবিত্রী ছিল? অত্যন্ত কষ্ট হইতে লাগিল। মাসিক চল্লিশ টাকা বেতন দিয়া যে চাকরটিকে নিযুক্ত করিয়াছি সেও আমার বালিশের উপর তোয়ালেটি বিছাইয়া দিবার অবসর পায় নাই। খাদ্যমন্ত্রী হইতে সুরু করিয়া সামান্য চাকর পর্যন্ত সব ফাঁকিবাজ! এ দেশের কি কোনও দিন উদ্ধার হইবে? মনের কষ্ট মনে চাপিয়া স্বহস্তেই বালিশের উপর রোমশ তোয়ালেটি বিছাইয়া লইলাম।

১২-৭-৫০

সকালে বাগানে বেড়াইতেছিলাম। বেড়াইতে বেড়াইতে সহসা একটি কালো জিনিস নজরে পড়িল। তুলিয়া দেখিলাম আমসি! আমসি!! একদিন আম ছিল আজ আমসি হইয়াছে। মনে হইল আমাদের দেশের অবস্থাও কি এইরূপ নয়? আমাদের দেশও একদিন আম ছিল আজ আমসি হইয়াছে। মনে হইবামাত্র হৃদয়বাল্‌তি দুঃখবারিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। একটি সিগারেট ধরাইয়া দেশের কথাই চিন্তা করিতে লাগিলাম। সেদিন রাস্তায় যে ম্লানমুখী বালিকাটিকে দেখিয়াছিলাম তাহার কথা মনে পড়িল। ঘুরিয়া ফিরিয়া কেবলই মনে পড়িতে লাগিল। বিব্রত হইয়া খিলি দুই পান এবং একটু জরদা মুখে দিলাম। কাশীর জরদা পূর্বে কত ভালো ছিল, কৌটা খুলিলে কি চমৎকার গন্ধই ছাড়িত, এখন কিছু নাই। হায় হায়, দেশ কোন্ পথে চলিয়াছে? অত্যন্ত কষ্ট হইতে লাগিল।

১৪-৭-৫০

প্রতিটি খবরের কাগজের স্তম্ভে স্তম্ভে ক্রমাগত দুঃসংবাদ পড়িয়া অস্থির হইয়া পড়িয়াছিলাম। মনে হইতেছিল বুঝি পাগল হইয়া যাইব। কিছুক্ষণ ভুলিয়া থাকিবার জন্য অবশেষে তাই সিনেমায় গেলাম। খুব ভীড়। অতি কষ্টে একটি প্রথম শ্রেণীর টিকিট কিনিতে পারিলাম। প্রেক্ষাগৃহে প্রবেশ করিয়া কিন্তু ভারী আনন্দ হইল। যখনই সিনেমা দেখিতে যাই, তখনই এই ধরনের আনন্দ হয়। একসঙ্গে এতগুলি দেশের লোক আনন্দ লাভের আশায় একত্রিত হইয়াছে ভাবিলেই আমি রোমাঞ্চিত হই। রোমাঞ্চিত কলেবরে গিয়া নিজের আসনে উপবেশন করিলাম। আমার বাম পাশের আসনটি দেখিলাম তখনও খালি রহিয়াছে। একটি সিগারেট ধরাইয়া কল্পনা করিতে বসিলাম বাম পাশের আসনটিতে কে বসিবে? নারী না পুরুষ? কোন্ বয়সের? স্বদেশী না বিদেশী? বেশীক্ষণ কিন্তু এ চিন্তা করিবার অবসর মিলিল না, প্রেক্ষাগৃহ অন্ধকার হইয়া গেল, চিত্রপটে একের পর এক বিজ্ঞাপনের ছবি ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। কিছুক্ষণ দেখিবার পর বড়ই বিষণ্ণ বোধ করিতে লাগিলাম। মনে হইল বিদেশী বিজ্ঞাপনের ছবিগুলি কি সুন্দর, দেখিলেই জিনিসটি কিনিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু ওই প্যাঁচামুখীকে দেখিবার পর কি আর স্নো কিনিতে ইচ্ছা করিবে? আমাদেরই যদি স্বদেশী জিনিস কিনিতে অনিচ্ছা জন্মে স্বদেশী ব্যবসায় চলিবে কি করিয়া? স্বদেশী ব্যবসায় যদি না চলে···আর ভাবিতে পারিলাম না। মনে হইল সীমাহীন বেদনা-সমুদ্রে অন্তর ভরিয়া গিয়াছে, তাহার তরঙ্গে তরঙ্গে হৃদয়-শোলা দিশাহারা হইয়া ভাসিয়া বেড়াইতেছে। ছবির পর ছবি আসিতে লাগিল, আমি বেদনা-সমুদ্রে হাবুডুবু খাইতে লাগিলাম। তাহার পর আসল ছবি আরম্ভ হইয়া গেল। দশটি যুবতীর নৃত্য-ভেলা আঁকড়াইয়া ধরিয়া গজল শুনিতে শুনিতে বেদনা-সমুদ্র পার হইতে লাগিলাম, কিছুক্ষণ পরে সান্ত্বনা-সৈকতও দেখা গেল, কিন্তু হায়, আবার ঝটিকা আসিল। মনে হইল বাম পার্শ্বের আসনটিতে একটি মহিলা আসিয়া উপবেশন করিলেন। আমি কেনারাম ঘোষ, চিরকালই ভীতু স্বভাবের লোক। ঘাড় ফিরাইয়া দেখিতে সাহস করিলাম না। অন্ধকারও ছিল। দুরু দুরু কম্পিত হৃদয়ে বসিয়া বোম্বাই-মার্কা নৃত্য দেখিতে লাগিলাম।···ইন্টারভাল হইল। তখন অতিকষ্টে সাহস সঞ্চয় করিয়া ঘাড় ফিরাইলাম। দেখিলাম সেই ম্লানমুখী বালিকাটি বসিয়া আছে—সেদিন যাহাকে পথে দেখিয়াছি। প্রখর বিদ্যুতালোকে দেখিলাম বালিকা নয়, যুবতী। আমার ভয় যেন মন্ত্রবলে অদৃশ্য হইয়া গেল, কর্তব্য স্থির করিয়া ফেলিলাম। একটু ইতস্তত করিয়া প্রশ্ন করিলাম—"মাপ করবেন, আপনার বাড়ি কি পাকিস্তান?" মেয়েটির ম্লান মুখ যেন আরও ম্লান হইয়া গেল। যদিও সে মুচকি হাসিয়া উত্তর দিল, "না, আমার বাড়ি এখানেই" কিন্তু আমার চোখকে সে ফাঁকি দিতে পারিল না। দেশের দুঃখ অনলে জ্বলিয়া জ্বলিয়া আমার দৃষ্টি অদ্ভুত তীক্ষ্ণতা লাভ করিয়াছে। আমি তাহার বেদনা প্রত্যক্ষ করিলাম। তাহার মুচকি হাসি তাহার বেদনাকে আরও যেন স্পষ্ট করিয়া তুলিল। আমি ইহাও বুঝিলাম যে, তাহার বাড়ি পাকিস্তান বলিলে পাছে আমি তাহার প্রতি অনুকম্পাশীল হই তাই সে সত্য গোপন করিতেছে। বড়ই কষ্ট হইতে লাগিল। কর্তব্যবোধেই আমিও তখন চাতুরী অবলম্বন করিব স্থির করিলাম। বলিলাম, "কিছু মনে করবেন না, আমার একজন অত্যন্ত নিকট

আত্মীয়া পাকিস্তানে ছিল, সে ঠিক আপনার মতো দেখতে। আপনাকে দেখে তার কথা মনে পড়ছে।” মেয়েটি আর একটু মুচকি হাসিল। চানাচুরওয়ালাকে ডাকিয়া দুই ঠোঙা চানাচুর কিনিলাম।

“আপনি খাবেন? নিন না। আমার যে আত্মীয়াটির কথা বলছিলাম, সে চানাচুর খেতে খুব ভালবাসত। জানি না সে এখন কোথায়।”

“বেশ দিন।”

মেয়েটি হাত বাড়াইয়া ঠোঙাটি লইল এবং যে ভাবে খাইতে লাগিল তাহাতে আমি অবাক হইয়া গেলাম। আমার বিস্ময় ক্রমশ কষ্টে রূপান্তরিত হইল। স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম বেচারী অনাহারে আছে! মনে হইল আমি যেন দময়ন্তীকে প্রত্যক্ষ করিতেছি। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পুনরায় চাতুরীর আশ্রয় লইলাম।

বলিলাম, “আমার সেই আত্মীয়াটি ফিরপোতে খেতে খুব ভালবাসত। আপনার যদি অসুবিধে না হয় চলুন না ফিরপোতে যাই।”

“বেশ, সিনেমার পর যাওয়া যাবে।”

পাছে আমি তাহাকে গরীব এবং অসহায় মনে করিয়া কৃপা-পরবশ হই সেইজন্য বোধহয় খুব সপ্রতিভভাবে কথাগুলি বলিল। কিন্তু আমাকে ফাঁকি দেওয়া শক্ত। দেশের দুর্দশা যে কত গভীরে গিয়া পৌঁছিয়াছে তাহা আমার চেয়ে বেশী আর কে জানে! তিনটি দৈনিকপত্র প্রত্যহ তন্ন তন্ন করিয়া পাঠ করত যে সূক্ষ্ম-দৃষ্টি আমি লাভ করিয়াছি তাহা যে মর্মভেদী। প্রিণ্টেড্ শাড়ি দিয়া সে দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করা যাইবে না! খুবই কষ্টভোগ করিতে লাগিলাম। সিনেমা শেষ হইবামাত্র ভাল একটি ট্যাক্সি ডাকিয়া উভয়ে চড়িয়া বসিলাম এবং ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ফিরপো অভিমুখে রওনা হইয়া গেলাম।

* * *

দেশদরদী কেনারাম ঘোষের রোজনামচার উপরোক্ত অংশটুকু তাঁহার ত্রিতল বাটির সম্মুখস্থ ডাস্টবিন হইতে পাওয়া গিয়াছিল। দেশদরদী কেনারাম পত্নীর সহিত তুমুল কলহ করিয়া যেদিন গৃহত্যাগ করেন সেদিন তাঁহার পত্নী ত্রিতলের বাতায়ন হইতে যে সকল কাগজপত্র ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিতেছিলেন সেই কাগজপত্রের মধ্যে উপরোক্ত অংশটুকু ছিল। বাকী অংশটুকু বোধহয় আর পাওয়া যাইবে না, বহু অমূল্য জিনিসের সহিত ধাপার মাঠে তাহা বোধহয় মারা গিয়াছে।

জীবন-দর্শন

স্বাধীনতা দিবসে নিজের বাটির সম্মুখভাগ সুসজ্জিত করিবার বাসনা সকলেরই হয়, ভুবন মাইতিরও হইল। ভুবন মাইতির পিতা জীবন মাইতি সামান্য কেরানী মাত্র, বহুকালাবধি দশটা-পাঁচটা আপিস করিয়াছেন, কোনও হুজুগে মাতিবার মতো মানসিক তারুণ্য তাঁহার আর নাই। কিসে চাকুরিটি বজায় থাকে ইহাই তাঁহার একমাত্র চিন্তা। বাটির সম্মুখভাগ সুসজ্জিত করিলে যদি চাকুরির কোনও সুবিধা হইত জীবন মাইতি নিশ্চয়ই তাহা করিতেন। কিন্তু তিনি জানেন বাটির সম্মুখভাগ

লতাপাতা দিয়া সাজাইয়া 'জয় হিন্দ' টাঙাইয়া দিলে বর্তমান বড়বাবুর চিত্তে বিশেষ কোনও সুপ্রভাব বিস্তার করা যাইবে না। বিপরীত ফল হওয়াও বিচিত্র নয়। তাই তিনি এ বিষয়ে বিশেষ কোন উৎসাহ বোধ করেন নাই। নূতন ধরনের একটা চিন্তা মনে উদিত হওয়ায় প্রত্যুষেই তিনি বাহির হইয়া গিয়াছিলেন।

তাঁহার পুত্র ভুবন মাইতি কিন্তু স্বাধীনতা দিবসের সম্মান রক্ষা করিতে উৎসুক। সে শিক্ষিত লোক, কবি লোক। সুতরাং গতানুগতিক পন্থায় ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা উড়াইয়া, কিংবা গোটাকতক লাল নীল বাতি জ্বালাইয়া এই মহাদিবসকে সম্বর্ধনা করিবার প্রেরণা সে পাইল না। সে এমন কিছু করিতে চাহিল যাহা অনন্য, যাহা অনবদ্য, যাহা তাহার কবি হৃদয়ের পরিচায়ক। যে স্বাধীনতার জন্য সুরেন্দ্রনাথ, ক্ষুদিরাম, কানাইলাল, চিত্তরঞ্জন, নেতাজী···তাহার মগজের মধ্যে স্বাধীনতার সমস্ত ইতিহাসটা থলবল করিয়া উঠিল। "কি করা যায়···মানে,"—নিপুণভাবে একটি সিগারেট ধরাইয়া প্রচুর ধূম উদ্গীরণ করত সে ভ্রূ-কুঞ্চিত করিতে বাধ্য হইল। দ্বিতীয় সিগারেটটি নিঃশেষ করিবার পর হঠাৎ তাহার মাথায় ঝড়াৎ করিয়া 'আইডিয়া' আসিয়া গেল একটা। ঠিক! উঠিয়া সিগারেটটি জানালা দিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া সে মালকোঁচা মারিতে লাগিল। তাহাদের বাড়ি হইতে দুই ক্রোশ দূরে যে জঙ্গলটি আছে সেই জঙ্গল হইতে ফুল লতাপাতা আনিয়া সে বাড়ি সাজাইবে। ভারতের সভ্যতা একদিন অরণ্যের ক্রোড়েই লালিত হইয়াছিল, সেদিন বনমহোৎসবও হইয়া গিয়াছে। ঠিক! ভুবন মাইতি বাইকে চড়িয়া বাহির হইয়া গেল।

* * *

একগোছা হলুদ রঙের ফুল পাড়িয়া তাহার মনে হইল, ইহাই কি কর্ণিকার? যে কর্ণিকারের কথা কবি কালিদাস বলিয়াছেন, ইহা কি তাহাই? গ্র্যান্ড কিন্তু। ইহা যদি কর্ণিকার নাও হয় তাহা হইলেই বা কি আসে যায়। আমি ইহাকে কালিদাসের কর্ণিকার ভাবিয়াই তুলিব, কালিদাসের কর্ণিকার ভাবিয়াই ঘর সাজাইব। কালিদাস ভারতীয় সংস্কৃতির অলংকার, আজ স্বাধীনতা দিবসে···সমস্ত গাছটা সে মুড়াইয়া ফেলিল।

তাহার পর তাহার নজরে পড়িল একগোছা লালফুল। ঊর্ধ্বমুখী শাখায় গুচ্ছ গুচ্ছ ফুটিয়া রহিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের কবিতা মনে পড়িল—উদ্ধত যত শাখার শিখরে রডোডেনড্রন গুচ্ছ। রডোডেনড্রন কি রকম ফুল? লাল, না, সাদা? পুনরায় সে ভ্রূ-কুঞ্চিত করিতে বাধ্য হইল। ভ্রূ-কুঞ্চিত করার ফলেই হোক বা অন্য কোন কারণেই হোক একটা নূতন কথাও মনে হইল তাহার। ওগুলো অশোক ফুল হইতেই বা বাধা কি! আগস্ট মাসে কি অশোক ফুল ফোটে? কে জানে। কিছুক্ষণ ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া থাকিয়া সে স্বগতোক্তি করিতে বাধ্য হইল—আর দূ্যৎ, ওসব লইয়া বৃথা মাথা ঘামাইতেছি। আমি নিজে যদি উহার নূতন নামকরণ করি আটকায় কে। দুইজন ভারতীয় কবির ব্যবহৃত দুইটি ফুলের যদি সন্ধি করিয়া অশোকেনড্রন করিয়া দিই কি এমন ক্ষতি। স্বাধীনতা দিবসে এটুকু স্বাধীনতা যদি না থাকে তাহা হইলে আর···।

এ গাছটাকে সে মুড়াইয়া ফেলিল।

দুই রকম ফুল সংগ্রহ হইল! এইবার কিছু পাতা সংগ্রহ করিতে হইবে। বনে পাতার অভাব ছিল না। দুই হাতে সে পাতা ছিঁড়িতে লাগিল। স্বাধীনতা দিবসটা

চুটাইয়া পালন করিতে হইবে। সহসা কিন্তু তাহার মস্তকে বজ্রাঘাত হইল। হাতঘড়িটি কখন খুলিয়া পড়িয়া গিয়াছে সে টের পায় নাই। কি সর্বনাশ! চতুর্দিকেই ঝোপঝাড়, কোথায় সে খুঁজিবে। কিন্তু খুঁজিতেই হইবে।

…একটা ঝোপের ভিতর কিছুদূর হামাগুড়ি দিয়া ঢুকিয়া ভুবন মাইতি পুনরায় ভ্রূ-কুঞ্চিত করিতে বাধ্য হইল। অদূরে আর একটি ঝোপের অন্তরালে আর একটি লোক ঘাপটি মারিয়া বসিয়া আছে! ভাল করিয়া তাহার মুখটা যদিও দেখা যাইতেছে না কিন্তু তবু যেন চেনা চেনা ঠেকিতেছে। জামার ছিটটা তো খুবই পরিচিত। ভুবন মাইতি বহু প্রকার ডিটেকটিভ উপন্যাস পাঠ করিয়াছিল। তাহার মাথার ভিতর দিয়া ঝড় বহিয়া গেল। একটা কথা কিন্তু সে কিছুতেই ঠিক করিতে পারিল না, এই ব্যক্তিটি কি করিয়া জানিতে পারিল যে সে আজ রোল্‌ড গোল্‌ড রিস্টওয়াচ পরিয়া এই জঙ্গলে ফুল সংগ্রহ করিতে আসিবে এবং অসাবধানতা বশত সেটি হারাইয়া ফেলিবে। সে কোথায় যেন পড়িয়াছিল যে আধুনিক অনেক চোর না কি টেলিপ্যাথি বিদ্যাতেও পারদর্শী হইয়াছে। জ্যোতিষ বিদ্যাতেও। কিন্তু এরূপ কৃতবিদ্য চোর মুচিগ্রামের জঙ্গলে আসিয়া হানা দিবে ইহাও কল্পনা করা শক্ত। অনেকক্ষণ ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া থাকিয়া ভুবন মাইতি অবশেষে একটি দুঃসাহসিক কার্য করিয়া ফেলিল। সে জানিত বেকায়দায় পড়িলে ইহারা আচমকা পিস্তল বাহির করিয়া বসে এবং পিস্তলের গুলি মোক্ষম স্থানে লাগিলে অক্কা পাওয়াও বিচিত্র নয়- মনে মনে এই কথাগুলি সে আবৃত্তিও করিল কিন্তু তথাপি পশ্চাৎপদ হইল না। তাহার মনে হইল আজ স্বাধীনতা দিবস, আজ অন্তত ভীরুতা প্রকাশ করিলে চলিবে না!…

"কে—"

সাহস সংগ্রহ করিয়া সে প্রশ্ন করিয়া ফেলিল।

যিনি ঘাপটি মারিয়া বসিয়াছিলেন তিনি ঘাড় ফিরাইলেন। ভুবন মাইতি এবার সত্যই অবাক হইয়া গেল। সেই ঝোলা গোঁফ, নাকের পাশে সেই কালো আঁচিল—না, ভুল হইবার নয়, বাবাই। কিন্তু বাবা এখানে অমনভাবে বসিয়া আছেন কেন! জীবন মাইতি পুত্রের মুখের দিকে নির্নিমেষে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। তিনিও তাঁহার একমাত্র তনয়কে এস্থানে দেখিবেন কল্পনা করেন নাই।

"তুমি এখানে কি করছ বাবা?"

গুঁড়ি মারিয়া ঝোপের ভিতর হইতে তিনি বাহির হইয়া আসিলেন।

"আমি?"

ভুবন মাইতির কুঞ্চিত ভ্রূ মসৃণ হইয়া মুখে একটা অপ্রস্তুত ভাব ফুটিয়া উঠিল। পিতার মুখের দিকে তাকাইয়া সে তাহাই গলাধঃকরণ করিয়া ফেলিল, চলিত বাংলায় যাহাকে 'ঢোক' বলে।

"তুমি এখন এখানে কেন বাবা?"

জীবন পুনরায় প্রশ্ন করিলেন।

"স্বাধীনতা দিবসে বাড়িটা একটু সাজাব মনে করেছি তাই ভাবলাম ইয়ে মানে—"

"বুঝেছি। ফুল লতাপাতা সংগ্রহ করতে এসেছ। বুঝেছি। কিন্তু ওতে ভবি ভুলবে না বাবা।"

"ভবি?"

"হ্যাঁ। ও সব সৌখিন টুকিটাকিতে ভোলবার লোক বড়বাবু নয়। আমিও স্বাধীনতা দিবস করতেই বেরিয়েছি।"

ভুবন অসহায়ভাবে নির্নিমেষে পিতৃমুখ সন্দর্শন করিতে লাগিল। জীবন বলিলেন—"ব'স, বুঝিয়ে বলি তাহলে কথাটা। তোমাকে আমার অফিসে ঢোকাতে চাই। বড়বাবুর কাছে কথাটা পেড়েছিও, কিন্তু তিনি হুঁ হাঁ কিছুই করেন না। এখন দেশ স্বাধীন হয়েছে, এখন তাঁকে হুঁ হাঁ করাতে গেলে যে পরিমাণ রেস্ত থাকা দরকার, তা আমার নেই। আমাকে বিক্রী করলেও জুটবে কি না সন্দেহ। আমি প্রথম যখন চাকরিতে ঢুকি তখন যিনি বড়বাবু ছিলেন একছড়া কাঁচকলা মাঝে মাঝে দিলেই তিনি সন্তুষ্ট থাকতেন। তিনি ডিস পেপসিয়ার রুগী ছিলেন, কাঁচকলা পেলে ভারী খুশী হতেন। তরপর যিনি এলেন তাঁকে ডালি দিতে হত: অন্য কিছু নয়, পুজোর সময় ফলটা পাকড়টা, আমের সময় কিছু ল্যাংড়া আম। এর বেশী নয়। তারপর এলেন বিশ্বম্ভর গোঁসাই। তাঁকে কিছু দিতে হ'ত না, তাঁর কাছে কেবল বলতে হত যে তাঁর যিনি গুরুদেব—১০৮ শ্রীঅলখ অবধূত—তিনিই বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ অবতার, তিনি নিজের ঢোল নিজে বাজাচ্ছেন না বলে লোকে তাঁকে চিনতে পারছে না। এই বললেই গোঁসাইজি খুশী হতেন। গোঁসাইজির পরে এলেন মিস্টার পাকড়াশি। একের নম্বর হারামজাদা। কিন্তু একটি বোতল মদ দিলেই শিবটি। যা চাও তাই দেবে। এখন দেশের স্বাধীনতা হয়েছে। আমাদের বড়বাবু খদ্দর পরছেন। শুনলাম আমাদের নরেনের ভাইপোর চাকরিটি হয়েছে একটি রেডিও দিয়ে। নগদ সাতশ' টাকা লেগেছে। বড়বাবুর এখন একটা রেফ্রিজারেটারের দিকে ঝোঁক হয়েছে না কি শুনলাম। কিন্তু অত টাকা কোথায় পাব আমি। তাই শজারু খুঁজতে বেরিয়েছি।"

"শজারু? কেন?"

"বড়বাবুর পেটে কি এক ব্যথা হয়েছে, একজন হাকিম না কি বলেছে শজারুর মাংস খেলে ভাল হয়ে যাবে। বড়বাবু চারিদিকে শজারুর সন্ধান করছেন। ভৌমিক আমাকে বলেছিল এই বনে নাকি শজারু আছে। সেই খোঁজে আজ বেরিয়েছিলাম তাই। আজ স্বাধীনতা দিবসে বড়বাবুকে যদি একটা শজারু ধরে দিতে পারি হয়তো খুশী হবেন। ওই ঝোপের পাশে একটা গর্তর মতো দেখলাম, শজারুর কাঁটাও পড়ে আছে দু'একটা। চলতো দেখি একবার ভাল করে।"

পিতা ও পুত্র উভয়েই গুঁড়ি মারিয়া ঝোপের ভিতর ঢুকিয়া পড়িলেন। ফুল ও পাতাগুলি শুকাইতে লাগিল।

কেডলী সুপ

নাম যদিও ব্রহ্মানন্দ আনন্দ পান কিন্তু মাংসে। মুর্গিতে ষোল আনা লোভ। সেই জন্যেই বন্ধুত্ব হয়েছিল খলিলের সঙ্গে, হিন্দু-মুসলমান বিরোধ সত্ত্বেও। খলিলের বাড়িতে বিনা খরচায় ব্রহ্মানন্দ মুর্গ-মুসল্লমের যে আস্বাদ পেয়েছিলেন তা ভোলবার নয়। লীগ মিনিস্ট্রির তিক্ততাও সে মাধুর্যকে কমাতে পারে নি এক তিল। খলিলের সঙ্গে ব্রহ্মানন্দের বন্ধুত্ব বরাবর অটুট ছিল। খবরের কাগজের সম্পাদকীয়

দুর্গ-নিক্ষিপ্ত গোলাগুলি একটুও চিড় খাওয়াতে পারে নি তাতে। শুধু মুরগি নয়, আর একটা কারণও ছিল। লীগ মিনিষ্ট্রির কল্যাণে খলিল বন্দুক পেয়েছিল একটি। সেই বন্দুক দিয়ে ঘুঘু, শরাল, বুনো হাঁস প্রভৃতি শিকার করে খলিল মিঞা যে সব মোগলাই ভোজ্য বানাত বন্ধু ব্রহ্মানন্দও তার অংশ পেতেন প্রচুর। সুতরাং গান্ধী-জিন্না প্যাক্ট বারবার বিফল হচ্ছিল যদিও, ব্রহ্মানন্দ-খলিল সৌহার্দ্য ঠিক ছিল। দৃঢ়তর হচ্ছিল বললেও অত্যুক্তি হবে না। শেষ পর্যন্ত কিন্তু গড়বড়িয়ে গেল সব। দেশ স্বাধীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মানন্দের সমস্ত আনন্দ অন্তর্হিত হল। খলিল হিন্দু পাড়ায় বাস করত। পালাতে হল তাকে। ভয়েই পালিয়েছিল সম্ভবত। বন্দুকটাও নিয়ে যেতে পারে নি। ব্রহ্মানন্দের কাছে থেকে গেল সেটা। অদৃষ্টের পাকে চক্রেই এ অসম্ভব সম্ভব হয়েছিল, তা না হলে মুসলমানের বন্দুক হিন্দুর হাতে পড়বার কথা নয়। বন্দুকের ঘোড়াটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল একটু। ব্রহ্মানন্দের পরিচিত একটি মিস্ত্রি থাকায় নিখরচায় বন্দুকটি মেরামত হয়ে যাবে বলে খলিল বন্দুকটি ব্রহ্মানন্দকে দিয়েছিল। ঠিক তারপরই মার মার শব্দে দাঙ্গা বেধে গেল, পালাতে হল খলিলকে। ব্রহ্মানন্দ বেকায়দায় পড়ে গেলেন একটু। সুকতো, চচ্চড়ি, কলাইয়ের ডাল, বড়জোর মৌরলা মাছর টক্‌ কাঁহাতক আর খাওয়া যায়! মুরগির কথা কল্পনাও করা যায় না, প্রথমত দাম, দ্বিতীয়ত বাড়িতে ঢুকতে দেবে না পিসিমা। মাঝে মাঝে রেস্তোরাঁয় ঢুকে চপটা কাটলেটটা খেয়ে আসেন ব্রহ্মানন্দ, কিন্তু জুৎ হয় না। এই ভাবেই দিন কাটছিল, এমন সময় তাঁর সেই পরিচিত মিস্ত্রিটি খলিলের বন্দুকটা সারিয়ে দিল তাঁকে। ব্রহ্মানন্দ যেন অকুলে কুল দেখতে পেলেন। যদিও তিনি বন্দুক ছোঁড়েন নি কোন দিন (খলিলই বরাবর শিকার করত, তিনি দ্রষ্টা ছিলেন মাত্র) তবু তিনি অকুলে কুল পেলেন.। তার বিশ্বাস হল চেষ্টা করলে তিনিও বন্দুক ছুঁড়তে পারবেন। মানুষেই তো বন্দুক ছোঁড়ে তিনিই বা পারবেন না কেন? পারতেই হবে। মৌরলা মাছের টক খেয়ে কাঁহাতক থাকা যায়! সুতরাং তিনি কালবিলম্ব না করে তাঁর মেসোমশায়ের খুড়শ্বশুরের দ্বারস্থ হলেন। সেই খুড়শ্বশুরের সঙ্গে নাকি কংগ্রেস-ওয়ার্কার হরকালী নাগের খুব দহরম মহরম। নাগমশাই যদি একটি চিঠি দিয়ে দেন তাহলে পুলিশ সুপারিনটেণ্ডেণ্ট নির্ঘাত ব্রহ্মানন্দ সাণ্ডেলকে বন্দুক ব্যবহারের যোগ্যপাত্র বলে বিবেচনা করবেন। তিনি যদি যোগ্যপাত্র বলে মনে করেন তাহলে বন্দুকের লাইসেন্স পেতে দেরী হবে না। আর বন্দুকের লাইসেন্স পেলে মৌরলা মাছের বদলে শরাল হাঁস, না হয় ঘুঘু, না হয় হাঁরিয়াল, একটা না একটা কিছু জুটবেই। ব্রহ্মানন্দ অনন্যকর্ম হয়ে দিবারাত্র তদ্বির করতে লাগলেন। দেখা গেল হরকালী নাগের সত্যিই কলমের জোর আছে। তাঁর একটি চিঠিতেই কাজ হয়ে গেল। ব্রহ্মানন্দ বন্দুকের লাইসেন্স পেয়ে গেলেন। টোটাও কিনে ফেললেন। একটি আপদ কিন্তু জুটল। ওই হরকালী নাগের ভাই শিবকালী। সে ছোকরা বলে বসল—"শিকারে কবে বেরুচ্ছেন সাণ্ডেলমশাই। আমরা খবর টবর যেন পাই। একলাই খাবেন না—"

ব্রহ্মানন্দকে জিভ কেটে বলতেই হল—'আরে না, না, সে কি কথা। পরশু দিন সকালেই শিকারে বেরুবো। সেদিন সন্ধ্যাবেলা তুমি আমার বাসায় খেও।"

"আচ্ছা আসব।"

॥ দুই ॥

সমস্ত দিন নাওয়া খাওয়া নেই। বন্দুক কাঁধে ঘুরে বেড়াচ্ছেন ব্রহ্মানন্দ। তিনটি ফায়ার করেছিলেন কিন্তু একটিও ব্রহ্মাস্ত্র হয়নি। একটি পাখীর একটি পালকও খসেনি। আশপাশের কাকগুলো সচকিত হয়ে তারস্বরে চেঁচাচ্ছে কেবল। ব্রহ্মানন্দ উপলব্ধি করলেন শরাল হাঁস মারা সহজ নয়, ঘুঘুও অত্যন্ত চালাক পাখী। রোক চড়ে গেল তাঁর, মারতেই হবে একটা কিছু। শিবকালী ছোকরা আবার সন্ধ্যাবেলা খেতে আসবে। ওই একটা ঘুঘু না? কলাগাছের ফাঁক দিয়ে ল্যাজটা দেখা যাচ্ছে? কাদের বাগান এটা? গুঁড়ি মেরে মেরে অগ্রসর হতে লাগলেন ব্রহ্মানন্দ। গুড়ুম গুড়ুম —পর পর দুটো ফায়ারই করলেন একটু পরে। এবার ফল ফলল।

"কে বন্দুক ছুঁড়েছে!"

বাগানের গেট খুলে ঝাঁকড়া গোঁপ-ওয়ালা এক বলিষ্ঠ ব্যক্তি বেরিয়ে এল। কালো মুশকো চেহারা। মাথার চুল তো বটেই ভুরুগুলো পর্যন্ত খাড়াখাড়া।

"ঘুঘুটা পড়েছে নাকি"—

সপ্রতিভ হাসি হেসে এগিয়ে এলেন ব্রহ্মানন্দ।

"ঘুঘু? আপনি বন্দুক ছুঁড়েছেন?"

"হ্যাঁ।"

"কি সর্বনাশ করেছেন দেখবেন আসুন।"

"সর্বনাশ, মানে?"

"আসুন না স্বচক্ষেই দেখবেন।"

দুরু দুরু বক্ষে স্খলিত চরণে ব্রহ্মানন্দ বাগানে প্রবেশ করলেন।

"ওই দেখুন, কাঁদির প্রত্যেকটি কলা জখম হয়েছে।"

ব্রহ্মানন্দ নির্নিমেষে ছররা-বিধ্বস্ত কলার কাঁদির দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে একটু হাসবার চেষ্টা করলেন।

"ঘুঘুটাকে মিস্ করেছি।"

"কলার দামটা দিয়ে যাবেন অনুগ্রহ করে।"

"দাম?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, দাম। দাম না দিলে বন্দুকটি কেড়ে রেখে দেব। আমার নাম ভৈরব নিউগি—"

॥ তিন ॥

ব্রহ্মানন্দ চেষ্টার ত্রুটি করেন নি। ঘি, পেঁয়াজ, রসুন, লঙ্কা, হলুদ, ধনে, জিরেবাটা, তেজপাতা, গরম মসলা, এমন কি জাফরান পর্যন্ত। খেতে বসে শিবকালী একটু চেখে বললেন—"এ কিসের মাংস মশাই?"

"খেয়েই দেখুন না।"

শিবকালী আর একটু খেয়ে বললেন—"এ যে কাঁচকলার ঝোল মনে হচ্ছে? কি বলুন তো ব্যাপারটা।"

"কেডলী স্যূপ।"

"কেডলী ? কদলীকে কেডলী করেছেন নাকি ?"

"আরে না, না, খেয়েই দেখুন না। গোয়ানিজ প্রিপারেশন—"

দেশী ও বিলাতী

তখন হাসপাতালে চাকরি করি।

মফঃস্বলের একটি কলে বাহিরে গিয়াছি। স্থানটি পল্লীগ্রাম, শহর হইতে বেশ কিছু দূরে। পাঁচ ক্রোশ পথ গো-শকটের সাহায্যে অতিক্রম করিয়া গিয়া দেখি রোগটি অতিশয় সাংঘাতিক।

একটি শিশুর ডিপথিরিয়া হইয়াছে। শ্বাসনালিটি অবরুদ্ধ, নিশ্বাস-প্রশ্বাসের খুবই কষ্ট হইতেছে। শ্বাসনালিতে অস্ত্রোপচার করিয়া শ্বাস কষ্টটা লাঘব করিলাম বটে, কিন্তু ডিপথিরিয়ার ইনজেকশন না দিলে যে ছেলেটির জীবন সংশয় তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না।

পল্লীগ্রামে ডিপথিরিয়া অ্যান্টিটক্সিন পাওয়া গেল না। আমাদের হাসপাতালের ভাণ্ডার পূর্বেই নিঃশেষিত হইয়াছিল। শহরের দোকানগুলিতে খুঁজিয়াও পাইলাম না। নিরুপায় হইয়া তখন কলিকাতায় টেলিগ্রাম করিতে হইল।

প্রথমে একটি বিখ্যাত দেশী দোকানেই করিলাম। লিখিলাম, "একটি মুমূর্ষু রোগীর জন্য ঔষধটি অবিলম্বে প্রয়োজন। টেলিগ্রাম পাইবামাত্র পাঠাইয়া দিবেন।" তাহার পর কি মনে করিয়া একটি বিলাতী দোকানেও করিলাম। মনে হইল কি জানি এক স্থানে যদি টেলিগ্রামের গোলমাল হইয়া যায়। যদি দুই স্থান হইতেই ঔষধ আসে ক্ষতি নাই। যাহা বাঁচিবে আমি হাসপাতালেই কিনিয়া লইব।

…পরদিন পোস্টাফিসে লোক বসাইয়া রাখা হইল। পার্শেলটি আসিবামাত্র ছাড়াইয়া আনিবে, অযথা দেরী যেন না হয়।…

সমস্ত দিন পরে লোকটি আমার বাসায় আসিয়া খবর দিল যে একটিও পার্শেল আসে নাই।

বড়ই হতাশ হইলাম। মুমূর্ষু শিশুটির জন্য দুঃখও হইতে লাগিল। আহা, ঔষধটা ঠিক সময়ে পড়িলে ছেলেটা বোধ হয় বাঁচিয়া যাইত।

অদৃষ্ট এবং ভগবানের ইচ্ছার দোহাই পাড়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। তাহাই করিয়া হাসপাতাল অভিমুখে রওনা হইলাম।

হাসপাতালে আসিয়া দেখি একটি লোক আমার অপেক্ষায় বসিয়া আছে।

"আপনিই কি ডাক্তার মুখার্জি ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ—"

"এই চিঠি আর এই ওষুধ নিন।"

দেখিলাম লোকটি সেই বিলাতী দোকান হইতে আসিয়াছে।

দোকানের কর্তৃপক্ষ লিখিয়াছেন :

"প্রিয় ডাক্তার মুখার্জি,

আপনার টেলিগ্রাম যখন পাইলাম তখন ডাকে পাঠাইবার সময় ছিল না। আপনি জানাইয়াছিলেন রোগীটি মুমূর্ষু তাই লোক মারফৎ ঔষধটি পাঠাইতেছি। আশা করি ঔষধটি ঠিক মতো আপনি পাইবেন। ঔষধের বিলও এই সঙ্গে পাঠাইলাম। আপনার রোগী যদি অবস্থাপন্ন লোক হন, তাহা হইলে আমাদের কর্মচারীর যাতায়াতের ভাড়াটাও দিয়ে দিবেন। ইতি…"

তাহার পর দিনও দেশী দোকান হইতে ঔষধ আসিল না।

তাহার পর দিনও না।

সাতদিন পরে তাঁহাদের একটি পত্র পাইলাম।

তাঁহারা লিখিয়াছেন—

"প্রিয় মহাশয়,

আজকাল নিম্নলিখিত হারে ডিপথিরিয়া অ্যান্টিটক্সিনের মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই বর্ধিত হারে আপনি ঔষধ লইবেন কি না জানাইবেন। আপনার পত্র পাইলে তদনুযায়ী ব্যবস্থা করা হইবে। ইতি…"

ইঁহাদের আর পত্র লেখার প্রয়োজন হয় নাই। কারণ আমার রোগীটি ভাল হইয়া গিয়াছিল।

সত্য

সত্য কথাটা ভুলে যাই আমরা বারবার। গল্পটা শুনুন তবে। সেদিন স্টেশনে লোকে লোকারণ্য। একে জংশন স্টেশন, তার উপর তিন চারখানা ট্রেন লেট। হিন্দু, মুসলমান, বাঙালী, বিহারী, পাঞ্জাবী, মাড়োয়ারি, পেশোয়ারি, ফিরিঙ্গি সবরকম লোক কিলবিল করছে। ওয়েটিং রুমে স্থান নেই। প্লাটফর্মের উপর উপচে পড়েছে যাত্রীর ভীড়। শিশুর চীৎকার, ফেরিওয়ালার চীৎকার, এনজিনের শব্দ, কুলিদের কলহ মিলে একটা হট্টগোল চলেছে। আমি পুঁটুলিটি হাতে করে একধারে দাঁড়িয়ে আছি। সমস্ত মন বিরক্তিতে ভরে উঠেছে। মনে ইচ্ছে ইংরেজরা চলে গিয়ে কি দুর্গতিই হয়েছে আমাদের। ইংরেজদের আমলে দেশ-সুদ্ধ চোর যেন মুখোস পরে ছিল। তারা চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুখোস খসে পড়ে স্বরূপ বেরিয়ে পড়েছে সকলের। চাষী, মজুর, চাকুরে, ব্যবসাদার সবাই যেন পাল্লা দিয়ে জোচ্চুরি করছে। নেতারা পর্যন্ত ন্যাতা হয়ে গেল। আমার চিন্তাটা অবশ্য ঠিক যে একরঙা ছিল তা নয়। আমি এর অপর দিকটাও ভেবে দেখবার চেষ্টা করছিলাম। স্বাধীনতা পাওয়ার ঠিক অব্যবহিত পরে অন্যান্য দেশের অবস্থা কি আমাদের চেয়ে ভাল ছিল? সাধারণ লোকে কি আমাদের চেয়ে সুখে থাকত? ফরাসী বিদ্রোহের ঠিক পরের অবস্থা তো সাংঘাতিক হয়েছিল। বলশেভিকরা যখন রাজ্য অধিকার করল তখন সাধারণ লোকেদের অবস্থা যা হয়েছিল তা—সহসা আমার চিন্তায় সম্পূর্ণ নূতন ধরনের রং লাগল এক পোঁচ। জেনানা ওয়েটিং রুমে আমার স্ত্রীকে ঢুকিয়ে দিয়েছি, যা ভীড়, বেচারি বসতে পেয়েছে কিনা কে জানে। খোকাটাকে কোলে করে যদি দাঁড়িয়ে থাকতে হয়, কোলে করেই দাঁড়িয়ে থাকতে হবে, যা দামাল দুরন্ত… আমার এ চিন্তাকেও ছিন্নভিন্ন করে পরমুহূর্তে

বেজে উঠল একটা ঘণ্টা—ঢননং ঢননং ঢননং ঢননং । সবাই উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলাম কোন গাড়ীটা আসছে । জানা গেল আমাদের কারও গাড়ী নয় । আগের স্টেশনে অনেক বাস্তুহারা এসে জমেছিল, তাদের নিয়েই স্পেশাল ট্রেন আসছে একটা, আমাদের সমস্যার সমাধান হবে না, সমস্যা বরং জটিল হবে, কারণ ওই এক গাড়ী বাস্তুহারা এসে এই প্লাটফর্মেই নামবে । এমনিতেই তো তিল ধারণের স্থান নেই । তার উপর প্রচণ্ড গ্রীষ্ম, গাছের পাতাটি পর্যন্ত নড়ছে না । মন্থর গতিতে বিরাট ট্রেনটা এসে দাঁড়াল একটু পরে । আর তার থেকে নামতে লাগল ভীত চকিত অসহায় মানুষের দল । মানুষ, না পশু ? পরমুহূর্তেই মনে হল, না, ওরা হিন্দু বাঙালী, এই ওদের একমাত্র অপরাধ ! সমস্ত মাথাটা কেমন যেন ঘুরে উঠল । চোখ বুজে বসে পড়লাম । মুদিত চোখের সামনে কৃতী হিন্দু বাঙালীরা যেন মিছিল করে এল আর চলে গেল । এঁরাই না স্বাধীনতা মন্ত্রের উদগাতা ? এঁদেরই উত্তরাধিকারী আমরা কোথায় তলিয়ে গেলাম ! আমরা তবু কোনক্রমে টিঁকে আছি কিন্তু আমাদের বংশধরেরা কি পারবে ? খোকার মুখটা সহসা মনে ভেসে উঠল আবার । এই প্রাদেশিকতা-সংকীর্ণ ভারতের আত্মকেন্দ্রিক জনতায় আমার খোকন কি আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে পারবে কোনদিন ? চোখ বুজে কতক্ষণ বসেছিলাম জানি না, হঠাৎ চীৎকার চেঁচামেচিটা বেড়ে যাওয়াতে উঠে দাঁড়াতে হল । দেখলাম জনতার মধ্যে কলহ শুরু হয়ে গেছে ।

কান পেতে শুনলাম—কে একজন তারস্বরে বলছেন—“আরে রেখে দিন মশাই, ওসব প্যাক্টের ভাঁওতায় ভোলবার ছেলে আমরা নই । ওসব কেবল আই ওয়াশ, মনকে চোখ ঠারা । বাঙালী হিন্দু মরছে মরুক তার জন্যে জহরলাল মাথা ঘামাতে যাবে কেন । কাশ্মীরে সোলজার পাঠিয়েছিল কেন জানেন ? নিজে কাশ্মীরী যে । হায়দ্রাবাদ বাংলাদেশ হলে হায়দ্রাবাদেও সোলজার যেত না ।”

আর একজন কে প্রত্যুত্তর করলেন শুনতে পেলাম । তাঁর গলার আওয়াজও কম নয় ।

“দেখুন মশাই, আপনি যা বললেন তাতে আপনার বুদ্ধির পরিচয় পাচ্ছি না, পরিচয় পাচ্ছি নীচ মনের । পাকিস্তান একটা ডোমিনিয়ন সে কথা মনে রাখবেন । তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে হয়তো থার্ড ওয়ার্লড ওয়ার বেধে যাবে । একথা ভুলে যাচ্ছেন কেন যে পাকিস্তান হচ্ছে ইংরেজদের সৃষ্টি ভারতের স্বাধীনতাকে খর্ব করবার জন্যে । এরা তো চাইছেন যে আমরা যুদ্ধটা ঘোষণা করি !”

“কেন যুদ্ধ ঘোষণা করলে কি হত ?”

“পাকিস্তানের নামে আমেরিকান সুপার ফোর্ট্রেস এসে পাঁচ সাতদিনের মধ্যেই আমাদের ঠাণ্ডা করে দিত । যাদের হাই তুলতে গেলে চোয়ালে খিল ধরে যায় তাদের বন্দুক কাঁধে করতে না যাওয়াই ভাল ।”

“দেখুন মশাই, আমাদের আর সেদিন নেই—”

কোলাহল ক্রমশ এত তুমুল হয়ে উঠল যে আর কিছুই শুনতে পেলাম না । দু'জন বাঙালীই বোধহয় তর্কটা আরম্ভ করেছিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা অবাঙালীদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ল । অনুভব করলাম প্রো-জহরলাল এবং অ্যান্টি-জহরলাল দুটো দল হয়েছে এবং বাংলা, হিন্দী, ইংরেজি ভাষায় পরস্পর পরস্পরকে গালাগালি দিচ্ছে । গালাগালি শেষে হাতাহাতিতে পরিণত হবার উপক্রম হল । প্রায় সাতফুট লম্বা চাপ-

দাড়ি একজন পাঞ্জাবী সরদার চক্ষু রক্তবর্ণ করে এমন আস্ফালন করতে লাগলেন যে মনে হতে লাগল বুঝি তিনি কাউকে মেরেই বসবেন বা।

এমন সময় আমার কাছায় টান পড়ল। ফিরে দেখি আমার স্ত্রী আলুথালু বেশে দাঁড়িয়ে আছেন। "খোকনকে কোল থেকে নাবিয়ে দিয়েছিলুম, টুক করে হামা দিয়ে কখন সে বেরিয়ে গেছে। আমি পাশের একটি মেয়ের সঙ্গে গল্প করছিলাম একেবারে টের পাইনি।"

সর্বনাশ! এই ভীড়ে ওইটুকু শিশু একেবারে পিষে যাবে যে! অসহায়ভাবে জনতার দিকে চেয়ে দেখলাম। তাদের উষ্মা বেড়েছে বই কমেছে বলে মনে হল না! পাঞ্জাবী সরদারের চোখ আরও রক্তবর্ণ হয়েছে।

"কোন দরজা দিয়ে বেরিয়েছে দেখতে পাওনি?"

"পেলে তো ধরেই ফেলতাম। তবে ওদিকের দরাজাটাও খোলা আছে। প্লাটফর্মের দিকে বেরুলে ঠিক দেখতে পেতাম, ঠিক ওই দিকেই বেরিয়ে গেছে।"

প্লাটফর্মের এই বিরাট জনতায় খোকনকে খোঁজবার চেষ্টা করা মানে যে কি তা ভাবতেও হৃদ্‌কম্প হচ্ছিল আমার। আগে বাইরের দিকটাই দেখে আসা যাক। বেরিয়ে গেলাম। কোথায় খোকন? তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম চারিদিক এমন কি স্টেশনের বাইরে গাড়ির স্ট্যাণ্ড, মিষ্টির দোকান, চায়ের দোকান পর্যন্ত ঘুরে ঘুরে দেখলাম। কোথাও খোকন নেই। যার সঙ্গে দেখা হল তাকেই প্রশ্ন করলাম—"একটি ছেলেকে হামাগুড়ি দিয়ে আসতে দেখেছেন ওয়েটিং রুম থেকে?" কেউ দেখেনি। একজন অযাচিত উপদেশ দিলেন, "সাবধান মশাই, চারিদিকে ছেলেধরা ঘুরছে, পুলিশে খবর দিন যদি না পান।"

…প্লাটফর্মে এসে ঢুকলাম আবার। এই ভীড়ে কি করে যে খুঁজব! প্লাটফর্মে ঢুকেই কিন্তু একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম। গোলমাল থেমে গেছে। তর্কাতর্কি, কলহ, চীৎকার একদম নেই। মাঝে মাঝে হাসির আওয়াজ উঠছে বরং। ভীড় ঠেলে এগিয়ে গিয়ে দেখি, একি, খোকন সবার কোলে কোলে ঘুরছে। আমি যখন কাছাকাছি এলাম সরদারজি তখন খোকনকে কোলে নিয়েছেন এবং খোকন দুহাত দিয়ে তাঁর চাপদাড়ি মুঠো করে ধরেছে। হঠাৎ যেন এক ডিক্‌টেটার এসে থামিয়ে দিয়েছে সব গোলমাল। আমার চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে পড়ল। একটু আগেই মনে হচ্ছিল ভবিষ্যতে খোকনরা কি প্রতিষ্ঠা করতে পারবে নিজেদের? এই তো এখনই পেরেছে! যা প্রাণবন্ত সজীব, সুন্দর, তার আধিপত্যকে অস্বীকার করবে কে!

ছোট গল্পের গল্প

অদৃশ্য মানসিক টেলিফোনে বারম্বার 'রিং' করিবার পর অবশেষে ছোট গল্পের সাড়া পাইলাম।

"কি বলছেন?"

"তোমার যে দেখাই পাই না আজকাল, ব্যাপার কি!"

"আজকাল পুজোর মরশুম যে! সব লেখকই ডাকাডাকি করছেন। মোটে অবসর নেই। আপনার কলমের ডগাতেও হাজির হতে হবে নাকি!"

"হবে বই কি। আমারও তো পূজোর মরশুম—"

"বেশ যাব। কখন আপনার অবসর? আগে তো রাত বারোটার পর লিখতেন!"

"এখন বিয়ে করে সংসারী হয়েছি। এখন—"

"কখন যাব তাহলে বলুন।"

"এখনই এস না।"

"এখনই?"

"কেন, কোনও অসুবিধে আছে কি?"

"আচ্ছা যাচ্ছি।"

অদৃশ্য ট্যাক্সি চড়িয়া ছোট গল্প আসিয়া হাজির হইল। তাহাকে দেখিয়া আমি অবাক হইয়া গেলাম। সেই তন্বী কিশোরীটি, যাহাকে আমি চিনিতাম, সে কোথায়? এই ভীমকান্তি মহিলাটি তো সে হইতে পারে না। তন্বী কিশোরীকেও ভীমকান্তি মহিলায় রূপান্তরিত হইতে দেখিয়াছি। কিন্তু এত অল্প সময়ে তাহা তো হয় না! সেদিনই তো রাস্তার মোড়ে অন্ধ ভিখারীটির পাশে তাহার দেখা পাইয়াছিলাম। বিস্ময়ে নির্বাক হইয়া মহিলাটির দিকে চাহিয়া রহিলাম। তিন থাক চিবুকের খাঁজে খাঁজে পাউডার, বৃত্তাকার সকজ্জল চক্ষু, সুপুষ্ট অধরোষ্ঠে সুপুষ্ট রং, বিরাট দেহ ঘিরিয়া জমকালো একটা বেনারসী শাড়ী, ব্লাউজের হাতায় সোনার জরি, দৃশ্যমান অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে অলঙ্কারের বাহুল্য, আংটি গোটা তিনেক। রীতিমত ঘাবড়াইয়া গেলাম।

"চিনতে পারছেন না নিশ্চয়—'

মহিলা কলকণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন। হাসিটি ঠিক তেমনি আছে! দেহটা এমনভাবে বদল হইল কি করিয়া! ছিঃ, ছিঃ।

"সত্যি চিনতে পারছি না। অসম্ভব মনে হচ্ছে একেবারে। এ কি কাণ্ড!"

"প্রকাশকের বাড়ী থেকে সোজা চলে আসছি কিনা। 'মেক-আপ'-টা ছাড়া হয়নি এখনও। আমি এখন ছোট গল্প নই মশাই। আমি এখন উপন্যাস। আধুনিক জীবনের দ্বন্দ্ব-সমন্বিত, পাঁচজন অধ্যাপক, তিনজন সমালোচকের প্রশংসাপত্র সম্বলিত জগদ্দল কাণ্ডকারখানা।"

মুখোসটা সহসা খুলিয়া ফেলিল। সেই লাবণ্যময় মুখ-চোখের দৃষ্টিতে সেই সকৌতুক হাসি আবার দেখিতে পাইলাম।

"এত মোটা হলে কি করে?"

'খড়, তুলো আর নারকোল ছোবড়ার সাহায্যে।"

"এ রকম করবার মানে?"

"প্রকাশকদের কাছে ছোট গল্পের আদর নেই! ছোট গল্পের আদর মাসিকের পাতায়। প্রকাশকদের কাছে যেতে হলে তাই উপন্যাসের 'মেকআপ' নিয়ে যাই। পাশের ঘরটা খালি আছে কি? এগুলো তাহলে ছেড়ে ফেলি।"

"খালি আছে।"

'ট্যাক্সি থেকে আমার সুটকেশটা নিয়ে আসি তাহলে। ট্যাক্সিটা ছেড়ে দেব কি? কতক্ষণ দেরী হবে আপনার।"

"ট্যাক্সি ছেড়ে দাও।"

ক্ষণকাল পরে সুটকেশ হ’তে ছোট গল্প প্রবেশ করিল এবং পাশের ঘরে ঢুকিয়া ‘মেক-আপ’ ছাড়িতে লাগিল। আমি চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। মনে হইল স্বপ্ন নয় তো!

“একটা সাবান আর একটু জল পেলে ভাল হ’ত! দিতে পারেন?”

ঘরের ভিতর হইতেই সে বলিল।

“ঠিক পাশেই চানের ঘর। ঢুকে যাও সব পাবে।”

প্রায় কুড়ি মিনিট পরে ছোট গল্প স্বস্থ হইয়া পাশের ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল! এবার তাহার দিকে চাহিয়া চোখ জুড়াইয়া গেল। তাহার যে রূপ আমাকে চিরকাল মুগ্ধ করিয়াছে, সেই অর্ধস্ফুট মাধুরী আবার প্রত্যক্ষ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। আমার চোখের দিকে চাহিয়া তাহার চোখের দৃষ্টিতে একটা সকৌতুক হাসি জ্বলজ্বল করিয়া উঠিল।

“আপনার কি মনে হচ্ছে জানি, দোহাই আপনার, বলবেন না সেটা। আমার সময় নেই। আপনি কি চান বলুন।”

“তোমাকে চাই। ছোট গল্পকে—”

“তা তো বুঝলাম। কিন্তু কি ‘মেক-আপ’ চান বলুন। সামাজিক, রাজনৈতিক, তত্ত্বমূলক, তথ্যমূলক, দার্শনিক না ঐতিহাসিক, ধাঁচটা কি রকম হবে?”

আমি কি বলিব ভাবিয়া পাইলাম না।

“বুঝতে পারছি না ঠিক—গল্প চাই, মানে—”

“বুঝতে পারছেন না? আচ্ছা, একটা মজা করি দাঁড়ান। আমি একজনের কাছে ম্যাজিক শিখেছি একটা। চোখ বুজুন, এখনই বুঝতে পারবেন।”

“চোখ? কেন, কি করবে?”

“চোখের পাতায় হাত বুলিয়ে দেব। তারপর আপনি—বুজুনই না চোখ দুটো—দেখতেই পাবেন এখুনি।”

চোখ বুজিলাম। ছোট গল্প আমার চোখের পাতার উপর ধীরে ধীরে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। ক্রমশ যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িলাম। খানিকক্ষণ পরে অনুভব করিলাম, আমার চোখের পাতায় আর কেহ হাত বুলাইতেছে না। ধীরে ধীরে চোখ খুলিলাম। যাহা দেখিলাম তাহা সত্যই অপ্রত্যাশিত।

দেখিলাম আমার টেবিলে বই, খাতাপত্র কিছুই নাই, কেবল সারি সারি নানাবিধ খাদ্য-সামগ্রী সাজানো রহিয়াছে। রুটি, পরোটা, লুচি, কচুরি, সিঙ্গাড়া, নিমকি, খাজা, গজা, বালুশাই, পাঁউরুটি, কেক, বিস্কুট, হালুয়া এবং ইহাদের পাশে একটু বেমানান ভাবেই এক-কড়াই ময়দার আঠা, চলিত বাংলায় যাহাকে লেই বলে। অবাক হইয়া গেলাম। এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিলাম ছোট গল্প নাই, কোথায় গেল সে? সহসা তাহার গিটকিরিভরা কলহাস্য বাতায়ন-পথে ভাসিয়া আসিল। বাতায়নের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, আকাশের পটভূমিকায় একটি সবুজ গমের শীষ বাতাসে ধীরে ধীরে দুলিতেছে।

…গমের শীষ কথা বলিতে লাগিল।

“টেবিলের ওপর যা দেখছেন ওর প্রত্যেকটি আমারই রূপান্তরিত অবস্থা। ঐ একধারে যে লেইটা আছে ওটাও। যে আমি একদিন উদার আকাশের তলায় শ্যামল

মাঠে সবুজ গমের শীষ ছিলাম, সেই আমি নানা রকম 'মেক-আপ' নিয়ে ওই অত রকম হয়েছি। আমার প্রত্যেক 'মেক-আপ'টাই বাজারে চলছে। এইবার দেখুন—"

দেখিলাম, কেকের সহিত বিস্কুটের মারামারি বাধিয়াছে। সহসা দুইটি কাগজ শূন্য হইতে ভাসিয়া আসিল। দুইটি অদৃশ্য হস্ত কাগজ দুইটিতে খস্ খস্ করিয়া কি যেন লিখিয়া চলিয়াছে। লেখা শেষ হইলে দেখিলাম, দুইটি হস্তই নিজের নিজের কাগজে বেশ করিয়া লেই মাখাইয়া দুই দিকের দেওয়ালে সাঁটিয়া দিল। একটি কাগজে বিস্কুটের জয়গান, আর একটি কাগজে কেকের। আরও দেখিলাম, বিস্কুটের দিকে নিমকি, সিঙাড়া, কচুরি, পরোটা যোগদান করিয়াছে, কেকের দিকে লুচি, রুটি, হালুয়া, খাজা। গজা এবং পাঁউরুটি কোন দিকে যোগদান করে নাই, শান্তির বাণী আওড়াইতেছে, শূন্য হইতে ক্রমাগত কাগজ ভাসিয়া আসিতেছে আর অদৃশ্য হস্ত দুইটি ক্রমাগত লিখিয়া চলিতেছে। দুই দিকের দেওয়াল পরিপূর্ণ হইয়া গেল।

গমের শীষ বলিল, "সবুজ গমের শীষ বাজারে কেউ চায় না আজকাল। নিছক ছোট গল্পেরও বাজার দর নেই। একটা ছাপ চাই। কি ছাপ নিয়ে আপনার কাছে আসব বলুন ?"

"আমি ছাপ চাই না ! আমি সবুজ শীষের গল্পটাই শুনতে চাই। তোমার কথা, তোমার ব্যথা, তোমার আনন্দ, তোমার কল্পনা—যা তুমি কাউকে কোনদিন বলনি,—কিন্তু যা তোমার মর্মে অহরহ জাগরূক হয়ে আছে সেইটি আমি চাই—"

"সে যে বড় ছোট হবে। একটি মুহূর্তের ঘটনা—"

"হোক ছোট, তাই বল তুমি—"

গমের শীষ ধীরে ধীরে দুলিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে তাহার কথা শুনিতে পাইলাম।

"একদিন ভোরে আকাশ থেকে এক ঝলক রাঙা আলো এসে পড়েছিল আমার মুখে। আর ঠিক সেই সময়ে মৃদু একটি হাওয়া এসে দোল দিয়েছিল আমার সর্বাঙ্গে। ঠিক সেই মুহূর্তে একটা ফড়িং লাফিয়ে পড়ল আমার ঘাড়ে। বিব্রত হয়ে পড়লাম আমি। একটু পরে যখন সামলে নিলাম তখন দেখি তারা চলে গেছে। সেই রাঙা আলোর ঝলক আর মৃদু হাওয়ার পরশ আর আসেনি আমার জীবনে। আমার সমস্ত 'মেক-আপ' এর মধ্যে এ কথাটি কিন্তু আমি ভুলিনি যে তারা এসেছিল। এখনও আশা করে আছি হয়তো আবার আসবে…

"হ'ল তো ? চললুম।"

সুটকেস হাতে লইয়া ছোটগল্প বাহির হইয়া গেল।

উৎসব-দেবতা

স্বপ্ন নাকি সফল হয়েছে, উৎসবের ধুম পড়ে গেছে তাই ।

বাজছে কাড়া-নাকাড়া বাজছে জগঝম্প। লাফাতে লাফাতে ঢাকিগুলোর ঊর্ধ্বশ্বাস উঠছে, তবু থামবার উপায় নেই। উৎসব যে, থামলে চলবে না। লাফাতে লাফাতে বাজিয়ে চলেছে তাই ক্রমাগত। থামলেই চাকরি যাবে। বাঁশি-ওলা, কাঁসি-ওলা, সানাই-ওলা সকলেরই ওই এক দশা ।

শব্দ হচ্ছে ভয়ংকর। সাধারণ লোকের কথাবার্তা শোনা যায় না। উৎসবের হট্টগোলে চাপা পড়েছে সব ।

উৎসব-দেবতা স্থাপিত হয়েছেন উৎসব-মণ্ডপে। সাড়ম্বরে সজ্জিত করা হয়েছে তাঁকে—বহু বর্ণে, বহু অলংকারে। বহু ঋত্বিক, বহু পুরোহিত, বহু অধ্বর্যু, বহু উদ্‌গাতা সমবেত হয়েছেন। উদাত্ত কণ্ঠে স্তোত্রপাঠ চলছে, আরতি হচ্ছে নানা ভঙ্গিতে, শঙ্খঘণ্টার রোলে দশ দিক প্রকম্পিত হচ্ছে মুহুর্মুহু ।

কবি দাঁড়িয়েছিলেন নাটমন্দিরের প্রাঙ্গণে উৎসব-দেবতার প্রতিমূর্তির দিকে নির্নিমেষে চেয়ে। তিনি অনুভব করলেন, উৎসব-দেবতা আসেন নি। যাকে ঘিরে কোলাহল চলেছে, তা খড়-মাটি-রঙ-রাংতার পিণ্ডমাত্র, উৎসব-দেবতা আবির্ভূত হন নি ওর মধ্যে ।

অভিমান হ'ল কবির। স্বপ্ন সফল হয়েছে, অথচ উৎসব-দেবতা এলেন না কেন? নিজের ঘরে গিয়ে তিনি সেতারে বাজাতে লাগলেন ভৈরবী। ভৈরবীর করুণ-মধুর সুরের পথ ধ'রে গেলেন তিনি উৎসব-দেবতার দ্বারে ।

এস, এস, কবি এস, তোমারই আশাপথ চেয়ে আছি। উৎসব-দেবতা উঠে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা করলেন কবিকে। কবি বললেন, আমাদের উৎসবে গেলেন না কেন আপনি? ডাক তো আসে নি। কোন সাড়াশব্দও তো পাই নি। এত ঢাক-ঢোল কাড়া-নাকাড়া বাজছে—

কই, শুনি নি তো—

তারপর জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে নীচের দিকে চেয়ে দেখলেন ।

হ্যাঁ, কতকগুলো লোক লম্ফঝম্প করছে বটে, কিন্তু উৎসবের বাজনা তো শোনা যাচ্ছে না ।

কবিও এগিয়ে গিয়ে দেখলেন। ঠিকই তো, লাফালাফিটাই দেখা যাচ্ছে কেবল, সুর শোনা যাচ্ছে না ।

উৎসব-দেবতা মৃদু হেসে বললেন, আত্মপ্রশংসার ঢক্কানিনাদ এতদূর পর্যন্ত এসে পৌঁছয় না। ও তোমাদের মণ্ডপেই নিবদ্ধ আছে। উৎসব কিন্তু জমেছে এক জায়গায়। চল, সেখানে যাই ।

কোথায়?

চলই না ।

নিমন্ত্রণ পাই নি যে!

এখনই পাবে ।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে উচ্ছ্বসিত হাসির তরঙ্গে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল চারিদিক। একটা অদৃশ্য আনন্দ-সমুদ্র যেন উদ্বেলিত হয়ে উঠল ।

হ'ল তো ? কত সহজ সরল ওদের নিমন্ত্রণের ভাষা ! চল, যাই !'

এই বেশে ?

এই বেশে কি যাওয়া যায় ! বেশ পরিবর্তন করতে হবে। ওরা যেন বুঝতেও না পারে যে, আমরা গেছি। নিমন্ত্রণও করেছে অজ্ঞাতসারে, আমরা উৎসবে যোগও দেব ওদের অজ্ঞাতসারে। জানাজানির টানাটানিতে উৎসব যায় মাটি হয়ে।

গলির গলি, তস্য গলি। সেখানে নর্দমার ধারে খেলা জমেছে দুটি শিশুর। ধুলো স্তূপীকৃত ক'রে মন্দির তৈরী করছে তারা। ধুলোর মন্দির ধূলিসাৎ হচ্ছে বার বার। কিন্তু ব্যর্থতার গ্লানি জমছে না একটুও, ভেসে যাচ্ছে অনাবিল হাসির তোড়ে। ঠিক তাদের পিছনে নামহীন এক বন্যগুল্মে ফুল ফুটেছে একটি, আর সেই ফুলকে ঘিরে গুঞ্জন করে চলেছে এক মধুকর। গাছের ফাঁক দিয়ে এক ফালি রোদের টুকরো এসে পড়েছে তাদের উপর।

স্বাধীনতার জন্ম

ডিমের ভিতরে ভ্রূণ একদিন স্বপ্ন দেখিয়াছিল। স্বাধীনতার স্বপ্ন। আকাশে উড়িবে। আকাশ কি জানা ছিল না, কিন্তু আকাশের স্বপ্নটা ছিল। আকুলতা ছিল, আগ্রহ ছিল, একটা দুর্দম প্রেরণা সমস্ত বাধা অপসারণ করিয়া ছুটিয়া যাইতে চাহিয়াছিল অসীম শূন্যে। কিন্তু বাধা দুস্তর। একটা লালার সমুদ্রে সে হাবুডুবু খাইতেছে। সে সমুদ্রও সীমাবদ্ধ। ঊর্ধ্বে নিম্নে দক্ষিণে বামে কঠিন অস্বচ্ছ প্রাচীরের পরিবেষ্টনী। প্রাচীর অতিক্রম করিয়াও স্বাধীনতা নাই। আছে পালকের জঙ্গল। পক্ষীমাতার কুক্ষিগত সে। স্বাধীনতা কোথায় ?

সহসা বাহিরের বাতাস যেন তাহাকে স্পর্শ করিল। সহসা যেন সে অনুভব করিল, পক্ষপুটের আবরণ নাই। স্বপ্নের ঘোরেই সে প্রশ্ন করিল, আমি কোথায় আছি ?

স্বপ্নের ঘোরেই শুনিল, আমার হাতের উপর।

কে তুমি ?

মানুষ।

কোথায় লইয়া চলিয়াছ ?

এখনই বুঝিতে পারিবে।

তুমি কি আমাকে স্বাধীনতা দিবে ?

নিশ্চয়ই !

যে খোলা আমাকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছে, তাহা ভাঙিয়া দিবে ?

অচলায়তন ভাঙিয়া ফেলাই তো আমার কাজ।

ঠক ঠক ঠক ঠক ··

ভ্রূণের অন্তরে শিহরণ জাগিল। প্রাচীর ভাঙিতেছে।

এ কি —এ কি—কি করিতেছ তুমি ?

ফ্যানাইতেছি।

গেলাম—গেলাম—বাঁচাও—বাঁচাও—কি যন্ত্রণা!—তপ্ত কটাহের ফুটন্ত তৈলে ভ্রূণের আর্তনাদ থামিয়া গেল।

ভ্রূণ মরিল, কিন্তু স্বপ্ন মরিল না।

সবিস্ময়ে সে প্রশ্ন করিল, এ কি করিলে?

ওম্‌লেট।

স্বপ্ন স্তম্ভিত হইয়া রহিল খানিকক্ষণ।

তাহার পর নীত হইল ভ্রূণান্তরে। আবার স্বাধীনতা-স্বর্গ রচনা করিতে লাগিল রূপকথালোকে।

আবার মানুষ আসিল।

কে তুমি?

মানুষ।

আবার স্বাধীনতা দিতে আসিয়াছ?

হাঁ।

তাহার ইচ্ছা হইল, বলে—যাইব না। কিন্তু প্রতিরোধ করিবার শক্তি তো নাই। পক্ষীমাতা সভয়ে সরিয়া গিয়াছে।

মানুষ অবলীলাক্রমে তাহাকে তুলিয়া লইল।

ক্ষীণকণ্ঠে একবার শুধু সে আবেদন জানাইল, এবার আমাকে আর ওমলেট বানাইও না।

যদি ঘি দিয়া ভাজি?

না।

বেশ, ওমলেট বানাইব না।

প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিব। ওমলেট না বানাইয়া তরকারি বানাইল।

এইভাবে চলিতে লাগিল ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি।

যুগের পর যুগ কাটিল, শতাব্দীর পর শতাব্দী।

ডিমের স্বাধীনতা-প্রয়াস মূর্ত হইল নানারূপে নানা মানুষের প্রতিভায়। বিবিধ পাচক, বিবিধ মসলা, বিবিধ ফোড়ন।

কারি, পোচ, ডেভিল, চপ, দোরমার বিচিত্র সম্ভারে সুসজ্জিত হইল বহুবিধ মহার্ঘ প্লেট দেশে দেশান্তরে।

এ দেশের লোকেরা সুর তুলিল, স্বদেশের ডিমে স্বদেশী খাবার বানাইতে হইবে। তাহাই হইল। ভাতে সিদ্ধ করিয়া, ব্যাসন দিয়া বড়া ভাজিয়া, দেশী ডালনার মসলা দিয়া প্রস্তুত হইল বহুবিধ স্বদেশী ব্যঞ্জন। কচুসহযোগে একজন রাঁধুনী এমন ডিমের ঘণ্ট করিলেন যে, সকলের তাক লাগিয়া গেল।

তর্ক বাধিয়া গেল। কোন্‌টা ভাল, দেশী না বিদেশী।

তর্ক পরিণত হইল যুদ্ধে।

একটি ঘটনা কিন্তু ঘটিয়া গেল ইতিমধ্যে।

সু-উচ্চ শাখায় ক্ষুদ্র একটি নীড়ে পক্ষীমাতার চঞ্চু আঘাতে ডিমের খোলা ফাটিয়া গেল একদিন। পক্ষীশাবক বাহির হইয়া আসিল। কুৎসিৎ কদাকার। পালক নাই, রঙ নাই, সুর নাই, গান নাই। ধনীর প্রাসাদে নয়, অলঙ্কৃত টেবিলে নয়, মহার্ঘ

প্লেটের উপরে নয়, অতি-তুচ্ছ খড়-কুটার শয্যায় শুইয়া আছে। আশেপাশে দুলিতেছে কয়েকটা সবুজ ডাল, মাথার উপরে অনন্ত নীলাকাশ। নিতান্ত অসহায়। সর্প, শ্যেন, শিকারী, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, দৃশ্য-অদৃশ্য অসংখ্য শত্রু চতুর্দিকে। ও কি বাঁচিবে?

মৃত্যুহীন স্বপ্নের উচ্ছ্বসিত কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইতেছি, নিশ্চয় বাঁচিবে। ও-ই একদিন আকাশে উড়িবে। উহার মধ্যেই নিহিত আছে গরুড়ের শৌর্য, রাজহংসের মহিমা। উহারি পালকে জাগিবে ইন্দ্রধনুর বর্ণসম্ভার, উহারই কণ্ঠে ফুটিবে অনবদ্য সঙ্গীত-মাধুরী। এখন কিন্তু কিছুই নাই। আছে কেবল অসংখ্য অভাব, অসহ্য ক্ষুধা, ব্যায়ত আনন। ক্ষুধার তাড়নায় ক্রমাগত হাঁ করিতেছে। পক্ষীমাতা, কোথায় তুমি, খাবার আন, খাবার আন, খাবার—খাবার—খাবার—

পক্ষী-পুরাণ

সুবিখ্যাত ফরাসী গ্রন্থকার আনাতোল ফ্রাঁস তাঁহার 'পেঙ্গুইন আইল্যান্ড' নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে দেখাইয়াছেন, কি করিয়া পেঙ্গুইন পাখিরা মানুষে রূপান্তরিত হইল এবং নানা বিবর্তনের ভিতর দিয়া শেষ পর্যন্ত তাহাদের কি পরিণতি ঘটিল। পাখিকে মানুষে পরিণত করিবার জন্য কোনও দুরূহ বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার সাহায্য লইতে হয় নাই। ভগবানের ইচ্ছা হইল—পাখিরা মানুষ হোক, অমনই তাহারা মানুষ হইয়া গেল।

প্রাগৈতিহাসিক যুগে বঙ্গদেশেও অনুরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে। আনাতোল ফ্রাঁস বোধ হয় খবরটি টের পান নাই, পাইলে তাহা নিশ্চয় উক্ত পুস্তকের একটি অধ্যায় বৃদ্ধি করিত।

প্রাচীন আর্যগণ বাংলা দেশের তদানীন্তন অধিবাসীদের পক্ষীজাতি বলিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন। সুধী-সমাজে এ কথা সুবিদিত। যে কথাটি সুবিদিত নয়, তাহাই আমি বর্ণনা করিতেছি।

পিতামহ ব্রহ্মা একদা নিভৃতে নীরবে মননশক্তি-সহযোগে দেবী সরস্বতীর সহিত নিরুক্ত আলোচনায় নিমগ্ন ছিলেন। সহসা একটা বেসুরা বিকট চীৎকারে আলোচনা বিঘ্নিত হইল। তিনি উঠিয়া আসিয়া একজন দেবদূতকে চীৎকারের কারণ নির্ণয় করিতে আদেশ করিলেন।

দেবদূত একটু পরে আসিয়া শুদ্ধ ভাষায় খবর দিল, কমলযোনি, বঙ্গদেশবাসী পক্ষীকুল কলরব করিতেছে। তাহাদের নিবৃত্ত হইতে অনুরোধ করিলাম, কিন্তু তাহারা আমার কথা শুনিল না।

মহা ফ্যাসাদে পড়া গেল তো!

পিতামহ সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে বীণাপাণির দিকে তাকাইলেন।

ওদের মানুষ ক'রে দিন। মানুষ হ'লে ওরা সভ্য হবে।

বীণাপাণি হাসিয়া অনুরোধ করিলেন।

পিতামহ বাংলা দেশের পক্ষীজাতিকে মানুষ করিয়া দিলেন। মনুষ্যীভূত পক্ষীগুলি কিন্তু বিপদে পড়িয়া গেল। পক্ষীরূপে তাহারা মন্দ ছিল না। এদিক

ওদিক হইতে খুঁটিয়া আহার করিত, গাছের ডালে রাত কাটাইত, যৌবনকালে মনোমত সঙ্গী বা সঙ্গিনী জুটাইয়া প্রণয় করিত, খড়-কুটা সংগ্রহ করিয়া নীড় বাঁধিত, ডিম পাড়িত, ডিমে তা দিত, শাবকগুলি বড় না হওয়া পর্যন্ত তাহাদের প্রতিপালন করিত, তাহার পর তাহাদের পালক গজাইলে তাহারা উড়িয়া চলিয়া যাইত। সরল স্বাভাবিক জীবন ছিল তাহাদের। মানুষ হইয়া তাহারা বিপদে পড়িয়া গেল। অত সহজে খাবার, বাসা, সঙ্গী, সঙ্গিনী কিছুই পাওয়া যায় না।

এখন যেমন আমরা কথায় কথায় প্রধানমন্ত্রীর কাছে দৌড়াই· তখন মর্তবাসীরা তেমনই সোজা বিধাতার কাছে দৌড়াইতে পারিত। বিধাতাকে খুব বেশী বিরক্ত করার ফলেই বোধ হয় অধুনা আমরা এই সুবিধাটুকু হারাইয়াছি।

বঙ্গদেশ হইতে কান-ছোট সম্প্রদায়ের দলপতি নিখিল-নব-সৃষ্ট-মনুষ্যজাতির প্রতিনিধিরূপে একদা পিতামহের দরবারে গিয়া হাজির হইলেন। নব-সৃষ্ট-মনুষ্য-সমাজও নানা দলে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। কান-ছোট, নাক-লম্বা, চুল-কোঁকড়া, চোখ-কটা, চিরুন-দাঁত, নাদা-পেটা প্রভৃতি নানারূপে শ্রেণী-বিভাগ ছিল তাঁহাদের। যে সময়ের কথা লিখিতেছি, সে-সময় কান-ছোট সম্প্রদায়ের খুব বাড়-বাড়ন্ত।

কান-ছোট সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি পিতামহকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া কহিলেন, প্রভো, আমরা মহা অসুবিধায় পড়িয়াছি। পক্ষীরূপে আমরা সুন্দর ছিলাম, মানুষ হইয়া আমাদের কষ্টের অবধি নাই। উপার্জন করিয়া খাইতে হইবে, কিন্তু কি করিয়া উপার্জন করিব তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। অন্য-প্রদেশবাসীরা শুনিয়াছি ব্যবসায় করে, কিন্তু ধন না থাকিলে ব্যবসায় করা যায় না। আমাদের কিছু ধন দিন।

পিতামহ রেবতী নক্ষত্র-মণ্ডলীতে একটি নব সৌরলোকের পরিকল্পনায় তন্ময় ছিলেন। কল্পনা বাধা পাওয়াতে অষ্ট ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া ক্ষুদ্রকর্ণ খর্বকায় ব্যক্তিটির দিকে চাহিলেন। তাহার পর ঈষৎ বিরক্ত কণ্ঠে বলিলেন, তোমাদের প্রত্যেককেই তো ধন দিয়েছি, আবার ঘ্যান ঘ্যান করছ কেন?

প্রতিনিধিটি সভয়ে শুদ্ধ বাংলা বলিতেছিলেন। পিতামহের মুখে চলতি বাংলা শুনিয়া একটু অবাক হইয়া গেলেন। সাহসও পাইলেন।

বলিলেন, কই, আমরা তো কিছুই পাই নি পিতামহ!

আরে, কি আপদ! ধন মানে শক্তি। তোমাদের প্রত্যেককেই প্রচুর শক্তি দিই নি? যাও চ'রে খাওগে, বিরক্ত করো না।

শুধু শক্তিতে কিছু হয় না পিতামহ। মনুষ্য-সমাজে ব্যবসা করতে গেলে মূলধন চাই। কিছু মূলধন দিন আমাদের।

তা হ'লে বিশ্বকর্মার কাছে যাও। বিশু, ও বিশু!—পিতামহের হাঁকা-হাঁকিতে বিশ্বকর্মা দ্বার-প্রান্তে আসিয়া উঁকি দিলেন।

আমাকে ডাকছেন?

হ্যাঁ, এ কি চাইছে একে দাও, যত সব আপদ জোটে এসে। মূলধন! বিশ্বকর্মার ইঙ্গিতে প্রতিনিধিটি বিশ্বকর্মার কক্ষে গিয়া উপনীত হইলেন। বিশ্বকর্মা আলতো আলতো ভাবে গোঁফে হাত বুলাইতে বুলাইতে মনোযোগ-সহকারে তাঁহার সমস্ত কথা আদ্যোপান্ত শুনিলেন। তাহার পর একটু হাসিয়া বলিলেন, মুশকিল! একে ভাঁড়ারে মাল কম, তার উপর পিতামহ আবার একটা নূতন সৌরলোক নিয়ে মেতেছেন, অহরহ

নানা রকম ফরমাশ করছেন, আর সঙ্গে সঙ্গে আমাকে যেমন ক'রে হোক মাল যোগান দিতে হচ্ছে। দেখি, বাড়তি যদি কিছু থাকে দিচ্ছি আপনাকে। আপনি বসুন একটু।

বিশ্বকর্মা ভিতরের দিকে চলিয়া গেলেন। একটু পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, দেখুন, কিছু রঙ, কিছু বাঁশ, কিছু কাগজ আর খানিকটা আগুন আপনাকে দিতে পারি। এ ছাড়া বাড়তি আর কিছু নেই।

ও-সবে কি আমাদের সমস্যার সমাধান হবে ?

আপনারা ব্যবসা করতে চান তো ? এর প্রত্যেকটি নিয়ে ব্যবসা করা যাবে। প্রচুর অর্থোপার্জন করতে পারবেন !

কিছু সোনা বা রুপো—

বাড়তি নেই। পিতামহ যদি বলেন, তা হ'লে দিতে পারি। কিন্তু তিনি যে সৌরলোক সৃষ্টি করছেন, তাতে সব রকম ধাতু অজস্র লাগছে। সোনার হিমালয়, রুপোর বিন্ধ্যাচল হচ্ছে সেখানে। পারদ-সমুদ্র হবে না কি। কোনও রকম ধাতুই তিনি এখন ভাড়ার থেকে বাইরে যেতে দেবেন না ; সেদিন স্বয়ং পার্বতীর এক জোড়া দুলের জন্যে স্বয়ং মহাদেব কিছু সোনা চেয়ে পাঠিয়েছিলেন, দিলেন না।

তবু চেয়ে দেখব ?

দেখতে পারেন।

আলতো আলতো ভাবে গোঁফে হাত বুলাইতে লাগিলেন। প্রতিনিধিটি ব্রহ্মার ঘরে গিয়া দেখিলেন, চতুরানন নিমীলিত-নয়নে ধ্যানমগ্ন রহিয়াছেন। তিনি তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ করিতে আর সাহস করিলেন না। বিশ্বকর্মা প্রদত্ত রঙ, বাঁশ, কাগজ এবং আগুন লইয়া বঙ্গদেশে ফিরিয়া গেলেন।

তাহার পর বহু শতাব্দী অতীত হইয়াছে।

সহসা পিতামহের এক দিন খেয়াল হইল, বিশ্বকর্মাকে ডাকিয়া প্রশ্ন করিলেন, হ্যাঁ হে বিশু, বাংলা দেশ থেকে সেই যে এক ছোকরা মূলধন চাইতে এসেছিল, তাকে কিছু দিয়েছিলে ?

আজ্ঞে হ্যাঁ। ভাল ভাল জিনিসই দিয়েছিলাম। রঙ, বাঁশ, কাগজ আর আগুন। এর যে-কোনও একটা দিয়েই তারা বিশাল ব্যবসা করতে পারে।

নিশ্চয়ই, এত দিনে বোধ হয় ফেঁপে উঠেছে সব। উঁকি মেরে দেখ তো, কি তাদের অবস্থাটা।

বিশ্বকর্মা স্বর্গের বাতায়ন হইতে ঝুঁকিয়া বঙ্গদেশের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন।

দেখতে পাচ্ছ কিছু ? খুব ধুমধাম বোধ হয় ? অমন চারটে জিনিস নিয়ে গেছে, বড় বড় বাড়ি হাঁকড়েছে নিশ্চয় ?

আজ্ঞে না, বাড়ি-টাড়ি তো তেমন দেখছি না !

কি দেখছ তা হ'লে ? জিনিস চারটে নিয়ে কি করলে তা হ'লে ওরা ?

ফানুস বানিয়েছে বোধ হয়।

ফানুস ?

রঙ-বেরঙের ফানুসই তো উড়ছে দেখছি।

বল কি !

উপকরণ-সংগ্রহ (১)

আবেগ-কম্পিত-কণ্ঠে পুষ্টকান্তি গদাধর বলিলেন, "আইস ভাই রামতনু, এবার আমরা সাহিত্য চর্চা করি।"

ক্ষীণকায় রামতনু মিটমিট করিয়া চাহিয়া উত্তর দিলেন, "কেন, রাজনীতি কি ছাড়িয়া দিবে?"

"দিব। কারণ গলার জোর, পয়সার জোর কোনটাই নাই। ওপথে যাওয়াই আমাদের ভুল হইয়াছিল।"

রামতনু হোমিওপ্যাথি ঔষধের শিশিটি হইতে সন্তর্পণে একটু নস্য ঢালিয়া ছোট একটি টিপ্‌ দক্ষিণ হস্তের তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া মনোনিবেশ সহকারে সেটি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

"কোন জবাব দিতেছ না যে?"

"ভাবিতেছি।"

নস্যের টিপটির প্রতি আর একবার চাহিলেন।

"কি ভাবিতেছ বল না।"

"ভাবিতেছি, সাহিত্য-চর্চাও কি আমরা পারিয়া উঠিব? শুনিয়াছি এসব ব্যাপারে প্রতিভার প্রয়োজন। আমাদের কি তাহা আছে? রাজনীতিতে যেমন গলার জোর, পয়সার জোর চাই, এসব ব্যাপারে তেমনি কল্পনার জোর চাই।"

সূক্ষ্মভাবে আলগোছে নস্য লইতে লাগিলেন।

উত্তেজিত গদাধর উত্তর দিলেন—"আমি কাল্পনিক সাহিত্য-চর্চা করিব না। ওসব সাহিত্যের দিন গিয়াছে। আমি প্রত্যক্ষ সাহিত্য-চর্চা করিতে চাই। যাহাদের দিকে ভাল করিয়া কেহ চাহিয়া দেখে নাই তাহাদের আমরা দেখিব, যাহাদের কথা ভাল করিয়া কেহ শোনে নাই তাহাদের কথা আমরা শুনিয়া পাঁচজনকে শুনাইব—"

"কাহাদের কথা?"

"যাহারা বড়লোক নয়, যাহাদের মোটর গাড়ী নাই, যাহারা চকচকে জামা-কাপড় পরিয়া রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়ায় না, যাহারা মাঠে ধান কাটে, বাজারে মোট বয়, বাড়িতে বাসন মাজে—"

"ও! তুমি গণ-সাহিত্যের কথা বলিতেছ? বেশ তো! কি করিবে ঠিক করিয়াছ?"

রামতনুর উৎসাহ-অগ্নি সহসা যেন প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল।

"উহাদের সত্য পরিচয়, উহাদের জীবনধারার খুঁটিনাটি প্রথমে জানিতে হইবে। প্রথমে উপকরণ-সংগ্রহ করা দরকার। ওঠ, বাহির হইয়া পড়।"

"এখনই?"

"হাঁ, শুভস্য শীঘ্রম্‌।"

"বেশ, চল।"

রামতনু সজোরে নস্যর টিপটি নাসারন্ধ্রে টানিয়া লইয়া চক্ষু আরক্ত করিয়া ফেলিলেন, গদাধর ধরাইলেই একটি মোটা সিগার।

"একটি খাতা আর পেন্সিল লওয়া দরকার।"

"কেন?"

"যাহা দেখিব সঙ্গে সঙ্গে টুকিয়া ফেলিব।"

"হাঁ হাঁ, ঠিক। লও—"

"কিছু খাবার সঙ্গে লইলে কেমন হয়?"

"উত্তম হয়। কতক্ষণ ঘুরিতে হইবে স্থিরতা নাই।"

"চিঁড়া আছে। কিছু গুড়ও লইতে পারি।"

"খাসা হইবে।"

দুই বন্ধু বাহির হইয়া পড়িলেন।

গদাধর ঈষৎ পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

প্রখর রৌদ্র। মেঠো পথ। সহসা তিনি ভিন্নমুখী হইয়া যদু মিত্রের প্রাচীর পরিবৃত বাগান-বাড়ির দিকে সবেগে পদচালনা করিতে লাগিলেন।

রামতনু। ওদিকে যাইতেছ কেন?

গদাধর। ওই দেওয়ালটার পাশে একটু ছায়া আছে। আইস প্রথমে একটু বিশ্রাম করিয়া লই। ভাই রামতনু, এখনও পর্যন্ত তেমন কিছু তো চোখে পড়িল না।

রামতনু। পড়িবে, ব্যস্ত হইও না। জিরাইয়া লইতে চাও, লও।

উভয়ে গিয়া প্রাচীর-সন্নিহিত ছায়ায় উপবেশন করিলেন।

গদাধর। খাওয়াটা শেষ করিয়া লইবে কি?

রামতনু। [সবিস্ময়ে] ইহার মধ্যেই ক্ষুধা পাইয়া গেল? একটু আগেই তো একতাল হালুয়া খাইয়া আসিয়াছ।

গদাধর। [কান চুলকাইয়া] না, ক্ষুধা পায় নাই, কাজটা সারিয়া রাখিব ভাবিতেছিলাম।

রামতনু গদাধরের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেই গদাধর অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া লইলেন। কিন্তু বেশিক্ষণ মুখ ফিরাইয়া থাকিতে পারিলেন না, সন্তর্পণে ঘাড় ফিরাইয়া আড়চোখে রামতনুর দিকে আবার চাহিলেন। রামতনুকে তাঁহার বড় ভয়। কথায় কথায় মাথা খোঁড়ে, আত্মহত্যা করিতে যায়। রামতনুকে না হইলে তাঁহার চলেও না। বাল্যবন্ধু এবং অক্লান্ত কর্মী। রামতনুর মুখের দিকে চাহিয়া গদাধর দেখিলেন তিনি ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া উৎকর্ণ হইয়া কি যেন শুনিতেছেন।

গদাধর। ভাই রামতনু, ক্ষমা কর, আহার-প্রসঙ্গ আর তুলিব না।

রামতনু। চুপ, চুপ, শুনিতে পাইতেছ না?

গদাধর ঘাড় কাৎ করিয়া উৎকর্ণ হইলেন এবং শুনিতে পাইলেন, নারীকণ্ঠের চাপা ক্রন্দন।

গদাধর। [আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে] ভাই রামতনু, আর তো বসিয়া থাকা যায় না। চল, ওঠ, কারণ নির্ণয় করি।

রামতনু। চল। কিন্তু সাবধানে যাইতে হইবে। তাড়াহুড়া করিও না। আস্তে আস্তে হাঁট। তোমার পামসু বড় বেশি মশমশ শব্দ করিতেছে।

দেওয়ালের ওপাশ হইতে ক্রন্দনধ্বনি ভাসিয়া আসিতেছিল। দেওয়ালের ধারে ধারে গুঁড়ি মারিয়া উভয়ে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিছুদূর গিয়া দেওয়ালটা বাঁকিয়া গিয়াছিল। সেই বাঁকের মুখে দাঁড়াইয়া উভয় বন্ধু উঁকি দিয়া দেখিলেন

একটি ফরসাগোছের লোক উবু হইয়া বসিয়া আছে এবং তাহার পাশে একটি কৃশাঙ্গিনী নারী শতচ্ছিন্ন মলিন আঁচলে চোখ ঢাকিয়া কাঁদিতেছে। সম্মুখে একটি ছোট শিশু খেলা করিতেছে।

রামতনু। [নিম্নকণ্ঠে] তুমি এখানে বস। আমি ব্যাপারটা অনুসন্ধান করিয়া আসি।

গদাধর। [আবেগরুদ্ধ স্বরে] বোধ হয় কোনও জমিদার বা সুদখোর মহাজন উহাদের উচ্ছেদ করিয়া গৃহহারা করিয়াছে।

রামতনু। অনুসন্ধান করিলেই বোঝা যাইবে।

রামতনু খুরু খুরু করিয়া চলিয়া গেলেন। গদাধর সেইখানেই বসিয়া পড়িয়া নিজের ঝাঁকড়া-গোঁফে অঙ্গুলি-সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। ভাবাধিক্য হইলে গদাধর এইরূপ করিয়া থাকেন। কিন্তু নিজেকে তিনি আর সংযত করিতে পারিলেন না। খাতা পেন্সিল বাহির করিয়া লিখিতে শুরু করিয়া দিলেন।

"আজ দেখিলাম মিত্রদের বাগান বাড়ির দেওয়ালের পাশে জনৈক শ্রমিক এবং জনৈকা শ্রমিকা বসিয়া আছে। শ্রমিকের চোখের দৃষ্টি অসহায়, শ্রমিকা কাঁদিতেছে। আহা, বোধ হয় উহারা ধনিক-সম্প্রদায় কর্তৃক অত্যাচারিত। বন্ধুবর রামতনু অনুসন্ধান করিতে গিয়াছে।..."

এই পর্যন্ত লিখিয়া গদাধরের চিন্তাধারা ভিন্নপথ ধরিল। সহসা ব্যাগ হইতে চিঁড়া বাহির করিয়া চট করিয়া একমুঠা মুখে ফেলিয়া দিলেন এবং হাঁটু দোলাইয়া দোলাইয়া চিবাইতে লাগিলেন।

রামতনু ফিরিলেন মিনিট দশেক পরে।

গদাধর। কি, ব্যাপার কি ?

রামতনু। বলিতেছি, শোন। যে লোকটি উবু হইয়া বসিয়া আছে তাহার নাম ভগ্গু। ভগবানের অপভ্রংশ সম্ভবতঃ। স্ত্রীলোকটির নাম বুধিয়া। বুধিয়াকে ভগ্গু তিন বৎসর পূর্বে 'চুমানা' অর্থাৎ 'নিকে' করিয়াছে। ভগ্গুর প্রথমা স্ত্রী বর্তমান। প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে কোনও সন্তানাদি না হওয়ায় ভগ্গু বুধিয়াকে জীবনের দ্বিতীয়া সঙ্গিনীরূপে গ্রহণ করিয়াছে। ভগ্গু বলিতেছে, প্রথমা স্ত্রী তাহাকে গ্রহণ করিতে বাধ্য করিয়াছে। ওই যে ছোট মেয়েটি দেখিতেছ ওটি ভগ্গুর সন্তান নয়—ইহার গর্ভেও ভগ্গুর কোনও সন্তানাদি হয় নাই। এ মেয়েটি বুধিয়ার প্রথম স্বামীর। প্রথম স্বামীকে বুধিয়া ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে। কেন ত্যাগ করিয়াছে তাহা কিছুতেই বলিল না। অনেকবার জিজ্ঞাসা করিলাম। কাল বুধিয়া মাঠে কাজ করিয়া নিজের মজুরি হইতে কিছু শকরকন্দ আলু কিনিয়া আনে। রাত্রে কয়েকটি খাইয়া বাকিগুলি সিদ্ধ করিয়া রাখিয়া দিয়াছিল সকালে খাইবে বলিয়া। সকালে উঠিয়া দেখে একটিও নাই। ভগ্গুও নাই। বুধিয়ার সন্দেহ হইল তাহার সতীনই নিশ্চয় আলুগুলি আত্মসাৎ করিয়াছে। কিন্তু সতীনকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করার ফলে যাহা ঘটিয়াছে তাহা ভয়াবহ। সতীন (বুধিয়া উচ্চারণ করিতেছিল সৌতিন) তাহার চুলের ঝুঁটি ধরিয়া ঠাস ঠাস করিয়া তাহাকে চড়াইতে থাকে। বুধিয়া তাহার পেটে কামড়াইয়া না ধরিলে বোধ হয় চড়াইতে চড়াইতে মারিয়াই ফেলিত। চুলের ঝুঁটি ছাড়িয়া দিতেই বুধিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে ঘর হইতে ছুটিয়া চলিয়া আসে। তাহার শিশু

হয়। নাকের ছিদ্র দুটিই শুধু দেখা যায়, তাহাও সর্দিতে বোজা। হাঁ করিয়া নিশ্বাস লয়। দুখিয়া কাজ করে আর দুখিয়ার বোন রুকমিনিয়া সেটাকে টাঙাইয়া লইয়া বেড়ায়। দুখিয়া যেখানে বসিয়া বাসন মাজে সেইখানেই ধুলার উপর মেয়েটাকে মাঝে মাঝে শোয়াইয়া দেয়। মেয়েটাও বেশ শুইয়া থাকে, বাসন মাজিতে মাজিতে দুখিয়া তাহার সহিত কথা কয়, তাহাতেই সে মহাখুশি। হাত-পা ছুঁড়িয়া খেলা করে এবং ওং ওং বলিয়া মায়ের কথার জবাব দেয়। ক্ষুধা পাইলে কাঁদে। তখন দুখিয়া তাহাকে ময়লা হাতেই দুই কনুই ও বাহুর সাহায্যে বুকে তুলিয়া লইয়া দুধ খাওয়ায়। মেয়েটি বড়ই নোংরা। হাত ধুইয়া ছেলেকে লইলেই পারে। দুখিয়ার স্বামী রংলাল দেহাত ছাড়িয়া এখানে আসিয়াছে। কারণ তাহার স্ত্রী (অর্থাৎ দুখিয়া) শহর ছাড়িয়া দেহাতে যাইতে রাজী নয়, অথচ দেহাতে তাহাদের কয়েক বিঘা জমি আছে। দুখিয়ার আর এক ভগ্নী সুখিয়ার বিবাহ হইয়াছে দুখিয়ারই ভাসুর চমকলালের সহিত। চমকলাল সুখিয়াকে লইয়া দেহাতেই থাকে। কিন্তু দুখিয়া বলে সুখিয়া সুখে নাই। স্বামীটি 'মারখুনডা', শাশুড়ি 'খানডারনি'। ইহার উপর আছে 'জড়াইয়া বোখার' এবং পেটের অসুখ। কিছুদিন পূর্বে সুখিয়া ছেলে হইবার জন্য আসিয়াছিল। ছেলেটা বাঁচিল না, আঁতুড়েই মারা গেল! সুখিয়াও যায় যায় হইয়াছিল, অনেক কষ্টে রক্ষা পাইয়াছে। তাহার শরীর সারিতে না সারিতেই মহিষের শিঙের মতো গোঁফ উঁচাইয়া লাঠি ঘাড়ে চমকলাল আসিয়া হাজির হইল এবং সুখিয়াকে লইয়া গেল। সুখিয়ার দুরবস্থা দেখিয়া দুখিয়া সাবধান হইয়াছে। সে আর দেহাতে যাইবে না। স্ত্রৈণ রংলালও স্ত্রীর আঁচল ধরিয়া সহরে আসাতে দুখিয়ার সুবিধাই হইয়াছে। কিন্তু একটু মুশকিলও হইয়াছে। জামাই স্কন্ধারূঢ় হওয়াতে দুখিয়ার মা একটু ঘ্যানঘ্যান শুরু করিয়াছে। রংলাল একটু বাবু প্রকৃতির লোক, প্রায়ই দেখা যায় সে একটি ফরসা ফতুয়া গায়ে দিয়া গুজরাটি কনট্রাক্টরবাবুর মোটর ড্রাইভারটির সহিত গল্প করিতেছে। শ্রমসাধ্য কাজে বড় ভিড়িতে চায় না। কোদালপাড়া, মোট বওয়া, রিক্সা টানা, রাজমিস্ত্রির সহিত জনখাটা এসব করিতে পারিলে শহরে কাজের অভাব হয় না। কিন্তু রংলাল সে সব করিবে না। একটা মাড়োয়ারির রঙের কারখানায় দিনকতক ছাপার কাজ করিয়াছিল। কিন্তু বেশীদিন সেখানে টিকিতে পারিল না। বড় খাটুনি। তাছাড়া সর্বাঙ্গে রং লাগিয়া যায়। আজকাল মাড়োয়ারিরা গঙ্গার ধারে যজ্ঞ করাইতেছে, সেখানে তাহারা একটা জলসত্র খুলিয়াছে। রংলাল তাহাতেই ছোলা গুড় এবং জল বিতরণের চাকরি করিতেছে। দৈনিক দেড়টাকা মজুরি, তাহার উপর খাইতে পায়। কাজটি রংলালের মনোমত। বেশি পরিশ্রম নাই। তৃষ্ণার্ত ভিখারীদের উপর একটু আধটু 'তম্বি' করিবার সুযোগ আছে। যজ্ঞ কিন্তু অনন্তকাল চলিবে না। তখন যে রংলাল কি করিবে তাহা ভাবিয়া দুখিয়া চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছে। মায়ের বাক্যবাণ ক্রমশ যেরূপ তীক্ষ্ন হইয়া আসিতেছে তাহাতে বেকার রংলাল বেশিদিন যে শ্বশুরবাড়িতে থাকিতে পারিবে তাহা মনে হয় না—

গদাধর এই পর্যন্ত লিখিয়াছিলেন এমন সময় রামতনু প্রবেশ করিলেন।

রামতনু। আজ বাহির হইবে না?

গদাধর। নিশ্চয় হইব।

রামতনু। কি লিখিতেছিলে?

গদাধর। কাল দুখিয়ার সম্বন্ধে যাহা সংগ্রহ করিয়াছি তাহা লিখিয়া ফেলিলাম।

রামতনু তীব্র দৃষ্টিতে গদাধরের দিকে চাহিলেন।

রামতনু। এতক্ষণে লিখিলে? কালই সন্ধ্যায় লিখিয়া শেষ করা উচিত ছিল। কাল সন্ধ্যায় কি করিতেছিলে?

গদাধর। [কাচুমাচু] একজায়গায় নিমন্ত্রণ ছিল, তাহাই রক্ষা করিতে গিয়াছিলাম। [সহসা উৎফুল্ল] বেশ ভাল খাওয়াইল।

রামতনু। খাওয়া কমাও, নতুবা বিপদে পড়িবে।

অপ্রতিভ গদাধর উঠিয়া পড়িলেন এবং রামতনুর দিকে পিছন ফিরিয়া জামা পরিতে লাগিলেন।

গদাধর। আজ কোন্ দিকে যাইবে?

রামতনু। নাক-বসা ভজুয়ার বাড়ির দিকে।

গদাধর। [উল্লসিত] ও! সে একজন আসল শ্রমিক। যে আগে তোমার বাড়ির চাকর ছিল সেই তো? এখন চানাচুর ফেরি করিয়া বেড়ায়?

রামতনু। হ্যাঁ সেই। সেই শ্রমিক ভজুয়ার অন্তঃপুর পরিদর্শন করিব মনস্থ করিয়াছি। ভিতরের খবর ঠিক মতো জানিতে হইলে অন্তঃপুর পরিদর্শন করা প্রয়োজন।

গদাধর। [বিস্মিত] তাহা কি করিয়া সম্ভব? সে তোমাকে অন্তঃপুরে ঢুকিতে দিবে কেন! দিলেও সব সামলাইয়া সুমলাইয়া ফেলিবে, তাহাদের স্বরূপ জানিতে পারিবে না।

রামতনু। চল না, সমস্ত ভাবিয়া রাখিয়াছি।

উভয়ে ভজুয়ার বাড়ির দিকে অগ্রসর হইলেন। বাড়ির কাছাকাছি আসিয়া রামতনু গদাধরকে থামিতে বলিলেন। তাঁহার পর এদিক ওদিক চাহিয়া ইঙ্গিতে অনুসরণ করিতে বলিলেন। আঁদাড়-পাঁদাড় ভাঙিয়া অবশেষে ভজুয়ার বাড়ির পিছন দিকে একটি গাছতলায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন উভয়ে। গাছটি বিশাল এবং শাখাপত্রবহুল।

রামতনু। গাছে উঠিতে হইবে।

গদাধর। এই গাছে? বল কি?

রামতনু। [দৃঢ়কণ্ঠে] হ্যাঁ।

গদাধর। আমি ভাই পারিব না।

রামতনু। কঠোরদৃষ্টিতে একবার তাহার স্ফীতোদরের দিকে চাহিলেন। আড়চোখে রামতনুর দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া গদাধরকে মুখ অন্য দিকে ফিরাইতে হইল। অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া তিনি ধীরে ধীরে গোঁফে আঙ্গুল চালাইতে লাগিলেন।

রামতনু। বেশ, আমিই উঠিব, তুমি গাছের নীচেই বসিয়া থাক।

রামতনু ক্ষিপ্রতা সহকারে মালকোচা মারিয়া গাছে উঠিয়া পড়িলেন এবং অবলীলাক্রমে শাখা হইতে শাখান্তরে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। বিস্মিত গদাধর কিছুক্ষণ উর্ধ্বমুখে দাঁড়াইয়া থাকিয়া অবশেষে একটি বসিবার স্থান নির্বাচন করিতে

প্রবৃত্ত হইলেন। দেখিলেন গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়া বসা যাইবে না। গুঁড়িটি কুম্ভীর পৃষ্ঠের মতো অমসৃণ। গাছের ঠিক নীচে বসিবার উপায় নাই। টিনের কোটা, ভাঙ্গা শিশি, ভাঙ্গা হাঁড়ি, কাঁটা গাছ প্রভৃতিতে স্থানটি পরিপূর্ণ! গদাধর এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিলেন, নিকটেই আর একটি বাড়ির দেওয়ালের নীচে সবুজ ঘাসে ঢাকা একটি চমৎকার স্থান রহিয়াছে। ত্বরিতপদে সেখানে গিয়া উপবেশন করিলেন। আরাম করিয়া সিগারেটটি ধরাইবেন এমন সময় মাথার উপর আচম্বিতে খানিকটা আবর্জনাবৃষ্টি হইয়া গেল। গদাধর ঘাড় ফিরাইয়া বুঝিলেন দেওয়ালের ওপার হইতে নিশ্চয় কেহ ফেলিয়াছে। উঠিয়া গা-মাথা ঝাড়িতেছেন এমন সময় রামতনুর কণ্ঠস্বর শোনা গেল—গদাধর, তুমি কোথায় গেলে—।

গদাধর দ্রুতপদে বৃক্ষতলে উপনীত হইলেন। উর্ধ্বমুখ হইয়া দেখিলেন রামতনু শূন্যে ঝুলিতেছেন। তাঁহার কাছা একটা ডালে আটকাইয়া গিয়াছে। সহসা গদাধরের দেহে ও মনে অপ্রত্যাশিত শক্তি সঞ্চারিত হইল। জীবন তুচ্ছ করিয়া তিনি গাছে উঠিয়া পড়িলেন।

রামতনু। [ঝুলিতে ঝুলিতে] তোমার মাথায় ছাই কেন?

গদাধর। দেওয়ালের ধারে বসিয়াছিলাম। দেওয়ালের ওপার হইতে কেহ ফেলিয়া থাকিবে।

রামতনু। তোমাকে গাছের তলায় বসিতে বলিয়াছিলাম।

গদাধর। তোমার এমন অবস্থা কি করিয়া হইল তাহাই আগে বল!

রামতনু। ডাল ভাঙ্গিয়া পড়িয়া যাইতেছিলাম। কাছা ডালে আটকাইয়া যাওয়াতে রক্ষা পাইয়াছি।

গদাধর। ঘাড়ে ভর দাও, আমি ডালটা ছাড়াই।

গদাধর সন্তর্পণে রামতনুকে গাছ হইতে নামাইয়া আনিলেন।

গদাধর। কি দেখিলে বল, টুকিয়া লই।

রামতনু। একটি জাঁতা, একটি উনুন, একটি উদূখল চোখে পড়িল। উনানটি গোবরমাটি দিয়া নিকানো। ছাগী আছে, তাহার দুইটি বাচ্চা হইয়াছে। একটি কালো, একটি বাদামী। আঙিনার একধারে রহিয়াছে ক্ষারসিদ্ধ কাপড়ের স্তূপ আর একধারে ভজুয়ার বড় মেয়ে লছমী সেজ মেয়ে হিরিয়ার মাথার উকুন বাছিতেছে। ভজুয়া কিম্বা তাহার স্ত্রী বাড়িতে নাই। ইহার বেশি আর লক্ষ্য করিবার সুযোগ পাইলাম না। কারণ ঠিক ইহার পরেই যাহা দৃষ্টি আকর্ষণ করিল তাহাতেই ধৈর্য্য হারাইলাম, মাথায় রক্ত চড়িয়া গেল। দ্রুতপদে নামিতে গিয়া পায়ের নিচের ডালটি ভাঙিল।

গদাধর। সে বস্তুটি কি?

রামতনু। গাড়ু। আমার গাড়ুটি হারাইয়াছিল, স্পষ্ট দেখিলাম তাহা ভজুয়ার ঘরের কোণে রহিয়াছে। আমি পুলিশে খবর দিব।

গদাধর। [আবেগ কম্পিত কণ্ঠে] ভাই রামতনু, ও কাজ করিও না। ভজুয়া বড় দুঃখী। একে অশিক্ষিত, তাহার উপর অভাবগ্রস্ত। শিক্ষিত ধনীরা দুই হাতে ডাকাতি করিতেছে, তাহাদের যদি ধরিতে পার পুলিশে খবর দিও। দুঃস্থ ভজুয়াকে কিছু বলিও না।

রামতনু ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া গদাধরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। ধীরে ধীরে তাঁহার চিত্তও বিগলিত হইতে লাগিল।

উপকরণ-সংগ্রহ (৩)

প্রতিবেশী মাণিক ভাদুড়ীর কাহিনী শুনিয়া রামতনু অদূরে উপবিষ্ট গদাধরের দিকে তাকাইলেন। পাড়ার সমস্ত চাকর পলাইয়াছে। এত বক্তৃতা সমস্ত ব্যর্থ হইল। নির্বাক গদাধরের নয়নযুগলে যে ভাষা জ্বলজ্বল করিতেছিল তাহা উত্তেজিত রামতনুর অন্তরকে উত্তপ্ততর করিল মাত্র।

মাণিক চলিয়া যাইবামাত্র তিনি বলিলেন—"আমি মাথা খুঁড়িব।"

ভাগ্যে তিনি গদাধরের বিছানায় বসিয়াছিলেন। নিকটেই যে তাকিয়াটা ছিল তাহার উপরেই তিনি মাথা খুঁড়িতে শুরু করিয়া দিলেন। নিমিষে গদাধরের জ্বলমান চক্ষু শঙ্কাতুর হইয়া উঠিল, তিনি ছুটিয়া গিয়া রামতনুকে ধরিয়া ফেলিলেন। তাঁহার মনে হইল রামতনুর মাথা যদিও ফাটিবে না, কিন্তু এই বাজারে তাকিয়া ফাটাও তো কম শোচনীয় ব্যাপার নয়।

রামতনু। না, আমাকে বাধা দিও না। আমি—

গদাধর। হঠকারিতা করিও না। এই বাজারে তোমার মাথা কিম্বা আমার তাকিয়া কোনোটাই তুচ্ছ করিবার মতো বস্তু নয়। আমার কথা শোন, যুক্তিযুক্ত কথাই বলিব—

রামতনু। বল।

গদাধর। তোমার ক্ষোভের কারণ আছে তাহা স্বীকার করিতেছি। নবাগত ঘুষখোর দারোগাটার বিরুদ্ধে সে দিন চাকরদের আড্ডায় গিয়া যে বক্তৃতাটা দিয়াছিলে তাহা খুবই ওজস্বিনী হইয়াছিল একথাও আমি মানি এবং সেই দারোগাটা 'তু' করিয়া ডাকিবামাত্র এত বক্তৃতা সত্ত্বেও তোমার, মাণিকবাবুর এবং পাড়ার প্রায় সকলেরই চাকর সেই দারোগাটার কাজ করিবার জন্য উর্ধ্বশ্বাসে চলিয়া গেল এ ঘটনাও খুব হৃদয়বিদারক তাহাতে সন্দেহ নাই, কেবল একটি বিষয়ে তোমাকে অবহিত হইতে অনুরোধ করি।

রামতনু। কি বিষয়ে বল ?

গদাধর। দেখ, আমাদের উদ্দেশ্য উপকরণ সংগ্রহ করা, উপকরণ দেখিয়া বিচলিত হওয়া নয়। বৈজ্ঞানিকের মতো নিষ্কাম নিষ্ঠাভরে···

রামতনু। তুমি কদলী অথবা কচু খাও।

অপ্রত্যাশিতভাবে বাধা পাওয়াতে গদাধরের চক্ষু দুইটি ঠিকরাইয়া বাহির হইয়া পড়িবার মতো হইল। রামতনু দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিলেন।

গদাধর। কদলী বা কচু ! খাইব !

রামতনু। কি করা উচিত সহজ কথায় সেটা বলিতে পারো না রাক্কোস, কেবল কথার মারপ্যাঁচ কষিতেছো !

রামতনু মাঝে মাঝে গদাধরকে রাক্কোস (রাক্ষস) বলে, সম্ভবতঃ তাহার ভোজন-পটুতার জন্য।

গদাধর। [অপ্রতিভ] মানে, আমি বলিতেছিলাম—

রামতনু। সংক্ষেপে সহজ ভাষায় বল এখন কি করা উচিত।

গদাধর। যেখানে আমাদের চাকরেরা গিয়াছে সেইখানে যাওয়া উচিত।

রামতনু। থানায় ?

গদাধর। তোমার বক্তৃতা শুনিলে দারোগা হয়তো—

রামতনু। বেশ চল।

রামতনু যুক্তির দাস। অবিলম্বে তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন !

॥ দুই ॥

পদব্রজে দুইক্রোশ দূরবর্তী থানায় যখন তাঁহারা উপস্থিত হইলেন তখন মধ্যাহ্ন উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। পদদ্বয় ধূলি-ধূসরিত, দেহ অবসন্ন, অন্তর ক্ষুৎপিপাসাকাতর। রামতনুর সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই, গদাধরের ভ্রূক্ষেপ করিবার সাহস নাই। আর একটা ব্যাপারেও উভয়েই বিভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এটা থানা কিনা তাহাই তাঁহারা ঠিক করিতে পারিতেছিলেন না। মনে হইতেছিল যেন জমিদারের কাছারি। কানে কলম গুঁজিয়া বারান্দায় সারি সারি যাঁহারা খেরোর খাতায় নিবন্ধদৃষ্টি হইয়া বসিয়া আছেন তাঁহাদের গোমস্তা বলিয়া মনে হয়। পুলিশ কর্মচারীর এরূপ মূর্তি কল্পনা করা শক্ত। সম্মুখের বিস্তৃত প্রাঙ্গণটা বহুলোক মিলিয়া পরিষ্কার করিতেছে। প্রকাণ্ড একটা সামিয়ানা খাটাইবারও আয়োজন চলিতেছে। থানার সহিত কোনও সাদৃশ্যই তাঁহারা দেখিতে পাইলেন না। মনে হইল যেন কোন জমিদারবাড়িতে বৃহৎ একটা উৎসবের আয়োজন চলিতেছে। থানার কোন চিহ্ন নাই। অথচ সকলেই বলিতেছে এইটাই না কি থানা। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া উভয়ে উভয়ের বহুবার দৃষ্ট মুখচ্ছবি পুনরায় অবলোকন করিতেছিলেন, এমন সময় সমবেতকণ্ঠে ধ্বনিত হইল—"সেলাম হুজুর।"

ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলাম ভগ্‌গত, ফৈজু, চমকলাল, ছেদি, ছককু, বানার্সি অর্থাৎ পাড়ার সমস্ত পলাতক ভৃত্য সারি বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া সেলাম করিতেছে।

রামতনু ভাঙা হিন্দিতে রুক্ষকণ্ঠে জানিতে চাহিলেন তাহারা এমনভাবে একযোগে পলাইয়া আসিল কেন।

ছেদি (মাণিক ভাদুড়ির চাকর) শুদ্ধ হিন্দিতে সবিনয়ে যে উত্তর দিল তাহার সংযত বাংলা অনুবাদ করিলেও দাঁড়াইয়া যায়—"পলাইয়া আসিব কেন হুজুর, কোন পাপ তো করি নাই। এখানে দৈনিক তিনটাকা মজুরি এবং একবেলা খাওয়া পাইতেছি, আসিব না কেন ?"

ছেদিকে সরাইয়া দিয়া রামতনুর পুরাতন ভৃত্য নাক-বসা ফৈজু আগাইয়া আসিল। তাঁহার সহিত রামতনু নিম্নলিখিতরূপে আলাপ করিলেন।

রামতনু। তোমাদের কি কাজ করিতে হয় ?

ফৈজু। থানার হাতা পরিষ্কার।

রামতনু। এ কাজে তোমাদের কে বাহাল করিয়াছেন ?

ফৈজু। দারোগাবাবু নিজে।

রামতনু। এতগুলি লোককে তিনিই মজুরি দিতেছেন?

ফৈজু। হাঁ হুজুর।

রামতনু। তিনি কোথায়?

ফৈজু। ভিতরে আছেন। না, না, ওই যে আসিতেছেন।

—ভৃত্যের দল নিমেষের মধ্যে সরিয়া গিয়া স্ব স্ব কর্মে মনোনিবেশ করিল। দারোগা রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিলেন। বিশাল বপু, বিশাল গোঁফ। তিনি আসিয়াই যাহা করিলেন তাহা আরও চমকপ্রদ। গদাধরের দিকে হর্ষোৎফুল্ল নয়নে চাহিয়া সোচ্ছ্বাসে তিনি চিৎকার করিয়া উঠিলেন—"একি, পণ্ডিত মহাশয়, আপনি এখানে কি করে এলেন—?"

গদাধরের উদীয়মান ক্রোধ আচমকা বিস্ময়ে রূপান্তরিত হওয়াতে তাঁহার বাকরোধ হইল। শুধু তাই নয়, অতীত জীবনের কয়েকটি আলেখ্যও দ্রুতভাবে মানসপটে প্রকট হইয়া পড়াতে তিনি রীতিমত বিব্রত হইয়া পড়িলেন। প্রথম যৌবনে মালদহ জেলার একটি গ্রামে যখন তিনি মাইনর স্কুলে হেড-পণ্ডিতি করিতেন তখন এই রাম-বনস্পতি পাণ্ডে তাঁহার ছাত্র ছিল। সে-ই দারোগা হইয়াছে! এত বড় গোঁফ তাহার! ব্যাকুল গদাধরকে ব্যাকুলতর করিয়া রাম-বনস্পতি তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলেন। ইহার পর যে সব আলোচনা অনিবার্যভাবে আসিয়া পড়ে সে সবও আসিয়া পড়িল।

রামতনু তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে সমস্ত দেখিতেছিলেন। কিছুমাত্র ভূমিকা না করিয়া হঠাৎ তিনি দারোগাকে বলিলেন, "আপনার সহিত আমাদের কয়েকটি কথা আছে। আপনি যখন গদাধরের ছাত্র তখন আমারও ছাত্রস্থানীয়, আশা করি আমার প্রশ্নগুলির সরল উত্তর দিবেন।"

দারোগা। [স-সম্ভ্রমে] নিশ্চয় দিব। আগে হাত-পা ধুন, আহারাদি করুন, বিশ্রাম করুন, তাহার পর—

রামতনু। কথা না বলিয়া কিছুই করিব না।

দারোগা। বেশ। আসুন তবে—

তিনজনে একটি ঘরে গিয়া প্রবেশ করিলেন।

রামতনু। গদাধর তুমিই প্রশ্ন কর।

গদাধর। আচ্ছা, রাম, তুমি ঘুষ লও?

দারোগা। লই বই কি, না লইলে চাকরি থাকে না। উহাই আজকাল নিয়ম।

গদাধর। কি রকম?

দারোগা। এই দেখুন না আজকাল আইন করিয়া বিহার হইতে বাঙ্গলা-দেশে লবণ পাঠানো নিষিদ্ধ হইয়াছে। বাঙ্গলাদেশের লোক লবণ খাইবেই, বিহারের ব্যবসায়ীরাও লবণ বিক্রয় করিবেই। সুতরাং প্রতিদিন নৌকা করিয়া হাজার হাজার মণ লবণ পাঠানো হইতেছে। আমি আমার এলাকায় ঘাটে ঘাটে পুলিশ মোতায়েন করিয়া নৌকাগুলি ধরিতেছি এবং মণ পিছু এক টাকা করিয়া আদায় করিতেছি। ইচ্ছা করিলে বেশিও লইতে পারিতাম। লই নাই। ইহাতেই আমার দৈনিক গড়ে এক হাজার হইতে দেড় হাজার টাকা আয় হইতেছে। কিছুটা উপর-ওয়ালাদের দিতে হয়। বারান্দায় যাহারা বসিয়া খাতাপত্র লিখিতেছে তাহারা এই সবেরই হিসাবপত্র করিতেছে।

সব টাকাটা আমি লই না। দেশের আজকাল দুর্দিন, কিছু টাকা আমি এখানকার গরীবদের দিই, অবশ্য মজুরি হিসাবে। যে কোনও একটা অজুহাতে তাহাদের নিযুক্ত করিয়া মোটা মজুরি দিই। এখানকার সমস্ত জঙ্গল, পুষ্করিণী পরিষ্কার করাইব মনস্থ করিয়াছি। আজ একটা খ্যামটা নাচের দল আসিয়া আমাকে ধরিয়াছে। দেশের এই দুর্দিনে তাহাদের নাকি অত্যন্ত দুরবস্থা হইয়াছে। আজ রাত্রে তাহাদের নাচিতে বলিয়াছি। আমার হাত দিয়া যে যতটা পাইয়া যায় যাক।

গদাধর। ইহাদের সকলকে খাইতে দাও?

দারোগা। অনেক চোরাই চাল আটক করিয়াছি তাহাই খাইতে দিই। চালগুলো পচাইয়া কি হইবে?

রামতনুর চক্ষু অগ্নিবর্ষণ করিতেছিল।

রামতনু। কিন্তু এসব কি অন্যায় নহে?

দারোগা। খুবই অন্যায়। কিন্তু—

রামতনু। তুমি পাষণ্ড!

দারোগা। খুব সম্ভব।

গদাধর গলা ঝাঁকারি দিলেন।

গদাধর। আসল কথাটি বলি শোন। বেশি মজুরির লোভে আমাদের সমস্ত চাকর তোমার কাছে চলিয়া আসিয়াছে। আমাদের সংসার অচল।

দারোগা। আমি যতদিন আছি ভাবনা নাই। কে কে আপনাদের চাকর দেখাইয়া দিন তাহারা এখনই আপনাদের সঙ্গে ফিরিয়া যাইবে। মজুরি আমিই দিব।

রামতনু। কিন্তু এরকম করিলে—

দারোগা। [করজোড়ে] আপনারা গুরুজন, আপনাদের সহিত তর্ক করিতে আমি অপারগ। বাক্-বিতণ্ডা আমি করিব না।

॥ তিন ॥

ভূরিভোজনান্তে রামতনু ও গদাধর যখন পাল্কিযোগে গৃহাভিমুখে রওনা হইলেন তখন সন্ধ্যা আসন্ন। গরুরাও ধূলি উড়াইয়া গোহালে ফিরিতেছিল। পাল্কির পিছনে এক হাঁড়ি দই, এক কলসী দুধ এবং একটি প্রকাণ্ড মাছ লইয়া ফৈজু, ছেদি ও বানার্সি আসিতেছিল।

পাল্কির ভিতর রামতনু ও গদাধর নির্বাক হইয়া বসিয়াছিলেন।

উপকরণ-সংগ্রহ (৪)

দাঙ্গা বাধিয়া যাওয়াতে একটু মুশকিল হইল। স্থূলকায় গদাধর ক্ষীণকান্তি রামতনু উভয়েই চিন্তা করিতে লাগিলেন, প্রাণ তুচ্ছ করিয়া এ অবস্থায় পথে পথে ঘুরিয়া বেড়ানো সমীচীন কি-না। গদাধর গোঁফের ভিতর অঙ্গুলি চালনা করিতেছিলেন এবং রামতনু গদাধরের মুখের দিকে চাহিয়া ললাটদেশ কুঞ্চিত হইতে

কুঞ্চিততর করিতেছিলেন। উভয়সংকটে পড়িলে রামতনু ইহাই করিয়া থাকেন। রামতনু বুঝিতেছিলেন যে প্রাণের ভয়ে কর্তব্যকর্ম হইতে বিরত হওয়া মহাপাপ। কিন্তু ভয় সত্যই করিতেছিল এবং অকপটে তাহা প্রকাশ করিতেও পারিতেছিলেন না। গদাধরের নিকটে খেলো হওয়া অসম্ভব। বরাবর তাহার কাছে নিজেকে তিনি নির্ভীক প্রাণ-তুচ্ছকারী কর্মী রূপে পরিচিত করিয়াছেন।

গদাধরের প্রকৃত মনোভাব জানিবার জন্য রামতনু অবশেষে একটি টোপ ফেলিলেন।

রামতনু। শ্রমিক-চরিত্রের একটি দিক হয়তো অপ্রত্যাশিতভাবে খুলিয়া গিয়াছে। এ সুযোগ কি পরিত্যাগ করা উচিত?

গদাধর টোপ গিলিলেন না। কোন উত্তর না দিয়া গোঁফে আঙুল চালাইয়া যাইতে লাগিলেন।

রামতনুর কোটরস্থ অক্ষিযুগল হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছুটিল।

রামতনু। তুমি কি মনে কর না, এই দাঙ্গার পরিপ্রেক্ষিতে শ্রমিক-জীবনের একটা নূতন দিক দেখা যাইবে? তাহাদের এই দাঙ্গা-উন্মত্ত রূপটা কি তুচ্ছ করিবার মতো? রাস্তায় রিকশা নাই, কুলি নাই, বাজারে মাছ নাই, তরকারি নাই। উপর্যুপরি নিরামিষ আহার করিয়া জীবনে বিতৃষ্ণা আসিয়া গিয়াছে এবং এ সকলের কারণ কি শ্রমিকদের দাঙ্গা-লোলুপতা নয়?

গোঁফের ভিতর গদাধরের চলমান অঙ্গুলিদ্বয় থামিয়া গেল।

গদাধর। শ্রমিকেরা দাঙ্গা করিতেছে না।

রামতনু। [বিস্মিত] কাহারা করিতেছে তবে?

গদাধর। ধনিকরা। [সহসা আবেগ-কম্পিত-কণ্ঠে] ধনিকের হিংসা-লালসার বহ্নিতে শ্রমিকেরা এতদিন ধীরে ধীরে পুড়িতেছিল, এবার হু হু করিয়া পুড়িয়া যাইতেছে। ভাই রামতনু, ভুল করিও না, শ্রমিকেরা ইন্ধন মাত্র। চিন্তা কর।

চিন্তা করিবার অবসর কিন্তু পাওয়া গেল না।

"হুজুর গেট খোলিয়ে···" উচ্চকণ্ঠে নিঃসৃত এই আবেদনে উভয়েই ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলেন লম্বা-লাঠি-ঘাড়ে নাক-বসা ভজুয়া গেটের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার পিছনে বিরাট মোট মাথায় লইয়া নানা বয়সের বালক-বালিকা। কাহারও হাতে খনুন্তা কাহারও হাতে বঁটি, কাহারও হাতে কুঠার।

গদাধরের মুখ শুকাইয়া গেল। রামতনুর তালুও।

"কি মাংতা হ্যায়···" ক্ষীণ কণ্ঠে গদাধর প্রশ্ন করিলেন।

"গেট খোল দিজিয়ে।"

বাড়ি রামতনুর। সে বাড়ির গেট খুলিবার অধিকারও স্বভাবতঃই রামতনুর। সুতরাং গদাধর রামতনুর মুখের দিকে তাকাইলেন। ব্যাপারটার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া রামতনুর ভ্রূ-যুগল আরও কুঁচকাইয়া গেল। কয়েক দিন পূর্বেই ইহার বাড়ির পিছনের গাছে তিনি চড়িয়াছিলেন। ব্যাটা হয়তো এই সুযোগে প্রতিশোধ লইতে আসিয়াছে। তাঁহার ইচ্ছা করিতেছিল সটান উঠিয়া ঘরে ঢুকিয়া খিল বন্ধ করিয়া দিতে। গদাধর না থাকিলে হয়তো তাহাই করিতেন। কিন্তু চরিত্রের সামান্যতম দুর্বলতার জন্য যে গদাধরকে সর্বদা তিনি যৎপরোনাস্তি ভর্ৎসনা করিয়া থাকেন

তাহার সম্মুখে এমন ভীরুতা প্রকাশ করা অপেক্ষা ভজুয়ার লাঠির তলায় মাথা পাতিয়া দেওয়া তাঁহার নিকট সহজ বলিয়া মনে হইল। তবু মনে বল পাইতেছিলেন না। কিন্তু একটা কাণ্ড ঘটিয়া যাওয়াতে বল পাইলেন। হঠাৎ প্রতাপাদিত্য হইতে শুরু করিয়া সুভাষচন্দ্র পর্যন্ত বাঙালী বীরবৃন্দের কাহিনী নিমেষ-মধ্যে তাঁহার মস্তিষ্কটাকে যেন ঝড়ের বেগে নাড়া দিয়া গেল। তিনি ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলেন গদাধর তখনও স্থিরদৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া আছেন। আর কালবিলম্ব না করিয়া তিনি উঠিয়া পড়িলেন এবং দৃঢ়পদবিক্ষেপে অগ্রসর হইয়া অকম্পিত হস্তে গেট খুলিয়া দিলেন।

ভজুয়া লাঠি মারিল না।

উপরন্তু সে যাহা বলিল তাহাতে রামতনুর চিত্ত বিগলিত হইয়া গেল। তাহার বাড়ির নিকটেই মুসলমান বস্তি। তাহারা রাত্রে যদি অতর্কিতে আক্রমণ করে এই ভয়ে ভজুয়া তাহার পুরাতন মনিবের বাড়িতে আশ্রয় লইতে আসিয়াছে। সপরিবারে আসিয়াছে, সমস্ত জিনিসপত্র লইয়া। রামতনু খুশি হইলেন। ভজুয়া চোর, তাড়ি খায়, উপদংশ-জর্জরিত—এ সবই রামতনু জানেন তবু খুশি হইলেন। গদাধরের অন্তরেও পুলক জাগিল, কারণ বাড়ির বাহিরে পদক্ষেপ না করিয়াও নানারূপ উপকরণ আয়ত্তের মধ্যে আসিয়া গেল।

দিন দুই মন্দ কাটিল না।

গদাধর লক্ষ্য করিলেন ভজুয়ার কন্যা হিরিয়ার রোজ জ্বর হয়, পেটে প্লীহা বাড়িয়াছে। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, পাড়ার ডাক্তারবাবুটি করুণা-পরবশ হইয়া বিনামূল্যে যদিও তাহার চিকিৎসার ভার লইয়াছিলেন, কালাজ্বরের দুই একটি ইনজেকশনও দিয়াছিলেন কিন্তু তথাপি হিরিয়া তাঁহার কাছে আর যায় না। কারণ অন্য কিছু নয়, সুইয়া (ইনজেকশন) লইতে তাহার বড় ভয় করে। রামতনু তাহাকে নির্ভয় করিবার জন্য ভাংগা হিন্দীতে অনেক কথা বলিলেন, হিরিয়া ঘাড় বেঁকাইয়া মুচকি হাসিতে হাসিতে সব শুনিল, কিন্তু গদাধর এবং রামতনু উভয়েই হৃদয়ংগম করিলেন যে ও কিছুতেই ইনজেকশন লইবে না। মরিয়া যাইবে, তবু লইবে না। গদাধর আর একটা জিনিসও লক্ষ্য করিলেন। ইহাদের চুল দাঁত চোখ চামড়া কাপড় জামা তো নোংরা বটেই, ভাষাও অত্যন্ত নোংরা। মা মেয়েকে যে ভাষায় গালি দিতেছে, এমন কি, যে ভাষায় আদরও করিতেছে তাহা লেখা যায় না। সমস্তই কাঁচা খিস্তি, অনেক ক্ষেত্রে যদিও ব্যাকরণ-সম্মত সমাসবন্ধ। এ বিষয়ে রামতনুর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে হঠাৎ তিনি বলিলেন—"তোমার কাছে যাহা অশ্লীল মনে হইতেছে উহাদের কাছে সেটা স্বাভাবিক, অশ্লীল নয়।" রামতনুর দিকে আড়চোখে একবার চাহিয়া গদাধর থামিয়া গেলেন। রামতনুও দুইটি ঘটনা লক্ষ্য করিয়াছিলেন তাহা গদাধরকে 'নোট' করিয়া লইতে বলিলেন। প্রথম—ভজুয়ার বউ কাল তাঁহার বাথরুমে ঢুকিয়া তাঁহার সাবান ব্যবহার করিয়া স্নান করিয়াছে। দ্বিতীয়—হিরিয়ার রুক্ষকেশ সহসা তেল-জবজবে হইয়া উঠিয়াছে যে-তৈল-সহযোগে, তাহা তাঁহারই কেশরঞ্জন তৈল। ভজুয়ার অবশ্য এসব বিষয়ে লক্ষ্য নাই। সে একটি খুরপি লইয়া হাতা পরিষ্কারের কাজে লাগিয়া গিয়াছে এবং প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যায় রামতনুকে সেলাম করিতেছে। গদাধরকেও। কিছুক্ষণের জন্য মাঝে সে

বাহিরে যায় এবং দাঙ্গার লোমহর্ষণ খবর সংগ্রহ করিয়া আনে। এইভাবে দিন দুই মন্দ কাটিল না।

তৃতীয় দিন সকালে যাহা ঘটিল তাহাতে রামতনুর চিন্তা আবার হঠাৎ সপ্তমে চড়িয়া গেল। উপর্যুপরি কয়েকদিন নিরামিষ আহার করিয়া তিনি দুর্বল বোধ করিতেছিলেন। প্রতিবেশী বকুবাবুর কাছে সংবাদটি পাইয়া তিনি আরও দুর্বল বোধ করিতে লাগিলেন।

বকুবাবু প্রাতঃকালে আসিয়া বলিলেন, "ভজুয়াকে আশ্রয় দিয়া আপনি ভুল করিয়াছেন। হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার সুযোগ লইয়া এইবার শ্রমিকেরা বিদ্রোহ করিবে শুনিতেছি। আমাদের মতো পেটি বুর্জোয়াদের ঘরে প্রথমে উহারা পূর্ব পরিচয়ের সুযোগে ঢুকিবে, তাহার পর হঠাৎ একদিন একযোগে আক্রমণ করিবে।"

খবরটি বলিয়া বকুবাবু চলিয়া গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল ভজুয়া নাই। সমস্ত দিন আসিল না। সন্ধ্যায় গদাধরের দিকে রামতনু বিষণ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন।

রামতনু। সমস্ত দিন যখন আসিল না তখন গতিক খারাপ। তুমি আজ রাত্রে আমার কাছে শুইবে কি?

গদাধর। বল তো শুইতে পারি।

সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ়তর হইয়াছে। রামতনু ও গদাধর মুখোমুখি বসিয়া আছেন। রামতনুর ঠাকুর ভাতে-ভাত নামাইয়া আসিয়া রামতনুকে বলিল—"এখনই খাইবেন কি?"

"থোড়া ঠহর যাইয়ে ঠাকুর জি—"

বারান্দায় ভজুয়ার কণ্ঠস্বর শুনিয়া রামতনু চমকাইয়া উঠিলেন। গদাধরের আঙ্গুলিদ্বয় গুম্ফ মধ্যে অনড় হইয়া গেল।

ঠাকুর আগাইয়া গিয়া প্রশ্ন করিল—"কি বলছ?"

কাচুমাচু ভজুয়া হিন্দি ভাষায় যাহা বলিল তাহার সার-মর্ম এই যে, সে দুই দিন হইতে লক্ষ্য করিতেছিল যে, মৎস্যাভাবে বাবুর খাওয়া হইতেছে না। তাই সে একটি ছিপ যোগাড় করিয়া নিকটবর্তী খালটায় মাছ ধরিতে গিয়াছিল। সৌভাগ্যক্রমে একটি রোহিত ধরা পড়িয়াছে। ঠাকুর যেন সেটির ঝোল বানাইয়া তবে বাবুকে খাইতে দেয়। সে মাছটি এখনই কুটিয়া দিতেছে। কুঞ্চিত-ভ্রূ রামতনু গদাধরের দিকে চাহিলেন। গদাধরের চক্ষু দুইটি হাস্যোদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

উপকরণ-সংগ্রহ (৫)

"ভুজঙ্গী নামটাই খুব খারাপ।"

কথাটা বলিয়া রামতনু গদাধরের দিকে চাহিলেন এবং কোনও উত্তর না পাইয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন। গদাধর অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া কথাটা প্রণিধান করিতে লাগিলেন। সহসা কোনও উত্তর দিলেন না। কিন্তু কিছুক্ষণ প্রণিধান করিবার পরও দেখিলেন বিশেষ সুবিধা হইতেছে না। কথাটা শুনিবামাত্র তাহার বিবেক যে কথা

বলিয়াছিল, এতক্ষণ প্রণিধান করিবার পরও সেই কথাই বলিতেছে। যাহা বলিতেছে তাহা সাহস করিয়া রামতনুকে বলা যায় না। বিবেকের বিরুদ্ধাচরণ করাও দুরূহ কাজ। সুতরাং মোলায়েম করিবার চেষ্টা করিলেন।

গদাধর। ভুজঙ্গী নামটা হয়তো শ্রুতিমধুর নয়, কিন্তু চাকরের নাম শ্রুতিমধুর না-ই বা হইল ভাই, কাজ লইয়া কথা।

রামতনু। কাজের প্রসঙ্গেই কথাটা বলিয়াছি। ইতিপূর্বে আমি দুইজন ভুজঙ্গীর সংস্রবে আসিয়াছি। দুইজনেই দাগা দিয়াছে। প্রথমটি ভুজঙ্গী মিশ্র। লোকটা তিলক ফোঁটা কাটে, লম্বা টিকি আছে, ভাবিয়াছিলাম ভাল লোকই হইবে। আমার চৌকিটি মেরামত করিবার জন্য নিযুক্ত করিলাম। করিবামাত্রই অগ্রিম টাকা চাহিয়া বসিল। বলিল, জিনিসপত্র কিনিতে হইবে। অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া দিলাম তাহাকে দশটা টাকা। টাকাটি হস্তগত করিয়াই ডুব মারিল। দুই দিন দেখা নাই। তৃতীয় দিনে আসিল একেবারে চিতাবাঘটি সাজিয়া। তাহার পর এমন ভাবে চৌকিটি মেরামত করিল যে খড়ম লইয়া তাহাকে তাড়া করিতে বাধ্য হইলাম। ক্রোধে এমন আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছিলাম যে মুক্তকচ্ছ হইয়া হোঁচট খাইতে হইল। যন্ত্রপাতি ফেলিয়া সেই যে পলাইয়াছে এখনও পর্যন্ত তাহার পাত্তা নাই। দ্বিতীয় ভুজঙ্গীকে তো তুমি দেখিয়াছ। যতদিন আমার কাছে ছিল ঘুমানো ছাড়া দ্বিতীয় কাজ করে নাই। যখন ঘুমাইত না, তখন বসিয়া ঢুলিত কিংবা হাই তুলিত।

গদাধর। সে বেচারা যে রুগ্ন ছিল; পরে তাহা তো প্রমাণিত হইল। ডাক্তারবাবু পরীক্ষা করিয়া বলিলেন উহার পেটে ক্রিমি আছে। উহার আলস্যের কারণ ভুজঙ্গী নাম নয় ভাই, হুক ওয়ার্ম।

রামতনু যুক্তির নিকট চিরকাল নতমস্তক। চুপ করিয়া রহিলেন। তাহার পর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটি দিয়া দক্ষিণ নাসারন্ধ্রটি চাপিয়া বাম নাসারন্ধ্র-পথে সশব্দে বায়ু নিঃসারিত করিয়া ফেলিলেন। মাথা কিন্তু সাফ হইল না। কারণ ইহা করিবার পরও দ্বিতীয় ভুজঙ্গীর বিরুদ্ধে তিনি নূতন কোনও যুক্তি সংগ্রহ করিতে পারিলেন না। কিন্তু একটি সুফল ফলিল। প্রথম ভুজঙ্গীর বিরুদ্ধে আর একটি কথা তাঁহার মনে পড়িয়া গেল। এটি এতক্ষণ মনে পড়ে নাই।

রামতনু। পরে খোঁজ লইয়া জানিয়াছি ভুজঙ্গী মিশ্র না কি টেটনের বউকে লইয়া সরিয়াছে।

গদাধর। হয়তো সে-ও অসুস্থ। কোনও মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসক পরীক্ষা করিলে হয়তো তাহার মনের ভিতরও কোনও ক্রিমি আবিষ্কার করিতে পারিবেন। [সহসা আবেগ ভরে] ভাই রামতনু, উহারা সকলেই অসুস্থ। উহাদের উপর রাগ করিও না।

রামতনু। রাগের কথা নয় গদাই, অভিজ্ঞতার কথা।

গদাধর। মাত্র দুইটি ভুজঙ্গী দেখিয়া যে মূল্যবান অভিজ্ঞতা তোমার হইয়াছে আজকালকার ভৃত্যসংকটের দিনে যদি কেবল মাত্র তদ্দ্বারাই তুমি চালিত হইতে চাও তোমার মনের জোরের আর একটি অকাট্য প্রমাণ পাইব।

এই পর্যন্ত বলিয়া গদাধর সহসা থামিয়া গেলেন। “কিন্তু ইহা তোমার বুদ্ধির সূক্ষ্মতার নিদর্শন হইবে না”—এই বাক্যটিও তাঁহার জিহ্বাগ্রে আসিয়া পড়িয়াছিল

কিন্তু জোর করিয়া তিনি আত্মসম্বরণ করিয়া ফেলিলেন। সামান্য ব্যাপার লইয়া বন্ধুর হৃদয়ে এতটা আঘাত দিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না।

গদাধরের যে ছাত্রটি দারোগা হইয়া আসাতে ইঁহাদের ভৃত্য সমস্যার সমাধান হইয়াছিল, তিনি সম্প্রতি বদলি হইয়া অন্যত্র চলিয়া যাওয়াতে সে সমস্যা পুনরায় গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে। রামতনুর বিপদ আরও বেশি। কারণ খাঁটি দুধ খাইবার লোভে তিনি গরুও পুষিয়া থাকেন। তাঁহার গোয়ালা চাকরটিও কয়েকদিন হইতে অন্তর্ধান করিয়াছে। কিছুক্ষণ ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া থাকিয়া রামতনু অবশেষে একটি বিষয়ে কৃতনিশ্চয় হইলেন। অদৃষ্টে যাহাই থাকুক গদাধর-পরামর্শ-ভেলা সম্বল করিয়াই তিনি অকুল সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িবেন। তাঁহার মনে হইল ইহা ছাড়া গত্যন্তর নাই।

রামতনু। স্পষ্ট করিয়া বল। এই ভুজঙ্গীকে আমি বাহাল করিব কি না?

গদাধর। আমার মতে করা উচিত। এ লোকটা জাতিতে গোয়ালা, তোমার গরুর সেবাও করিতে পারিবে।

রামতনু। বেশ! তোমার পরামর্শ বরাবরই শুনি, এবারও শুনিব।

একমাস কাটিয়া গেল।

একদিন প্রভাতে সহসা রামতনু পুনরায় গদাধরের বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

রামতনু। গদাধর, তুমি একটা জিনিস লক্ষ্য করিয়াছ কি?

গদাধর। কি বল।

রামতনু। আমি রোগা হইয়া যাইতেছি। এই দেখ—

রামতনু নিজের কোট কামিজ গেঞ্জি পটাপট খুলিয়া ফেলিলেন। গদাধর দেখিলেন সত্যই কৃশ রামতনু কৃশতর হইয়াছেন।

গদাধর। হ্যাঁ রোগা হইয়াছ। হেতুটা কি?

রামতনু। ভুজঙ্গীকে দেখ তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবে।

ভুজঙ্গীকে রামতনু সঙ্গে করিয়াই আনিয়াছিলেন। ডাকিতেই সে ভিতরে প্রবেশ করিল। এতক্ষণ সে বাহিরে বারান্দায় দাঁড়াইয়াছিল।

রামতনু। [ভুজঙ্গীকে] জামা খোল্।

ভুজঙ্গী জামা খুলিল। গদাধর সবিস্ময়ে দেখিলেন ভুজঙ্গী মোটা হইয়াছে।

রামতনু। [ভুজঙ্গীকে] এইবার বাড়ি যা।

ভুজঙ্গী চলিয়া গেল।

গদাধর। ভাই রামতনু, তোমার দেহের মেদমাংস ভুজঙ্গীর দেহে গেল কি করিয়া!

রামতনু। প্রথমেই তোমাকে বলিয়াছিলাম ভুজঙ্গী নামটা সুবিধার নয়, ও নামের চাকর আমি রাখিতে চাহি না, কেবল তোমার অনুরোধেই বিবেকবাক্য লঙ্ঘন করিয়াছিলাম। ভুজঙ্গী এখন কি করিতেছে জান?

গদাধর। বল।

রামতনু। প্রত্যহ গভীর রাত্রে উঠিয়া আমার গাইটি দুহিয়া দুগ্ধপান করিতেছে। সকালে সুতরাং দুধ হয় না। কারণ জিজ্ঞাসা করাতে বলিল বাছুর বড় হইয়া গিয়াছে।

আমার কিন্তু কেমন যেন সন্দেহ হইল। রাত্রি জাগরণ করিয়া একদিন পর্যবেক্ষণ করিলাম। দেখিলাম ভুজঙ্গী দুধ দুহিয়া খাইতেছে। তোমার বাক্য স্মরণ করিয়া ক্রোধ দমন করিয়া রাখিলাম। [তর্জনী আস্ফালনপূর্বক] হাঁ, কেবল তোমার বাক্য স্মরণ করিয়া। পরদিন প্রভাতে উঠিয়া চিন্তা করিলাম কি করা উচিত। অনেকক্ষণ চিন্তার পর স্থির করিলাম, বাছুরটা সরাইয়া রাখিব। তাহাই রাখিলাম এবং রাত্রি জাগরণ করিয়া পুনরায় ভুজঙ্গীর গতিবিধি লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। যাহা আবিষ্কার করিয়াছি তাহা যুগপৎ চমকপ্রদ ও আতঙ্কজনক।

গদাধর। কি!

রামতনু। দেখিলাম ভুজঙ্গী বাছুরের মতো বাঁটে মুখ লাগাইয়া দুধ খাইতেছে! আমার গাইটি কত শান্ত তাহা তুমি তো জান, সে কোনও বাধা দিতেছে না।

গদাধর গোঁফে আঙুল চালাইতে লাগিলেন।

রামতনু। [তিক্ত হাসি হাসিয়া] ভুজঙ্গী নামের চাকর এই জন্যই আমি রাখিতে চাহি নাই। তুমিই আমাকে এই প্যাঁচে ফেলিয়াছ, ভুজঙ্গী নামটাই খারাপ।

গদাধর। ভাই রামতনু, যদি অভয় দাও, তাহা হইলে তোমাকে একটি ঘটনা বলি।

রামতনু। বল।

গদাধর। আগে জিনিসটা দেখ।

গদাধর উঠিয়া গেলেন ও পাশের ঘর হইতে অতি কষ্টে একটি ঝুড়ি বহিয়া আনিলেন। ঝুড়ির মুখটি কাপড় দিয়া ঢাকা।

গদাধর। ঢাকা খুলিয়া দেখ।

রামতনু ঢাকা খুলিয়া দেখিলেন ঝুড়িটি ইট পাটকেলে পরিপূর্ণ!

রামতনু। ইহার অর্থ কি!

গদাধর। অর্থ আজ বুঝিয়াছি। আমার ভগ্নিপতির একটি বাগান আছে। তিনি আমার জন্য কিছু ল্যাংড়া আম পাঠাইয়াছিলেন। ফরসা-জামা-কাপড়-পরা একজন ভদ্রলোকের হাতেই পাঠাইয়াছিলেন। ভদ্রলোক আমার পরিচিত! তিনি ঝুড়িটি নামাইয়া দিয়াই চলিয়া গেলেন। খুলিয়া আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। আজ এইমাত্র ভগ্নিপতির পত্র আসাতে ব্যাপারটা পরিষ্কার হইয়াছে। ভদ্রলোকটি ভগ্নীপতিরও তেমন পরিচিত লোক নন। তিনি এই দিকে আসিতেছিলেন বলিয়া তাঁহার হাতে ঝুড়িটি দিয়াছিলেন! ভদ্রলোকের নাম কি শুনবে?

রামতনু। কি বল।

গদাধর। ভুজংগী নয়, বুদ্ধদেব।

পরী

মাথার উপর পাখাটা বনবন করিয়া ঘুরিতেছিল। কুমার সুমিত্রানন্দনের অবিন্যস্ত তৈলহীন কেশরাশি হাওয়ার আবর্তে আরও অবিন্যস্ত হইয়া পড়িতেছিল। ঠিক পাশেই মর্মর-নির্মিত তেপায়ার উপর রক্ষিত সুরাপাত্রের ফেনবুদ্বুদমালাও ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িতেছিল সে হাওয়ার বেগে। কুমার সুমিত্রানন্দন কম্পিত হস্তে সুরাপাত্রটি

তুলিয়া আর এক চুমুক পান করিলেন। তাহার পর সম্মুখের দেওয়ালে বিলম্বিত ছবিটির দিকে নির্নিমেষে চাহিয়া রহিলেন খানিকক্ষণ। মদিরাক্ষী তরুণীর ছবি। চোখের দৃষ্টিতে স-কৌতুক হাসি ফুটিয়া রহিয়াছে। কুমার আর এক চুমুক সুরা পান করিলেন। তাঁহার বিহ্বল চোখের দৃষ্টি আবেশময় হইয়া উঠিল। ক্ষণকাল পরে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া তিনি দ্বারের দিকে চাহিলেন।

কে, নিখিলবাবু না কি?

হ্যাঁ

স-সংকোচে প্রৌঢ় ম্যানেজার নিখিলনাথ প্রবেশ করিলেন।

সব ঠিক হয়ে গেল?

হ্যাঁ। বাড়িটা বাঁধা রাখতে হবে, তবে তিনি টাকা দেবেন বলেছেন!

মাত্র এক লক্ষ টাকার জন্যে দশ লক্ষ টাকা দামের বাড়িটা বাঁধা রাখতে হবে?

ম্যানেজার চুপ করিয়া রহিলেন।

কুছ পরোয়া নেই। কাগজপত্তর ঠিক করুন। দেরি করবেন না।

সব ঠিক ক'রে রেখেছি, আপনি সই ক'রে দিলেই হবে খালি।

বেশ, রেখে যান আপনি। আমি সই ক'রে দিচ্ছি একটু পরে। হাতটা এখন স্টেডি নেই।

দলিলটি লইয়া নিখিলনাথ বাহির হইয়া গেলেন।

পুনরায় ছবিটির দিকে চাহিয়া সুমিত্রানন্দন আপন মনে বলিলেন, তোমার দাম দশ লক্ষ টাকার চেয়েও বেশি—ঢের বেশি।

বাহিরে পদশব্দ হইল। কুমার সুমিত্রানন্দন আবার দ্বারের দিকে চাহিলেন।

নিখিলবাবু না কি?

না, আমি।

ও, বীরু! এস, এস।

বয়স্য বীরেন্দ্রনাথ সোফায় বসিতে বসিতে বলিলেন, তোমার পরীর খবর কি?

আকাশলোক থেকে আজই নেবে আসবে মনে হচ্ছে।

মনে হওয়ার কারণ?

হীরের হারটা আজই কিনে দেব।

লক্ষ টাকা খরচ ক'রে! অত টাকা পেলে কোথা? তোমার ব্যাংক-ব্যালান্স তো—

বাড়িটা বাঁধা রেখে টাকা ধার করছি।

ও।

বীরেন্দ্রনাথ স্মিতমুখে চুপ করিয়া রহিলেন। ক্রমশ তাঁহার চোখের দৃষ্টিতেও একটি সকৌতুক হাসি ফুটিয়া উঠিল।

কুমার সুমিত্রানন্দন তাঁহার চোখের দিকে চাহিয়াছিলেন। বলিলেন, তোমার মনে কিছু একটা জেগেছে বুঝতে পারছি। ব'লে ফেলো। তবে মর‍্যাল লেকচার দিও না।

বীরেন্দ্রনাথ ইতিহাসের ছাত্র।

না, মর‍্যাল লেকচার দেব না। আমি খুশিই হয়েছি।

তোমার খুশি হবার কারণ?

মানব নামক পশুর প্রগতি দেখে।

কি রকম, খুলে বল, বুঝতে পারলাম না।

সুমিত্রানন্দন আর এক চুমুক সুরাপান করিয়া বলিলেন, আমার তো ধারণা কিস্‌সু হয় নি। হা-হা-হা-হা—

অট্টহাস্য করিতে করিতে সহসা থামিয়া গেলেন সুমিত্রানন্দন।

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, কি রকম প্রগতি হয়েছে, শুনি।

তা হ'লে একটা গল্প শোন। আর কিছু নয়, ব্যাপারটা একটু নীট হয়েছে।

বল।

প্রাগৈতিহাসিক যুগের এক রাজকুমার যে রমনীটির প্রেমে পড়েছিলেন, তাঁর অনুগ্রহ লাভ করবার জন্যে কি করেছিলেন জান ?

কি ?

দশ হাজার মানুষকে বলিদান দিয়েছিলেন।

কেন ?

তাঁর প্রেয়সীর সখ হয়েছিল লোধ্রফুলের রেণু মাখতে। তিনি বলেছিলেন লোধ্রফুলের একটি বাগান ক'রে দাও আমাকে। রাজা কিন্তু বহু চেষ্টা ক'রেও লোধ্রফুলের একটি চারাও বাঁচাতে পারলেন না তাঁর জমিতে। হয়তো সে জমিতে লোধ্রফুলের উপযোগী সার ছিল না। তাঁর পুরোহিত তাঁকে বললেন যে, ওই জমিতে যদি দশ হাজার মানুষ বলিদান দিতে পার, তা হ'লে লোধ্রফুলের চারা বাঁচবে। রাজার অসংখ্য দাস ছিল। পরদিনই দশ হাজার মানবপশুর রক্তে সে জমিতে কাদা হয়ে গেল। ব্যাপারটা একটু স্থূল, এই আর কি। এখনকার ব্যাপার একটু সূক্ষ্ম হয়েছে। ওই এক লক্ষ টাকা ওই মারোয়াড়ির ব্যাঙ্কে জমেছে হয়তো দশ হাজার লোকের বুকের রক্ত শোষণ ক'রেই, কিন্তু তার প্রকাশ হয়েছে ওই হীরের হারে।

সুমিত্রানন্দনের চোখের দৃষ্টিতেও কৌতুক ঝলমল করিয়া উঠিল।

এ ব্যাপারে মানব-পশুর বলিদান দেখতে পাচ্ছ না তুমি ?

পাচ্ছি, কিন্তু সে একটিমাত্র পশুর।

সুমিত্রানন্দন হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

তাহার পর বলিলেন, লোধ্রফুল কোথায় পাওয়া যায়, দেখেছো কখনও ?

না, দেখি নি। কালিদাসের কাব্যে পড়েছি। উজ্জয়িনীর আশে-পাশেই পাওয়া যায় সম্ভবত। আমি এখন চলি ভাই, সন্ধ্যেবেলা আসব আবার।

বীরেন্দ্র চলিয়া গেলেন। সুমিত্রানন্দন পরীর ছবির দিকে নির্নিমেষে চাহিয়া হাসিলেন একটু।

পরক্ষণেই ফোনটা বাজিয়া উঠিল।

কে, পরী ?···তোমার হার নিয়ে আজ যাচ্ছি সন্ধ্যের সময়···হ্যাঁ, বীরেন এখুনি এসেছিল। ভারি মজার একটা গল্প ব'লে গেল। শুনবে, ফোনটা ধ'রে থাক তা হ'লে—

সুমিত্রানন্দন গল্পটি আগাগোড়া বলিলেন। তাহার পর সহসা তাঁহার মুখভাব পরিবর্তিত হইয়া গেল।

সত্যি বলছ ? নিশ্চয়, যেমন ক'রে পারি যোগাড় করব।

ম্যানেজার নিখিলনাথ দলিলপত্র লইয়া প্রবেশ করিলেন।

নিখিলবাবু, টাকার আর দরকার নেই। আমি এখ্খুনি উজ্জয়িনী যাব। লোধ্রফুল যোগাড় করতে হবে। ফোন ক'রে এখ্খুনি বার্থ রিজার্ভ করুন।

নিখিলনাথ সবিস্ময়ে প্রভুর দিকে চাহিয়া রহিলেন।

গন্ধমূষিক শর্মার আত্মজীবনী

ঈজি-চেয়ারে শুয়ে চালের বাতা গুনছিলাম। আমি যে ঘরটিতে লেখাপড়া করি সেটির ছাদ পাকা নয়, সুতরাং কড়িকাঠ গোনবার সুযোগ নেই। অতিশয় বোকার মতো আমি আশা করছিলাম যে, ওই ঘুন-ধরা চালের বাতাগুলির মধ্যেই হয়তো কোনও গল্পের প্লট পেয়ে যাব। মিনিট কয়েক পরে কিন্তু ঘরের মধ্যে একটি নূতন ঘটনা ঘটাতে আমার চিত্ত বিক্ষিপ্ত হ'ল। দৃষ্টি বা মনকে আর চালের বাতায় নিবদ্ধ রাখতে পারলাম না। কোথা থেকে একটা ছুঁচো বেরিয়ে ঘরের মধ্যে কিচকিচ ক'রে বেড়াতে লাগল। শব্দে আর গন্ধে অস্থির হয়ে উঠলাম। চেয়ারের উপর পা-টা গুটিয়ে নিলাম ভাল ক'রে। আমার বন্ধু অমর সামান্য একটা ইঁদুরের কামড়ে মর-মর হয়েছিল মনে পড়ল। জ্বর হয়ে বুকে সর্দি ব'সে যায় আর কি বেচারা। ছুঁচো যদি কামড়ায় না-জানি কি কাণ্ড হবে! পা-টা ভাল ক'রে গুটিয়ে বসলাম! তার পরই আবার কপাটে ঠুকঠুক ক'রে আওয়াজ আরম্ভ হ'ল! কপাটে খিল বন্ধ ছিল। ভাবলাম কি আপদ, আজ আর লিখতে দেবে না দেখছি! ঠুকঠুক শব্দ সমানে চলতে লাগল। ছুঁচোটাই শব্দ করছে নাকি? কিন্তু একটু পরেই বুঝতে পারলাম, ছুঁচো নয়। বাইরে থেকে কেউ কড়া নাড়ছে। উঠে কপাটটা খুলে দিলাম। খুলে যা দেখলাম, তা সত্যিই অপ্রত্যাশিত। অপরূপ সুন্দরী দাঁড়িয়ে আছেন একজন। রাত-দুপুরে কে এল এ! মিঠু মজুমদার নামে যে মেয়েটি চিঠির পর চিঠি লিখে যাচ্ছে ক্রমাগত, সে-ই সশরীরে এসে হাজির হ'ল নাকি শেষ পর্যন্ত! আসবে ব'লে শাসিয়েছিল। মিঠু আমার লেখার একজন ভক্ত—সে যা লেখে তার কিয়দংশও যদি সত্য হয় তা হ'লে খুব প্রগাঢ় ভক্তই বলতে হবে; কিন্তু তবু এই রাত-দুপুরে বিনা আমন্ত্রণে সে আমার দ্বারস্থ হবে এতটা বাড়াবাড়ি ভক্তি কল্পনা করতে কুণ্ঠিত হচ্ছিলাম। কিন্তু আর আমার চিন্তা বেশী দূর অগ্রসর হতে পেল না। মহিলাটি সহাস্য দৃষ্টি তুলে নিজেই বললেন, অনেকক্ষণ থেকে কাতরভাবে ডাকছ, তাই এলাম।

অনেকক্ষণ থেকে তো মেধো চাকরকে ডাকছি এক পেয়ালা কফি দিয়ে যাবার জন্যে! আর কাউকে ডেকেছি ব'লে তো মনে পড়ছে না।

সভয়ে প্রশ্ন করলাম, কে আপনি?

আমি সরস্বতী। আমি আরও বিশেষ ক'রে এলাম আর একটা কারণে। এই পুজোর হিড়িকে তোমরা অনেকেই যা তা লিখছ। তাই ঠিক করেছি, তোমাদের লেখাগুলো একবার দেখে দেব। চল—

সরস্বতী দেবী ঘরে এসে ঢুকলেন এবং ঘরের এক কোণে একটা চেয়ারে গিয়ে বসলেন। আমার দিকে চেয়ে বললেন, আমার জন্যে তোমায় কিছু ব্যস্ত হতে হবে না। তুমি আপন মনে যা লিখতে চাও লিখে ফেল। লেখাটা শেষ হ'লে দেখে আমি ব'লে দেব, ছাপাবার উপযুক্ত হয়েছে কি না!

তার পর আমার দিকে চেয়ে একটু হেসে বললেন, আমি চেয়ারটা আর একটু কোণের দিকে নিয়ে যাচ্ছি। আমি সামনে বসে থাকলে হয়তো অন্যমনস্ক হয়ে পড়বে।

চেয়ারটা টেনে তিনি অন্ধকার কোণটায় অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আমি যে কি করব, কি বলব—কিছুই ভেবে পেলাম না। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম, তার পর নিজের চেয়ারটাতে গিয়ে বসলাম।

যে ছুঁচোটা কিচকিচ ক'রে ঘরময় ঘুরে বেড়াচ্ছিল তার শব্দটা বন্ধ হয়ে গেল হঠাৎ। গন্ধটা কিন্তু গেল না, বরং মনে হ'ল, সেটা যেন আরও নিবিড় হয়ে উঠেছে। তার পরই দেখতে পেলাম, ছুঁচোটা আমার টেবিলের উপর উঠে পিছনের দুই পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে আর সামনের পা দুটো জোড় ক'রে আমার দিকে চাইছে। ঠিক মনে হ'ল, যেন কোন প্রার্থী হাতজোড় ক'রে প্রার্থনা করছে কিছু। অদ্ভুত কাণ্ড! পর মুহূর্তে যা হ'ল, তা আরও অদ্ভুত। মানুষের ভাষায় কথা কইতে আরম্ভ করলে সে।

বলতে লাগল, আমি ছুঁচো নই, ছুঁচী। আমি সুবিখ্যাত গন্ধমূষিক শর্মার কনিষ্ঠা পত্নী কস্তুরী দেবী। ছুঁচো-সমাজে তিনিই প্রথম বিদ্রোহী, তিনিই প্রথম পৈতে নিয়েছেন, তিনিই প্রথম রাজনৈতিক আন্দোলন করেছেন, তিনিই প্রথম সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। এত বড় একজন মহাপুরুষের মহজ্জীবনী কি আপনারা প্রচার করবেন না? শুনেছি, আপনারা সুন্দরের উপাসক, মহানের পূজারী—

বিস্ময় সীমা অতিক্রম করেছিল। তবু যথাসম্ভব গাম্ভীর্য রক্ষা ক'রে বললাম, যা শুনেছেন তা ঠিক। শ্রীযুক্ত গন্ধমূষিক শর্মার জীবনীর উপকরণ যদি পাই, তা হ'লে তা নিশ্চয়ই ব্যবহার করব। কিন্তু উপকরণ পাব কোথা? আপনি সরবরাহ করবেন কি?

শ্রীমতী কস্তুরী মুচকি হেসে বললেন, (বিশ্বাস করুন, ছুঁচীর ছুঁচলো মুখের মুচকি হাসি সত্যিই মনোরম) আমি তাঁর জীবনের কতটুকু আর জানি! মাত্র দিন কুড়ি আগে তো ওঁর কাছে এসেছি। আমার আগে উনি অন্তত শ দুই ছুঁচীকে নিয়ে ঘর করেছেন। তারা হয়তো অনেক কিছু উপকরণ দিতে পারত আপনাকে। কিন্তু তাঁদের সে সব খেয়ালই হয় নি। আমি আধুনিকা, এসেই বুঝেছি যে উনি সাধারণ ছুঁচো নন, ওঁর জীবনী জনসমাজে প্রচার না করলে জনসমাজের প্রতিই অবিচার করা হবে।

কিন্তু সে জীবনীর উপকরণ পাই কি ক'রে?

উনি নিজেই বলবেন আপনাকে। প্রথম প্রথম উনি রাজি হচ্ছিলেন না। বলছিলেন—নিজের কথা, বিশেষ ক'রে নিজের প্রশংসা কি নিজের মুখে বলাটা ভাল দেখাবে? আমি তখন নজীর দেখালাম, কত বড় বড় লোক এ যুগে আত্মজীবনী লিখছেন। বর্তমান যুগে ওইটেই ফ্যাশন। ওতে দোষের কিছু নেই।

উনি রাজী হয়েছেন?

অনেক কষ্টে রাজী করিয়েছি। উনি যদি সব খুলে বলেন, তা হ'লে দেখবেন, কি অদ্ভুত ওঁর জীবন! অনেক বড়লোক শুনেছি নিজের শৈশব-জীবন বা কৈশোর-জীবন থেকে আত্মচরিত শুরু করেন। শ্রীযুক্ত গন্ধমূষিক যদি ইচ্ছে করেন, তা হ'লে

নিজের পূর্বজীবন থেকেই আরম্ভ করতে পারেন। কারণ পূর্বজীবনেরও প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি ওঁর চমৎকার মনে আছে। ওঁর বর্তমান জীবনও রোমাঞ্চকর। কি ক'রে একবার একটা নিষ্ঠুর সাপ ওঁকে প্রায় গিলে ফেলেছিল, কি ভাবে একবার এক গৃহস্থের 'মীট-সেফে' উনি বন্দী হয়েছিলেন, প্রকাণ্ড একটা দুধের কড়ায় পড়ে গিয়ে কি ক'রে হাবুডুবু খেতে খেতে শেষে উনি বাঁচেন—এ সব ঘটনা লিপিবদ্ধ করার মতো। উনি যদি প্রাণ খুলে সব বলেন আর আপনি যদি ভাল ক'রে লিখতে পারেন, আপনাদের সমাজে হৈ-হৈ প'ড়ে যাবে দেখবেন। ওঁর যৌবনজীবনও অনবদ্য। সবটা বোধ হয় খুলে বলবেন না উনি। কিন্তু একটুও যদি বলেন, দেখবেন, কি দুর্দমই না ছিল ওঁর যৌবন! এখনও তার রেশ আছে। আশা করি এটাকে আপনি নিছক যৌন-লালসা ব'লে ভুল করবেন না। এর মধ্যে প্রাণপ্রবাহের যে অস্থির চঞ্চলতা আছে তা আপনার মতো রসিকের দৃষ্টি এড়িয়ে যাবে না আশা করি। আর একটা জিনিসও আপনাকে ব'লে দিচ্ছি। ওঁর গলায় দেখবেন পৈতে রয়েছে, ওঁকে জিজ্ঞেস করলে উনি বলবেন যে একবার একটা জালে নাকি আটকে পড়েছিলেন, সেই জাল কেটে যখন পালিয়ে আসেন তখন ওই সুতোটুকু নাকি ওঁর গলায় আটকে থেকে গিয়েছিল। এই মিথ্যাভাষণটুকু উনি করবেন, কারণ উনি নিজের আধ্যাত্মিক জীবনের নিগূঢ় ইতিহাস প্রকাশ করতে চান না। আপনি কিন্তু বিশ্বাস করবেন না এ কথা, বুঝলেন।

ক্রমশই আমি কেমন যেন সম্মোহিত হয়ে পড়ছিলাম। বললাম, বেশ, নিয়ে আসুন তাঁকে।

আমার টেবিলের উপর ছোট যে বইয়ের শেলফটা ছিল, শ্রীমতী কস্তুরী দেবী তার পাশে অন্তর্হিত হলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হাজির হলেন শ্রীযুক্ত গন্ধমূষিক শর্মা। বেশ কেঁদো ছুঁচো একটা। তিনিও এসে পিছনের পা দুটিতে ভর দিয়ে দাঁড়ালেন এবং সামনের পা দুটি বুকের কাছে জোড় ক'রে মিটমিট ক'রে চাইতে লাগলেন আমার দিকে। গলার সুতোটি দেখতে পেলাম। আরও দেখলাম তাঁর একটি কান একটু মোড়া, গায়ের লোমও উঠে গেছে মাঝে মাঝে, মুখটা খুব বেশি ছুঁচলো নয়, একটু যেন ভোঁতা হয়ে গেছে।

বললাম, নমস্কার, আপনার আত্মজীবনী শুনব ব'লে অপেক্ষা করছি।

ক্ষণকাল ইতস্তত ক'রে গন্ধমূষিক বললেন, আমি ছুঁচো।

ব'লেই থেমে গেলেন তিনি। আমি আরও কিছু শোনবার আশায় চুপ ক'রে রইলাম। কিন্তু গন্ধমূষিক আর কিছু না ব'লে এদিক ওদিক চাইতে লাগলেন শুধু।

বললাম, বলুন।

আজ্ঞে, আমি ছুঁচো।

আবার থেমে গেলেন।

হ্যাঁ, বলুন।

আজ্ঞে, আমি ছুঁচো ছাড়া আর কিছু নই।

ব'লেই তিনি পট্ ক'রে শেলফের পাশে অন্তর্ধান করলেন। পর-মুহূর্তেই টেবিলের নীচে আবার কিচকিচ শব্দ শুনতে পেলাম, মনে হ'ল, কলহ শুরু হয়েছে। ক্ষণকাল প'রে তাও থেমে গেল।

উপরোক্ত ঘটনাটি লিপিবন্ধ ক'রে চুপ ক'রে ব'সে আছি, এমন সময় অন্ধকার কোণ থেকে দেবী সরস্বতী আবির্ভূতা হলেন আবার।

কই, দেখি ?

খাতাখানা এগিয়ে দিলাম। পড়তে পড়তে তাঁর মুখে মৃদু হাস্য ফুটে উঠল একটা। খাতাখানা ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, ছাপতে দিতে পার।

ছাপতে দেব ? কি আছে ওতে ?

একটা জিনিস অন্তত আছে।

কি ?

শ্রীযুক্ত গন্ধমূষিক শর্মা তাঁর আত্মজীবনীটি বেশ সংক্ষেপে বলেছেন। সমস্ত বক্তব্যটা খুব কম কথায় গুছিয়ে বলা মস্ত বড় একটা আর্ট। উনি যে একটি ছুঁচো ছাড়া আর কিছু নন—এই কথাটাই উনি ভ্যানর ভ্যানর ক'রে দশ হাজার পাতাতেও বলতে পারতেন; কিন্তু সে লোভ উনি সংবরণ করেছেন। আচ্ছা, আমি চললুম।

দেবী অন্তর্হিতা হলেন। আমি চুপ ক'রে ব'সে রইলাম।

দুই নারী

॥ এক ॥

আমাদের মধ্যে যে পশুটা সর্বক্ষণ উদ্যত হয়ে থাকে, সেই পশুটাকে দমন ক'রে রাখবার শিক্ষা ভাগ্যক্রমে আমি পেয়েছিলাম ব'লে প্রথমবার বেঁচে গিয়েছিলাম। তখন আমি বি. এ. পাশ করেছি। ভর্তি হয়েছি এম. এ. ক্লাসে। আমার দূর-সম্পর্কের এক দাদা তখন তিনপাহাড়ে ছিলেন। পুজোর ছুটিতে তাঁর কাছে বেড়াতে গিয়েছিলাম। আমার দেহ-মনে তখন দুর্বার যৌবন প্রতি মুহূর্তে বাঁধ ভাঙবার চেষ্টা করছে। আর আমি প্রাণপণে চেষ্টা করছি যে বাঁধকে দৃঢ় করবার। অশ্বিনী দত্তের 'ভক্তিযোগ' সর্বদা সঙ্গে থাকে। শান্তিশতকের শ্লোকটা প্রায়ই আওড়াই মনে মনে, যার অর্থ—যে যুবতীটি একদিন কত মোহের জাল বিস্তার করেছিল, চেয়ে দেখ এখন সে শ্মশানে। খট্টাঙ্গের একপ্রান্তে তার মাথার খুলিটা প'ড়ে আছে, দাঁত বেরিয়ে রয়েছে, শ্মশানের হাওয়া হু-হু ক'রে তার মধ্যে ঢুকছে আর বেরুচ্ছে। সে হাওয়া সবাইকে ডেকে যেন বলছে—কোথায় সেই মুখপদ্ম, কোথায় সেই অধর-মধু, কোথায় সেই বিশাল কটাক্ষ ? কোথায় সেই কোমল আলাপ, মদনধনুর মতো কুটিল ভ্রূবিলাস ? কোথায় সে সব এখন ? যোগোপনিষদে শুকদেব যা বলেছেন তা স্মরণ করি রোজ, এই শরীর ব্রণমুখ, দুর্গন্ধ-চর্ম-জড়িত, শত শত কৃমিপূর্ণ, মূত্রবিষ্ঠালিপ্ত, পরিবর্তনশীল, সর্বভোগের বাসস্থান; মরণের কারণ··· । মনের যখন এই অবস্থা তখন তিনপাহাড়ে গেলাম। দাদার ঠিক মাস ছয়েক আগে বিয়ে হয়েছিল। বউদিকে সেই প্রথম দেখলাম আমি। আমাকেও বউদি দেখলেন। দুজনেই দুজনের দিকে চেয়ে নির্নিমেষ হয়ে গেলাম কয়েক মুহূর্তের জন্য। বউদিকে রূপসী বললে কিছুই বলা হয় না, পরমাসুন্দরী বললেও না, ঠিক কি বললে

যে তাঁর রূপটি বোঝানো যায় তা আজও ঠিক করতে পারি নি আমি। তাঁকে দেখে একটিমাত্র কথা আমার মনে হয়েছিল, সে কথাটি হচ্ছে 'চুম্বক'।

শিকারী খেলোয়াড় বড় মাছকে বঁড়শিতে গেঁথে অনেকক্ষণ খেলিয়ে তারপর যেমন টেনে তোলে, টেনে তোলবার আগে আমাকেও তেমনি খেলাচ্ছিলেন বউদি দৃষ্টির বঁড়শিতে গেঁথে। যখনই তাঁর দিকে চাইতাম, চোখাচোখি হয়ে যেত। মনে হ'ত, আমি যখন তাঁকে দেখছি না তখনও যেন তিনি চেয়ে আছেন আমার দিকে। পিঠের কাছে অস্বস্তি বোধ করতাম একটা। ঘাড় ফিরিয়ে চাইলেই চোখাচোখি হয়ে যেত, বউদির মুখে ফুটত মুচকি হাসি।

আমার যতীনদা ছিলেন শিবটি। বউদির এইসব চটুলতা তিনি লক্ষ্য করেছিলেন কি না জানি না, কিন্তু লক্ষ্য করলে সদ্য-বিবাহিত স্বামীর অন্তরে যা যা হওয়া স্বাভাবিক তা তাঁর হয় নি। তার কোনও লক্ষণ অন্তত দেখি নি। তিনি বেশ প্রসন্ন মনে ভোরে উঠতেন, স্নান করতেন, পুজো করতেন, সকাল সকাল খেয়ে আপিসে চ'লে যেতেন। মাঝে মাঝে বউদির দিকে চেয়ে প্রসন্ন হাসি হেসে বলতেন, তোমারই মজা হয়েছে দেখছি। একা একা কি করবে ভেবে পেতে না, মণ্টু আসাতে বেশ একটি সঙ্গী জুটে গেছে তোমার। একদিন যাও না দুজনে, মতিঝরণায় বেড়িয়ে এস।

আমি কিন্তু বউদিদির ব্যবহারে বিব্রত হয়ে পড়ছিলাম। খুব ভোরে এসে আমার ঘরে ঢুকে আমার গায়ে হাত দিয়ে আমাকে ঠেলে ঠেলে ওঠাতেন তিনি।

ওঠ ওঠ, কত বেলা পর্যন্ত ঘুমুবে! চা যে জুড়িয়ে গেল—

ঘুমের ঘোরে কাপড়-চোপড় সব সময় ঠিক থাকত না, বিব্রত হয়ে উঠে বসতাম। বউদি মুচকি হেসে বলতেন, আহা, বেচারী! সারারাত একলাটি শুয়ে থাকতে কষ্ট হয় নিশ্চয়। একটেরে ঘর তো—

একদিন দুপুরবেলা ব'সে তেল মাখছি, বউদি একটা মোড়ায় এসে বসলেন উঠোনে। আমার দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে বললেন, তুমি বোধ হয় একসারসাইজ কর, নয়?

কুস্তি করি।

কার সঙ্গে?

আমাদের আখড়ার লোকের সঙ্গে।

এখানে কুস্তি করবার লোক পাচ্ছ না বুঝি! এখানে কে তোমার মতো অসুরের সঙ্গে লড়বে, বল! ও কি, হয়ে গেল তেল-মাখা? পিঠটাতে তো কিছুই হ'ল না! দেব মাখিয়ে?

না না, থাক্।

বউদি শুনলেন না। উঠে এলেন, আমার মানা করা সত্ত্বেও আমার পিঠে তেল মাখাতে লাগলেন। মুচকি হেসে বললেন, পুরুষ মানুষের অত লজ্জা কিসের?

নির্বাক হয়ে রইলাম। ঠিক করলাম, সেই দিনই স'রে পড়ব। 'ভক্তিযোগে'র অশ্বিনী দত্ত সেই পরামর্শই দিতে লাগলেন আমাকে। যাওয়া কিন্তু হ'ল না। যতীনদা আপিস থেকে এসে বললেন, কাল তোমরা মতিঝরণা ঘুরে এস, ট্রলি ঠিক করেছি।

যতীনদা রেলের ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগে কি একটা কাজ করতেন। ট্রলি এসে হাজির হ'ল তার পরদিন ভোরে। যতীনদা যেতে পারলেন না, তাঁর আপিস ছিল। বউদিকে নিয়ে আমিই গেলাম। যেতে হ'ল। রেল থেকে কিছু দূরে মতিঝরণা। বেশ খানিকটা হেঁটে যেতে হয়। গিয়ে যখন হাজির হলাম, মনে হ'ল, না এলে ঠকতাম। অদ্ভুত দৃশ্য। অদ্ভুত নির্জনতা। মনে হ'ল, অন্য একটা জগতে এসেছি। একটা কুলি আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছিল। সে বললে, আমি হুজুর খাবার নিয়ে আসি। আপনারা স্নান করেন তো ক'রে নিন।

বউদিদি কাপড়-গামছা এনেছিলেন। শুধু নিজের নয়, আমারও। আমি বললাম, আমি স্নান করব না। শরীরটা ভাল নেই।

আমি কিন্তু করব।—মুচকি হেসে বউদিদি বললেন।

কুলিটা চ'লে গেল। আমি দূরে একটা পাথরের ওপর ব'সে রইলাম। বউদিদি স্নান করতে লাগলেন। তাঁর স্নানলীলা অবর্ণনীয়। প্রতিজ্ঞা করলাম, ফিরে এসে রাত্রের ট্রেনেই চ'লে যাব।

যাওয়া কিন্তু হ'ল না। যতীনদাই বাধা দিলেন। বললেন, আজ আমাদের এখানে যাত্রা হবে। আজ যাত্রাটা দেখে কাল যেও।

কত রাত হয়েছিল জানি না। যাত্রা দেখছিলাম ব'সে ব'সে। খানিকক্ষণ পরে কিন্তু আর ভাল লাগল না। ঘুম পেতে লাগল। উঠে এলাম। বাইরের ঘরে আমার বিছানা পাতাই ছিল, এসে শুয়ে পড়লাম। ঠিক তন্দ্রাটি এসেছে, খুট ক'রে শব্দ হ'ল একটা। ঘরে কেউ এসেছে না কি? পর-মুহূর্তেই আমার হাতটা চেপে ধরলেন বউদি! উষ্ণ স্পর্শ!

কে?

কোন উত্তর নেই।

আমি তড়াক ক'রে বিছানা থেকে নেমে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম। ভোরেই একটা ট্রেন ছিল, সেই ট্রেনেই ত্যাগ করলাম তিনপাহাড়।

॥ দুই ॥

চ'লে এলাম বটে, কিন্তু স্বস্তি পেলাম না। সেই উষ্ণ স্পর্শটাও আমার সঙ্গে সঙ্গে এল। আমার সংযমের হিমালয় গলতে লাগল ধীরে ধীরে। তার পর নূতন বইও পড়লাম কয়েকটা পর পর। 'নষ্টনীড়', 'নানা', 'লেডি চ্যাটার্লি'জ লাভার', 'মাস্টার প্যাশন', 'রেন্স্'। দৃষ্টিভঙ্গী বদলাতে লাগল। মনে হতে লাগল 'ভক্তিযোগ' আর 'গীতা'র রসাস্বাদন করবার যোগ্যই হই নি আমি। রাজসিক জীবন যাপন না করলে আধ্যাত্মিকতার প্রকৃত মর্ম বোঝা যায় না। আগে ভোগ, তার পর ত্যাগ। পিপাসা না পেলে কখনও শীতল জলের মূল্য বুঝতে পারে কেউ? ইংরাজী বাংলা দু রকম 'ওমর খৈয়াম' কিনে ফেললাম। রবীন্দ্রনাথের গানগুলোর নূতন অর্থ প্রতিভাত হ'ল মনে। আদ্যোপান্ত প'ড়ে ফেললাম, বায়রন কীটস শেলী বার্নস্। মনে হ'ল, জীবনের

ঐশ্বর্যকে ত্যাগ ক'রে কোন মরুভূমির দিকে ছুটছি আমি । অনুতাপ হতে লাগল । আমি শুকদেব নই, পাথরও নই, আমি উর্বশীকে প্রত্যাখ্যান করতে গেলাম কেন ? উর্বশী তো জীবনে বার বার আসে না, একবার এসেছিল, আর আসবে কি ? কবিতা লিখতে শুরু করলাম । কাগজে সেগুলো ছাপাও হতে লাগল । অনেকগুলো কাগজ বউদিকে পাঠিয়েও দিলাম । আশা করতে লাগলাম, উত্তর আসবে একটা । নিশ্চয়ই আসবে ! উষ্ণ স্পর্শটা উষ্ণতর হতে লাগল প্রতিদিন । উত্তর কিন্তু এল না । তার পর আর একটা বই হাতে এল । বেট্‌সের লেখা কয়েকটা গল্প । মনে হ'ল. এই তো জীবনের স্বরূপ । এস্‌থারের ছবিটা আঁকা হয়ে গেল মানসপটে । ছলনাময়ী নারী উদ্দাম পুরুষকে যুগে যুগে আমন্ত্রণ করেছে, উদ্দাম পুরুষ যুগে যুগে বাঁধা পড়েছে তার আলিঙ্গন-পাশে । এই নিয়ম । আমি সে নিয়মের ব্যতিক্রম হব কেন ? অনুতাপ হতে লাগল—হায়, হায়, কি সুযোগই হারিয়েছি !

॥ তিন ॥

সুযোগ কিন্তু পেলাম আর একবার । বছর দুই পরে । যতীনদা তখন জামালপুরে । তিনিই আমন্ত্রণ করলেন আবার । গিয়ে যখন পৌঁছলাম, তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে । বউদি আমাকে দেখে মুচকি হাসলেন একটু । যতীনদা বললেন, আমি ভেবেছিলাম তুমি সকালের ট্রেনে আসবে । তা ভালই হ'ল । লাইন খারাপ হয়েছে, আমাকে বেরুতে হবে এখুনি । অমিতাকে আর একা থাকতে হ'ল না, আমি একটা কুলিকে রেখে যাব ভাবছিলাম ।

যতীনদা চ'লে গেলেন, মুচকি মুচকি হেসে বউদি আমার খাওয়ার ব্যবস্থা করলেন । গরম গরম ফুলকো লুচি আর ডিমের ডালনা । খাওয়া শেষ হ'লে বিছানা পেতে দিয়ে বললেন, সমস্ত দিন ট্রেনে এসেছ, শুয়ে পড় ।

ঘুম পায় নি । ব'স না তুমি এইখানটায় । আমার কবিতাগুলো পড়েছিলে ?

পড়েছি । কিন্তু যার উদ্দেশ্যে তুমি ওগুলো লিখেছিলে সে চ'লে গেছে !

চ'লে গেছে ?

ম'রে গেছে ।

তার মানে ?

তোমার দাদাটিকে চেন না ? অমন পরশপাথরের কাছে লোহা কতক্ষণ লোহা থাকতে পারে বল ? সোনা তাকে হতেই হবে । দেখলে না কেমন বিশ্বাস ক'রে নির্ভয়ে চ'লে গেলেন ? আমি আর সে নেই, আমি অন্য মানুষ হয়ে গেছি ! ঘুমোও । পাখাটা খুলে দিচ্ছি ।

পাখাটা খুলে কপাটটা বন্ধ ক'রে বউদি চ'লে গেলেন ।

আমি নির্বাক হ'য়ে ব'সে রইলাম । পাখাটা বনবন ক'রে ঘুরতে লাগল ।

নুড়ি ও তালগাছ

বিরাট প্রান্তর । তার মাঝখানে একা দাঁড়িয়ে আছে প্রকাণ্ড এক তালগাছ । কতদিন থেকে কেউ জানে না । আশে-পাশে কোন গাছ নেই । চতুর্দিকে কেবল মাঠ আর মাঠ, দিগন্তরেখা পর্যন্ত বিশাল একটা বিস্তৃতি কেবল ।

তালগাছের ঠিক নীচে প'ড়ে আছে ছোট একটি পাথরের নুড়ি । কতদিন থেকে তা-ও কেউ জানে না । আশে-পাশে তার ছোট-ছোট ঘাস । নুড়ির যতদূর স্মরণ হয়, এই ঘাস ছাড়া আর কিছুই সে দেখে নি । বর্ষাকালে গজায়, গ্রীষ্মকালে শুকিয়ে যায় । ফের বর্ষা এলে আবার জেগে ওঠে, জড়িয়ে ধরে তাকে শ্যামল স্নেহ-ভরে । চিরকালই সে এই দেখেছে । মাটিতে ঘাস হয়, শুকিয়ে যায়, আবার হয় । এই তার অভিজ্ঞতা । মাঝে-মাঝে তার মনে হয়, আমার দৃষ্টির বাইরে আরও কিছু ঘটে না-কি অন্যরকম ?

হঠাৎ একদিন সে তালগাছটার সম্বন্ধে সচেতন হ'লো ।

এই কালো মোটা জিনিসটা কি বস্তু । সোজা উপর দিকে উঠে গেছে । যতদূর মনে পড়ে, একে একই রকম দেখছে সে চিরকাল । ঋজু…বলিষ্ঠ…ঊর্ধ্বমুখী ।

—"শুনছেন ?"

তালগাছ নিরুত্তর ।

—"শুনছেন ?"

কোনো উত্তর নেই ।

পাথরের নুড়ি ছোট, কিন্তু নাছোড়বান্দা । বহুবার ডেকে-ডেকে তালগাছকে অবশেষে বিচলিত করলে সে ।

—"কি বলছ, কে তুমি ?"

—"আমি আপনার পায়ের তলায় প'ড়ে আছি, ছোট পাথরের নুড়ি । আপনি কে ?"

—"আমি তালগাছ ।"

—"ও !"

যদিও তালগাছের তলাতেই সে প'ড়ে আছে এত কাল, তবু তালগাছের নাম শোনেনি সে । একটু অবাক হ'লো । সোজা উঠে গেছে কত উঁচুতে ! হঠাৎ মনে হ'লো, ওর অভিজ্ঞতা হয়তো নূতন রকম । একটু থেমে প্রশ্ন করলে :

—"আচ্ছা, আপনি অত উঁচুতে কি দেখেন রোজ ?"

—"আকাশে সূর্য ওঠে আর অস্ত যায় ।"

—"তারপর ?"

—"আবার ওঠে"…

টোপ

মাছ ধরা সম্বন্ধে গল্প হচ্ছিল। রিমঝিম করে বৃষ্টি পড়ছিল বাইরে। এক প্রস্থ চা নিমকি হয়ে গেছে, প্রবীণ মৎস্য-শিকারী বিপিন বোস তাঁর প্রাত্যহিক হুইস্কি-সোডাটি ধীরে ধীরে "সিপ" করছেন, গলির ভিতর লোক চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ, নিবিড় অন্ধকার থমথম করছে চতুর্দিকে। গল্প জমাবার মতো পারিপার্শ্বিক সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু গল্প জমছিল না ঠিক।

সান্ধ্য বৈঠকটি বসেছিল কানুবাবুকে কেন্দ্র করে। কানুবাবু গয়া-নিবাসী এবং ও অঞ্চলের একজন নামজাদা মৎস্য-শিকারী। তিনি এসেছিলেন তাঁর ভগ্নীপতি অতুলের কাছে। অতুল বিপিন বোসের সাকরেদ। বিপিন বোস যখনই মাছ ধরতে বেরোন অতুল তাঁর তলপি-তলপা বহন করে তাঁর পাশে একটা ছিপ নিয়ে বসে প্রত্যেকবার! পুটি-মাছ, ন্যাটা মাছ, বাটা মাছ ধরেওছে অনেকবার। কিন্তু যা তার স্বপ্ন তা তখনও অগাধ জলের তলায়। বড় মাছ একটাও ধরতে পারেনি বেচারি।

এক্ষেত্রে যা চিরকাল হয় তাই হচ্ছিল। অতুলচন্দ্র তার নামজাদা ভগ্নীপতি কানুবাবুর কাছে সালঙ্কারে বর্ণনা করছিল কিভাবে একবার একটা দশ-সেরি রুই 'একটু'র জন্যে ফসকে গিয়েছিল তার ছিপ থেকে।

"মাইরি বলছি, প্রায় টেনে তুলেছিলাম, পট্ করে সুতোটা গেল ছিঁড়ে। বিপিনদাকে জিগ্যেস করুন—" বিপিন বোস স্মিতমুখে মাথা নাড়লেন। বাইরের লোকের কাছে নিজের শিষ্যকে খেলো করবার লোক তিনি নন।

"প্রায় দশসের হবে মাছটা, নয় বিপিনদা ?"

"বেশী।"

কানুবাবু তাঁর কাঁচা-পাকা ফ্রেঞ্চকাট দাড়ির সুচালো অংশটি পাকাতে পাকাতে বললেন "আসল জিনিস হচ্ছে টোপ। টোপটি যদি মুখরোচক হয় মাছ হ্যাঁচকা টান মারবেই না। গলায় বঁড়শি বেঁধা সত্ত্বেও মারবে না, এই হচ্ছে আমার অভিজ্ঞতা।"

বিপিন বোস খানিকক্ষণ চেয়ে রইলেন কানুবাবুর মুখের দিকে, তারপর একমুখ হেসে সমর্থন করলেন কথাটা।

"তাতে আর সন্দেহ আছে ? আমারও অভিজ্ঞতা তাই। কি ধরনের টোপ আপনি ব্যবহার করেন ?"

"আমি নানারকম টোপ ব্যবহার করি। কেঁচো, গুগলি, ছোট কাঁকড়া, বোলতার চাক। কিন্তু আমি আর একটি জিনিষ করি!…"

খুব রহস্যময়ভাবে দাড়ির ডগাটি পাকাতে লাগলেন কানুবাবু।

"আর কি করেন ?"

"আমি বেশ করে আচার মাখিয়ে নি' তাতে।"

"আচার ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। পুরোনো আমের আচার। ব্যবহার করে দেখবেন, খুব ভাল ফল হয়।"

বিপিন বোস গম্ভীর হয়ে গেলেন ক্ষণকালের জন্য। অতুল চকিতে একবার চেয়ে দেখলে তাঁর মুখের দিকে। মাছ-ধরা সম্বন্ধে বিপিন বোসকে নূতন কথা শেখাবে

এমন লোক জন্মায় নি, অতুলের এই ধারণা। কানুবাবুর আচারের কথা শুনে বেচারা একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়ল মনে মনে। বিপিন বোস কিন্তু সামলে নিলেন। বললেন, "খোট্টার দেশের মাছেরা আচার দেখে ভুলে যেতে পারে, এদেশের মাছেরা ভুলবে না। আমার একটা কি ধারণা হয়েছে জানেন? পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া অনুসারে মাছেদেরও স্বভাব বদলায়, রুচি বদলায়। আমার জীবনে একবার নয়, দু'দুবার প্রমাণ পেয়েছি এর।"

"কি রকম?"

"আমি তখন ইনকম্‌ট্যাক্‌স্‌ অফিসার। বরাবরই তো মাছধরার বাতিক, যেখানে যখন গেছি খবর নিয়েছি কোন পুকুরে মাছ আছে। একবার খবর পেলাম শ্রীকৃষ্ণপুরের জমিদার গোঁসাইজির পুকুরে মাছ আছে অনেক। কিন্তু কাউকে তিনি পুকুরে ছিপ ফেলতে দেন না। কিন্তু আমি ইনকম্‌ট্যাক্‌স্‌ অফিসার, আমাকে 'না' বলা শক্ত। খবর পাঠাতেই সাদরে আহ্বান করলেন। গেলাম এক রবিবারে। গিয়ে দেখি বিরাট পুকুর। পুকুর নয় তো যমুনা যেন। টলমল করছে কালো জল। পুকুরের পাড়েই রাধবল্লভজীর প্রকাণ্ড মন্দির। নানারকম চার আর টোপ নিয়ে গিয়েছিলাম, বাগিয়ে ছিপটি ফেললাম। ও মশাই, আধঘণ্টা একঘণ্টা, দেড়ঘণ্টা কেটে গেল একটি মাছ ঠোকরাল না। আশেপাশে বড় বড় রুই কাৎলা ঘুরছে বুঝতে পারছি, কিন্তু টোপের কাছাকাছি এসেই মুখ ঘুরিয়ে চলে যাচ্ছে। কেঁচো, ক্যাঁকড়ার বাচ্চা, মাছের নাড়িভুঁড়ি, মাংসের কিমা—সব আমার সঙ্গে ছিল। একের পর এক টোপ বদলাতে লাগলাম কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা, একটি মাছ ঠোকরায় না। সমস্ত দুপুর রোদে ঠায় বসে রইলাম, কিছু হল না। অথচ মাছ প্রচুর। ঠিক করলাম আর একদিন আসব। মন্দিরের একটা রোগা গোছের চাকর ছিল। তাকে কিছু বখশিস দিলাম, আর বললাম—আসছে রবিবারে সকাল থেকেই চার ফেলে রাখিস। আমি দুপুরের দিকে আসব। চাকরটা এদিক ওদিক চেয়ে চুপি চুপি আমাকে বললে—হুজুর, এবার কিছু মালপো সঙ্গে করে আনবেন। এ পুকুরের মাছ কেঁচো টেঁচো খায় না, কোনরকম আমিষ খায় না। রাধাবল্লভজীর পুকুরের মাছ কি না। তাছাড়া এ বাড়ির সবাই বৈষ্ণব, মাছ মাংসের পাটই নেই—। অবাক হয়ে বললাম—মালপো খাবে? তুই জানলি কি করে? মুচকি সে বললে—আমি মাঝে মাঝে রাত্রে লুকিয়ে ধরি যে। কাউকে বলবেন না যেন হুজুর। আসছে রবিবার মালপো নিয়ে আসবেন, গপ্‌গপ্‌ করে খাবে দেখবেন। তাই হল। পরের রবিবার মালপো টোপ ফেলে চারটি বড় বড় বৈষ্ণব রুই কাৎলা গেঁথে নিয়ে এলাম।"

এতক্ষণে গল্প জমল। কানুবাবু 'থ' হয়ে গেলেন। অতুলের চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে উঠল। বিপিন বোস হুইস্কি-সোডায় আর একটি 'সিপ' দিলেন। কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থেকে দ্বিতীয় গল্পটি বললেন তিনি।

"দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটে লক্ষ্ণৌয়ে। লক্ষ্ণৌ শহর থেকে বেশ কিছু দূরে মফঃস্বলে ছিল পুকুরটা। কোন এক নবাবজাদার পুকুর। পুকুরের নাম বেগম তালাও। খোঁজ পেয়ে মোটরে করে গেলাম একদিন। দেখি বিরাট একটা পোড়ো বাগান বাড়ি। শ্বেতপাথরের তৈরি ভাঙা মতি-মন্‌জিল্‌ আর তার সামনে শ্বেতপাথরের বাঁধানো প্রকাণ্ড বেগম তালাও। দেখলাম পুকুরের মাঝখান পর্যন্ত শ্বেতপাথরের বাঁধানো চমৎকার একটা

প্লাটফর্মের মতো রয়েছে। তার উপর রয়েছে শ্বেতপাথরেরই ছত্র একটি। রোদ লাগবে না। জলের রংও অদ্ভুত—ঠিক ব্র্যাণ্ডির রঙের মতো। নবাবজাদারা অনেকদিন আগেই নির্বংশ হয়েছেন। থাকবার মধ্যে ছিল একটি পুরানো চাকর। সেই এসে কুর্নিশ করে দাঁড়াল এবং আমার অভিপ্রায় শুনে বললে যে যেদিন খুশী যতক্ষণ খুশী আমি এখানে এসে মাছ ধরতে পারি, সে আমার যথাসাধ্য খিদমৎ করবে। তোড়-জোড় করে গেলাম একদিন। কিছুক্ষণ বসবার পর সেদিনও বেকুব হতে হোল মশাই। বড় বড় রুই কাৎলা ঘুরছে, কিন্তু কাছে আসে না কেউ। মালপো ইনসিডেণ্টটা মনে পড়ল, ভাবলাম এখানে পোলাও টোলাও আনতে হবে নাকি ! ঘণ্টা দুই বেকার বসে থাকার পর সেই বুড়ো চাকরটাকে ডাকলাম। বললাম, কি রকম চার, কি রকম টোপ দিলে মাছ আসবে বলতে পার ? সে কুর্নিশ করে বললে, হুজুর যদি গোস্তাকি মাপ করেন তাহলে হদিশ বাতলাতে পারি। বললাম, বাতলাও বখশিস করব তোমাকে। সে বললে, হুজুর, এ বেগম তালাওয়ের মাছ এমনিতে ধরা দেবে না। দুটি খপসুরৎ বাইজি আনতে হবে। তারা এসে আপনার দু'পাশে বসবে, তাদের ছায়া জলে পড়বে, তবে মাছ আসবে। বলা-বাহুল্য, এতটা আমি প্রত্যাশা করি নি। অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম তার দিকে। সে আর একবার সেলাম করে বললে, গরীব পরবর, যা বলছি তা করে দেখুন। আমি আপনার সঙ্গে কি দিল্লগি করতে পারি ?

বিপিন বোস হুইস্কি-সোডাতে আর এক 'সিপ' দিয়ে চুপ করে রইলেন। তাঁর চোখ দুটো থেকে হাসি উপচে পড়তে লাগল কেবল।

"তারপর ?"

"পরের রবিবার দুটো বাইজি নিয়েই গেলাম মশাই। বললে বিশ্বাস করবেন না ঝাঁকে ঝাঁকে মাছ আসতে লাগল। ময়দার টোপ দিয়েই ধরে ফেললাম গোটা আস্টেক কেঁদো কেঁদো মাছ। আমার বুইক গাড়ির কেরিয়ারটা ভরে গেল—"

বিপিন বোস চুপ করতেই কানুবাবু ভক্তি ভরে তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে বললেন, "রাত অনেক হল এবার উঠি—"

অতুলের মুখের ভাব যা হল তা অবর্ণনীয়।

ভূতের প্রেম

"এই দেখ ইন্দুর ডায়েরি। আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না, তুমি পড়ে দেখ দিকি, কিছু মানে বার করতে পার কিনা।"

বলিষ্ঠকায় ভুজঙ্গধর মরক্কো-চামড়া দিয়া বাঁধানো সুদৃশ্য খাতাখানি আমার দিকে আগাইয়া দিল।

"উনত্রিশে তারিখে যেটা লিখেছে সেইটে পড় ! আরও পাতা উলটে যাও—হ্যাঁ, ওইখান থেকে পড়।"

পড়িতে লাগিলাম। ভুজঙ্গধর ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। ভুজঙ্গধর আমার বাল্যবন্ধু এবং ইন্দুমতীর স্বামী।

ইন্দুমতী লিখিয়াছেন, "কাল রাত্রে যে অদ্ভুত ঘটনাটা ঘটেছে তা এতই অসম্ভব

যে বললে কেউ বিশ্বাস করবে না। আমি কাউকে বলিওনি, এমন কি মাণিককেও না। মাণিককে বলতে খুবই লোভ হচ্ছে, কিন্তু ভয় হচ্ছে পাছে সে আমাকে ভীতু বলে ঠাট্টা করে। তার চক্ষে নিজেকে ভীতু প্রতিপন্ন করবার ইচ্ছে নেই। সত্যি সত্যি ভীতু আমি নইও। ভীতু হলে জনমানব-বর্জিত এই পোড়ো বাড়িতে এসে থাকতেই রাজি হতাম না কি? ঘটনাটা তবু লিখে রেখেছি। লিখে রাখবার মতো ঘটনা ক'টাই বা ঘটে জীবনে! ভবিষ্যতে কোনও পাঠক বা পাঠিকা হয়তো এটা পড়ে পাগল ভাববেন আমাকে; কিংবা হয়তো কোনও উৎসাহী মনস্তাত্ত্বিক এর থেকে কোনও তথ্য উদ্ধার করে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করবেন আমার স্বামীকে। সত্যই অদ্ভুত ঘটনাটা।"

কাল রাত দশটার সময় মাণিক হঠাৎ বলল—"ওহো, একটা বড় ভুল হয়েছে, পেট্রোলটা কেনা হয়নি। চল কিনে আনি গিয়ে। দশ মাইল যেতে আসতে আর কতক্ষণ লাগবে?"

আমার শরীরটা তেমন ভাল ছিল না, কোমরটা ব্যথা করছিল সন্ধে থেকেই। তাছাড়া আগাথা ক্রিষ্টির একখানা বই এমন পেয়ে বসেছিল আমাকে যে কোথাও নড়তে ইচ্ছে করছিল না।

বললাম, "আমি আর যাব না, থাক না কাল কিনলেই হবে।"

মাণিক বললে, "ওটা হল স্ত্রীবুদ্ধি। আমরা যেরকম অবস্থায় আছি তাতে মোটরে সদাসর্বদা পুরো পেট্রোল থাকা চাই।"

"তাহলে তুমিই গিয়ে নিয়ে এস।"

"তুমি থাকতে পারবে একা? ভয় করবে না তো?"

"আমি যদি ভীতু হতাম তাহলে যা করেছি তা করতে পারতাম কি!"

মাণিক হঠাৎ ঝুঁকে আমার গালে চপাৎ করে চুম খেল একটা। এমন দুষ্টু আর অসভ্য হয়েছে আজকাল!

"আমি পেট্রোলটা নিয়ে আসি তাহলে। যাব আর আসব।"

মাণিক চলে গেল। আমরা যে বাড়িটাতে এসে ছিলাম সেটা কোনো এক মৈথিল জমিদারের বাগান বাড়ি। যদিও এখন পোড়ো বাড়ির মতো হয়ে গেছে, কিন্তু একদিন যে এর মহিমা ছিল তা একনজরেই বোঝা যায়। জমিদারের বংশধর জীমূতবাহন সিংয়ের সঙ্গে মাণিকের বন্ধুত্ব আছে বলেই বাড়িটা পাওয়া সম্ভব হয়েছে। বাড়ির চাবিটা মাণিককে দিয়ে জীমূতবাহন লন্ডনে পাড়ি দিয়েছেন সম্প্রতি। প্রচণ্ড বাড়ি, প্রকাণ্ড হাতা। আমরা দোতলায় যে ঘরখানা নিয়ে আছি, তার ঠিক সামনেই গাড়ি-বারান্দা, গাড়ি-বারান্দায় বেরিয়ে দাঁড়ালেই চোখে পড়ে সুবিস্তৃত বাগানটা। বাড়ির সামনেই বাগান। এখন অবশ্য বাগানের পূর্বশ্রী নেই। ফাঁকা মাঠের মতো খানিকটা জমি পড়ে আছে খালি। বাগানের ওপারে গেট। গেটেরও ভগ্নদশা। কপাট নেই, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড থাম দুটো দাঁড়িয়ে আছে কেবল।

সেদিন জ্যোৎস্না উঠেছিল খুব। ফিনিক ফুটছিল চতুর্দিকে। ইজিচেয়ারটায় শুয়ে শুয়েই আমি টের পেলাম মাণিক মোটর নিয়ে বেরিয়ে গেল। তারপর কতক্ষণ কেটেছিল, আমার মনে নেই ঠিক। আমি তন্ময় হয়ে বই পড়ছিলাম। হঠাৎ শুনতে পেলাম কিসের যেন একটা শব্দ হচ্ছে। মনে হল ঘোড়ার পায়ের শব্দ, অনেকগুলো ঘোড়া যেন টগবগ করে ছুটে আসছে। মনে হল অনেক দূরে থেকে আসছে, কেন জানি

না হঠাৎ মনে হল অনেকদিন ধরে আসছে! শব্দটা প্রথমে ক্ষীণ ছিল, তারপর স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। খটবট খটবট খটবট খটবট—ক্রমশই যেন এগিয়ে আসছে। আমি বইটার দিকে চেয়ে বসেছিলাম কিন্তু পড়ছিলাম না। আমি রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছিলাম। কার বা কিসের, তা জানি না, কিন্তু অপেক্ষা করছিলাম। মনে হচ্ছিল চরাচরও যেন অপেক্ষা করছে রুদ্ধশ্বাসে। কি হয় তা দেখবার জন্যে সবাই যেন উৎসুক। ছুটন্ত ঘোড়াগুলোর প্রতিটি পদক্ষেপ-ধ্বনি সবাই যেন শুনছে উৎকর্ণ হয়ে। এগিয়ে আসছিল শব্দটা···কাছে···আরও কাছে···গেট দিয়ে ঢুকল। তারপরই আমি ধড়মড় করে দাঁড়িয়ে উঠলাম। মনে হল ঘোড়াগুলো বুঝি হুড়মুড় করে আমার ঘাড়েই লাফিয়ে পড়ল। আমি দাঁড়িয়ে ওঠামাত্র শব্দটা কিন্তু থেমে গেল হঠাৎ। হলের দরজাটা খোলা ছিল, ঘাড় ফিরিয়ে দেখি সেখানে একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। প্রকাণ্ড লম্বা লোক।

"আমি তোমাকে নিতে এসেছি ইন্দুমতী।"

"কে?"

ঘরের ভিতর ঢুকল এসে। শালপ্রাংশু মহাভুজ চেহারা। মাথায় স্বর্ণমুকুট, অঙ্গে কারুকার্য খচিত অঙ্গচ্ছদ, কর্ণে মণিকুণ্ডল, বাহুতে কেয়ূর। চোখ দুটো যেন জ্বলজ্বল করছে। কুচকুচে কালো গোঁফ, কুচকুচে কালো কোঁকড়ানো এক মাথা চুল। আমি তো অবাক!

"কে আপনি—?"

"অয়ি মানস-সরোবর-বিহারিণী রাজহংসী, তুমি কি সত্যিই চিনতে পারছ না আমাকে!"

আমি নীচের ঠোঁটটা দাঁত দিয়ে কামড়ে ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করে ভাবতে চেষ্টা করলাম, কোথাও একে দেখেছি কি না। সে বলতে লাগল—"একটু ভেবে দেখ মনে পড়বে। নারদের বীণাচ্যুত মালার আঘাতে আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়েছিল। কিন্তু আমি তোমাকে তো একদিনের জন্যও ভুলিনি। বারবার এসেছি তোমার কাছে। নানারূপে এসেছি। তুমিও তো আমাকে প্রত্যাখ্যান করনি সখি। অয়ি রম্ভোরু, অয়ি অনবদ্যা ভোজনন্দিনী, ভুলে গেছ কি সব? অর্জুনরূপে এসেছিলাম সুভদ্রার কাছে, পৃথ্বীরাজরূপে এসেছিলাম সংযুক্তার কাছে···আমাকে তো তুমি প্রতিবারই চিনেছ···"

আমি তখন আত্মস্থ হয়েছি।

বললাম, "ওসব বাজে কথা ছেড়ে দিন। স্পষ্ট করে বলুন আপনি কে?"

"আমি অজ।"

"অজ? সে আবার কে!"

"মহারাজ রঘুর পুত্র। শ্রীরামচন্দ্রের পিতামহ—"

"কি চান আপনি—"

"তোমাকে চাই। তুমি আমার। স্বয়ংবর সভায় মলয়রাজের যে ঐশ্বর্য তোমাকে ক্ষণিকের জন্যও বিচলিত করেছিল তা আমি আহরণ করেছি ইন্দুমতী। অয়ি মত্ত-চকোর-লোচনে, নিতম্বগুর্বি, আমিও তোমার জন্য তাম্বুললতাপরিবৃত, পূগতরু-শোভিত, এলালতালিঙ্গিত, চন্দনবৃক্ষ সুরভিত, তমালমালা-আকীর্ণ মনোরম কানন

নির্মাণ করে রেখেছি নিষ্কলুষ মানসলোকের উত্তুঙ্গ মলয় শিখরে। চল সখি সেখানে। আমি রথ এনেছি তোমার জন্যে। চল…”

লোকটা ঘরে ঢুকে গাড়ি-বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। আমিও মন্ত্রমুগ্ধবৎ তার অনুসরণ করলাম। গিয়ে দেখি সত্যিই চতুরশ্ববাহিত বিরাট এক রথ দাঁড়িয়ে রয়েছে নীচে। ওরকম বলিষ্ঠ ঘোড়া আমি আর দেখিনি এর আগে। যেন মার্বেল পাথর দিয়ে তৈরী !

“আর বিলম্ব কোরো না, চল।”

লোকটা আমার হাত ধরতে যাচ্ছিল। আমি চীৎকার করে উঠলাম। মাণিকের কথা মনে পড়ল আমার !

“ভয় পেয়ো না, আমি ভদ্রবংশজাত, আমি বলাৎকার করব না। যাবে না তুমি আমার সঙ্গে ?”

“না—”

“কেন—”

“আমি মাণিককে ভালবাসি।”

“মাণিক ? সে কে !”

“আমাদের মোটর ড্রাইভার ছিল কিছুদিন আগে। কিন্তু এখন সেই আমার সব—”

“ও। আচ্ছা আমি অপেক্ষা করব। একটা কথা শুধু বলে যাচ্ছি, আমার কাছে তোমাকে আসতেই হবে। আবার আসব আমি…”

পরমুহূর্তেই সব অন্তর্হিত হয়ে গেল।

এইখানেই ডায়েরির সমাপ্ত হইয়াছে। মুখ তুলিয়া দেখিলাম ভুজঙ্গধর তখনও ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া রহিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলাম—“ইন্দুকে তুমি ফিরিয়ে এনেছ ?”

“হ্যাঁ, চুলের ঝুঁটি ধরে মারতে মারতে ফিরিয়ে এনেছি—”

“আর মাণিক ?”

“তাকে গুলি করে ওইখানকারই একটা ইঁদারায় ফেলে দিয়েছি।”

“কি সর্বনাশ !”

আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে ভুজঙ্গধর বলিল—“ইন্দুকে সত্যিই আমি ভালবাসি ভাই। ওর জন্যে ফাঁসি যেতেও আমার আপত্তি নেই।”

“এত রাত্রে তুমি আমার কাছে এসেছ কেন বল তো ?”

“পরামর্শ করতে। ইন্দুকে কি লুম্বিনী পার্কে পাঠাব ?”

“ডায়েরিটা পড়ে মনে হচ্ছে হয়তো পাগল হয়ে গেছে ?”

ঘড়িতে টং টং করিয়া বারোটা বাজিল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে প্রবেশ করিল ভুজঙ্গধরের চাকর ঘনাই। বোঝা গেল ঘনাই উর্ধ্বশ্বাসে আসিয়াছে।

হাঁপাইতে হাঁপাইতে সে বলিল, “বাবু, মাঠান আবার বেরিয়ে গেলেন—”

“সে কি রে !”

“হ্যাঁ বাবু। প্রকাণ্ড একটা চার ঘোড়ার গাড়ি এসে দাঁড়াল বাড়ির সামনে, কি বড় বড় ধবধবে সাদা ঘোড়াগুলো। গাড়ির ভিতর থেকে চোগোঁপ্পা একটা লোক মুখ বার করে বললে—‘ইন্দুমতী, এস।’ মাঠাকরুণ ছুটে বেরিয়ে এসে গাড়িতে চেপে বসলেন, আর টগবগ টগবগ করে গাড়িটা বেরিয়ে গেল ঝড়ের বেগে !”

"তাই নাকি !"

আমরা যথাসম্ভব দ্রুতবেগে অকুস্থলে গিয়া উপস্থিত হইলাম। কেহ কোথাও নাই, চতুর্দিক নিস্তব্ধ। ইন্দুমতী আর ফেরে নাই।

মন্মথ

॥ এক ॥

কয়েকটি ট্যাবলেট বিলটুর হাতে দিয়ে বললাম, "দুটো করে ট্যাবলেট তিন ঘণ্টা অন্তর খাবে। কাল এসে একবার খবর দিও। যদি দরকার হয় অন্য ওষুধ দেব। এতেই ভাল হয়ে যাবে আশা করি—"

"কি খাব ডাক্তারবাবু—"

"আজ শুধু জল খেয়ে থাক—"

"শুধু জল ?"

"শুধু জল না পার পাতলা করে বার্লি খেও।"

বিলটু মুখ বেঁকিয়ে বলল, "বার্লি ? বার্লি একেবারেই সয় না আমার। খেলেই বমি হয়ে যাবে—"

"পেটের অসুখ করেছে, উপোস দেওয়াই তো ভাল—"

"উপোস দিতে পারি না যে।"

"তাহলে মাকে বোলো গরম ফ্যান একটু নুন আর লেবুর রস দিয়ে—"

"ফ্যান তো গরুতে খায়, আমি কি গরু—"

"গরু ভাতও খায়, তরকারিও খায়। তুমি ভাত তরকারি খাও না ?" বিলটু মুচকি মুচকি হাসতে লাগল।

"মাছের ঝোল চলবে ?"

"চলবে, যদি তোমার মা মশলা না দিয়ে করে দেন। স্টু খেতে পার—"

"রসগোল্লা ?"

"না।"

"রসটা নিংড়ে ফেলে যদি ছানাটা খাই ?"

"না—"

বিলটু অপ্রতিভ মুখে বসে রইল। বিলটুর বয়স বারোর কাছাকাছি। আমাদের পাড়াতেই থাকে। কিছুদিন আগে পিতৃহীন হয়েছে। আমরা সবাই তাই গার্জেন হয়ে উঠেছি ওর। অসংকোচে ফাই ফরমাস করি, অসংকোচে শাসন করি, অসংকোচে উপদেশ দি। বিলটু আপত্তি করে না। সকলেরই ফরমাস খাটে, ভান করে যেন সকলেরই উপদেশ শুনছে। আমার নাতিকে যে প্রাইভেট টিউটারটি পড়ান তার কাছে বিলটুও এসে বসে মাঝে মাঝে, হাতের লেখা লেখে, অংক কষে। ওর মা আশা করে আছে আমি আগামী বছর ওকে স্কুলেও ভরতি করে দেব। আমার কাছেই বিলটু একটু আধটু আবদারও করে। কয়েকদিন আগেই তাকে ঘুড়ি লাটাই কিনে দিয়েছি।

বিলটু নাকি সুরে বললে—"কি খাব তাহলে বলুন না—"

"বললাম তো, ণ্টু খাও গে।"

"মা অত হাঙ্গামা করতে রাজি হবে না।"

'বেশ, আমাদের বাড়িতে এস, আমি ব্যবস্থা করব।"

বিলটু হয়তো আরও কিছু বলত। কিন্তু দ্বারের দিকে চেয়ে চট করে উঠে পড়ল সে। প্রবেশ করলেন পুরুষোত্তমবাবু। মনুষ্যরূপী মহিষ একটি। শুধু মহিষও নয়, মহিষ এবং শজারুর সমন্বয়। মাথায় একজোড়া শিং সর্বদা উদ্যত হয়ে থাকে ভদ্রলোকের, সর্বাঙ্গে নানারকম কাঁটাও। মনে মনে তিনি বাস করেন পবিত্র অতীত যুগে—যে যুগে সবই ভালো ছিল—চাল ডাল দুধ ঘি সস্তা ছিল, নারীদের সতীত্ব ছিল, পুরুষদের ধর্মজ্ঞান ছিল, ঠিক সময়ে বৃষ্টি হত, ছেলেমেয়েদের ঠিক সময়ে বিয়ে হত, সন্তান হত। কিন্তু অদৃষ্টের এমনি ফের সশরীরে তাঁকে বর্তমান যুগে সজ্ঞানে বাস করতে হচ্ছে!

ঘরে ঢুকে আমার সামনে এক বাণ্ডিল চিঠি ফেলে দিয়ে বললেন—"এই নিন। ফনীতির বাক্স থেকে পেয়েছি। এর যদি ব্যবস্থা একটা না করেন আই শ্যাল শুট হিম।"

পুরুষোত্তমবাবুর বন্দুক ছিল না, কিন্তু কথায় কথায় তিনি সকলকে 'শুট' করতে চাইতেন। চিঠিগুলি খুলে খুলে দেখলাম। গোলাপী রঙের শৌখীন কাগজ। কাগজে এসেন্সের গন্ধ ভুর ভুর করছে। ভাষা আরও রঙিন আরও সুরভিত। সামান্য একটু উদ্ধৃত করছি—"নিদ্‌মহলের আলোছায়ায় রজনীগন্ধার আবেশের মতো যে স্বপ্ন আমাকে উতলা করে তোলে তা কি তুমি জানো না? মর্মের মর্মর-শয্যায় যে রাজকন্যা শতদলের পাপড়ির উপর ঘুমিয়ে আছে তার ঘুম ভাঙাবার সোনার কাঠি কোথায় পাব। প্রাণের ফন্তু, তুমিই বলে দাও কোথায় পাব…।"

এই ধরনের উচ্ছ্বাস পাতার পর পাতা।

লম্বা সুঁটকো গালের-হাড়-উঁচু মন্মথর মুখটা ভেসে উঠল মনে। বিবাহিত, চার পাঁচটি ছেলে মেয়ে, বউটি আসন্ন-প্রসবা। ওই ছোকরার এই কাণ্ড! ও যে এমন ভাল বাংলা জানে তাই বা কে জানত!

"মন্মথ কোথায়, ডাকুন তাকে।"

"সে একটা ইনজেকশন্‌ দিতে গেছে। আসবে একটু পরে। আপনি বাড়ি যান, আমি জিজ্ঞেস করব তাকে। এতে এত বিচলিত হবার কি আছে, চিঠিই তো লিখেছে আর তো কিছুই করে নি—"

"কিছুই করে নি? এ কথা আপনার মতো বিজ্ঞ লোকের কাছে আশা করিনি। করবার আর বাকী কি রেখেছে! ভদ্রঘরের নিষ্পাপ কুমারীকে এমনভাবে প্রলুব্ধ করাটা কিছুই নয় না কি আপনার চক্ষে—!"

"না, না তা বলছি না, অন্যায় খুবই করেছে। আরও গড়াতে পারতো তো—"

"আমার বাড়িতে পারতো না। এখনও পারে না! কিন্তু চিঠি বন্ধ করি কি করে বলুন। বাড়ির সব জানলা কপাট তো চব্বিশ ঘণ্টা বন্ধ করে রাখতে পারি না। আপিস কামাই করে বসেও থাকা যায় না মেয়েকে পাহারা দিয়ে—"

"তা তো বটেই—"

ইচ্ছে হল বলি, কাউকেই কেউ পাহারা দিয়ে সৎপথে রাখতে পারে না, নিজেই নিজেকে পাহারা দিতে হয়। কিন্তু একথা বললে পুরুষোত্তম বোমার মতো ফেটে

পড়বেন। তাই বললাম, "আমি মন্মথকে শাসন করে দেব। আপনি আর এ নিয়ে বেশী হৈচৈ করবেন না। এ ধরনের কথা চাউর হয়ে গেলে বুঝছেন না—"

"চাউর হয়ে গেছে! তাই না আপনার কাছে এসেছি। বাড়ির ঝি চাকর পর্যন্ত জেনেছে। এখন আর চাপা দেওয়া যাবে না, খোলাখুলি তদন্ত করতে হবে—"

"খোলাখুলি তদন্ত করার বিপদও আছে। ধরুন যদি ব্যাপারটা সত্যিই হয়, আপনি কি মন্মথর সঙ্গে আপনার মেয়ের বিয়ে দেবেন?"

"বিয়ে দেব? আই শ্যাল শুট হিম—"

"কিন্তু আপনার মেয়ের ভবিষ্যতের কথা ভাবুন। এ রকম একটা খোলাখুলি তদন্ত হওয়ার পর কোনও ভদ্রঘরে কি তার আর বিয়ে দিতে পারবেন—"

"তাকে গলাধাক্কা দিয়ে বাড়ি থেকে বের করে দেব যদি প্রমাণিত হয় যে সেও চিঠি লিখেছে, আপনার মন্মথকে সেইটেই জিজ্ঞেস করুন। আই ওয়াণ্ট প্রুফ, সলিড প্রুফ—"

পুরুষোত্তম হুঙ্কার দিয়ে টেবিলে ঘুসি মারলেন একটা। দেখলাম তার নাকের ফুটো খুব বড় হয়ে গেছে, ডগাটা কাঁপছে।

"বেশ, আপনি বাড়ী যান এখন। মন্মথ আসুক তাকে জিজ্ঞেস করি। সন্ধ্যের পর আসবেন একবার তখন বিচার করা যাবে—"

হঠাৎ পুরুষোত্তম আমার পা দুটো জড়িয়ে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন।

"আমি গরীব কেরাণী হতে পারি, তা বলে কি আমার মান ইজ্জত কিছুই নেই, কত বড় বংশের ছেলে আমি—"

"উঠুন, উঠুন, বাড়ি যান এখন। সব ঠিক হয়ে যাবে, ভাবছেন কেন—"

পুরুষোত্তম চলে গেলেন।

॥ দুই ॥

মন্মথ দেখলাম আমাকে এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করছে। আমাকেও মাঝে মাঝে 'কলে' বেরুতে হয়েছে। দুপুরে যখন ফিরলাম তখন আড়াইটে বেজে গেছে। মন্মথ তখনও দেখলাম কাজে ব্যস্ত রয়েছে খুব। প্রসঙ্গটা তখন উত্থাপন করা সমীচীন হল না। কি জানি উত্তেজিত হয়ে বা অভিভূত হয়ে যদি প্রেসক্রপশন সার্ভ করতে ভুল করে, মুশকিল হবে। বিকেল পাঁচটা নাগাদ ডাকলাম তাকে।

"মন্মথ শোন, একটা কথা আছে—"

ডিসপেন্সারীতে আর তৃতীয় ব্যক্তি ছিল না, সুতরাং সুবিধে হল।

"কি বলছেন।"

"পুরুষোত্তমবাবু আজ সকালে আমাকে এই চিঠিগুলো দিয়ে গেছেন। এগুলো তুমি লিখেছ?"

দেখলাম মন্মথর চোখেমুখে একটা মরীয়া ভাব ফুটে উঠল। কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে সে বললে—

"হ্যাঁ, এগুলো আমারই লেখা।"

এ রকম সাফ জবাব প্রত্যাশা করিনি।

"ভদ্রলোকের মেয়েকে এরকম চিঠি লেখার মানে ?"

মন্মথ চুপ করে রইল।

"উত্তর দিচ্ছ না যে—"

"আমি ওকে ভালবাসি, স্যার।"

লক্ষ্য করলাম গলা একটু কেঁপে গেল।

"তুমি উগ্রক্ষত্রিয়, বিবাহিত, ছেলে-পিলে আছে তোমার, তুমি হঠাৎ ব্রাহ্মণের কন্যাকে ভালবাসতে গেলে কেন—"

"মাপ করবেন স্যার। এ 'কেন'র জবাব দিতে বড় বড় কবিরা পারেন নি, আমিও পারব না। কিন্তু বিশ্বাস করুন সত্যিই আমি তাকে ভালবাসি।"

"কিন্তু এরকম ভালবাসার পরিণাম কি জান ?"

"জানি—"

"তবে—?"

মন্মথ চুপ করে রইল। জবাব সে আগেই দিয়েছিল। বড় বড় কবিরা যে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন নি, সে প্রশ্নের নিরুত্তরই উত্তর।

"ফন্তুর সঙ্গে তোমার আলাপ হল কি করে।"

"একদিন দেখলাম সে তাদের বাইরের বারান্দায় বসে বসে কাঁদছে। আমি যাচ্ছিলাম সেদিক দিয়ে। জিজ্ঞাসা করলাম কাঁদছ কেন। সে বললে বড্ড মাথা ব্যথা করছে। জিজ্ঞাসা করলাম—ওষুধ খাওনি কিছু? বললে—বাবা এক ডোজ হোমিওপ্যাথিক ওষুধ দিয়েছেন। বলেছেন সাতদিন পরে আর এক ডোজ দেবেন। আমি ফিরে এসে তাকে অ্যাসপিরিনের গুলি পাঠিয়ে দিলাম একটা। তার পর মাঝে মাঝে লুকিয়ে সে অ্যাসপিরিনের গুলি নিতে আসত। বিলটুকেও পাঠাত মাঝে মাঝে। এই রকম করেই আলাপ শুরু হয়।"

"তারপর—?"

মন্মথ চুপ করে রইল।

"চিঠি লিখতে আরম্ভ করলে কবে থেকে ?"

"তার কিছুদিন পর থেকে।"

"চিঠি নিজেই গিয়ে দিয়ে আসতে ?"

"আজ্ঞে না।"

"তবে—?"

"বিলটুর হাতে পাঠাতাম।"

"তোমার চিঠির জবাব পেয়েছ কিছু ?"

"অনেক। রোজই পাই—"

"রোজই ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, প্রায় রোজই। ফন্তুও আমাকে সত্যি ভালবাসে স্যার। আপনার যদি বিশ্বাস না হয় দেখাচ্ছি আপনাকে তার চিঠি—"

মন্মথ চলে গেল এবং খানিকক্ষণ পরে সে-ও এক বাণ্ডিল চিঠি নিয়ে এল। চক্ষুস্থির হয়ে গেল আমার। প্রতি চিঠিতেই সম্বোধন—প্রাণেশ্বর! বানানটা অবশ্য

ঠিক করে লিখতে পারে নি, লিখেছে—"প্রাণেরসর"। অতিশয় চিন্তিত হয়ে পড়লাম। এই সব চিঠি যদি পুরুষোত্তমবাবু দেখেন তাহলে—!

মন্মথকে বললাম, "আচ্ছা, তুমি যাও, চিঠিগুলো থাক আমার কাছে—"

মন্মথ চিঠিগুলোর দিকে একবার সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করে চলে গেল।

ঠিক সন্ধ্যা বেলায় মন্মথ গেল ইনজেকশন দিতে। একটু পরে পুরুষোত্তমবাবু এলেন। আমি ভেবে চিন্তে একটা বুদ্ধি বের করে রেখেছিলাম।

"আপনার মেয়ের হাতের লেখা খানিকটা চাই। মন্মথর কাছ থেকে কোনও চিঠি যদি বেরোয় মিলিয়ে দেখতে হবে। আপনি বাড়ি গিয়ে তাঁকে দিয়ে খানিকটা বাংলা লিখিয়ে আনুন। নিজের সামনে লেখাবেন।"

"নিশ্চয়ই।"

পুরুষোত্তমবাবু চলে গেলেন এবং একটু পরেই ফিরে এসে ফন্তুর হস্তাক্ষর দাখিল করলেন আমার সামনে।

"আপনার সামনে লিখেছে তো—"

"নিশ্চয়ই। আমি 'ভক্তিযোগ' থেকে ডিকটেট করেছি সে লিখেছে—"

লেখা দেখে আশ্বস্ত হলাম। একেবারে আলাদা হস্তাক্ষর। কিন্তু ও চিঠিগুলো কার লেখা তাহলে!

বললাম, "আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন আপনার মেয়ে মন্মথকে কোনও চিঠি লেখেনি।"

"কি করে জানলেন—"

"মন্মথর কাছে যে চিঠি পেয়েছি তার হস্তাক্ষর একেবারে আলাদা।"

"আমি স্বচক্ষে দেখতে চাই সেটা—"

দেখালাম একখানা চিঠি।

পুরুষোত্তমবাবুর মুখের মেঘ অনেকটা কেটে গেল। বললাম—"মন্মথকে শাসন করে দেব আমি। আর ও চিঠি লিখবে না। আমি গ্যারাণ্টি রইলাম। ফের যদি চিঠি পান, আমাকে এনে দেখাবেন, আমি দূর করে দেব ওকে—"

সন্তুষ্ট হয়ে পুরুষোত্তমবাবু চলে গেলেন।

আমি কিন্তু কৌতূহলী হয়ে উঠলাম। ফন্তুর নাম দিয়ে ও চিঠিগুলো কে লিখলে!

বিলটুকে ডেকে পাঠালাম।

"আমাকে ডেকেছেন?"

"হ্যা। কেমন আছ তুমি।"

"ভাল আছি। ও বেলা স্ট্যু খুব ভাল লেগেছিল। এ বেলা দুখানা রুটি খাব?"

"আগে একটা কাজ কর দেখি। তোমার পুরোনো বাংলা হাতের লেখার খাতা আছে—"

"এইখানেই তো আছে—"

"নিয়ে এসো।"

"কি করবেন খাতা নিয়ে—"

"দরকার আছে। আন না—"

বিলটু এক ছুটে গিয়ে খাতা নিয়ে এল। সমস্যার সমাধান হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। বিলটুই যে চিঠিগুলির লেখক তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ রইল না। মন্মথ ইনজেকশন দিতে গিয়েছিল, সে-ও এসে ঢুকল।

বললাম—"মন্মথ, তোমার চিঠির একখানাও ফন্তির লেখা নয়—"

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। বিলটুর মুখও ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছিল।

"ফন্তুরই লেখা স্যার। বিলটুকে জিজ্ঞাসা করুন।"

একখানা চিঠি বার করে বিলটুকে দেখালাম।

"এসব চিঠি কে লিখেছে—"

বিলটু ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল আমার দিকে।

"সত্যি কথা বল—"

"আমি লিখেছি। শৈলদি, আভাদি, পুষ্পদি যা যা বলে দিত আমি লিখে দিতুম। ফন্তিদি একদিনও লেখায় নি—"

"তুমি লিখতে কেন—"

"উত্তর এনে দিলে কম্পাউন্ডারবাবু আট আনা পয়সা দিতেন যে। সেই পয়সা দিয়ে আমরা সবাই মিলে রসগোল্লা খেতাম।"

মন্মথকে বকতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু তার বিবর্ণ মুখের দিকে চেয়ে আর বকতে পারলাম না।

বর্ণে বর্ণে

॥ এক ॥

একটি বাদামি, অপরটি কালো। দুইটিই বেশ হৃষ্টপুষ্ট, সতেজ এবং কচি। যাঁহারা পছন্দ করিতে আসিয়াছিলেন তাঁহারা দুইটিকেই দেখিয়া গেলেন। তাঁহারা চলিয়া যাইবার পর বাদামি বলিল, "আমাকেই পছন্দ করবে দেখিস।"

কালো উত্তর দিল, "কি করে জানলি সেটা?"

"দেখলি না আমার দিকে কেমন করে চাইছিল।"

"আমার দিকেও তো চাইছিল।"

"তোর দিকে যে ভাবে চাইছিল তা আমি দেখেছি। কিন্তু তুই শুধু চাউনিটাই দেখেছিস, ঠোঁটের কোণে যে হাসিটা উঁকি দিচ্ছিল তা দেখিস নি।"

উভয়ে তর্ক করিতে লাগিল।

যাঁহারা পছন্দ করিতে আসিয়াছিলেন তাঁহারা বলিয়া গিয়াছেন কাহাকে পছন্দ হইল খবর পাঠাইবেন।

॥ দুই ॥

ঠিক পাশের বাড়িতে আর একটি অনুরূপ ঘটনা ঘটিতেছিল। সে বাড়িতেও একটি বাদামি, আর একটি কালো। যাঁহারা পছন্দ করিতে আসিয়াছিলেন তাঁহারা

নানাভাবে দুইটিকে দেখিলেন, কিন্তু কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিলেন না। তাঁহারাও যাইবার সময় বলিয়া গেলেন যে পরে খবর পাঠাইবেন কাহাকে পছন্দ হইল।

দ্বিতীয় বাড়ির বাদামি এবং কালো তর্ক করিল না। তাহারা তাহাদের অভিমত আপন আপন অন্তরেই নিবদ্ধ রাখিল।

বাদামি ভাবিল, "পছন্দ আমাকেই করবে, ওই কুচকুচে কালোকে কেউ আবার পছন্দ করে না কি—"

কালো ভাবিল, "রং আমার কালো বটে কিন্তু আমার চোখ, আমার নাক, আমার মুখের গড়ন এ সবের কি কোন দাম নেই? ওর রংটা হয়তো একটু ফিকে কিন্তু ওই থ্যাবড়া নাক, বসা চোখ, প্রকাণ্ড হাঁ কি পছন্দ করবার মতো?"

॥ তিন ॥

প্রথম বাড়িতে পছন্দ হইল কালোটিকে। কারণ শ্যামাপুজোয় কালো পাঁঠা বলি দেওয়াই নিয়ম।

দ্বিতীয় বাড়িতে পছন্দ হইল বাদামিকে। কারণ যিনি তৃতীয় পক্ষে বিবাহ করিবেন তিনি কালো মেয়ে দু'চক্ষে দেখিতে পারেন না।

পক্ষী বদল

ইন্দুবালার কথা শুনে অবাক হয়ে গেলাম।

ইন্দুবালা যা বলছে সেটা অবিশ্বাস্য। কিন্তু আমি নিজের চোখে যেটা রোজ দেখছি সেটাকে তো অস্বীকার করা যায় না। জিতেনবাবুর, (মানে ইন্দুবালার স্বামীর,) স্বভাব সত্যিই বদলেছে খুব। বিলেত যাবার আগে যে জিতেনবাবুকে আমি চিনতাম তাঁর সঙ্গে সত্যিই এঁর আকাশ-পাতাল তফাত। তিনি সিগারেট দূরের কথা পানটি পর্যন্ত খেতেন না, অত্যন্ত নিষ্ঠাচারী নির্বিবাদী লোক ছিলেন, কারও সাতে-পাঁচে থাকতে দেখিনি কখনও তাঁকে। খুটখুট করে নিজের কাজকর্ম করতেন, আর অবসর পেলে দাওয়ায় বসে কৃত্তিবাসী রামায়ণটি পড়তেন। রাস্তায় দেখা হ'লে মৃদু হেসে সসংকোচে সরে দাঁড়াতেন এক ধারে, যেন রাস্তায় সামনা-সামনি দেখা হয়ে যাওয়াটা মস্ত অপরাধ। কোন বিষয়ে তাঁকে প্রতিবাদ করতেও শুনিনি, জীবনের সমস্ত ঝঞ্ঝাট ঝামেলাকে তিনি সবিনয়ে মেনে নিয়েছিলেন, সমস্ত অত্যাচার অবিচারকেও। অর্থাৎ তিনি জীবন যুদ্ধের সৈনিক ছিলেন না। জীবন সম্বন্ধে তাঁর মনোভাব ছিল অনেকটা স্টেশন প্লাটফর্মের যাত্রীর মনোভাবের মতো। একটু পরেই ট্রেন এলেই তো চলে যেতে হবে, প্লাটফর্ম নিয়ে বা প্লাটফর্মে সমবেত যাত্রী-যাত্রিনীদের নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ কি! যতক্ষণ ট্রেনটা না আসছে ততক্ষণ ভদ্রতা বজায় রেখে কোন রকমে গা বাঁচিয়ে থাকতে পারলেই যথেষ্ট। এই তাঁর মনোভাব।

কিন্তু বিলেত থেকে ফিরে এসে যে জিতেনবাবুকে আমি দেখলাম তিনি একেবারে অন্যলোক। টিন টিন সিগারেট ওড়াচ্ছেন, ক্রমাগত পান জরদা খাচ্ছেন, হাফশার্ট পরে

বাটারফ্লাই গোঁফ রেখে একটা মোটর সাইকেল চড়ে দামড়ে বেড়াচ্ছেন চতুর্দিকে। নেতাও হয়েছেন একটা উগ্রপন্থী রাজনৈতিক দলের। বিলেত যাবার আগে আমি যে জিতেনবাবুকে চিনতাম তিনি সসঙ্কোচে সব কিছুই মেনে নিতেন, এ ভদ্রলোক যেন কিছুই মানতে চান না। এখানকার প্রবীণ উকিল গোলকবাবুই ছিলেন আমাদের মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান। তাঁকে সরাবার কল্পনাও কেউ কখনও করিনি আমরা। বিলেত থেকে ফিরে এসে দেখি তাঁকে পদচ্যুত করে জিতেনবাবু নিজেই চেয়ারম্যান হয়েছেন। যে লোক ধীর স্থির বিনয়ী নির্বিবাদী ছিল সে যে এমন অশান্ত চঞ্চল উগ্র একগুঁয়ে হয়ে উঠতে পারে তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা সত্যিই শক্ত। এ যা ধরবে তা করবেই। মাথায় গুরুতর আঘাত লাগলে চরিত্রের এ রকম পরিবর্তন হয় শুনেছি। গল্পে উপন্যাসে পড়েছি, সিনেমাতেও তো হরদম দেখছি অন্ধ দৃষ্টি ফিরে পাচ্ছে, বোবা কথা কইছে, শয়তান দেবতা হয়ে যাচ্ছে। জিতেনবাবুও মাথায় গুরুতর আঘাতই পেয়েছিলেন। প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে একবার তিনি গ্রামান্তর থেকে ফিরছিলেন। গাছের প্রকাণ্ড একটা ডাল ভেঙে নাকি তাঁর মাথায় পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে বজ্রাঘাতও হয় একটা। জিতেনবাবু অজ্ঞান হয়ে পড়েন। জিতেনবাবুর সঙ্গে ছিল জিতেনবাবুর চাকর হারু। সে-ই দৌড়ে গিয়ে লোকজন ডেকে আনে। সবাই ধরাধরি করে অজ্ঞান অবস্থাতেই বাড়িতে তুলে আনে তাকে। বাড়িতে কান্নাকাটি পড়ে গেল। চোখ বন্ধ, নিশ্বাস পড়ছে না, নাড়ি পাওয়া যাচ্ছে না দেখে সবাই ভেবেছিল সে মরেই গেছে। এমন কি বিনোদ ডাক্তার পর্যন্ত। জিতেনকে খাটিয়ায় তুলে শ্মশানের উদ্দেশ্যেও নাকি যাত্রা করেছিল সবাই। পথের মাঝে এক গাছতলায় খাটিয়া নামাবার পর দেখা গেল, জিতেনের হাত-পা নড়ছে, নিশ্বাস পড়ছে একটু একটু। তারপর চোখ খুলে চাইলেন। শুনেছি একটু হেসেও ছিলেন না কি! তখন সবাই আবার তাকে বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে এল। যে আঘাত তাকে মৃতবৎ করে ফেলেছিল তা যে খুবই সাংঘাতিক তাতে সন্দেহ করবার কিছু নেই, তাতে চারিত্রিক পরিবর্তন হতেও পারে। চারিত্রিক পরিবর্তন যে হয়েছে তা তো দেখতেই পাচ্ছি কিন্তু তার স্ত্রী ইন্দুবালা যা বলছে তা কি বিশ্বাস্য? আদালত তা বিশ্বাস করবে? আমার মনে হয় না। কিন্তু জিতেনবাবুও না-ছোড়, তিনি আদালতে কেস ঠুকে দিয়েছেন। মকোদ্দমায় শেষ পর্যন্ত কি হবে তা বলা শক্ত।

জিতেনবাবুকে একদিন বলেছিলাম, “ইন্দু যখন আপনাকে স্বেচ্ছায় ছেড়ে চলে গেছে তখন আপনি আবার একটা বিয়ে করুন না। আপনার যখন ছেলেপিলে হয় নি করতে বাধাটা কি। কেউ দোষ দেবে না আপনাকে।”

জিতেনবাবু কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন, তারপর আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে বললেন, “ইন্দুকেই আমার চাই। এর জন্য যদি সর্বস্ব পণ করতে হয় তাও করব।”

ইন্দু দূর সম্পর্কের বোন হয় আমার। মরা জিতেনবাবু বেঁচে ওঠবার পরেই সেই যে সে কোলকাতায় তার বাপের বাড়ি চলে গেছে, আর ফেরেনি। আর ফিরবেও না চিঠি লিখেছে। জিতেনবাবু কিন্তু ছাড়বেন না। আইনত লড়ে দেখতে চান তিনি। তাঁর ভাবগতিক দেখে মনে হচ্ছে আইনত যদি তিনি ইন্দুকে আনতে না পারেন, বে-আইনী উপায় অবলম্বন করতেও ইতস্তত করবেন না।

মনে করলাম নিজেই একবার কোলকাতা চলে যাই, ইন্দুকে বুঝিয়ে দেখি সে যদি আসতে রাজি হয়। আদালতে এ নিয়ে কেলেঙ্কারি করাটা সব দিক থেকেই অশোভন। ইন্দুর বাবাকে চিঠি লিখে কোনও ফল হয় নি। তিনি উত্তর দিয়েছেন, "ইন্দু তার স্বামীর ঘর করুক এটা আমারও কম কাম্য নয়। তাকে অনেক বুঝিয়েছি, কিন্তু সে কিছুতেই রাজি হচ্ছে না, কি করব বল। মেয়েকে তো আর দূর করে দিতে পারি না। তুমি এসে যদি বুঝিয়ে ওকে নিয়ে যেতে পার আমি আনন্দিতই হব!"

একদিন চলেই গেলাম। গিয়ে দেখি ইন্দু বিধবার বেশ পরে আছে। আড়ালে ডেকে বললাম, "ব্যাপার কি বল দেখি! স্বামী থাকতে বিধবার বেশ কেন?"

"উনি আমার স্বামী নন।"

"স্বামী নন তো কে?"

"উনি বীরেনবাবু—"

ক্ষণকাল চুপ করে থেকে ইন্দু বললে, "আমি যখন কলেজে পড়তাম তখন বীরেনবাবু বলে একজন ভদ্রলোক আমাকে বিয়ে করবার জন্যে খুব ঝুঁকেছিলেন। কিন্তু তিনি কায়স্থ ছিলেন বলে বাবা বিয়ে দেন নি। বীরেনবাবু তারপর আমাকে চিঠি লেখেন যে আমি তার সঙ্গে পালিয়ে যেতে রাজি আছি কি না। লোকটাকে আমি দু'চক্ষে দেখতে পারতাম না। কড়া গোছের একটা উত্তর লিখে দিলাম। চিঠি পেয়ে তিনি আত্মহত্যা করলেন। আমার বিশ্বাস তারই প্রেতাত্মা আমার মৃত স্বামীর দেহে ভর করে আছে।"

আমি সবিস্ময়ে ইন্দুর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম।

পাগল টাগল হয়ে যায় নি তো!

"হঠাৎ তোমার এমন আজগুবি ধারণা হল কেন?"

"এর চাল-চলন, কথাবার্তা, চোখের চাউনি ঠিক বীরেনবাবুর মতো, আমার স্বামীর মতো একটুও নয়। তা ছাড়া আর একটা কাণ্ড যা ঘটেছিল তা শুনলে আপনারা কেউ বিশ্বাস করবেন না।"

"কি কাণ্ড?"

"গত মাঘ মাসে একদিন অনেক রাত করে উনি বাড়ি ফিরলেন। ওঁর খাবার ঢাকা দেওয়া ছিল। আমি জেগেছিলাম খালি। আর সবাই ঘুমিয়ে পড়েছিল। ফিরে এসে উনি বসে খাচ্ছিলেন, আমি সামনে বসেছিলাম। খেতে খেতে হঠাৎ বললেন, আমাকে একটু পেয়ারার জেলি এনে দাও তো। জেলি ছিল ভাঁড়ার ঘরে। প্রকাণ্ড উঠোন পেরিয়ে সেই শীতে ভাঁড়ার ঘরে গিয়ে জেলি আনতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। বললাম, কাল এনে রাখব। আজ গুড় দিয়ে ওই রুটিখানা খেয়ে নাও না। উনি বললেন, জেলি আমার এখনই চাই, কাল পর্যন্ত তর সইবে না। জীবনে যখনই যা চেয়েছি না নিয়ে ছাড়িনি। জান ত' কথায় বলে স্বভাব যায় না ম'লে। আমারও যায়নি। জাতিভেদের অজুহাতে বীরেন মিত্তিরকে তোমরা ঠেকিয়ে রাখবে ভেবেছিলে, কিন্তু তা যে পারনি সেটা তুমি অন্তত বুঝেছ এত দিনে।"

ইন্দুর কথা শুনে আমি অবাক হয়ে গেলাম। আপনারাও হচ্ছেন নিশ্চয়।

বললাম, "তার মানে তুমি বলতে চাও খাঁচাটা ঠিক আছে পাখীটা বদলে গেছে?"

ম্লান হেসে ইন্দু বললে, "তাই তো মনে হচ্ছে।"

কার্য কারণ

॥ এক ॥

বৃষ্টি পড়িলে এখনও আমার পীরু মিঞা এবং ভুতনাথের কথা মনে পড়ে। কার্যকারণের সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে গিয়া যাঁহারা কেবল স্থূল স্বার্থপরতা ছাড়া আর কিছু হিসাবের মধ্যে ধরিতে চান না, তাঁহারা বুদ্ধিমান ব্যক্তি। হয়তো পীরু মিঞা এবং ভুতনাথের আচরণের মধ্যেও প্রচ্ছন্ন স্বার্থ নিহিত ছিল, বিশ্লেষণ করিবার প্রবৃত্তি হয় নাই, কারণ মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলাম।

॥ দুই ॥

প্রায় পঁচিশ বছর আগেকার কথা।

দুই দিন হইতে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পড়িতেছিল। মুষলধারা বৃষ্টির সহিত উন্মত্ত পবন মিলিয়া যে কাণ্ড করিতেছিল, তাহা প্রায় অবর্ণনীয়। সভ্যতা হইতে বেশ কিছু দূরে (স্টেশন হইতে দশ ক্রোশ, পোস্টাপিস হইতে দুই ক্রোশ) যে গ্রামে তখন আমাদের বাস ছিল, তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থা অকথ্য হইয়া উঠিয়াছিল। একটি গাছ খাড়া ছিল না, খড়ের চাল উড়িয়া গিয়াছিল, মাটির দেওয়ালগুলি ভুশায়ী হইয়াছিল, নদী-নালা, খাল-বিল, মাঠ-ঘাট জলে কর্দমে পরিপূর্ণ হইয়া যে দৃশ্যের অবতারণা করিয়াছিল, তাহা বিদ্যাপতি বা চণ্ডীদাসের চিত্তে কি ভাব জাগাইত জানি না, আমার হৃদয়ে তাহা এক অপ্রত্যাশিত ভাব সঞ্চার করিয়াছিল, মনে পড়িতেছে। আমি মুগ্ধ হইয়া বসিয়া ছিলাম। বর্ষার শোভা দেখিয়া নয়, ইট, চুন, সুরকি ও সিমেন্টের মহিমা প্রত্যক্ষ করিয়া। গ্রামের মধ্যে একমাত্র আমাদের বাড়িটিই পাকা। ঝড়বৃষ্টির বিপুল তাণ্ডবে সেটি অক্ষত ছিল।

আমার সেই মুগ্ধ ভাবও কিন্তু মধ্যে মধ্যে বিঘ্নিত হইতেছিল। আমি একজনের আগমন প্রত্যাশা করিতেছিলাম। প্রিয়ার নয়, পিওনের। তখন প্রিয়া-বিরহে ব্যাকুল হইবার বয়স হয় নাই। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়া বাড়িতে বসিয়া ছিলাম। কলিকাতার বন্ধু ছকুকে টাকা দিয়া আসিয়াছিলাম, পরীক্ষার ফল বাহির হইবামাত্র তারযোগে যেন আমাকে জানায়। সে জানাইবে ঠিক, কিন্তু এই দুর্যোগে এক্সপ্রেস তারও কি এই সুদূর মফঃস্বলে পৌঁছিবে? পোস্টাপিস দুই ক্রোশ দূরে, টেলিগ্রাম যদি পৌঁছিয়াও থাকে, এই ঝড়বৃষ্টি মাথায় করিয়া পিওন কি আসিতে পারিবে? পিওনকে অবশ্য বারবার বলিয়া আসিয়াছি, বকশিশের লোভও দেখাইয়াছি, কিন্তু যে রকম দুর্যোগ···

আর একটা কারণে আশা করিতেছিলাম যে, পিওন হয়তো আসিতে পারে। আমি এবং ওপারের ভুতনাথ এ অঞ্চলের মাত্র এই দুইটি বালকই এবার ম্যাট্রিকুলেশন দিবার সুযোগ পাইয়াছি। দশ ক্রোশের ভিতর একটি লোয়ার প্রাইমারি স্কুল ছাড়া আর কোনও বিদ্যালয় সেকালে ছিল না। সুতরাং আমাদের পরীক্ষার ফল কি হয়, জানিবার জন্য সকলেই উৎসুক। সকলেই প্রতীক্ষা করিতেছিল, আমরা এ অঞ্চলের মান রাখিতে পারি কি না।

বাহিরের ঘরটিতে উৎকর্ণ হইয়া বসিয়া ছিলাম। বৃষ্টির বিরাম নাই। ভেককুলের আনন্দ-কলরবে চতুর্দিক মুখরিত। বাতায়ন দিয়া যতটুকু দেখিতে পাইতেছিলাম, তাহাতে হতাশই হইতেছিলাম। জনপ্রাণী কেহ নাই, কেবল বাতাসের বেগে সদ্যচ্ছিন্ন পত্ররাশি মাঝে মাঝে উড়িয়া আসিয়া কাদায় লুটাইয়া পড়িতেছে। ডোবার ধারে কয়েকটি বক চিত্রার্পিতবৎ বসিয়া আছে। এই দুর্যোগেও তাহাদের ধ্যানভঙ্গ হয় নাই। মাঝে মাঝে ছাগলের ডাকের মতো শব্দ পাইতেছিলাম, আমাদের চাকরটা বলিল যে, উহাও ব্যাঙের ডাক।

সূর্যদেবের দেখা নাই। আকাশ মেঘময়। সকাল এবং বিকালের একই রূপ। কিন্তু সন্ধ্যা যখন ঘনাইয়া আসিল, তখন সে-রূপ আরও ভয়ংকর হইয়া উঠিল। বাতাসের বেগ আরও বাড়িল, আকাশে আরও মেঘ ঘনাইয়া আসিল, বিদ্যুৎস্ফুরণে বজ্রগর্জনে চতুর্দিক সচকিত হইয়া উঠিল। মনে হইতে লাগিল, বুঝি প্রলয়ের কালরাত্রি ঘনাইয়া আসিতেছে।···ঠিক করিলাম বাহিরের ঘরেই শুইব। পিওনের আসিবার আশা নাই। কিন্তু যদি আসে···

॥ তিন ॥

গভীর রাত্রে ধড়মড় করিয়া বিছানায় উঠিয়া বসিলাম। জোরে শব্দ হইল। বাজ পড়িল না কি ? কান পাতিয়া রহিলাম। বাহিরে বাতাস ও বৃষ্টির মাতামাতি সমানে চলিয়াছে। আবার শব্দ হইল। কড়া-নাড়ার শব্দ। তাড়াতাড়ি উঠিয়া কপাট খুলিলাম। তবে কি ··

কপাট খুলিতেই কিন্তু আপাদমস্তক সিক্ত ও কর্দমাক্ত যে ব্যক্তিটি হুড়মুড় করিয়া ঢুকিয়া পড়িল, সে পিওন নয়, পিরু মিঞা। তাহার বাঁকা নাক এবং সামনের ফোকলা দাঁত ভুল হইবার নয়। কিন্তু এ সময়ে, এই ভীষণ দুর্যোগের মধ্যে জমিদার জবরদস্ত খাঁর গোমস্তা পীরু মিঞাকে দেখিব বলিয়া প্রত্যাশা করি নাই।

"আরে খোকাবাবু তুমি বাইরে আছ, ভালই হয়েছে, তোমার কাছেই এসেছি, বড় জরুরি দরকার—"

"কি বলুন তো ?"

"এই চিঠিখানা পড়। চেঁচিয়েই পড়—"

পড়িলাম—কে একজন বিনোদ সিংহ লিখিতেছে—"মিঞা সাহেব, আদাব জানিবেন। খোদার মরজিতে আশা করি খুশমেজাজে আছেন। আপনার মনিব শেখ জবরদস্ত খাঁ আগামী শুক্রবার ফিরিবেন। তাঁহার জন্য ঘাটে প্রত্যুষে যেন নৌকা প্রস্তুত থাকে। তাঁহার হুকুমে এই পত্র আপনাকে লিখিতেছি।"

চিঠি পড়া শেষ হইবামাত্র পীরু মিঞা প্রশ্ন করিলেন—"প্রত্যুষ মানে কি ?"

"প্রত্যুষ মানে ভোর।"

"ভোর মানে কি ?"

"ভোর মানে সকাল।"

"কি বিপদ! সকাল মানে কি! যখন পহেলা মোরগ ডাকে, তখনও সকাল, যখন দোসরা মোরগ ডাকে, তখনও সকাল। প্রত্যুষ মানে কোন্ সকাল ?"

বিব্রত হইলাম। অভিধান খুঁজিলেও এ প্রশ্নের সদুত্তর মিলিবে কিনা সন্দেহ। পীরু মিঞার কাছে নিজের অজ্ঞতা প্রকাশ করিতে বাধিল। বলিয়া দিলাম—"যখন পহেলা মোরগ ডাকে তখনই প্রত্যুষ।"

"ঠিক তো ?"

"ঠিক।"

"যাক, নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। জানতাম, তোমার কাছে এলেই হদিস পাব।"

"এই জন্যেই আপনি এসেছিলেন ?"

"এই জন্যেই—"

বিস্মিত হইলাম।

"এই দুর্যোগ মাথায় করে একটা কথার মানে জানতে এসেছেন !"

"কাল ঠিক 'প্রত্যুষে' যদি নৌকা হাজির না থাকে, তাহলে দুর্যোগ আরও ভয়ানক হবে। জবরদস্ত খাঁকে তুমি চেন না খোকাবাবু।"

পীরু মিঞার চোখে একটা গর্ব যেন জ্বলজ্বল করিয়া উঠিল।

"কেন, কি করবেন তিনি ?"

"একদিন কি করেছিলেন দেখ—"

পীরু মিঞা তাঁহার বাঁকা নাক ও ফোকলা দাঁতের দিকে এমনভাবে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া রহিলেন, যেন আমাকে কাহারও মহৎ কীর্তি দেখাইতেছেন।

"তখন আমারও জোয়ান বয়েস, খাঁ-সাহেবেরও জোয়ান বয়েস। তোমাদের তখন জন্ম হয় নি। ফুনশিয়ার মাঠে বগেরি শিকার করতে গিয়েছিলেন। বলে গিয়েছিলেন, আমি যেন ঠিক সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়া নিয়ে হাজির হই। আধ ঘণ্টা দেরি হয়েছিল আমার। ঠিক মুখের উপর বুটসুদ্ধ এইসা লাথি ঝাড়লেন যে—"

পীরু মিঞা বাক্য শেষ করিলেন না। ফোকলা দাঁত দুইটি আরও প্রকটিত করিয়া একটু হাসিলেন শুধু।

"কিসে করে এলেন এতদূরে আপনি ?"

'মোষের গাড়িতে। হাঁটতেও হয়েছে একটু। গাছ পড়ে রাস্তাই বন্ধ হয়ে গেছে যে। আচ্ছা, আমি আর বসব না। নৌকোর ব্যবস্থা করতে হবে গিয়ে—"

পীরু মিঞা চলিয়া গেলেন। আমি সবিস্ময়ে ভাবিতে লাগিলাম, সত্যই কি পীরু মিঞা প্রাণের ভয়েই এতটা কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন ?

আধঘণ্টা পরে আর এক কাণ্ড ঘটিল। আপাদমস্তক ভিজিয়া ভুতনাথ আসিয়া হাজির হইল। তাহার বাড়ি নদীর ওপারে। সাঁতরাইয়া আসিয়াছে !

"তুই ফাস্ট ডিভিসনে পাশ করেছিস।"

"কি করে জানলি ?"

"কোলকাতার চিঠি পেলাম একটু আগে। পিওনটা সন্ধের পর এল। তোর টেলিগ্রাম নিশ্চয় আসে নি। আসবে কি করে ? টেলিগ্রাফের তারই ছিঁড়ে গেছে। আমি ভাবলাম, তোকে সুখবরটা দিয়ে আসি।"

"তুই ?"

"আমি ফেল মেরেছি।"

ভুতনাথের হাসি আকর্ণ বিস্তৃত হইয়া গেল।

"আমি আর বসব না ভাই। মা ভাববে। মাকে লুকিয়ে পালিয়ে এসেছি।"

মুচকি হাসিয়া ভুতনাথও চলিয়া গেল।

ভুতনাথের সঙ্গে আমার প্রেমের সম্পর্ক ছিল না। ক্লাসের ওঁছা ছেলে বলিয়া তাহাকে ঘৃণাই করিতাম। গুণ্ডামি করিয়া বেড়ানোই তাহার কাজ ছিল। সে কেন···

কোনও সদুত্তর খুঁজিয়া পাইলাম না। আজও পাই নাই।

অনেক দিন পরে পীরু মিঞার সম্বন্ধে খুব বিশ্বস্তসূত্রে আর একটি খবর শুনিয়া আরও বিস্মিত হইয়াছি। ঘোড়া হইতে পড়িয়া গিয়াই নাকি পীরু মিঞার নাক বাঁকিয়াছিল, দাঁত ভাঙিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার মনিব জবরদস্ত খাঁ যে সত্য সত্যই জবরদস্ত, একথা সকলের কাছে সগর্বে প্রচার করিবার সুযোগ পাইলে তিনি সত্য-মিথ্যা, সম্ভব-অসম্ভবের গণ্ডী লঙ্ঘন করিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করেন না। প্রভু যে লাথি মারিয়া তাঁহার মুখের চেহারা বদলাইয়া দিয়াছেন, এই মিথ্যা কথা বলিয়া তিনি আনন্দিত হন, লজ্জিত হন না।

মহীয়সী মহিলা

ট্রেনে বেশ ভীড় ছিল। গ্রীষ্মের ছুটিতে বাড়ী ফিরছিলাম। থার্ড ক্লাসের টিকিট। আমি একটি কামরার এক কোণে অতি কষ্টে বসবার জায়গা করে নিয়েছিলাম, কিন্তু আর বসবার জায়গা ছিল না। দাঁড়িয়েছিল অনেকে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের লোক একসঙ্গে জুটেছিলাম সেই কামরাটিতে। বাঙালী, বিহারী, মাড়োয়ারী, সাঁওতাল, পাঞ্জাবী সরদার এবং আরও বহুপ্রকার ইতর অথবা ভদ্র চেহারার লোক কেবলমাত্র দেখে যাদের জাতিনির্ণয় করা অসম্ভব। পরস্পরের মধ্যে অমিল ছিল অনেক, মিলও হয়তো ছিলো। কিন্তু একটি বিষয়ে আমরা সর্বতোভাবে একমত হয়েছিলাম। কামরায় আর যেন কেউ উঠতে না পারে। ওঠবার সম্ভাবনাও অবশ্য কম ছিল, কারণ, কামরার ডানদিকের দরজায় দাঁড়িয়েছিলেন একজন ভোজপুরী সিপাহী। তার মুখে প্রকাণ্ড গোঁফ, হাতে বিরাট লাঠি। চোখ মুখের দৃষ্টিও কমনীয় নয়। আর বাঁদিকের দরজায় ছিলেন সরদারজি। ঘন ভ্রূ, ঘন চাপদাড়ি, গোঁফও মানানসই-রকম ঘন—মনুষ্যবেশী সিংহ একটি। প্রায় কোনও স্টেশনেই কেউ উঠতে সাহস করছিল না। বড় বড় দুটো জংসন পেরিয়ে গেল, সিপাহিজী এবং সরদারজিকে দরজার কাছ থেকে একচুল নড়াতে পারল না কেউ। সিপাহিজী এবং সরদারজীর উপর সমস্ত কামরাটির ভার দিয়ে আমরা সকলেই নিশ্চিন্ত হয়েছিলাম।

কিন্তু দক্ষিণ দ্বারে অবশেষে শত্রু হানা দিল। স্টেশনটি খুব ছোট। সিপাহিজী ভাবতেই পারেন নি যে, এই স্টেশনে এমন একটা পল্টন এসে হাজির হতে পারে। তিনি তাই খৈনি প্রস্তুত করতে ব্যস্ত ছিলেন। অর্থাৎ বাম করতলের উপর কিছু তামাক পাতা এবং চুন রেখে দক্ষিণ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দিয়ে নিবিষ্ট চিত্তে মর্দন করছিলেন সেগুলি। তাঁর দুটি হাত এবং মন, কোনটাই দ্বাররক্ষায় ব্যাপৃত ছিল না।

হঠাৎ বামাকণ্ঠে ভুল হিন্দিতে শোনা গেল—"রাস্তা ছোড়িয়ে না। কেবাড়িকা পাশ সংকা মাফিক খাড়া হ্যা কাহে—। হটিয়ে হটিয়ে—"

দ্বারপ্রান্তে দেখা গেল একটি বলিষ্ঠা মহিলা গাড়ির হাতল ধ'রে ঝুলছেন। প্রকাণ্ড গোল মুখ, গোল গোল চোখ, চিবুকের তলায় দু' থাক চর্বি, নাকে নথ, নথে টানা। মাথার কাপড় খুলে পড়েছে, আলুলায়িত কুন্তল লুটিয়ে পড়ছে পিঠের উপর। সিঁথিতে জ্বলজ্বল করছে সিঁদুর।

"হটিয়ে হটিয়ে। ট্রেন বেশী নেই থামে গা, গার্ড সাহেব ঝণ্ডি দেখাতা হ্যায়। হটিয়ে না—"

সিপাহিজী এ মূর্তি দেখে ঘাবড়ে গিয়েছিলেন একটু। কারণ, তাঁর কণ্ঠস্বরে এবং মুখভাবে একটু কোমলতার আমেজ পাওয়া গেল।

"কুছভি জগা নেই হ্যায় মাইজি—"

"আপ খোলিয়ে না, হটিয়ে না, হামলোক খাড়া হোকে যাঙ্গে। ই ট্রেণ ফেল করনে সে বাবুজিকা নোকরি চলা যাগা, কাল জয়েনিং তারিখ হ্যায়—হটিয়ে—"

"মগর।"

মহিলা আর অধিক বাক্যব্যয় না করে কপাট ঠেলে ঢুকে পড়লেন। সিপাহিজী আর তাঁকে বাধা দিতে সাহস করলেন না। তাঁর ঈষৎ অনুকম্পাও হয়েছিল বোধহয়। কারণ পরে জানা গেল তিনিও ছুটির শেষে কাজে জয়েন করতে যাচ্ছেন। ছুটির শেষে কাজে জয়েন না করলে যে কি মর্মান্তিক ব্যাপার ঘটে তা তাঁর জানা ছিল।

কপাটটা ভাল করে খুলে দিয়ে ভোজপুরী পুরুষপ্রবরকে স্থানচ্যুত করে ভদ্রমহিলা সমস্ত দরজাটি দখল করে হাঁক দিলেন—"ওরে তোরা আয়, মন্টু আগে ওঠ, জিনিসপত্তরগুলো গোছাতে হবে, ঘণ্টু কোথা গেলি; শন্টু মিণ্টু কানটু বানটু—আয় না তাড়াতাড়ি সব ওঠ, হাবলি ওদিকে হাঁ করে দেখছিস কি, উঠে পড় না টপ করে—"

পিল পিল করে নানা বয়সের একদল ছেলেমেয়ে উঠে পড়ল। সরদারজি একটু এগিয়ে এসে বাধা দেবার চেষ্টা করলেন—"ইয়ে তো জুলুম কি বাত হ্যায় মাতাজি,—"

"আপ চুপ রহিয়ে।"

ভদ্রমহিলার ধমকে সরদারজী থতমত খেয়ে সরে দাঁড়ালেন।

"এই কুলি, ইধার ইধার—"

তোরঙ্গ, সুটকেস, হোলড্‌অল্‌, নানা আকারের পুঁটুলি, ঝুড়ি গোটা দুই, প্রকাণ্ড একটা টিফিন কেরিয়ার, গোটা চারেক হাঁড়ি, গোটা তিনেক প্রকাণ্ড তরমুজ, একটা বঁটি, তা ছাড়া একটা মুখ বাঁধা প্রকাণ্ড বস্তা··· ! প্রকাণ্ড কুঁজো !

ভদ্রমহিলা দরজা থেকে সরে দাঁড়ালেন, কুলিরা এইসব তুলতে লাগল।

"আওর দো কুলি উপর চলা আও, চীজ বাস্‌ সরিয়াকে রাখখো। ওই উধারকা বাঙ্ক মে সব এলোমেলো হোকে হ্যায়, পহলে সব ঠিক করে দেও।···"

যে সব যাত্রীর জিনিস উক্ত বাঙ্কে ছিল তাঁরা শশব্যস্ত হয়ে পড়লেন। মুসলমান মোলভীটি তাঁর ফেজ আর বদনাটি নামিয়ে নিজের কাছে রাখাই সঙ্গত মনে করলেন। ফেজটি শিরে ধারণ করলেন, বদনাটি অঙ্কে। মাড়োয়ারি ভদ্রলোকও তাঁর ছোট ট্রাঙ্কটি কোথায় রাখবেন ভেবে বিব্রত বোধ করছিলেন, ভদ্রমহিলা আশ্বস্ত করলেন সবাইকে।

"সব ঠিক করকে গুছায়কে রাখ দেঙ্গে. আপলোক ঘাবড়াইয়ে নেই—"

সত্যিই দেখা গেল বাঙ্কের জিনিসপত্রগুলো অগোছাল হয়েই ছিল। গুছিয়ে রাখাতে অনেকখানি জায়গা বেরোল। আমাকে সম্বোধন করে ভদ্রমহিলা বললেন, "খোকা, তুমি বাবা পা-টা গুটিয়ে বোস তো, হ্যাঁ,—ওইখানে হোল্‌ড্‌অল আর বোরাটা থাক, বেঞ্চি দুটোর ফাঁকে। ওগুলোর উপরেই তুমি পা রাখ। তুমি বাবা পা দুটো একটুখানি সরিয়ে নাও,—হ্যাঁ এইবার ঠিক হয়েছে" তারপর তিনি কামরাটার চারদিকে চেয়ে দেখলেন একবার।

"এই কুলি ট্রাঙ্কঠো ওই উধারকা কোণা মে লে চলো। দোনো বেঞ্চকা বিচ মে দে দেও। আপলোক মেহেরবানি করকে পয়ের মোড়কে বৈঠিয়ে—। শন্টু মন্টু ট্রাঙ্কের উপর গিয়ে ব'স তোরা।"

শৌখিন-পাঞ্জাবী-গায়ে নীল চশমা পরা একটি ছোকরা কোণে বসে' বসে' পা দুলিয়ে দুলিয়ে সিগারেট ফুঁকছিল। সে একটু ঝেঁজে বলে উঠল—"আপনি এমন ভাবে হুকুম করছেন যেন আমরা আপনার চাকর—"

"চাকর কেন হতে যাবে বাবা। তোমরা সব ছেলে। পা-টা গুটিয়ে বস লক্ষ্মীটি। হ্যাঁ, এই তো হয়ে গেল। সবাইকেই তো যেতে হবে। সব গুছিয়ে দিচ্ছি দেখ না, কারও কোন কষ্ট হবে না—। হ্যাঁ, ওই কোণে কুঁজোটা থাক।"

তারপর একটু হেঁট হয়ে দেখলেন বেঞ্চির তলাগুলো সব খালি আছে কি না।

"মিন্টু, পুঁটুলিগুলো আর তরমুজ তিনটে এই বেঞ্চের তলায় ঢুকিয়ে দে। আর ঘন্টুকে কোলে করে তুই ওই কোণটায় চলে যা। ও বাবা পাগড়ি, মেয়েটাকে একটু দাঁড়াতে জায়গা দাও বাবা—"

একটি ক্রিশ্চান দম্পতি একটু বেশী জায়গা নিয়ে একধারে বসেছিলেন। ক্রিশ্চান ভদ্রলোকের সাহেবী পোশাক দেখে তাঁকে ঘাঁটাতে কেউ সাহস করে নি। ভদ্রমহিলা করলেন। তিনি কানটু আর বানটুকে চালান করে দিলেন সেদিকে।

"তোরা ওই দিকে গিয়ে মেম-মাসীমার কাছে বস গিয়ে। হাবলিও যা—"

ক্রিশ্চান দম্পতি আপত্তি করলেন না। ভ্যানিটি ব্যাগ, অ্যাটাশে কেস প্রভৃতি টুকিটাকি জিনিসগুলি সরিয়ে নিয়ে জায়গা করে দিলেন শিশুগুলির। ক্রিশ্চান ভদ্রমহিলা তো বানটুকে কোলেই বসিয়ে নিলেন। ক্রিশ্চান ভদ্রলোকেরও শিভ্যালরি উদ্বুদ্ধ হ'ল সহসা। তিনি দাঁড়িয়ে উঠে ভদ্রমহিলাকে সম্বোধন করে বললেন—"আপ ভি বৈঠ যাইয়ে। মায় খাড়া রহুঙ্গা।"

"না না, তুমি বাবা ব'স। আমার বসবার দরকার নেই। ওগো, তুমি কোথা গেলে, এইবার তুমি ওঠ না, ওঠ, ট্রেন আর কতক্ষণ দাঁড়াবে।"

আড়ময়লা পাঞ্জাবীপরা ঝোলা-গোঁফ শীর্ণকান্তি একটি ভদ্রলোক উঠলেন।

"তুমি একটু জায়গা করে নাও কোথাও—"

"ইউ কাম হিয়ার, দেয়ার ইজ এনাফ্‌ স্পেস—"

ক্রিশ্চান ভদ্রলোকের পাশে গিয়ে বসলেন তিনি।

আমি তখন ভদ্রমহিলাকে আহ্বান করলাম—"আপনি এসে এই হোল্‌ড্‌-অলটার উপর বসুন। আমি পা গুটিয়েই বসছি—"

"তোমার কষ্ট হবে না তো বাবা ?"

"না কিছুমাত্র না।"

"আজকালকার ছেলেরা সোনার চাঁদ সব। হীরের টুকরো।"

ভদ্রমহিলা এসে গর্বীয়ান হয়ে হোল্‌ড্‌-অল্‌টির উপর অধিষ্ঠিতা হলেন। সব যখন মোটামুটি ঠিক হয়ে গেছে তখন ভদ্রমহিলার নজরে পড়ল মিণ্টু ঘণ্টুকে কোলে করে কোণঠাসা হয়ে আছে। দাঁড়িয়ে উঠলেন তিনি—"মিণ্টু তুই এসে এখানে ব'স। আমি দাঁড়িয়ে থাকছি।"

"আপনি দাঁড়াবেন কেন। ওদের জায়গাও করে দিচ্ছি। শেঠজি আপ থোড়া সে হাটকে বৈঠিয়ে।" শেঠজির মুখে একটু বিরক্তভাব ফুটে উঠল, কিন্তু তবু তিনি সরে বসলেন একটু। এতে কিন্তু সমস্যার সমাধান হল না। ওইটুকু জায়গায় ঘণ্টুকে কোলে নিয়ে মিণ্টুর বসা অসম্ভব। শেঠজির পাশেই বসেছিল একটি সাঁওতাল যুবক। বলিষ্ঠ কালো চেহারা, চোখে মুখে নির্ভীক সরলতা, একমাথা কালো ঝাঁকড়া চুল। তার দিকে চাইতেই সে উঠে পড়ল এবং দরজার ধারে গিয়ে সরদারজির পাশে দাঁড়াল। ঘণ্টুকে কোলে নিয়ে মিণ্টু বসল তার জায়গায়। সকলেরই স্থান সঙ্কুলান হয়ে গেল। আমি একটু বিস্মিত হচ্ছিলাম ট্রেনটা দাঁড়িয়ে আছে দেখে। এত ছোট স্টেশনে দু-তিন মিনিটের বেশী দাঁড়াবার কথা নয়। কুলীরা পয়সা নিয়ে নেবে গেল। তবু ট্রেন ছাড়ে না। হঠাৎ দেখলাম স্টেশন মাষ্টারমশাই পা-দানির উপর দাঁড়িয়ে জানলা দিয়ে মুখ গলিয়ে দেখছেন।

"ও, আপনারা এইখানে উঠেছেন বুঝি। জিনিসপত্তর সব উঠে গেছে? বড্ড 'রাশ' আজকে। ট্রেন তাহলে ছাড়ি?"

একমুখ হেসে ভদ্রমহিলা বললেন—"হ্যাঁ আমরা গুছিয়ে বসেছি। অনেক কষ্ট দিলুম বাবা আপনাকে, ভগবান আপনার মঙ্গল করবেন।"

"না, না, কষ্ট আর কি।"

নেমে গেলেন স্টেশন মাষ্টার।

তারপরই শোনা গেল—"অল্‌ রাইট, অল্‌ রাইট।"

ট্রেন ছাড়ল।

ভদ্রমহিলার এই অতর্কিত আক্রমণে অনেকেই অস্বস্তি বোধ করছিলেন। অসন্তুষ্টও হয়েছিলেন দু'একজন। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে সব ঠিক হয়ে গেল।

ভদ্রমহিলাও আমাকে বললেন—"ওই টিফিন কেরিয়ারটা বাঙ্ক থেকে নাবিয়ে দাও তো বাবা।" নামালাম।

বিরাট টিফিন কেরিয়ার। বেশ ভারী।

টিফিন কেরিয়ারটি খুলে ফেললেন তিনি। দেখলাম, প্রচুর লুচি, তরকারি আর রসগোল্লা রয়েছে। ভদ্রমহিলা দু'খানি করে লুচি, একটু করে তরকারি এবং একটি করে রসগোল্লা প্রত্যেককে বিতরণ করতে শুরু করলেন। দু'একজন নিতে আপত্তি করল, কিন্তু কিছুতেই তিনি শুনলেন না।

"হাম আপকো মা-ই হ্যায়, লিজিয়ে, লজ্জা কি বেটা—"

সকলকেই নিতে হল। সেই নীল চশমা পরা ছোকরাকে সম্বোধন করে তিনি বললেন—"তোমাকে বাবা একটু বেশী করে দিচ্ছি। ছেলেমানুষ তুমি, দুখানিতে তোমার কি হবে—"

ট্রেন চলছে। মুখও চলছে প্রত্যেকের। সমস্ত কুয়াশা কেটে গেল। ঘণ্টাখানেকের

মধ্যেই আমরা সবাই আজ্ঞাবহ ভৃত্য হয়ে উঠলাম তাঁর এবং তিনিও অসংকোচে হুকুম করতে লাগলেন সকলকে। কোনও স্টেশনে আমরা তাঁর পান কিনে দিলাম, একটা জংশনে সকলকে চা খাওয়ালেন তিনি। সিপাহিজী আর একটা স্টেশনে রসগোল্লা কিনে আনলেন আবার। সর্দারজি কুঁজো হাতে ছুটলেন জল ভরতে। চানাচুরওলার কাছ থেকে চানাচুর কিনে আবার বিতরণ করতে লাগলেন তিনি সকলকে। সেই গরমে, সেই ভীড়ে, সেই থার্ডক্লাস গাড়িতে আনন্দের হিল্লোল বইতে লাগল।

পুকুরে

শামুক। আমার বিশ্বাস ভিতরে গলদ আছে।

গুগলি। গলদ তো আছেই, তা নাহলে নিজেদের সমাজ ত্যাগ করে কেউ!

পাঁক। যখন দেখলাম ও বারফটকা হয়েছে—তখনই বুঝলাম গতিক খারাপ।

চুনোমাছ। গোড়াতেই তোমার শাসন করা উচিত ছিল। তুমি হলে আমাদের সমাজপতি।

পুঁটিমাছ। সমাজপতি উনি কি শ্যাওলা সে বিষয়ে মতভেদ আছে, সেকথা থাক, কিন্তু ওঁরই শাসন করা উচিত ছিল, উনিই তো মানুষ করেছেন।

পাঁক। আমি শাসনের ত্রুটি করিনি ভাই। অনেক বুঝিয়েছি, অনেক বকাঝকা করেছি! কিন্তু জানই তো ভাই, আমি খুব বেশী কড়া হতে পারি না, আমি তো পাথর নই।

গুগলি। তুমি পাথর হলে আমরা কি বাঁচতাম! তোমাকে পাথর হতে হবে না, একটু রাশ টেনে ধর খালি।

ন্যাটা মাছ। এখন আর কিছু করা যাবে না!

শামুক। কিন্তু কিছু তো একটা করা উচিত। আমার বিশ্বাস ভিতরে ভীষণ একটা গলদ আছে।

মশার বাচ্চা। আমি জানি কি হয়েছে। আমি তো ক্রমাগত নীচ থেকে উপরে যাচ্ছি। আমি জানি কি হয়েছে—

পাঁক। কি বল তো?

মশার বাচ্চা। কতকগুলো বাজে মাছির সঙ্গে ভাব হয়েছে। তারা ওর কাছে ক্রমাগত ঘুরঘুর করছে—ভনভন করছে—

গুগলি। তাই নাকি! আমার মাঝে মাঝে কিন্তু সন্দেহ হয় মাথাই খারাপ হয়ে গেছে ওর। কেমন করে যেন চেয়ে থাকে উপর দিকে মুখ করে। মাঝে মাঝে দোলে—

চুনো। এসব দুর্লক্ষণ!

পুঁটি। এ আমরা সহ্য করব না। পাঁক যদি এর কোনও ব্যবস্থা না করতে পারে আমরা শ্যাওলার শরণাপন্ন হব। এ রকম বেলেল্লাপনা বরদাস্ত করা অসম্ভব। [গুগলিকে] যা ভাবছ তা মোটেই নয়, মাথা টাথা কিছুই খারাপ হয়নি। ওসব ন্যাকামি, ঢং—

ন্যাটা মাছ কিছু না বলে হাসলেন।

দ্বিতীয় মশার বাচ্চা। [চুপি চুপি] আমি কিন্তু শুনেছি ও নাকি একটা মেয়েমানুষের পাল্লায় পড়েছে।

শামুক। ওই শোন!

গুগলি। তাই নাকি?

দ্বিতীয় মশার বাচ্চা। [চুপি চুপি] হ্যাঁ গো, আলো তার নাম।

শামুক। আমি তো বলেছিলুম ভিতরে গলদ আছে।

পুকুরের জল। আমি এতক্ষণ কিছু বলিনি। তোমাদের কথা শুনছিলাম খালি। তোমরা কেউ কিচ্ছু জান না। আসল ব্যাপারটি শোন তাহলে। ওর মাথাও খারাপ হয়নি, প্রেমেও পড়েনি। ও পাগলও নয়, প্রেমিকও নয়, ও বিশ্বাসঘাতক। ও ষড়যন্ত্র করছে। কার সঙ্গে জান? সূর্যের সঙ্গে, যে সূর্য প্রতিমুহূর্তে আমাকে শোষণ করছে—

এই ভীষণ সংবাদে সকলে স্তম্ভিত হয়ে গেল।

চুনো। কি করা যায় তাহলে?

পুঁটি। কেন, আন্দোলন! আন্দোলন করলে কি না হয়। দেখতে দেখতে বাছাধন ঠাণ্ডা হয়ে যাবেন—

সকলে সমস্বরে। বেশ তাই হোক তবে।

আন্দোলন সুরু হয়ে গেল।

পাঁক ঘুলিয়ে উঠল।

কমল ফুল কিন্তু যেমন বিকশিত হয়ে ছিল, তেমনি বিকশিত হয়েই রইল।

থাপ্পোড়

সন্ধ্যার সময় যে রোগীটির বাকী 'ফি' দিয়ে যাবার কথা সে এল না। মনটা খারাপ হয়ে গেল; ওষুধের দাম বা 'ফি' বাকি পড়লে তা আর সহজে আদায় হয় না। বেশী তাগাদা করলে লোকে বলে চামার। সুতরাং তা-ও করা যায় না। যিনি 'ফি' বা ওষুধের দাম বাকী রেখেছেন, তাঁরও একটা চক্ষুলজ্জা আছে, সুতরাং তিনিও যথাসাধ্য এড়িয়ে চলতে চান। রাস্তায় দেখা হলে হয় ভান করেন যেন আমাকে দেখতে পান নি বা পট্ করে পাশের গলিতে ঢুকে পড়েন। পুনরায় যখন ওষুধ বা ডাক্তারের দরকার হয়, তখন আমার কাছে আর আসেন না, আর কারও শরণাপন্ন হন। মানুষের অকৃতজ্ঞতায় মন বিষিয়ে ওঠে। ভদ্রলোকের বাড়িতে উপর্যুপরি চারদিন দু'বেলা গেছি, একটি পয়সা দেননি এখনও। আজ বলেছিলেন নিশ্চয় দিয়ে যাব, কিন্তু কই এখনও তো দেখা নেই। রাত ন'টা হয়ে গেল, একটা খবর পর্যন্ত দিলেন না ভদ্রলোক। কি দেশেই জন্মগ্রহণ করেছি। উঠব উঠব করছি এমন সময় দ্বারপ্রান্তে গণেশদা দেখা দিলেন। গণেশদা বেকার লোক। অনেক দিন হল চাকরি থেকে রিটায়ার করেছেন। স্ত্রী মারা গেছেন অনেক দিন আগে, ছেলেমেয়েদের যা হোক হিল্লে হয়ে গেছে, সুতরাং তাঁর এখন নিজের কোনও কাজ নেই। অপরের হাঁড়ির খবর নেওয়া, নিম্নকণ্ঠে এর কথা ওর কাছে বলা, নানাবিধ গুজব সংগ্রহ করে সেগুলি প্রচার করা,

কোন মন্ত্রী কি করছে তা নিয়ে মাথা ঘামানো—এই সব নিয়েই থাকেন তিনি আজকাল। অর্শ, গেঁটে বাত, একজিমা প্রভৃতি কয়েকটি পোষা ব্যাধি আছে তাঁর। এর মধ্যে যেটা যখন চাগায় আমার কাছে এসে ওষুধ নিয়ে যান। বলা বাহুল্য, বিনা মূল্যে।

গণেশদা এসেই বললেন, "ডাক্তারি করা ছেড়ে দাও, রোগ ধরতে পার না, আপ-টু-ডেট ওষুধের নাম জান না,—ডাক্তারি করার দরকার কি" বলেই তিনি হেসে ফেললেন।

"কেন, কি হয়েছে—"

"মিত্তিরদের বাড়ির ছেলেটাকে তুমি দেখছিলে কি ?"

"গত চারদিন থেকে দেখছি ! এখনই তাদের বাড়ি থেকে লোক আসবার কথা, ফি বাকী আছে—"

"আর তারা আসবে না, সিভিল সার্জনকে ডেকেছে। বলে বেড়াচ্ছে তুমি না কি রোগ ধরতে পার নি—"

"সত্যি ?"

"স্বকর্ণে শুনে এলাম।"

রাগে আপাদমস্তক জ্বলতে লাগল ! কিন্তু বাইরে সে ভাব প্রকাশ করলাম না। মৃদু হেসে কেবল বললাম, "ভাল।"

গণেশদা ক্ষণকাল চুপ করে থেকে বললেন, "আমার অর্শটা আবার কাল থেকে খুব বেড়েছে, বুঝলে—দেবে না কি কিছু একটা—"

কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে উত্তর দিলাম, "দিতে পারি যদি ওষুধের নগদ দাম দেন। এদেশে কারও উপকার করবার প্রবৃত্তি আর নেই।"

"ও বাবা, একেবারে সপ্তমে চড়ে গেলে যে ! আজ তাহলে যাই, শেঁক-টেক দিই গে। কাল আসব। আশা করি ততক্ষণে মাথা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে—"

গণেশদা মুচকি হেসে চলে গেলেন।

গুম হয়ে বসে রইলাম খানিকক্ষণ।

"কম্পাউণ্ডারবাবু, ওষুধের বিল সবসুদ্ধ কত বাকি আছে দেখুন তো—"

"প্রায় আড়াই শ' টাকা হবে।"

"কাল তাগাদায় পাঠিয়েছিলেন ?"

"পাঠিয়েছিলাম।"

"আদায় হয়েছে কিছু ?"

"না।"

"নালিশ করব ব্যাটাদের নামে। সব জোচ্চোর, অকৃতজ্ঞ—"

কম্পাউণ্ডার নীরব।

"দেখুন, কম্পাউণ্ডারবাবু, আপনি নিজে কাল একবার বেরিয়ে মিত্তিরদের ওখানে আমার বিলটা দিয়ে আসবেন। চার দিনের ফি বত্রিশ টাকা, আর ওষুধের দাম—"

"যে আজ্ঞে—"

"আশ্চর্য দেশে জন্মেছি ! একটি ভদ্রলোক নেই, সব জোচ্চোর, ধড়িবাজ আর নিমকহারাম—"

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই থাপ্পোড়টি খেলাম।

দ্বারপ্রান্তে একটি যুবক এসে দাঁড়াল। কখনও দেখেছি বলে মনে হল না।

"এইটেই কি ডাক্তার সামন্তের ডিসপেন্সারি?"

"হ্যাঁ—"

"ডাক্তার সামন্ত কোথায়।"

"আমিই ডাক্তার সামন্ত। কি দরকার বলুন।"

যুবকটি একটু ইতস্তত করতে লাগল। মনে হল যেন লজ্জিত এবং অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছে। তারপর ঘরে ঢুকে প্রণাম করলে আমাকে।

"আমি রতনদীঘি থেকে আসছি—"

প্রথম পাশ করেই রতনদীঘি গ্রামে প্র্যাকটিস করব বলে বসেছিলাম। বছরখানেক সেখানে ভ্যারেণ্ডা ভেজে চলে এসেছিলাম প্রায় তিরিশ বছর আগে। সেখান থেকে এতদিন পর কে এল!

"আপনাকে ঠিক চিনতে পারছি না তো।"

মৃদু হেসে যুবক বললে, "চেনবার কথা নয়। আমার মা-কে হয়তো চিনতে পারেন। আমার মায়ের নাম রাসমণি। আমি যখন হই তখন মায়ের বড় কষ্ট হয়েছিল, আপনি না থাকলে মা বোধহয় বাঁচতেন না।"

সমস্ত ঘটনা মনে পড়ে গেল। ষোল সতের বছরের একটি প্রসববেদনাতুরা নববধূর আর্ত মুখ ফুটে উঠল মানসপটে।

...রাসমণিও আমাকে একটি পয়সা দেয় নি, বলেছিল, "আপনার ঋণ শোধবার নয় ডাক্তারবাবু। তবু কিছু প্রণামী আমি নিশ্চয়ই পাঠিয়ে দেব আপনাকে যেমন করে হোক। বিশ্বাস করুন আমার কথা—"

একটু ইতস্তত করে যুবকটি বললে—"মা বছর দশেক হল মারা গেছেন। মরবার সময় বলে গিয়েছিলেন আমি নিজে রোজগার করে অন্তত একশ টাকা যেন আপনাকে দিয়ে আসি। আপনার আশীর্বাদে রোজগার কিছু কিছু হচ্ছে, তাই এই সামান্য কিছু এনেছি—"

একটি হাজার টাকার নোট আমার হাতে দিয়ে যুবকটি কাচুমাচু হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

"আপনার ঠিকানা খুঁজে বার করতে দেরি হল। তা না হলে আমি আগেই আসতাম।"

প্রেরণা

॥ এক ॥

হরিরঞ্জনবাবু কাছারী থেকে ফিরে সেদিনও যখন দেখলেন যে, তাঁর পুত্র গোপাল লেখাপড়া কিচ্ছু করেনি, ঘুড়ি-লাটাই নিয়ে কাটিয়েছে, তখন তিনি আর আত্মসম্বরণ করতে পারলেন না, ছাতা নিয়ে তেড়ে গেলেন। নিক্ষিপ্ত ছাতাটিকে এড়িয়ে গোপাল যেই পালাতে যাবে, অমনি হরিরঞ্জনবাবু ধরে ফেললেন তাকে। মিনিট তিনেকের

মধ্যেই হরিরঞ্জনবাবু মুক্তকচ্ছ এবং গোপাল অশ্রুসিক্ত হয়ে গৃহস্থালী-কাব্যের যে নূতন পর্বের সূচনা করছিলেন, অপ্রত্যাশিতভাবে তার রূপ বদলে গেল। গেটে মোটরের হর্ন শোনা গেল এবং হরিরঞ্জনবাবু উঁকি দিয়ে দেখলেন যে, তাঁর ওপর-ওলা নব-নিযুক্ত ছোকরা জজ সাহেবের গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং উষ্মা দমন করে কাছাটি গুঁজে হাসিমুখে বেরিয়ে আসতে হল তাঁকে। এই জজ সাহেবেরই আপিসের কেরাণী তিনি। জজ-সাহেবটি সম্প্রতি বদলি হয়ে এসেছেন এখানে। বয়স যদিও কম কিন্তু ছেলে নাকি খুব ভালো। চাকরির পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন না কি। কড়া মেজাজের লোক, কোথাও (বিশেষ) যান না কিন্তু হরিরঞ্জনবাবুর সঙ্গে যেচে আলাপ করেছেন। এই নিয়ে তিনবার এলেন তাঁর বাড়িতে।

"নমস্কার। গোপালের কান্না শোনা যাচ্ছে যেন। ব্যাপার কি -"

"আজ্ঞে না, ও কিছু নয়—"

"শাসন হচ্ছিল বুঝি—"

জজসাহেব বারান্দায় উঠলেন এসে!

"পড়াশোনায় একদম মন নেই স্যার। কেবল ঘুড়ি আর লাটাই। আমাদের দাইয়ের একটা ছেলে জুটেছে তার সঙ্গে সমস্ত দিন মাঠে মাঠে টো-টো করে বেড়াবে। একটিবার বই ছোঁবে না।"

"বটে—"

গোপাল ঘাড় হেঁট করে প্রাণপণে চোখ কচলাচ্ছিল দু'হাত দিয়ে। জজসাহেব তার মাথায় হাত বুলিয়ে স-স্নেহে বললেন, "কিসের মাঞ্জা দিলে ঘুড়ির সুতো মজবুত হয় বল তো?"

চোখ কচলাতে কচলাতেই ক্রন্দন-কম্পিত স্বরে গোপাল উত্তর দিলে—"বেলের আঠা আর কাঁচের গুঁড়ো।"

"আচ্ছা, আর একরকম ভালো মাঞ্জা তোমাকে শিখিয়ে দেব আমি—"

গোপাল আড়চোখে জজসাহেবের দিকে চেয়ে ফিক করে হেসে এক ছুটে চলে গেল বাড়ির ভেতর।

"মা, জজসাহেব আবার এসেছে আজ মোটরে করে। কি চমৎকার মোটরটা মা—"

"দেখেছি।"

হরিরঞ্জনবাবু সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করলেন, "গরিবের বাড়িতে এক কাপ চা খাবেন স্যার? করে আনতে বলি?"

"চা আমি খেয়ে বেরিয়েছি। তা বলুন, খাওয়া যাক আর এক কাপ—"

হাতল-ভাঙা কাঠের চেয়ারটা তাড়াতাড়ি এগিয়ে দিলেন হরিরঞ্জন। "বসুন স্যার। এক্ষুণি করে এনে দিচ্ছি।"

শশব্যস্ত হরিরঞ্জন দ্রুতপদে বাড়ির ভিতর ঢুকে গেলেন। "শুনছ মিনু, জজসাহেব চা খাবেন। চট ক'রে করে দাও দিকি এক কাপ। সেদিন যে নতুন টি-পটটা কিনেছি সেইটেতেই কোরো, বুঝলে। গোপ্‌লা গজুবাবুর বাড়ি থেকে একটা চায়ের পেয়ালা চেয়ে আন্‌ দিকি। খিড়কি দিয়ে যা, উনি যেন দেখতে না পান—"

॥ দুই ॥

চা পর্ব শেষ হয়ে গেল।

গোপালের পাঠে অমনোযোগের কথাই আলোচনা হচ্ছিল। হরিরঞ্জনবাবু বলছিলেন যে, পয়সার জোর থাকলে তিনি একজন প্রাইভেট টিউটার রাখতে পারতেন। তাহলে হয়তো কিছু কাজ হ'ত।

জজসাহেব হেসে বললেন, "তার কোনও মানে নেই হরিবাবু। একটা গল্প বলি তাহলে শুনুন। গল্প নয় সত্যি ঘটনা। একটি ভদ্রলোকের ছেলে ছিল দুটি। তারা যেন প্রতিজ্ঞা করেছিল যে, কিছুতেই লেখাপড়া করবে না। তাদের বাবা মাস্টারের পর মাস্টার বদলাতে লাগলেন. স্কুলের পর স্কুল বদলাতে লাগলেন, কোনও ফল হল না। রোজ তারা স্কুল পালাত। বাড়িতে প্রাইভেট টিউটার পড়ার প্রসঙ্গ তুললেই সরে পড়ত, মায়ের আদুরে ছেলে, গায়ে হাত তোলবারও উপায় ছিল না কোনও মাস্টারের। তবু একজন মাস্টার বিরক্ত এবং মরিয়া হয়ে গোবেড়েন করেছিলেন তাদের। কিন্তু কোনও ফল হয় নি। বাপের পয়সার অভাব ছিল না। তিনি শেষকালে কাগজে এই মর্মে বিজ্ঞাপন দিলেন যে, যে শিক্ষক আমার ছেলেদের পড়ায় মন বসিয়ে দিতে পারবেন, মাসিক বেতন ছাড়া তাঁকে নগদ একশত টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। জুটল একজন ছোকরা শিক্ষক। তিনি প্রথম প্রথম এসে পড়াশোনার কথাই তুললেন না। গুলি খেলা, ঘুড়ি ওড়ানো, কাগজের নৌকা তৈরি করা এইসব নিয়ে ভুলিয়ে রাখতেন ছেলে দুটিকে। কিছুদিন কাটল। তারপর মাস্টার ছেলেদের নিয়ে মাঠে বেড়াতে গেলেন একদিন। সবে সন্ধ্যা হয়েছে। দু'একটি তারা উঠেছে আকাশে। মাস্টার একটি তারা দেখিয়ে বললেন, "ওই দেখ একটি তারা উঠেছে।"

বড় ছেলেটি বললে—"ওই যে আর একটা—"

"ক'টা হ'ল, তাহলে।"

"দুটো—"

"ওই দেখ আর একটা। কটা হ'ল।"

"তিনটে। ওই এদিকে আর একটা স্যার।"

"কটা হ'ল ?"

"চারটে—"

"ওই গাছটার উপর দেখ আর একটা। চার আর একে পাঁচ হল তাহলে ? কি বল ?"

"হ্যাঁ স্যার।"

ছোট ছেলেটি এতক্ষণ একটি কথা বলে নি।

সে দাদার দিকে চেয়ে বললে, "দাদা মাস্টার কিন্তু পড়াচ্ছে—"

বলেই সে ছুটল বাড়ির দিকে। দাদাও ছুটল তার পিছু পিছু। মাস্টার সেইখান থেকেই বিদায় নিলেন। তাঁর দৃঢ় ধারণা হল এ ছেলেদের কিছু হবে না।"

জজসাহেব চুপ করলেন।

"তারপর ?"

"বড় ছেলেটি কলেরায় মারা গেল দিন কতক পরে। ফলে ছোট ছেলেটি আরও আদুরে হয়ে উঠল। পড়াশোনার ধার দিয়েও আর যেত না সে।"

আবার চুপ করলেন জজসাহেব।

"অত আদর দিলে কি আর লেখাপড়া হয় স্যার?" আদরের অপকারিতা বিষয়েই জজসাহেব বলছেন ভেবে কথাগুলি বললেন হরিরঞ্জন।

জজসাহেব বললেন—"অত আদর সত্ত্বেও কিন্তু ছেলেটির লেখাপড়ায় মন বসল হঠাৎ একদিন। টপাটপ পরীক্ষা পাশ করতে লাগল সে।"

"তাই না কি!"

"হ্যাঁ। কখন কিভাবে যে কি হয় তা বলা যায় না।"

"আজ্ঞে স্যার, তা তো বটেই, তা তো বটেই।"

"আচ্ছা এবার উঠি আমি। এমনিই এসেছিলাম। আপনার বাড়ির সব খবর ভালো তো—"

"আজ্ঞে হাঁ।"

জজসাহেব চলে গেলেন। তিনি যে গল্পটি বললেন সেটি অসম্পূর্ণ। তার শেষের অংশটুকু ইচ্ছে করেই চেপে গেলেন তিনি। সে অংশটুকু হচ্ছে এই যে, পাশের বাড়ির ন'বছরের মেয়ে মিনুর সঙ্গে খুব ভাব হয়েছিল মেয়েটির। আড়ালে তাকে সে একদিন নাকি বলেছিল—মিনু, আমাকে যদি তুই বিয়ে করিস বেশ হয়। করবি? উত্তরে মিনু বলে, তোমার মতো মুখ্যু ছেলেকে আমি বিয়ে করতে যাব কোন্ দুঃখে? আমার বর হবে বিদ্বান। তারপর থেকেই নাকি ছেলেটির পড়ায় মন বসে। আর একটা কথাও তিনি বলেননি। ছেলেটি অপর কেউ নয়, তিনি নিজেরই বাল্য কাহিনী বিবৃত করছিলেন।

লাল কালো

বাবা পক্ষাঘাতগ্রস্ত, মা পাগল, ম্যাট্রিক ফেল দাদা চাকরির চেষ্টায় ঘুরে বেড়ায়, আট বছরের ছেলে টুনুই সংসার চালায় ভিক্ষে করে। ভিক্ষে করে প্রায় বারো আনা রোজগার করে সে। সকালে উঠেই বেরিয়ে পড়ে, প্রতি দ্বারে দ্বারে হাত পাতে, প্রতি পথিকের করুণা উদ্রেক করবার চেষ্টা করে। কেউ পয়সা দেয়, কেউ গালাগালি দেয়, উপদেশও দেয় কেউ কেউ।

টুনুর বাঁধা ঘর আছে কয়েকটি। সকলেই মধ্যবিত্ত গৃহস্থ। বড়লোকের বাড়ির দিকে বড় একটা ঘেঁষে না সে। তাঁদের মধ্যে দয়ালু লোক হয়তো আছেন, কিন্তু তাঁদের বড় গেট পেরিয়ে তাঁদের কাছাকাছি যাওয়াই শক্ত! গেটে দারোয়ান থাকে, কুকুরও থাকে।

টুনুর বাঁধা ঘরের মধ্যে নানা জাতের লোক আছে। হিন্দু, মুসলমান, মাড়োয়ারি, বেহারী, ডাক্তার, দোকানী, উকীল, কেরাণী—সব রকম। সে সকলেরই ধাত চিনত। চিনতে পারেনি কেবল রামচরণবাবুকে। ওই উসকো-খুসকো-চুল রক্তচক্ষু লোকটির চরিত্র খুবই অদ্ভুত মনে হত তার কাছে। প্রতিদিনই তার একটা অপ্রত্যাশিত নূতন

রূপ যেন দেখতে পেত সে। রামচরণবাবু রোজই যে তাকে পয়সা দিতেন তা নয়, কিন্তু টুনু রোজই যেত তাঁর কাছে—হয়তো তাঁর অপ্রত্যাশিত রূপ দেখবে বলেই। সন্ধ্যার সময় সে যেত রোজ। গিয়ে কোনদিন দেখত রামচরণবাবু নিবিষ্টচিত্তে পড়ছেন। টুনু যদি বুঝতে পারত রামচরণবাবু কি পড়ছে তাহলে সে আরও আশ্চর্য হয়ে যেত এই ভেবে যে, রামচরণবাবু প্রতিদিনই নূতন রকম বই পড়েন, কোনদিন গীতা, কোনদিন ডিটেকটিভ নভেল, কোনদিন কোনও রাজনৈতিক নেতার বক্তৃতা, কোনদিন বা পাঁজি, কোনওদিন বা রেলোয়ে টাইমটেবল। টুনু দেখত রামচরণবাবু পড়ছেন এবং তাঁর ভুরু কুঁচকে আছে, যেন তিনি যেটা পড়ছেন সেটাকে ঈষৎ বিরক্তিমিশ্রিত সন্দেহের চক্ষে যাচাই করে নিচ্ছেন মনে মনে। টুনুর সঙ্গে চোখাচোখি হলেই একটা পয়সা বা ডবল পয়সা বা আনি যা হাতের কাছে পেতেন ছুঁড়ে দিতেন। কোনওদিন হয়তো যাওয়ামাত্র খেঁকিয়ে উঠতেন—"আবার এসেছ হারামজাদা। যেন বাপের জমিদারী!" টুনু বুঝত আজ সুবিধে হবে না, সরে পড়ত সুট করে। কোন কোন দিন সরে পড়বার মুখেও রামচরণবাবুর নূতন একটা মূর্তি চোখে পড়ত তার। রামচরণবাবু দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বলে উঠতেন, "আবার অভিমান করে চলে যাওয়া হচ্ছেলবাবপুত্তুরের। যা, নিয়ে যা" —ঠক্ করে একটা আনিই হয়তো এসে পড়তো পায়ের গোড়ায়। কোনদিন টুনু হয়তো গিয়ে দেখত রামচরণবাবু গলার সামনের দিকটায় হাত বুলুতে বুলুতে কড়িকাঠ গুনছেন। টুনু সঙ্কুচিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকত চুপ করে। টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করত না। তারপর হঠাৎ যখন রামচরণবাবুর সঙ্গে চোখোচোখি হয়ে যেত রামচরণবাবু অপ্রস্তুত হয়ে পড়তেন। যেন চুরি করে কিছু একটা করছিলেন, ধরা পড়ে গেছেন। অপ্রতিভ হাসি হেসে বলতেন, "ও তুই, কতক্ষণ এসেছিস"—তাড়াতাড়ি একটা পয়সা ছুঁড়ে দিতেন। রামচরণবাবুর নানা মূর্তি দেখেছিল টুনু। মাঝে মাঝে দেখত রামচরণবাবু একটা বোতল আর গ্লাস নিয়ে বসে আছেন। মেজাজ দিলদরিয়া। টুনুকে দেখবামাত্র বলে উঠতেন "এস এস, বাবা এস। তোমার অপেক্ষাতেই বসে আছি" - হয়তো একটা গোটা দু-আনিই পেয়ে যেত সেদিন টুনু। টুনু রামচরণবাবুর জীবনকথা কিছুই জানত না। জানত না যে, তাঁর স্ত্রী তাঁকে ছেড়ে পালিয়ে গেছে আর একজনের সঙ্গে প্রায় কুড়ি বছর আগে। জানত না যে শিশু পুত্রটিকে সে ফেলে গিয়েছিল এবং যাকে কেন্দ্র করে রামচরণবাবুর কল্পনা স্বপ্নের রঙীন প্রাসাদ সৃষ্টি করছিল সেই ছেলেটি যক্ষ্মারোগে মারা গেছে কিছুদিন আগে। এসব সে কিছুই জানত না। সে রামচরণের টুকরো টুকরো নানা ছবি জুড়ে জুড়ে এক নূতন রামচরণ সৃজন করেছিল নিজের মনে। এবং তাকে ভালও বেসেছিল।

॥ দুই ॥

কিছুদিন থেকে টুনু লক্ষ্য করছিল রামচরণবাবু ক্রমশঃ বেশী তিরিক্ষি হয়ে উঠছেন। মাঝে মাঝে এক আধটা পয়সা দেন বটে কিন্তু প্রায়ই তাড়িয়ে দেন। বোতল গ্লাস নিয়েও বসেন না আজকাল। গুম হয়ে বসে গলার সামনের দিকটায় হাত বুলোতে বুলোতে কেবল কড়িকাঠ গোনেন।

তারপর একদিন সে কার মুখে যেন শুনলে যে, রামচরণবাবুর অবস্থা না কি খারাপ হয়ে গেছে খুব। ঋণে আকণ্ঠ ডুবে গেছেন ভদ্রলোক। টুনুর মনে হল তাই বোধ হয় মদ কিনতে পারছেন না আজকাল, আর সেইজন্যেই মেজাজটা উগ্র হয়ে উঠেছে বোধ হয়। রামচরণবাবুর দিলদরিয়া মেজাজের ছবিটা ফুটে উঠল তার মানসপটে। মনে হল তার যদি পয়সা থাকত তাহলে সে নিশ্চয়ই এক বোতল মদ কিনে দিয়ে আসত তাঁকে। মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আর একটা কথাও তার মনে খেলে গেল বিদ্যুদ্বেগে। তারা যেখানে থাকে তার ঠিক সামনেই থাকে বিনোদ সাহু। সে লোকটাও মদ খায়। অত্যন্ত পাজি লোক। টুনু তার কাছে গালাগালি ছাড়া আর কিছু পায়নি কোনদিন। মদ খেয়ে রামচরণবাবুর মতো দিলদরিয়া হতে পারে না সে। তার বাড়ির সামনের দরজাটা প্রায়ই খোলা থাকে। টুনু ইচ্ছে করলে তার বাইরের ঘর থেকে একটা বোতল অনায়াসেই সরিয়ে ফেলতে পারে। বাইরের ঘরের তাকের ওপর একটা বোতল তো থাকেই, রাস্তা থেকেই দেখতে পায় টুনু। অনায়াসেই তো বোতলটা পাচার করতে পারে সে। আহা, যদি পারে…রামচরণবাবুর জন্যে সত্যিই কষ্ট হয় টুনুর।

॥ তিন ॥

রামচরণবাবু নিবিষ্টচিত্তে বসে বসে কড়িকাঠ গুণছিলেন, এমন সময় খুট করে শব্দ হল কপাটের কাছে।

"কে রে—"

চেঁচিয়ে উঠলেন রামচরণবাবু।

"আমি।"

বোতল হাতে এগিয়ে এল টুনু।

"ফের শালা তুই জ্বালাতে এসেছিস, বেরিয়ে যা এখান থেকে—"

টুনু যা কোনও দিন করেনি তাই করল সেদিন। ঘরের ভিতর ঢুকে টেবিলের উপর বোতলটা রেখে বলল, "এইটে আপনি খান—"

"খাব ? মানে ?"

বোতলটা তুলে দেখলেন রামচরণবাবু। মদের বোতল নয়, কালীর বোতল !

পরমুহূর্তেই আর্তনাদ করে উঠল টুনু। বোতলটা ছুঁড়ে মেরেছেন তাকে রামচরণবাবু। মাথা বোতল দুই-ই ফেটেছে। রক্তের লালের সঙ্গে কালীর কালো মিশে অদ্ভুত হয়েছে টুনুর মুখটা। রামচরণবাবু হতভম্ব হয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলেন। ভীড় জমতে লাগল।

নির্বাকের দুঃখ

রাগের আসল হেতুটা অবশ্য অন্য ছিল। নরেন বেশী রোজগার করে, মোটরকার কিনেছে, তার বউ বেশী সুন্দরী, বড়লোকের মেয়ে, পণে অলঙ্কারে আসবাবে

প্রায় হাজার পঁচিশেক টাকা এনেছে বাপের বাড়ি থেকে ; এর প্রত্যেকটি অদৃশ্য কণ্টকরূপে বিঁধছিল হরেনের বুকে। কিন্তু বিঁধলে কি হবে, এর কোনটার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে তো ফল হবে না। অনেকদিন আগেই বাড়ি-ঘর বিষয়-সম্পত্তি ভাগাভাগি হয়ে গেছে। নরেন তার ভাগের একতলা ঘরটার উপর উপর্যুপরি দুটো ঘর তুলে তিনতলা করেছে সেটাকে। ফলে হরেনের ভাগের উঠোনটা অন্ধকার হয়ে গেছে। নরেনের বউ তেতলার ঘরে বসে গাঁক গাঁক করে রেডিও বাজায়। হরেনের স্ত্রী ক্ষেমঙ্করীর বুক জ্বলে তাতে। রাগের আসল কারণ এই সব। কিন্তু এ সব কথাতো আদালতে গিয়ে বলা যায় না। তাই মকোদ্দমাটা বাধল একটা কাঁঠাল গাছ নিয়ে। কাঁঠাল গাছটা নরেনের ভাগে পড়েছিল। তারপরই পাঁচিল এবং ঠিক পাঁচিলের ওপারে হরেনের একটা ঘর। সেই ঘরের জানলায় কাঁঠাল গাছের একটা ডাল গিয়ে পড়েছিল। ডালটা যেন বলতে চাইছিল, "ও হরেন, কেন দুই ভায়ে ঝগড়া করছ তোমরা। কেন মন গুমরে আছ, যেমন ছিলে তেমনি থাক না—"

কিন্তু এ ভাষা শোনবার মতো কান হরেনের ছিল না। সে একটা কাটারি নিয়ে এসে ডালটাকে কেটে দিলে। তারপর নরেনকে বললে, "দেখ, তোমার ওই কাঁঠাল গাছ থাকাতে আমার ঘরটায় আলো হাওয়া কিছু ঢোকে না, আর ওইটি আমার একমাত্র শোবার ঘর, ও গাছ কেটে ফেল তুমি।"

নরেন রাজি হল না। হরেন উকিলের পরামর্শ নিয়ে আদালতে এই মর্মে নালিশ করে দিলে যে ও গাছ কেটে না ফেললে আমি যক্ষ্মারোগাক্রান্ত হ'য়ে মারা যাব। আমার রোজ সন্ধ্যায় জ্বর হয়, ডাক্তার সন্দেহ করছেন যে আমার বুকের দোষ হয়েছে। তিনি যে সব দামী ওষুধের ব্যবস্থা করেছেন তা কেনবার সামর্থ নেই আমার। ভগবানের দান আলো-হাওয়াটুকু যাতে আমি নির্বিঘ্নে পাই তার জন্যে আমি প্রার্থনা করছি ওই কাঁঠাল গাছটি কেটে ফেলবার হুকুম যেন আদালত দেন। গাছের যা ন্যায্য মূল্য তা আমি দেব।

বলা বাহুল্য, হরেনের যক্ষ্মা হয় নি, হয়েছিল রাগ। কিন্তু উকিলের পরামর্শ অনুসারে এবং ডাক্তারের সার্টিফিকেটের জোরে নিজেকে সে যক্ষ্মাগ্রস্ত বলে প্রমাণ করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল। কারণ উকিল বললেন তা না করলে ওই কাঁঠাল গাছ সরানো যাবে না।

আদালতে উকিল যক্ষ্মা সম্বন্ধে মর্মস্পর্শী বক্তৃতা করে মহামান্য বিচারকের কাছে সুবিচার প্রার্থনা করতে লাগলেন।

পাড়ার লোকেরা কেউ হরেনের কেউ নরেনের পক্ষ অবলম্বন করে গুজগুজ ফুসফুস শুরু করলেন। তাঁদের সময় বেশ কাটতে লাগল। আদালতেও ধাওয়া করতে লাগলেন কেউ কেউ টাটকা খবর সংগ্রহ করবার জন্যে। যাঁরা নিরপেক্ষ রইলেন তাঁরা বললেন —ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া, কি ট্র্যাজেডি! আসল ট্র্যাজেডির খবর কিন্তু রাখলে না কেউ। একটি নয়, তিনটি মর্মান্তিক ঘটনা ঘটল এর ফলে। হরেনবাবুর প্রথম পক্ষের একটি কুৎসিত মেয়ে ছিল। বয়স প্রায় বাইশ তেইশ। কিছুতেই কোথাও তার বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছিল না। টাকারও জোর নেই, রূপেরও জোর নেই। তার মামারা অবশেষে একটি দোজবরে ছেলের সঙ্গে তার বিয়ে প্রায় ঠিক করে এনেছিলেন এবং তাকে ঘিরেই মানুতির কল্পনা রঙীন হয়ে উঠেছিল গোপনে গোপনে। কিন্তু যেই পাত্রপক্ষ

শুনলেন হরেন যক্ষ্মাগ্রস্ত অমনি তাঁরা পিছিয়ে গেলেন। মানুতির রঙীন কল্পনা মিলিয়ে গেল মরীচিকার মতো।

দ্বিতীয় ট্র্যাজেডি ঘটল চাঁদনকে কেন্দ্র করে। নরেনের বাড়ির ঝি লক্ষ্মীর ছেলে চাঁদন ওই কাঁঠাল গাছটির তলায় যেন স্বর্গলোক আবিষ্কার করেছিল। তার মা তাকে যখন বস্তির অন্ধকার ঘুপচি ঘর থেকে বার করে এনে কাঁঠাল-ডালে ঝোলানো দোলনাটিতে শুইয়ে দিত তখন সে যেন স্বর্গসুখ উপভোগ করত।

আদালতের আদেশ অনুসারে কাঁঠাল গাছটি যখন কাটা পড়ল তখন বিনা দোষে স্বর্গচ্যুত হ'তে হল তাকে।

তৃতীয় ট্র্যাজেডি হ'ল এক শালিক দম্পতির। ওই কাঁঠাল গাছে নীড় বেঁধে ডিম পেড়েছিল তারা।

আদর্শ ও বাস্তব

ডাক্তার প্রিয়গোবিন্দ বসাক ছাত্র জীবনে আদর্শবাদী ছিলেন। যে সকল আদর্শ মনুষ্যত্বকে চিরকাল উদ্বুদ্ধ করিয়াছে, সে সকল আদর্শ প্রিয়গোবিন্দকেও উদ্বুদ্ধ করিত। তিনি সত্যবাদী, পরোপকারী ও পরার্থপর ছিলেন। ছাত্রজীবনেই দেশপ্রেমে তাঁহার চিত্ত আলোকিত হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ, অশ্বিনী দত্তের ভক্তিযোগ, রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ-বিষয়ক রচনাবলী তাঁহার চরিত্রে যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহাই উত্তরকালে তাঁহাকে বিবিধ সৎকার্যে প্রণোদিত করে। আমাদের দেশে সৎকার্য করিবার সুযোগ অনন্ত। বন্যা, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, অগ্নিকাণ্ড, ঝঞ্ঝা লাগিয়াই আছে। বিপন্ন দেশবাসীর সেবা করা ছাত্রজীবনে প্রিয়গোবিন্দের প্রধান আনন্দ ছিল। সেই সময়ই প্রিয়গোবিন্দ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন যে, দেশ মানে দেশের মাটি নয়, দেশের মানুষ এবং আমাদের দেশের হিমালয় বা গঙ্গা পৃথিবীর মধ্যে যত শ্রেষ্ঠত্বই লাভ করুক না কেন, এদেশের অধিকাংশ মানুষই অত্যন্ত নিম্নস্তরের। অন্নহীন, বস্ত্রহীন, স্বাস্থ্যহীন ও নিরক্ষর পশুর দল। এই পশুদের সেবা করিয়া মানুষ করিয়া তুলিতে হইবে—ইহাই প্রিয়গোবিন্দ বসাকের স্বপ্ন ছিল একদিন। এই স্বপ্নই তাঁহার ছাত্রজীবনের সমস্ত কর্মকে নিয়ন্ত্রিত করিত। ইহারই প্রেরণায় তিনি ক্ষুদিরামের চিতার ভস্ম সংগ্রহ করিয়াছিলেন, বিপ্লবী দলের আদর্শে ছোট একটি দল গঠন করিয়াছিলেন, ছোট একটি নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন, আরও কত কি করিয়াছিলেন।

এই স্বপ্নের ঘোরেই প্রিয়গোবিন্দ ডাক্তারি পাশ করিয়া ফেলিলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বিবাহও হইয়া গেল এবং তাহার কিছুদিন পরেই বাবা মারা গেলেন। যে অন্নহীন, বস্ত্রহীন, স্বাস্থ্যহীন ও নিরক্ষর পশুর দলকে তিনি এতদিন দূরে স্বপ্নলোকে প্রত্যক্ষ করিতেছিলেন, তাহারই একটা অংশ সহসা বাস্তবলোকে মূর্ত হইয়া তাঁহাকে যেন ঘিরিয়া ধরিল। তিনটি ছোট ভাই, দুইটি অবিবাহিতা ভগ্নী, দুইটি বিধবা পিসি, বিধবা মা এবং তরুণী ভার্যা তাহাদের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা, ক্ষুধা ও পিপাসার দাবী লইয়া তাঁহার মুখের দিকে সোৎসুকে চাহিয়া রহিল।

চাকুরির জন্য প্রিয়গোবিন্দ নানাস্থানে ত্রিশটি দরখাস্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু

কোথাও চাকুরি জুটিল না। তাঁহার বিরুদ্ধে পুলিশ-রিপোর্ট এমনই কড়া ছিল যে কোনও কর্তৃপক্ষই তাঁহাকে নিয়োগ করা নিরাপদ মনে করিলেন না।

ইহার ঠিক পনর বৎসর পরে প্রিয়গোবিন্দ সহসা একদিন সচেতন হইলেন। মনে হইল, কোন এক অদৃশ্য হস্ত যেন ঠাস করিয়া তাঁহার গালে চড় মারিয়া গেল।···দামী মোটরকার নিঃশব্দ দ্রুতগতিতে চলিয়াছে। কিন্তু সেই নৈঃশব্দ্যের মধ্যেও প্রিয়গোবিন্দ যেন চাপা হাসির আওয়াজ শুনিতেছিলেন। বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, অশ্বিনী দত্ত, গান্ধীজী, কানাইলাল, বাঘা যতীন এবং আরও অনেকে যেন চুপি চুপি হাসিতেছেন। প্রিয়গোবিন্দের মনে হইল, তাঁহারা অনেকদিন হইতেই হাসিতেছিলেন, আজ তিনি সহসা সেটা শুনিতে পাইয়াছেন। অদৃশ্য হস্ত তাঁহার গালে আর একটি চড় মারিল। শতচ্ছিন্ন, ময়লা কাপড়-পরা অকালবৃদ্ধা মেয়েটার অশ্রুসিক্ত মুখখানা চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল একবার। তাহার মিনতিপূর্ণ কথাগুলিও আবার তিনি শুনিতে পাইলেন :

“আমি বড় গরীব বাবু, আপনার ফী দেবার সামর্থ্য আমার নেই—”

“ওষুধের দাম দিতে পারবে তো ?”

“কত লাগবে বাবু ?”

“ইন্‌জেকশন দিতে হবে। টাকা পাঁচেক করে লাগবে প্রতি ইন্‌জেকশনে—”

“আমি বড় গরীব বাবু—”

ঠিক এই সময়েই যজ্ঞেশ্বর বাবুর মোটরখানা তাঁহার ডিসপেন্সারির সম্মুখে দাঁড়াইয়া সিংহনাদ করিয়াছিল। যজ্ঞেশ্বরবাবুর মোটরের হর্নের শব্দ যেন তাঁহার অহংকারেরই বাঙ্ময় রূপ। প্রিয়গোবিন্দ আর কালবিলম্ব না করিয়া উঠিয়া পড়িয়াছিলেন। শতচ্ছিন্ন, ময়লা কাপড়-পরা মেয়েটার কথা সম্পূর্ণরূপে শুনিবারও ধৈর্য তাঁহার আর থাকে নাই। যজ্ঞেশ্বরবাবুকে গিয়া ইন্‌জেকশন দিলেই ষোল টাকা ফী এবং যজ্ঞেশ্বরবাবু যদি তাঁহার উপর সন্তুষ্ট হন, তাহা হইলে আরও বহু ষোল টাকা···না, নিত্য অভাবগ্রস্ত প্রিয়গোবিন্দ ধৈর্যরক্ষা করিতে পারেন নাই।

মোটর নিঃশব্দ দ্রুতবেগে চলিতেছিল। প্রিয়গোবিন্দ ফিস ফিস হাসি শুনিতে শুনিতে চলিয়াছিলেন। তাঁহার মনে হইল সেই চাপা হাসি ক্রমশ যেন ভাষায় রূপান্তরিত হইতেছে। তিনি শুনিতে পাইলেন : “তুমি যাহাকে ইন্‌জেকশন দিবার জন্য ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া চলিয়াছ, সে লোকটি দুরাচার চরিত্রহীন, পাষণ্ড কালোবাজারী। তাহার সিফিলিস হইয়াছে। ইহা তোমার অবিদিত নাই যে, ব্যাধিটি তাহার স্বোপার্জিত এবং অকথ্য চরিত্রহীনতার পরিচায়ক। লোকটির টাকা আছে, তাই তুমি লালায়িত হইয়া পুলকিত কলেবরে তাহার চিকিৎসা করিতে ছুটিয়া চলিয়াছ। আর যে দীনদরিদ্র অভাগিনীকে তুমি তুচ্ছ করিয়া চলিয়া আসিলে, যাহার কথা শেষ পর্যন্ত শুনিবার ধৈর্য পর্যন্ত তোমার রহিল না, তাহার যক্ষ্মা হইয়াছে। সে বেচারী গরীব, তাই তাহার চিকিৎসা করিতে তুমি উৎসাহ পাইলে না! একটা কথা কি তুমি ভাবিয়া দেখিয়াছ প্রিয়গোবিন্দ ? যজ্ঞেশ্বরের সিফিলিস এবং ওই মেয়েটির যক্ষ্মা কি একই অবস্থার দুই দিক নয়! যে সামাজিক এবং রাজনৈতিক অব্যবস্থার ফলে যজ্ঞেশ্বর অত্যাধিক টাকা রোজগার করিয়া মাথা ঠিক রাখিতে পারে নাই, সেই সামাজিক ও রাজনৈতিক অব্যবস্থাই ওই অভাগিনী মেয়েটিকে অন্নহীন, বস্ত্রহীন, যক্ষ্মাগ্রস্ত

করিয়াছে। চতুর যজ্ঞেশ্বর আইনের সদ্ব্যবহার বা অপব্যবহার করিয়া টাকা লুণ্ঠন করিতে পারিয়াছে বলিয়াই ওই মেয়েটির ভাগে কিছুই থাকে নাই। আদর্শবাদী প্রিয়গোবিন্দ, ভাবিয়া দেখ, কাহাকে চিকিৎসা করা তোমার উচিত ছিল ?…”

মোটর সিংহগর্জন করিতে করিতে ছুটিতেছিল। প্রিয়গোবিন্দ নির্বাক হইয়া বসিয়া রহিলেন।

॥ দুই ॥

আরও পঁচিশ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। প্রিয়গোবিন্দের তিনটি পুত্র মানুষ হইয়াছে। সংসারের চাপ আর ততটা বেশী নাই। প্রিয়গোবিন্দ ঠিক করিলেন, এইবার তিনি তাঁহার আদর্শ অনুসরণ করিয়া চলিবেন। দেশে দরিদ্র রোগীর অভাব নাই। এইবার তাহাদের সেবা করিতে হইবে। বিশেষত সদ্যআগত বিলাতী ডিগ্রীধারি ডি. পি. গোহা নামক যে ডাক্তারটি বিজ্ঞাপন, দালাল ও ভাঁওতার জোরে বহু রোগীকে ধনে প্রাণে নাশ করিতেছে, তাহার কবল হইতে যতগুলিকে পারেন, তিনি রক্ষা করিবেন। চিকিৎসা করা মানে যে রোগীকে বিবিধ প্রকার খরচের ঘূর্ণাবর্তে ফেলিয়া সর্বস্বান্ত করা নয়, তাহা হাতে কলমে তিনি দেখাইয়া দিবেন। নিজের যদি লাভের লোভ না থাকে, তাহা হইলে স্বল্প ব্যয়ে সুচিকিৎসা করা যে সম্ভবপর, তাহা প্রমাণ করিবার সুযোগ ভগবান এতদিন পরে যখন তাঁহাকে দিয়াছেন, তখন সে সুযোগ তিনি পরিত্যাগ করিবেন না।

এই মনোভাব লইয়া প্রিয়গোবিন্দ প্রথম যেদিন নিজের ডিস্পেন্সারিতে গেলেন, সেইদিনই একটি মনোমত রোগী জুটিয়া গেল। লোকটি বহুকাল পূর্বে তাঁহারই ভৃত্য ছিল। চুরি করিয়াছিল বলিয়া তাহাকে তিনি তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। রামরতন সাশ্রুনেত্রে তাহার জীবনকাহিনী বর্ণনা করিয়া গেল। অনেক ঘাটের জল খাইয়াছে সে। উড়িষ্যা, আসাম, মাদ্রাজ, পাঞ্জাব—কোথাও বাকী নাই। একবার নাকি তাহার জেলও হইয়াছিল।

সমস্ত বর্ণনা করিয়া রামরতন অবশেষে প্রিয়গোবিন্দের পা দুটি জড়াইয়া ধরিয়া বলিল : “আমার দেশে মাত্র দু বিঘে জমি আছে বাবু, আর আমার কিছু নেই। পেটে অন্ন নেই, পরণে বস্ত্র নেই। খেটে খাবারও সামর্থ্য নেই আমার আর। যে কালরোগে ধরেছে বাবু, একটু কিছু করতে গেলেই হাঁপিয়ে পড়ি। রিকশা টানার কাজ নিয়েছিলাম একটা, কিন্তু পারলাম না, মুখ দিয়ে রক্ত উঠতে লাগল। ঝলকে ঝলকে রক্ত! তাছাড়া জ্বর সর্বদা লেগেই আছে। অনেক জায়গায় ওষুধ খেয়েছি ডাক্তারবাবু, কোথাও কিছু হয়নি। শেষকালে ভাবলাম, পুরোনো মনিবের কাছেই যাই, তিনি রাখতে চান রাখবেন, মারতে চান মারবেন—”

পা জড়াইয়া রামরতন হু হু করিয়া কাঁদিতে লাগিল। প্রিয়গোবিন্দ পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে, এ অবস্থায় আমাদের দেশের শতকরা আশীজনের যাহা হয়, রামরতনের তাহাই হইয়াছে। সে যক্ষ্মাগ্রস্ত ; তাহার দুইটি ফুসফুসই আক্রান্ত।

প্রিয়গোবিন্দ বলিলেন : “বেশ। তোর চিকিৎসা আমি করব। অসুখটি অবশ্য সাংঘাতিক হয়েছে—”

"এ অসুখের কি একটা ইন্‌জেকশন বেরিয়েছে না কি বাবু ?"

প্রিয়গোবিন্দ বুঝিলেন, রামরতন স্ট্রেপ্‌টোমাইসিনের কথা শুনিয়াছে।

বলিলেন : "বেরিয়েছে বটে, কিন্তু তাতে অনেক খরচ, তুই পেরে উঠবি না। আর সে ইন্‌জেকশন নিলে যে সারবেই এমনও কোন কথা নেই—"

"কত খরচ—"

"আড়াই শ'—তিন শ' টাকা ওষুধেরই দাম লেগে যাবে।"

"আমার যে জমিটা আছে, সেটা বিক্রী করে দিলে শ' তিনেক টাকা আমি পেতে পারি।"

"না, না, সে দরকার নেই। কম খরচে তোর সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি, দেখ্‌ না। ভাল খেতে হবে, সেইটেই হল প্রথম কথা। দুধ, ডিম, মাংস—এই সব খাওয়া চাই। তারপর আসল কথা হল বিশ্রাম। তুই ওবেলা আসিস, সব ব্যবস্থা করে দেব।"

"ইন্‌জেকশন দেবেন না ?"

"এখন ইন্‌জেকশন দরকার নেই।"

রামরতন চুপ করিয়া রহিল।

"তুই ওবেলা আসিস, তোর কখন কি খেতে হবে, আমি একটা কাগজে ফর্দ করে দেব, আর হজমের ওষুধও দেব একটা, তার দামও দিতে হবে না তোকে, বুঝলি—"

"আচ্ছা—"

রামরতন চলিয়া গেল, কিন্তু আর ফিরিল না।

কয়েকদিন পরে প্রিয়গোবিন্দ খবর পাইলেন যে, সে নিজেই দুই বিঘা জমি বিক্রয় করিয়া দিয়াছে এবং ডাক্তার ডি. পি গোহার নিকট গিয়া ইন্‌জেকশন লইতেছে।

প্রিয়গোবিন্দ নির্বাক হইয়া রহিলেন।

ইহার কয়েকদিন পরে প্রিয়গোবিন্দ নিজেই সন্ন্যাসরোগে আক্রান্ত হইলেন। যে স্টেথোস্কোপটি বহু লোকের বুকে বসাইয়া তিনি সারাজীবন অর্থোপার্জন করিয়াছেন, সেইটি তাঁহার চোখের সামনে দেওয়ালে ঝুলিতেছিল। সেইটির দিকেই তিনি নির্নিমেষে চাহিয়াছিলেন। ক্রমশ তাঁহার চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হইয়া আসিল। মনে হইল, স্টেথোস্কোপটিও রূপ পরিবর্তন করিয়াছে। তাহা আর স্টেথোস্কোপ বলিয়া মনে হইতেছে না, মনে হইতেছে যেন একটি জিজ্ঞাসা-চিহ্ন শূন্যে ঝুলিয়া রহিয়াছে।

দুইদিন পরে তাহার মৃত্যু হইল।

অলক্ষ্যে

॥ এক ॥

ঘটনাটা ঘটেছিল ঠিকই, কিন্তু কি করে ঘটেছিল তা জানি না। এইটুকু শুধু জানি, বৈজ্ঞানিকেরা এ রহস্যের হদিস পাবেন না, রসিকেরা হয়তো পেলেও পেতে পারেন।

পলাশ গাছের তলায় এক বুড়ি কাঠ কুড়িয়ে বেড়াচ্ছিল একদিন। সঙ্গে ছিল তার কিশোরী নাতনী সুখীয়া। সুখেরই জীবন্ত প্রতিমূর্ত যেন সে। সে কাঠ কুড়োচ্ছিল

না। মনের আনন্দে চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছিল শুধু। কখনও কুলগাছের ডালে নাড়া দিয়ে, কখনও নামহীন বন্যলতার ফুল পেড়ে, কখনও এক ঝাঁক উড়ন্ত প্রজাপতির দিকে চেয়ে চেয়ে সময় কেটে যাচ্ছিল তার। খানিকক্ষণ পরে হঠাৎ সে এসে পলাশ গাছটার তলায় ঊর্ধ্বমুখে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। অনেক উঁচুতে ফুল ফুটে আছে। গাছে না উঠলে পাড়া যাবে না। নাগালের মধ্যে যেগুলো রয়েছে সেগুলো কুঁড়ি। গাছেই উঠতে যাচ্ছিল সে কিন্তু বুড়ি মানা করলে।

"কি করছিস ?"

"ওই ফুলগুলো পাড়ি।"

"না, গাছে উঠতে হবে না। পনর দিন পরে বিয়ে, মেয়ে গাছে উঠতে যাচ্ছেন।"

"উঠলেই বা।"

"পড়ে গিয়ে হাত পা যদি ভাঙে তাহলে ভিকুর সঙ্গে আর বিয়ে হবে না তোমার। মুংলির বাপ মা ওৎ পেতে আছে।"

বলিষ্ঠ গঠন ভিকুর চেহরাটা ফুটে উঠল সুখীয়ার মানস-পটে। গাছে ওঠবার চেষ্টা সে আর করলে না।

"তুমি আবার কবে এদিকে আসবে দিদিমা।"

"দিন সাতেক পরে।"

"আমি তখন কিন্তু আসব তোমার সঙ্গে।"

"আসতেই হবে, অত বড় বোঝা আমি বইতে পারব না।"

"আমার বিয়ে হয়ে গেলে তোমার বোঝা বইবে কে।"

"তুমি আর ভিকু দু'জনে।"

হেসে উঠল সুখীয়া।

সমস্ত কথাগুলি মন দিয়ে শুনলে তারা।

॥ দুই ॥

দখিন হাওয়া এসে খোসামোদ করে গেল অনেক। আমোলই দিলে না তারা। তারপর এল একদল ভ্রমর।

"ঘোমটা খুলবে না নাকি তোমরা।"

তারা নিরুত্তর। অনেকক্ষণ ধরে গুঞ্জন করলে ভোমররা। কিচ্ছু ফল হলো না। এক ঝলক রোদ এসে পড়ল তাদের মুখে। সূর্যকিরণের আতপ্ত আহ্বানে আকুল হয়ে উঠল তাদের অন্তর, কিন্তু তবু তারা টলল না। মুখ টিপে চুপ করে বসে রইল জেদ করে যেন। প্রতিবেশীরা বলতে লাগল, "তোদের মতলব কি বল দিকি। বসন্ত যে বয়ে গেল—"

সাড়াই দিলে না তারা।

একবার নয়, বারবার চেষ্টা করলে সবাই! আবার এল দখিন হাওয়া, আবার এল ভ্রমরের দল, আবার এল সূর্যকিরণের আহ্বান, প্রতিবেশীদের মিনতি। দেহের শিরায় উপশিরায় সঞ্চারিত হল রসাবেগ। অবরুদ্ধ সৌরভ মথিত করে তুলতে লাগল উন্মুখ চেতনাকে।

কিন্তু তবু তারা মুখ টিপে বসে রইল চুপ ক'রে।

সাতদিন পরে।

সুখীয়া ভিকুর দিকে চেয়ে বললে, “দিদিমা আসে নি ভালই হয়েছে, না ?”

“দিদিমা এলে কি আমি আসতে পারতাম।”

“দিদিমার জন্যে কিন্তু বড় এক বোঝা কাঠ নিয়ে যেতে হবে—”

“ওই গাছটায় উঠে কিছু কাঠ ভাঙি তাহলে।”

“সাবধানে উঠো।”

ভিকু চলে গেল।

সুখীয়া পলাশ গাছটার দিকে চেয়ে দেখলে একবার।

“ওমা, এ কুঁড়িগুলো ফোটেনি এখনও।”

তবু কি মনে করে সেইগুলোকেই তুলে খোঁপায় সে পরে নিল।

সুখীয়া কাঠের বোঝা মাথায় দিয়ে চলেছিল। তার পিছু পিছু ভিকু চলেছিল বাঁশী বাজাতে বাজাতে। হঠাৎ ভিকু বলে উঠল—“তোমার খোঁপায় একটা আশ্চর্য কাণ্ড হচ্ছে কিন্তু।”

“কি।”

“পলাশফুলের কুঁড়িগুলো ফুটে উঠেছে !”

“তোমার বাঁশীর সুর শুনে বোধ হয়।”

মুচকি হেসে ভিকু ফুঁ দিল আবার বাঁশীতে। ফুল ফোটার আসল কারণটা কিন্তু কেউ জানল না।

অদ্ভুত বার্তা

আপনারা কেহ শুনিয়াছেন কি না জানি না, কিন্তু কল্পনাবেতার-যোগে আমি একটি অদ্ভুত বার্তা শ্রবণ করিয়াছি। বার্তাটি এই :

দেবী বীণাপাণি সম্প্রতি নিয়ম করিয়াছেন যে, তিনিও ভোট লইয়া ঠিক করিবেন, কোন্ পাঁচটি অক্ষর বা যুক্তাক্ষর কাব্য-রচনায় প্রাধান্য লাভ করিবে। যাহারা ভোটে জয় লাভ করিবে, কবিদের চেতনায় তাহাদেরই রূপ এবং ধ্বনি বারংবার প্রতিফলিত করিয়া দেবী কবিগণকে প্ররোচিত করিবেন, যাহাতে উক্ত অক্ষর বা যুক্তাক্ষরগুলি তাঁহারা নিজ নিজ কাব্যে পুনঃ পুনঃ ব্যবহার করেন।

পঞ্চাননকে তুষ্ট করিবার জন্যই নাকি পাঁচের প্রতি দেবীর এই পক্ষপাত। অধিকাংশ অক্ষরই রুষ্ট হইয়া ভোট-যুদ্ধে যোগদান করেন নাই। মাত্র আটজন এই দ্বন্দ্বে নামিয়াছিলেন। ভোটদাতা দেবগণের নিকট প্রত্যেকে স্বকীয় যোগ্যতার প্রমাণ-স্বরূপ যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাও উক্ত কল্পনাবেতার-যোগে আমি শ্রবণ করিয়াছি।

প্রার্থী ‘ন্দ’ বলিতেছিলেন : “হে দেবগণ, আমি মকরন্দে আছি, চন্দ্রে আছি, ইন্দ্রে আছি, ছন্দে আছি ! মন্দের মধ্যেও আমাকে থাকিতে হইয়াছে, কারণ, আমি জানি,

মন্দের মধ্যেও ভাল আছে। দ্বন্দ্ব মানে যাঁহারা কেবলমাত্র কলহ বোঝেন, আমি তাঁহাদের দলে নই। যে দ্বন্দ্ব অর্থে যুগল-মিলন, আমি সেই দ্বন্দ্বের নির্মাতা। একজন ভোটপ্রার্থী 'খন্দ' নামক প্রাকৃত কথার উল্লেখ করিয়া আমাকে এবং প্রিয়বন্ধু 'খ'কে ব্যঙ্গ করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছেন। আমি 'খন্দ' রূপে যে প্রতি পথিককে সাবধানতা শিক্ষা দিতেছি, তাহা উক্ত সমালোচক মহাশয়ের মাথায় আসে নাই। এ বিষয়ে আমি তর্ক করিতে চাই না। আমি শুধু আপনাদের স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, নন্দনে, চন্দনে, আনন্দে, বন্দনায় আমি চিরকাল আপনাদেরই সেবা করিয়া আসিয়াছি। আপনারা যদি আমাকে নির্বাচন নাও করেন, তাহা হইলেও করিব। বিশাল শব্দ-সাম্রাজ্যের বহু স্থানে কুন্দেন্দুবরেণ্য বাগ্‌দেবী আমাকে বহুভাবে নিয়োজিত করিয়া ধন্য করিয়াছেন। তাঁহারই প্রসাদমানসে আমি আজ এই দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হইয়া আপনাদের সুবিচার প্রার্থনা করিতেছি। ইহার বেশী আমার আর কিছুই বলিবার নাই।"

অঃ, অঃ, অঃ, অঃ—বিসর্গের দল হাসিয়া উঠিল।

তাহার পর সুরু করিলেন প্রার্থী 'গ' . "হে অমরবৃন্দ, বহুস্থানেই আমার সাক্ষাৎ আপনারা নিশ্চয়ই পাইয়াছেন। আমার বহুবিস্তৃত আভিধানিক রূপ বিস্ফারিত করিয়া আপনাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাইতে চাই না। শুধু বলিতে চাই, আমি গণেশে আছি, গগনে আছি, গতিতে আছি, গহনে আছি, গজে আছি—"

কে একজন বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল : "তুমি গর্দভে আছ, গোঁজামিলে আছ, গাঁটকাটায় আছ, গাঁজাতে আছ, গাফিলতিতে আছ, গাড্ডায় আছ,—তোমার কীর্তি অনেক।"

প্রার্থী 'গ' থতমত খাইয়া থামিয়া গেলেন মনে হইল। কিন্তু পরমুহূর্তেই তিনি পুনরায় আরম্ভ করিলেন : "গল্পে, গীতে, গঙ্গায়, গোবিন্দে, সাগরে, গিরিতে, গুরুতে, গরিষ্ঠে, গুণপনায়, গৌরবে আমার পরিচয় যাঁহারা পান না—"

বিরুদ্ধবাদী সেই লোকটি বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল : "তোমার আসল পরিচয় পাই গোক্ষুরে, গলগণ্ডে, গলগ্রহে—"

প্রার্থী 'গ' চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন : "গরুড়, ভগবান, ভগবতী, গান্ধারী, গন্ধর্বতে কি আমি নাই ?"

"গাবা, গোবর এবং গয়াতেও আছ—"

"মহাত্মা গান্ধী, গার্গী, গ্যালিলিও'র কীর্তির সহিত কি আমি জড়িত নই ?"

"ছাগল, পাগল এবং বগলের সহিতও তুমি জড়িত - "

তুমুল কোলাহল হইতে লাগিল। তাহার পর সব থামিয়া গেল হঠাৎ।

কিছুক্ষণ নীরবতার পর শোনা গেল, নীলকণ্ঠে কে যেন বলিতেছেন : "হে অন্তর্যামিগণ আপনারা তো সব জানেন। আপনাদের নিকট বাগ্‌বিস্তার করা ধৃষ্টতা মাত্র। একটি কথা শুধু আপনাদের মনে রাখিতে অনুরোধ করিতেছি, আমি 'ধ' নই, আমি 'ধী'। যতদিন 'ধ' ছিলাম, ততদিন আমাকে 'ধর ধর' 'ধড় ফড়' 'ধক ধক' 'ধড়িবাজ' 'ধকল' ইত্যাদি অভব্য কথাগুলি সৃষ্টি করিতে হইয়াছে। ধরার ঊর্ধ্বে উঠিতে পারি নাই। 'উ' ও 'ঊ'—ইহাদের সহিত যুক্ত হইয়াও শান্তি পাইলাম না। ধূর্ত, ধূসর, ধূম, ধূলি, ধুয়াতেই নিবদ্ধ থাকিয়া আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা বেদনায় ধুক

ধুক করিতে লাগিল। এখন আমি 'ঈ' কে বরণ করিয়া 'ধী' হইয়াছি। শান্তি পাইয়াছি। ধন্য হইয়াছি। হে সুধীবর্গ, এই কথাটিই শুধু আপনাদিগকে স্মরণ রাখিতে অনুরোধ করিতেছি যে, আমি 'ধ' নয় 'ধী'—"

বিপক্ষ দলের একজন বলিল : "সাধু, সাধু! আপনি যে বহুবার বিভিন্ন বিভিন্ন স্বরবর্ণের সহিত বন্ধুত্ব করিয়া অবশেষে তাহাদের ত্যাগ করিয়াছেন, এ সংবাদে আপনার প্রণয়-নিষ্ঠার পরিচয় পাইলাম। যাঁহাকে স্বয়ং বীণাপাণি ধৈবত স্থান দিয়াছেন, ধামরে উদাত্ত করিয়াছেন, ধেনুরূপে শ্রীকৃষ্ণের কৃপালাভ করিয়া যিনি গোকুলে আজও অমর হইয়া আছেন, তাঁহার 'ঈ'-প্রীতি সত্যই বিস্ময়কর। হে ধৃষ্ট ধুরন্ধর, তোমাকে ধিক!"

'ধী' ইহার কোন প্রতিবাদ করিলেন না।

চতুর্দিকে পুনরায় নীরবতা ঘনাইয়া আসিল।

তাহার পর শুনিলাম, কে একজন বলিয়া উঠিলেন : "চুপ চুপ। প্রার্থী 'জ' উঠিয়াছেন।"

প্রার্থী 'জ'য়ের কণ্ঠস্বর শোনা গেল : "আমার কোনও স্বরবর্ণের প্রতি পক্ষপাত নাই। আমি সকলের সহিত মিলিয়া মিশিয়া থাকিতে ভালবাসি। তাই জগৎ জুড়িয়া আমি আছি। জন্মে, জীবনে, জয়ে পরাজয়ে, জলদে জরদে, জনতায় জঙ্গলে, জপে, জঙ্গমে, জনকে, জননীতে, জনার্দনে—সর্বত্র আমি। কাহারও প্রতি আমার পক্ষপাত নাই। জমদগ্নি, জাহাঙ্গীর, জরাসন্ধ, জয়চন্দ্র, জয়পাল, জয়ন্ত, জয়দেব, জটায়ু, জাহ্নবী, জুলিয়াস্-সিজার, জর্জ—"

প্রার্থী 'জ' হয়তো আরও কিছু বলিতেন, কিন্তু বিপক্ষ দল সে সুযোগ তাঁহাকে দিল না। একজন চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল : "বাকী তালিকাটা আমি সম্পূর্ণ করিয়া দিতেছি, আপনাকে আর কষ্ট করিতে হইবে না। আপনি জটিলায়, জটিলতায়, জঞ্জালে, জতুগৃহে, জড়তায়, জরায়, জারজে, জয়দ্রথে, জবালায়, জুড়ুলে, জঘনে, জলপড়ায়, জাঁকজমকে—কোথায় নাই? আপনি সর্বত্র গজগজ করিতেছেন, জাহান্নামকেও আপনি ত্যাগ করেন নাই! হে সুবিধাবাদী, আপনাকে নমস্কার।"

সুরবৃন্দের হাস্য-কলরবে সভা মুখরিত হইয়া উঠিল।

তাহার পর আর একজন প্রার্থী উঠিলেন। তিনি বলিলেন : "আমি 'বৃ'। আমি 'ব' নই, 'ঋ'-ও নই। উভয়ের সংযোগে আমি বৃ। আমার আকাঙ্ক্ষা বৃহৎ। বৃহস্পতি, বৃকোদর, বৃষভানু, বৃন্দাবন, বৃষাঙ্ক সৃষ্টি করিয়াই আমি চরিতার্থ। আমার আর কিছু বলিবার নাই।"

বিপক্ষ দলের একটি ছোকরা বলিল : "আমার বৃহন্নলা-রূপটিও চমৎকার!"

সভায় বিশেষ গোলমাল হইল না।

তাহার পর উঠিলেন প্রার্থী 'র' : "হে সুরকুল, আমি আপনাদেরই অঙ্গ—"

বিপক্ষ দল বলিয়া উঠিল : "আপনি অসুরেরও অঙ্গ—"

"আমি রবিতে আছি, রাকায় আছি—"

"রাহুতেও আছেন—"

"আমি রাগ-রাগিণীতে—"

"রাসভই তাহার প্রমাণ—"

"রাম শব্দ নির্মাণ করিয়া আমি ধন্য—"

"রাবণ নির্মাণ করিয়াও তো আপনি ধন্য—"

"এমনভাবে বাধা দেওয়াটা কি ভদ্রতা-সঙ্গত ?"

"ভোট চাহিতে আসিয়াছেন, ন্যায্য সমালোচনা শুনিতে হইবে বৈকি—"

"আমি আর কিছু বলিব না, আপনারা যাহা খুশী করুন।"

প্রার্থী 'র' ক্রোধভরে বসিয়া পড়িলেন।

সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থী 'ব' শুরু করিয়া দিলেন : "আমার বক্তব্য সংক্ষিপ্ত। হে দেবতাগণ, আমার স্বরূপ আপনাদের অবিদিত নাই। অর্বাচীন-মহলে আত্মপ্রশংসা করিয়া আমি নিজেকে অবনমিত করিতে চাই না—"

প্রার্থী 'ব' বসিয়া পড়িলেন।

সভায় তুমুল কোলাহল, হাস্যকলরব, তর্কবিতর্ক চলিতে লাগিল। তাহার পর সমস্ত নীরব হইয়া গেল।

কল্পনা-বেতার-যোগে কিছুক্ষণ পরে ঘোষিত হইল : "জ র দ গ ব নির্বাচিত হন নাই। শুধু তাই নয়, ইঁহাদের কেহই একটি ভোটও পান নাই।"

কল্পনা-বেতার কিছুক্ষণ পরে আর একটি সংবাদ ঘোষণা করিল : "বলরামের অনুরোধে 'ব' এবং রতি দেবীর অনুরোধে 'র' বীণাপাণির নমিনেশন পাইয়াছেন। সুতরাং ধী ব র ব্ শব্দ অবশেষে নির্বাচিত হইলেন।"

কপাল

মাছ মাংসের স্বাদ প্রায় ভুলে গেছি। কিনে খাবার সামর্থ্য নেই। হঠাৎ নজরে পড়ল পাশের বাড়ির আঁস্তাকুড়ে অনেক পাখীর পালক প'ড়ে রয়েছে। মনে হল দাশ মশায় মুর্গি খাচ্ছেন না কি ? মুর্গির যা দাম আজকাল আমার তো দর করতে পর্যন্ত সাহস হয় না। দাস মহাশয়ও তো আমারই মতন ছাঁপোষা গৃহস্থ, হঠাৎ মুর্গি খাবার শখ হল কেন ? এদিকে তো দেনায় ডুবে আছেন শুনতে পাই। জামাই এসেছিল না কি ? প্রলুব্ধ নয়নে পালকগুলির দিকে চেয়ে সম্ভব-অসম্ভব নানারকম গবেষণায় ব্যাপৃত ছিলাম এমন সময় দাস মশায় স্বয়ং বেরিয়ে এলেন।

"কি দাস মশায়, একা একাই মুর্গি খাচ্ছেন না কি ?"

"মুর্গি ! মন্তর নেওয়ার পর থেকে আমি তো আর মুর্গি খাই না।"

"এগুলো কি তাহলে—"

পালকগুলো দেখালাম।

"ওগুলো পায়রার পালক—"

"পায়রার দাম আজকাল কত করে ?"

"আমি তো কিনে খাই নি।"

"তবে—"

"আমার ওই খোলার ঘরটার পরলে এক জোড়া গোলা পায়রা এসে বাসা বেঁধেছিল। কোথা থেকে এসেছিল কে জানে ! কিছুদিন পরে চিঁ চিঁ শব্দ শুনে

বুঝলাম বাচ্চা পেড়েছে। মনে হল ওদের যদি বংশ বৃদ্ধি হতে থাকে তাহলে তো টেকা যাবে না। গিন্নির ছুঁচি বাই, একটি ঠিকে ঝি মাত্র সম্বল। ভাবলাম সাবড়ে দেওয়াই বুদ্ধির কাজ। মাছ মাংস কিনে খাবার তো আর সামর্থ নেই। রাত্রে অফিস থেকে ফিরে এসে চেয়ারের উপর টুল চড়িয়ে ধরলাম পায়রাগুলোকে। একটা পালিয়ে গেল। তিনটেকে ধরতে পারলাম। চমৎকার লাগল অনেক দিন পরে। একটা পালিয়ে গেল বলে আফশোষ হতে লাগল খুব। কিন্তু দিন দুই পরেই আনন্দিত হলাম আবার। মাদি পায়রাটা পালিয়েছিল, বুঝলেন, দেখি সে আর একটা পুরুষ জুটিয়ে এনে ঠিক ওইখানটিতেই আবার ঘর বেঁধেছে। আবার কিছুদিন পরে বাচ্চা হল, আবার সেই বাচ্চা দুটিকে এবং পুরুষ পায়রাটিকে খেলাম আমরা। মাদিটাকে ইচ্ছে করেই ছেড়ে দিলাম। কয়েক দিন পরে দেখি আবার সে একটি সঙ্গী জুটিয়ে এনেছে। আবার তাদের বাচ্চা হল, আবার খেলাম। এই ভাবেই চলছে।"

"আমিও এক জোড়া পুষব না কি।"

"পুষুন না। যা দিনকাল পড়েছে, চারিদিকে নানাভাবে টোপ না ফেললে বাঁচা যাবে না—"

কথাটা মনে লাগল। সেই দিনই নগদ পৌনে তিন টাকা খরচ করে কিনে আনলাম এক জোড়া পায়রা। আরও টাকা চারেক খরচ করে তাদের থাকবার টং তৈরি করলাম। যথাসময়ে বাচ্চাও হল। দাস মশায়ের পদ্ধতি অনুসরণ করে যথারীতি সেগুলির সৎকারও করলাম।··

পরের দিন টং খুলে দেখি মাদি পায়রাটা চুপ করে বসে আছে। তাড়া দিলাম, তবু সে খোপ থেকে বেরুল না। গিন্নি বললেন, ওকে বিরক্ত করছ কেন, খানিকক্ষণ পরে আপনিই বেরুবে।" পায়রাটা কিন্তু বেরুলই না। দু'দিন না খেয়ে চুপ করে বসে রইল। তৃতীয় দিনে মরে গেল। দাস মশায়কে গিয়ে বললাম—"একি হল মশায়, পায়রাটা যে মরে গেল—"

"কি রকম।"

আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা বললাম। শুনে হর্ষোৎফুল্ল হয়ে উঠলেন দাস মশাই। বললেন, "ও সতী পায়রা! খুব রেয়ার জিনিস। আপনি ভাগ্যবান লোক তাই আপনি পেয়েছিলেন, গঙ্গায় দিয়ে আসুন। চলুন দেখে আসি, দর্শনেও পুণ্য—"

দাস মশায় মরা পায়রাটাকে ভক্তিভরে প্রণাম করলেন। আমরাও করলাম। তারপর তাকে ফুল চন্দন দিয়ে নতুন কাপড় জড়িয়ে গঙ্গার ঘাটের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লাম। সতী পায়রার সৎকারের জন্যও প্রায় টাকা খানেক খরচ হয়ে গেল। সমস্ত পথটা নিজের ভাগ্যের কথা চিন্তা করতে করতেই গেলাম। আশ্চর্য কপাল!

ঘুঁটে

সেদিন বিশুদের সান্ধ্য আড্ডায় একটি গোল প্যাকেট হাতে করে ভাদুড়ি মশাই ঢুকলেন।

"পাঁপর কিনলেন না কি ভাদুড়ি মশাই। বেশ জমিয়ে বড়দিন করবেন বলুন।"

সমস্বরে বলে উঠল সবাই।

"না ভাই পাঁপর নয়।"

"তবে কি কেক?"

"কেক বলতে পার, কিন্তু তোমরা যে কেকের কথা ভাবছ তা নয়। এই দেখ।"

খবরের কাগজের মোড়ক খুলে ভাদুড়ি মশাই যা দেখালেন তা সত্যিই অপ্রত্যাশিত। ঘুঁটে একখানা।

"অমন যত্ন করে কাগজে মুড়ে ঘুঁটে নিয়ে যাচ্ছেন মানে?"

"রাস্তায় পড়ে ছিল, কুড়িয়ে নিলাম। হাতে একখানা কাগজ ছিল, মুড়ে নিলাম তা দিয়ে। এতে দোষটা কি হয়েছে! হয়তো এর থেকেই আমার ভাগ্য ফিরে যেতে পারে, কিছু বলা যায় কি।"

হো হো করে হেসে উঠল সবাই।

"হাসছ হাস, হাসতে মানা নেই। কিন্তু এটা জেনে রেখ গোবর থেকে এই ঘুঁটে হয়েছে এবং মনে রেখ কংগ্রেসের বাক্সে গরুর ছবি আছে।"

"ঠিক বলেছেন ভাদুড়ি দা, ঘুঁটেকেই সম্বল করতে হবে এবার!"

নবীন অধ্যাপক তরুণ বিশ্বাস বললেন, "ভাদুড়ি মশাই ঘুঁটে খেয়ে এসেছেন না কি কিছু?"

ভাদুড়ি জবাব দিলেন না তার কথায়। স্মিতমুখে চুপ করে রইলেন। তারপর আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে বললেন—"ভাগ্য যখন সুপ্রসন্ন হয় তখন কোথা দিয়ে কি করে যে যোগাযোগ হয়ে যায় হিসেব করে আগে থাকতে তা কেউ বলতে পারে না। মিস্টার ভৌমিকের গল্পটা জান না তোমরা নিশ্চয়, জানবার কথাও নয়—"

বিশু বললে, "বলুন না শুনি—"

"শুনলে বিশ্বাস করবে না।"

"তবু বলুন।"

"আজ যিনি মিস্টার ভৌমিক নামে সুপরিচিত, যাঁর কৃপাদৃষ্টি লাভ করবার জন্যে বহু বেকার লোক আজ উদ্গ্রীব, ক্রাইসলার গাড়ি ছাড়া যিনি চড়েন না, কোলকাতা শহরে আট দশখানা বাড়ির মালিক হয়ে, লোহালক্কড়ের কারবারে ফেঁপে উঠে, কোলিয়ারি জমিদারি মিল কিনে যিনি আজ বহুলোকের ঈর্ষা-মিশ্রিত শ্রদ্ধা সম্ভ্রম অর্জন করেছেন তার আসল নাম কি জান? গজু। অনেকে গজাও বলত। উপাধি যে ভৌমিক এ খবর তো কেউ রাখতই না, গজু বা গজা যে কিসের অপভ্রংশ এও জানত না অনেকে। আমি এখনও জানি না। গজেন্দ্র, গজানন, গজেশ বা গজপতি ওই রকম কিছু একটা হবে। সব কিছু চাপা পড়ে গিয়েছিল গজু বা গজার আড়ালে। মামার বাড়িতে মানুষ হয়েছিল গজু। মা, বাপ, ভাই, বোন কেউ ছিল না তার। মামার বাড়িতে সে সকলের উপদেশ শুনত আর সকলের বকুনি খেত। এরই ফাঁকে

ফাঁকে লেখাপড়াও সে করেছিল কিছুটা অবশ্য। আই. এ. না বি এ. কি একটা পাশও যেন করেছিল মনে হচ্ছে। আর একটি বিশেষত্ব ছিল গজুর। গজু ডিটেকটিভ নভেলের ভক্ত ছিল খুব। কপাটটা বন্ধ করে দাও তো হে, বেশ শীত পড়েছে আজ। চা টা খাওয়াবে না কি কেউ—?"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়—"

ভাদুড়ি মশাই বিশুদের ক্লাবের অনারারি মেম্বার। চাঁদা দেন না, নিয়মিত আসেনও না। মাঝে মাঝে এসে আড্ডা জমিয়ে যান কেবল।

চা এসে পড়ল। ভাদুড়ি মশাই ছিন্ন লুইটি দিয়ে সর্বাঙ্গ ঢেকে চায়ে চুমুক দিলেন। অধ্যাপক তরুণ বিশ্বাস প্রশ্ন করলেন আবার।

"মিষ্টার ভৌমিক ? কোথাকার মিষ্টার ভৌমিক ? কখনও নাম শুনেছি বলে মনে হচ্ছে না তো ?"

ভাদুড়ি মশাই হাসিভরা চোখে চেয়ে রইলেন তার দিকে খানিকক্ষণ। তাঁর মনে যে উষ্মা জেগেছে তা বোঝা গেল তাঁর কথা থেকে।

"তুমি দুনিয়ার ক'টা লোকেরই বা নাম শুনেছ ? মিষ্টার ভৌমিকের নাম তোমার তো শোনবার কথাও নয়। একটা ওঁছা কলেজে প্রফেসারি কর তুমি, তিনজনের সঙ্গে শেয়ার করে বাস কর গলির গলি তস্য গলিতে একটা ঘুপচি ফ্ল্যাটে। তুমি মিষ্টার ভৌমিকের নাম শুনবে কি করে ? যা বলছি শুনে যাও, ফ্যাচাং তুলো না—"

চাটি শেষ করে ভাদুড়ি মশাই জামার হাতা দিয়েই মুখটি মুছে ফেললেন। তারপর শুরু করলেন।

"এ হেন গজুর যে কোনকালে কিছু হবে এ আশা কেউ করে নি। আমি কিন্তু একটা জিনিস মার্ক করেছিলুম ছোকরা ডিটেকটিভ নভেলগুলো বেশ মন দিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ে। তার সঙ্গে আলোচনা করে প্রত্যেক বারই মুগ্ধ হয়ে যেতাম। মনে হত—বাঃ ছোকরা ঠিক পয়েণ্টগুলি ধরেছে তো— । ওই ডিটেকটিভ নভেলই ওর উন্নতির কারণ হল শেষকালে—"

পকেট থেকে একটি অর্ধ-দগ্ধ বিড়ি বার করে ধরালেন সেটি ভাদুড়ি মশাই।

"ডিটেকটিভ নভেল উন্নতির কারণ হল ? বলেন কি।"

"হ্যাঁ। একদিন সকালে রহমনপুরের জমিদার বাড়ীর পাশ দিয়ে যেতে যেতে গজুর চোখে পড়ল মরা কাক পড়ে রয়েছে একটা। মরা কাক তো এমন কতই পড়ে থাকে, প্রথম দিন তেমন গ্রাহ্য করে নি সে। কিন্তু উপর্যুপরি তিন চারদিন যখন সে জমিদার বাড়ির আশেপাশে মরা কাক দেখতে পেলে তখন তার মনে হল নিশ্চয়ই কোন ব্যাপার আছে এর মধ্যে। ডিটেকটিভ নভেল-পড়া তীক্ষ্ন মন নিয়ে সে ঘুরে বেড়াতে লাগল বাড়ির চারিদিকে। হঠাৎ নজরে পড়ল একটা কাক গাছের ডালে বসে মরা ইঁদুর খাচ্ছে একটা। তাড়া দিতেই কাকটা উড়ে গেল, ইঁদুরটা পড়ে গেল তার মুখ থেকে। ইঁদুরটি তুলে নিলে গজু। এক ডাক্তারের সঙ্গে ভাব ছিল তার। ইঁদুরটি তাকে পরীক্ষা করতে দিল। ইঁদুরের ভিতর থেকে কি বেরুল জান ? আর্সেনিক। খোঁজ খবর নিয়ে অনেক ব্যাপার বেরুল তার পর। জমিদারের এক চাকর জমিদারকে পয়জন করবার জন্যে সন্দেশের সঙ্গে আর্সেনিকের বিষ মিশিয়েছিল। কিন্তু একটি জরুরি কাজে জমিদারকে বাইরে চলে যেতে হয়েছিল বলে সে সন্দেশ তাঁর আর খাওয়া

হয়নি। চাকরটা সন্দেশগুলো ভাড়ার ঘরে লুকিয়ে রেখেছিল, ভেবেছিল জমিদার ফিরে এলে তাকে খাওয়াবে আবার। কিন্তু রাখে কেষ্ট মারে কে! জমিদার সাতদিন ফিরলেনই না। ইঁদুরেরা সেই সন্দেশ খেতে লাগল আর মরতে লাগল। মরা ইঁদুর খেলে কাকরা, তারাও মল এবং তা পড়ল গজুর চোখে। কোথা থেকে কি হল দেখ।"

"তারপর।"

"সব শুনে জমিদার এত মুগ্ধ হয়ে গেলেন যে গজুর সঙ্গে তাঁর একমাত্র মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিলেন শেষ পর্যন্ত। তাঁর বিশাল বিষয়ের একমাত্র উত্তরাধিকারিণী ওই মেয়ে…"

"সত্যি?"

ভাদুড়ি মশাইয়ের যা স্বভাব হাসিভরা চোখে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর বললেন, "হ্যাঁ, সত্যি। গজু তারপর থেকে ক্রমশ উন্নতি করেছে। বিষয় অনেক বাড়িয়েছে। এখন সে মিস্টার ভৌমিক। ফেমাস মিস্টার ভৌমিক—"

"কোথায় থাকেন তিনি বলুন তো—"

অধ্যাপক তরুণ বিশ্বাস প্রশ্ন করলেন।

'কেন? তার সঙ্গে দেখা করবে যা-তে একটা হিল্লে হয়ে যায়? তার নাগাল পাওয়া অত সহজ নয় ভায়া। আচ্ছা উঠি—"

মুচকি হেসে বেরিয়ে গেলেন ভাদুড়ি। মিস্টার ভৌমিক কোথায় থাকেন তা বলে গেলেন না, কারণ তা বলা সম্ভব ছিল না তাঁর পক্ষে। গল্প বলবার সময় যদিও তিনি এমন ভাব দেখালেন যেন মিস্টার ভৌমিক তাঁর বহুকালের বন্ধু, কিন্তু আসলে তিনিও ভৌমিককে চিনতেন না। তাঁর গল্পটা শুনেছিলেন বন্ধু গণেশের কাছে। গণেশ শুনেছিল ট্রেনে এক যাত্রীর মুখে।

অন্ধকার গলি দিয়ে যেতে যেতে ভাদুড়ি ভাবতে লাগলেন—ঘুঁটে থেকে কি ক্লু পাওয়া যেতে পারে!

দুই রকম স্বাধীনতা

কিছুই ভাল লাগছিল না, তাই বাগানটায় গিয়ে বসলাম। অভাবগ্রস্ত হয়েছি তাই আর বাগানের সে শ্রী নেই। তবু গিয়ে বসলাম একটু। হঠাৎ চোখে পড়ল আমার লেডি হিলিংডনে ছোট একটি ফুল ফুটেছে। আশ্চর্য হলাম। মালিকে অনেক দিন আগেই বিদায় দিতে হয়েছে। গাছের একটুও যত্ন হয়নি, সার তো দূরের কথা—জল পর্যন্ত পড়ে নি। আগাছা গজিয়েছে চারদিকে, তবু ফুল ফুটেছে একটি। আরও আশ্চর্য হলাম ফুলটি কথা কইল।

"নমস্কার, অনেকদিন পরে দেখা হল—"

নির্বাক হয়ে চেয়ে রইলাম।

"আপনার শরীর খারাপ না কি? চেহারাটা বড় খারাপ দেখাচ্ছে।"

বিস্ময় কেটে গেল। মনের কথা বেরিয়ে পড়ল মুখ দিয়ে।

"চেহারা ভাল থাকবে কি করে বল, খেতে পাই না।"

"কেন ?"

"স্বাধীনতা পেয়েছি।"

লেডি হিলিংডন সবিস্ময়ে চেয়ে রইল আমার দিকে।

"আপনার কাপড় চোপড়ের অবস্থাও শোচনীয় দেখছি।"

"হ্যাঁ, তারও ওই কারণ—স্বাধীনতা।"

"স্বাধীনতা ? কি আশ্চর্য। আমিও তো স্বাধীন, কিন্তু আমার তো এমন দুর্দশা হয় নি। আপনার মালি যখন তদারক করত তখন একটু বেশী আরামে থাকতাম বটে, কিন্তু এখনও খুব যে খারাপ আছি তা নয়। দেখতেই তো পাচ্ছেন ফুল ফুটিয়েছি। হয়তো একটু ছোট কিন্তু তবু ফুল তো—"

চুপ করে রইলাম।

লেডি হিলিংডন আবার বললে—"সত্যি আপনাকে দেখে খুব কষ্ট হচ্ছে। এই দুর্দশার প্রতিকারের জন্য কি করছেন ?"

"মিটিং করছি, কাগজে লেখালেখি করছি—" আমার কথা লেডি হিলিংডন বোধ হয় বুঝতে পারলে না ঠিক। একটু চুপ করে থেকে আবার বললে—

"স্বাধীনতা আপনার কষ্টের কারণ কি করে হল ঠিক বুঝতে পারছি না। আমি তো স্বাধীন, আমার কোনও কষ্টই নেই।"

বললাম—"তুমি ফুল, আমি মানুষ। আমার স্বাধীনতা মানে—"

কেমন যেন গুলিয়ে ফেললাম। ইতিহাস, অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব বিষয়ে যে সব বড় বড় বই পরীক্ষার জন্য মুখস্থ করেছিলাম তার একটি বর্ণও মনে পড়ল না। অপ্রতিভ দৃষ্টিতে তার দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে শেষে বললাম—"আমার কষ্ট তুমি বুঝবে না। আমার যে কি অসহ্য কষ্ট—"

"আমি বুঝেছি।"

পাশের টব থেকে কথা কয়ে উঠল মৃতপ্রায় ক্রিসানথিমাম।

"লেডি হিলিংডন মাটিকে আশ্রয় করে দাঁড়িয়ে আছে। তোমার মালি জল না দিলেও ওর শিকড় মাটির রস আহরণ করে নিতে পারে। আমি আছি টবে, তোমার মালি জল না দিলে আমি বাঁচতে পারি না। আমার শিকড় টবের গায়ে আটকে যায়, মাটি পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না। তোমারও বন্ধু সেই অবস্থা। এক অদৃশ্য টবের উপর তুমি রয়েছ, বাইরে থেকে খাবার আসবে তবে তুমি বাঁচবে। তোমার কষ্ট আমি বুঝতে পারছি। আমরা উভয়েই সগোত্র। বাইরে থেকে রস এলে তবে আমরা ফুল ফোটাতে পারি। না এলে মরণ ছাড়া আমাদের আর গতি নেই। লেডি হিলিংডনের স্বাধীনতা আর তোমার আমার স্বাধীনতা এক নয়।"

চুপ করে বসে রইলাম খানিকক্ষণ। তারপর ক্রিসানথিমামের টবটা ভেঙে তাকে মাটিতেই পুঁতে দিলাম।

লেডি হিলিংডন হেসে বললে—"এবার আপনার টবটা ভাঙবে কবে ?"

"কি জানি !"

বহিরঙ্গ

॥ এক ॥

বহুকালপূর্বে হিমালয় গুহাবাসী একজন লামা একটি টিয়াপাখীর বাচ্চা কুড়িয়ে পেয়েছিলেন। পাখীটিকে তুলে নিয়ে গিয়ে তিনি লালন পালন করেন। পাখীটি যখন বড় হ'ল তখন লামা তাকে সম্বোধন করে বললেন, "বৎস শুক, এবার তুমি বড় হয়েছ, এবার চরে খাও গিয়ে। আমি সন্ন্যাসী মানুষ, তোমাকে নিয়ে আর কত দিন বিব্রত হব ?"

শুক জুলজুল করে লামার মুখের দিকে চেয়ে রইল। লামা বললেন, "তোমাকে মানুষের ভাষায় কথা বলবার শক্তি দিচ্ছি, তুমি মনোভাব ব্যক্ত কর।"

শুক তখন বললে, "প্রভু কি করে চরে খেতে হয় তা তো জানি না। আপনি খাবার দিয়েছেন আমি খেয়েছি। এখন—"

বৃদ্ধ লামা শুকপক্ষীর অসুবিধা হৃদয়ঙ্গম করে বললেন, "তুমি তাহলে মনুষ্য সমাজে যাও। সেখানে অনেকে শুককে পিঞ্জরাবদ্ধ করে আনন্দলাভ করেন শুনেছি। যদি তাঁদের কারো দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পার তোমার আহারের অভাব হবে না।"

শুক বললে, "আমার কি এমন গুণ আছে প্রভু যে আমি এমন মহানুভব ব্যক্তির দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারব !"

বৃদ্ধ লামা দেখলেন সত্যই বেচারা বিপন্ন। সত্যই তো দৃষ্টি আকর্ষণ করবার মতো বিশেষ কোনও গুণ ওর নেই। অনেকক্ষণ ভেবে তিনি তখন বললেন—"আচ্ছা, তোমাকে তাহলে গোটা দুই বুলি শিখিয়ে দিচ্ছি। সম্ভবত এতেই তোমার কাজ হবে—"

"কি বুলি প্রভু।"

"এস, কানে কানে বলে দি।"

বুলি দুটি প্রথমে কর্ণস্থ এবং পরে কণ্ঠস্থ করে শুকপক্ষী লামাকে বললে, "বুলি দুটি কোথায় কখন আওড়াব ?" লামা বললেন, "সমস্ত বলে দিচ্ছি। এই হিমালয়ের পাদদেশে ভারতবর্ষ নামে এক বিশাল দেশ আছে। খুব ছেলেবেলায় সে দেশে আমি একবার গিয়েছিলাম। প্রধানতঃ দু'রকম জাতের লোক সে দেশে বাস করে। প্রথম বুলিটি বললে এক জাতের লোকেরা তোমাকে সমাদর করবে, দ্বিতীয় বুলিটি তোমাকে প্রিয় করবে আর এক জাতের লোকের কাছে। যখন যে রকম সুবিধা বুঝবে আওড়াবে।"

শুক বললে, "কে কোন্ জাতের লোক আমি চিনব কি করে।"

"বুঝিয়ে দিচ্ছি তোমাকে। মন দিয়ে শোন।"

লামা তাঁর বাল্যকালের ধারণা অনুযায়ী বলতে লাগলেন। শুক নিবিষ্টচিত্তে শুনতে লাগল।

॥ দুই ॥

কিছুকাল পরে শুক পক্ষিটি উড়তে উড়তে ভারতভূমিতে হাজির হল এসে।

অনেক ঘুরে ঘুরেও কে কোন্ জাতের লোক তা সে নির্ণয় করতে পারল না কিন্তু। অধিকাংশ লোকই হাফপ্যান্ট বা প্যান্ট পরা, মাথায় শোলার হ্যাট বা গান্ধি টুপি, কিংবা ফেজ কিংবা পাগড়ি…লামার বর্ণনার সঙ্গে একটা মেলে তো আর একটা মেলে না।

অনেক ঘুরে ঘুরে সে শেষে মনঃস্থির করে ফেললে। বাড়ির চারদিকে মুরগি চরছে, পেঁয়াজের গন্ধ উঠছে রান্নাঘর থেকে, দাড়িওলা গৃহস্বামী চেক চেক লুঙ্গি পরে গড়গড়ার তামাক খাচ্ছেন, বাড়ির মেয়েরা সালোয়ার পরে ঘুরছে। শুকপাখী নেমে পড়ল চালের উপর এবং ছেলেরা যেখানে খেলছিল সেই দিকে এগিয়ে যেতে লাগল ধীরে ধীরে।

"ওমা কি সুন্দর একটা টিয়া দেখ দেখ।"

রোমাঞ্চিত কলেবরে বসে রইল শুক। ছেলেরা হাততালি দিলে, ঢিল ছুঁড়লে, নানারকম শব্দ করলে, কিন্তু শুক নড়ল না।

"কারও পোষা টিয়া বোধ হয় তাহলে রে। ধরবি ?"

"আমাদের একটা খাঁচাও তো আছে।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, ধরতে পারলে পোষা যাবে।"

শুক ধরা দিলে। মহানন্দে ছেলে-মেয়েরা তাকে খাঁচায় পুরে খাবার খেতে দিতে লাগল। শুকেরও আনন্দ হল খুব। সে গদগদ কণ্ঠে লামার শেখানো বুলিটি আউড়ে দিলে—"আল্লা হো আকবর।"

"আ মোলো, এটা মোচরমানের বাড়ির পোষা পাখী নিশ্চয়। দূর কর দূর কর দূর কর—"

সত্যিই দূর করে দিলে তারা শুককে।

॥ তিন ॥

অনেক ঘুরে ঘুরে শুক দ্বিতীয় আর একটি বাড়ি নির্বাচন করলে কিছুদিন পরে। গৃহস্বামীর গোঁফ দাড়ি কিছু নেই, গাই দুটিকে খুব যত্ন করেন, নিরামিষাশী, মাথায় সরু একটি টিকি, কপালে তিলক, গলায় কণ্ঠি। বাড়ীতে ছেলে পিলেও নেই বাজা বাঁজি। শুকপক্ষী চালে বসতেই বউটি বললে—"ওগো, কার টিয়া পালিয়ে এসেছে বোধ হয়। আহা, ওকে দেখে আমাদের টিয়াটার কথা মনে পড়ছে। আসবার সময় সেটাকেও যদি আনতাম—"

"চুপ।"

তর্জন করে উঠলেন স্বামী।

"ধরবে ওকে—"

শুকপক্ষী আর একটু নেমে এল।

"ওমা, নেবে আসছে।"

আর একটু নেবে এল সে।

"ওগো, হাতের কাছে এসে পড়ল যে। ধরব? একটা খাঁচা চাই যে—"

শুকের কাণ্ড দেখে গৃহস্বামীও বিস্মিত হয়েছিলেন। তিনি বললেন, "এতো আজব চিঁড়িয়া দেখছি। ধরে ফেল। খাঁচার ব্যবস্থা একটা হবেই…"

শুকপক্ষী পুনরায় পিঞ্জরাবদ্ধ হল। পুনরায় ছোলা ছাতু লঙ্কা পেঁপে দিয়ে সম্বর্ধনা করলে তাকে বউটি। পুনরায় গদগদ কণ্ঠে রোমাঞ্চিত কলেবরে শুকপক্ষী দ্বিতীয় বুলিটি আউড়ে দিলে, "রাধে কৃষ্ণ, রাধে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে—"

বুলি শুনে স্বামী স্ত্রী উভয়েই বিস্ফারিত নয়নে চেয়ে রইল তার দিকে। কি কাণ্ড!

স্বামী বললে, "থাক, এখন কিছু বোলো না।"

গভীর রাত্রে খাঁচার দ্বার খুলে গৃহস্বামী শুক পক্ষীকে বার করলেন এবং বললেন, "কাফের আমাকে রাধাকৃষ্ণ নাম শোনাতে এসেছ? ছদ্মবেশে না হয় হিন্দুস্থানে থাকতেই হয়েছে, তা বলে পাখীর স্পর্ধা সহ্য করব ভেবেছ—"

এই বলে গলাটি মুচড়ে দিলেন।

॥ চার ॥

অশরীরী শুক লামার কাছে এসে হাজির হল আবার। সমস্ত বর্ণনা করে বললে—

"একি করলে প্রভু—"

"কি করলাম!"

"আপনার সেকেলে ধারণার প্যাঁচে পড়ে প্রাণটি যে গেল—"

লামা তাঁর মুণ্ডিত মস্তকে একবার হাত বুলিয়ে বললেন, "আরে ভালোই তো হল, আর পেটের চিন্তা থাকবে না। এইবার ক্রমশ নির্বাণ লাভ করবে।"

"নির্বাণ? সে আবার কি।"

লামা কোন উত্তর না দিয়ে মুচকি হাসলেন একটু।

শ্রীহনুমান সিং

॥ এক ॥

গল্পটি পড়িবার পর যে লোকটিকে আপনারা হেয় মনে করিবেন তাহার স্বপক্ষে প্রথমেই কিছু ওকালতি করিতেছি। লোকটি প্রকৃতই ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি। প্রতিদিন দুই ক্রোশ হাঁটিয়া গঙ্গাস্নান করেন। কখনও মিথ্যা কথা বলেন না। তিনি দালাল, ডাক্তার, উকিল বা রাজনৈতিক নহেন, সুতরাং মিথ্যা কথা বলিবার প্রয়োজনও তাঁহার হয় না। তিনি সুদূর পল্লীগ্রামে চাষবাস লইয়া থাকেন। বেশ বড় গৃহস্থ। কোনপ্রকার বিলাসের ধার ধারেন না। নগ্ন পদ, নগ্ন গাত্র। বুক-পিঠ-ভরা ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল

ঢাকিয়া রাখিবার কোন প্রয়াসই তিনি করেন নাই। শোনা যায় জীবনে কোনও অন্যায় কার্যও তিনি করেন নাই, কাহারও অন্যায় সহ্যও করেন নাই। কথিত আছে—একবার একটি তস্কর তাঁহার গাছের বেল পাড়িয়াছিল, তিনি নাকি দুই ক্রোশ ছুটিয়া গিয়া তাহাকে ধরেন এবং এমন মার মারেন যে লোকটা সংজ্ঞাহীন হইয়া যায়। কোনপ্রকার অনাচার তিনি সহ্য করেন না।

লক্ষ্মণপুর গ্রামে হনুমান সিংয়ের বাস। সে গ্রামে তাড়ি বা গাঁজার দোকান তো নাই-ই, প্রকাশ্যে বিড়ি সিগারেটও বিক্রয় হয় না। নানারকম লোক লক্ষ্মণপুর গ্রামে নানারকম নেশার ব্যবসা চালু করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু সুবিধা করিতে পারে নাই। কারণ হনুমান সিং নিজে বলিষ্ঠ ব্যক্তি এবং গ্রামস্থ সকলে তাঁহাকে দেবতার ন্যায় শ্রদ্ধা করে। সুতরাং তাঁহার মতের বিরুদ্ধে লক্ষ্মণপুর গ্রামে কোনও কিছু করা অসম্ভব। এই নিরক্ষর গ্রাম্য হনুমান সিংকে আমিও শ্রদ্ধা করিতাম। এই খর্বাকৃতি লোকটির এমন একটা ব্যক্তিত্ব ছিল যে স্বতঃই সে সকলের মনে শ্রদ্ধা উদ্রিক্ত করিত।

তাহাকে একদিন বলিয়াছিলাম, "সিংজি, অগর আপ ইংরেজি জানতে তো মিনিস্টর বন্ যাতে—"

"আরে রাম রাম। অংরেজি ম্লেচ্ছ-ভাষা হ্যায়, কোন দুখসে ম্লেচ্ছ-ভাষা শিখেঙ্গে। তুলসীদাসজীকি ভাষা জানতে হে', ওহি কাফি হ্যায় মেরে লিয়ে—"

'কাফি' এবং 'লিয়ে'ও যে ম্লেচ্ছ শব্দ তাহা আর সিংজিকে বলিলাম না। সিংজিকে চটাইয়া লাভ নাই। তাহার দৌলতেই আমার লক্ষ্মণপুরের প্র্যাকটিস একচেটে।

সিংজির একটি মাত্র দোষ ছিল তিনি পট করিয়া চটিয়া যাইতেন এবং চটিয়া গেলে তাঁহার জ্ঞান থাকিত না।

॥ দুই ॥

সেদিন ডিসপেন্সারিতে আসিয়াই দেখিলাম সিংজি পরম আরামে আমার ডিসপেন্সারির বারান্দায় বসিয়া আছেন। অর্থাৎ একটি গামছাকে বেড় দিয়া কোমর এবং জানুদ্বয়কে একসঙ্গে বাঁধিয়া লইয়াছেন। সিংজি চেয়ারে বসা পছন্দ করেন না। আমরা চেয়ারে বসিয়া যে সুখ পাই সিংজি কোমর এবং হাঁটুকে গামছা-বন্ধনে কায়দা করিয়া লইয়া তদপেক্ষা অধিক সুখ পাইয়া থাকেন। সিংজির পাশেই একটি শীর্ণকান্তি বালক বসিয়াছিল।

"মেরা বেটা হ্যায় ডাকটার সাহেব, দিন দিন শুখ্ যাতা হ্যায়, তবিয়ৎ লাগা কর দেখিয়ে তো ক্যা হুয়া—"

পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম। প্রধান লক্ষণই দেখিলাম রক্তহীনতা। বালকের চোখ-মুখ একেবারে পাণ্ডুর হইয়া গিয়াছে। মনে হইল ইহার মলটা একবার পরীক্ষা করিয়া দেখা দরকার। কৃমির জন্য অনেক সময় এরূপ হয়। সিংজিকে সে কথা বলিলাম। তিনি বলিলেন, "হাঁ হাঁ মলমূত্র খুন সব কুছ যাঁচ কর লিজিয়ে—"

প্রথমে মল পরীক্ষা করাই স্থির করিলাম।

॥ তিন ॥

হুক্‌ ওয়ার্ম পাওয়া গেল।

হুক্‌ ওয়ার্মের জন্যই যে ছেলেটির ওই দুর্দশা তাহাতে সন্দেহ রহিল না।

“কেয়া মিলা ডাকটার সাহেব”– সিংজি সোৎসুকে প্রশ্ন করিলেন।

“হুক্‌ ওয়ার্ম। রোগকা আসল্‌ কারণ ওহি হ্যায়। আব থোড়া ঠহর যাইয়ে, ম্যায় থোড়িদের কে লিয়ে বাহার যাতা হুঁ। ঘুরকে আ কর দাবাকা বন্দোবস্ত কর দেংগে।”

হনুমান সিং সবিস্ময়ে একবার আমার দিকে, একবার আমার মাইক্রোস্‌কোপের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। একটি কথা বলিলেন না। পরমুহূর্তেই তাঁহার ঝাঁকড়া ভ্রূযুগল কুঞ্চিত এবং রোমাচ্ছন্ন নাসারন্ধ্রদ্বয় বিস্ফারিত হইয়া গেল। আমার আর দাঁড়াইবার সময় ছিল না, একটি কলেরা রোগী আমাকে ডাকিতে আসিয়াছিল। আমি তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেলাম।

ফিরিয়াই অবিলম্বে বালকটির চিকিৎসা সুরু করিতে হইল। তাহার মাথা কাটিয়া গিয়াছিল, নাক দিয়া রক্তও পড়িতেছিল। সিংজি গর্জন করিতেছিলেন, “হুক্কা পি কর বেমারি বানায়ে হেঁ, শালা। মানা করতে করতে হায়রান হো গিয়া। কেত্‌না দফে তুমকো কহা থা—আরে শালা, হুক্কা মৎ পিও। হুক্কা মৎ পিও। ডাক্‌টার সাহেব যন্তর দেকে পকড় লিহিন হুক্কা বেমারি হুয়া হ্যায়, তব্‌ ভি চালাকি ? উল্লু কাঁহিকা—”

বুঝিলাম সিংজির ভুল ভাঙাইতে বেশ কিছু সময় লাগিবে, অগ্রে বালকটিকে রক্ষা করা দরকার।

তাহাই করিলাম।

হৃদয়রাজ্যের বিচার

॥ এক ॥

হৃদয়রাজ্যে এখনও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, সেখানে এখনও স্বেচ্ছাচারতন্ত্র চলিতেছে। বিবেক নামক যে রাজ্যটিকে আমরা সে রাজ্যের সিংহাসনে বসাইয়া রাখিয়াছি তাঁহার চাল-চলন আচার-বিচার কোনও আধুনিক পদ্ধতি মানিয়া চলে না। অথচ তিনি আধুনিক সকল কথাই বেশ মন দিয়া শোনেন। তিনি পণ্ডিত জওহরলালের বক্তৃতা শুনিয়া মুগ্ধ হন। স্তালিনের স্বল্প-ভাষণের স্বপক্ষে মাথা নাড়েন, জনবুল সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি চার্চিলকেও তিনি অবজ্ঞা করেন না বরং তাঁহার সাহিত্যিক প্রতিভা তাঁহার অন্তরে পুলকই সঞ্চার করে—কিন্তু কার্যকালে দেখা যায় তিনি নিজের মতে নিজের পথে চলিতেছেন। জওহরলাল, স্তালিন বা চার্চিল তাঁহাকে স্বপথ হইতে বিন্দুমাত্র বিচলিত করিতে পারে নাই।

…একবার ট্রেনে যাইতেছিলাম। একটা বড় স্টেশনে গাড়ী দাঁড়াইয়াছিল। খদ্দরি স্যুট পরিহিত এক হোটেলওয়ালা আসিয়া উপস্থিত হইল। সসম্ভ্রমে বলিল, ভারতীয় কৃষ্টি সর্বসমন্বয়-মূলক আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সে ইটালিয়ান পাচকের সাহায্যে

মোচা দিয়া এক রকম অভিনব ফ্রেঞ্চ কাটলেট প্রস্তুত করাইয়াছে। দেশপ্রেমিক মাত্রেরই উচিত তাহা একবার আস্বাদন করিয়া দেখা। হৃদয়রাজ্যের অধিপতি কথাগুলি স্মিতমুখে শুনিলেন, কিছু বলিলেন না। হোটেলওয়ালা চলিয়া গেল। তাহার পর আসিল একজন নিখুঁত স্বদেশী মিষ্টান্ন-বিক্রেতা। মাথায় খদ্দরের পাগড়ি, গায়ে খদ্দরের আলখাল্লা, পায়ে অনলঙ্কৃত মহিষ চর্মের পাদুকা। রাষ্ট্রভাষা হিন্দিতে সে যাহা নিবেদন করিল তাহার বাংলা সারমর্ম এই : স্বদেশী ইক্ষু হইতে প্রস্তুত স্বদেশী গুড় এবং স্বদেশী চাউল হইতে প্রস্তুত চোরাট্টা (চাউল-চূর্ণ —এই উভয়বস্তুকে একত্রিত করিয়া সে নিখুঁত স্বদেশী সন্দেশ প্রস্তুত করিয়াছে। স্বাধীন ভারতের প্রত্যেক জীবিত ব্যক্তিরই উচিত—ইত্যাদি। বিবেক হাসিমুখে মাথা নাড়িলেন, কিন্তু সন্দেশ কিনিবার আদেশ দিলেন না। একটু পরে ক্ষুধা আসিয়া আবেদন জানাইল—কি খাইব? বিবেক বলিলেন, কিছু কলা এবং পেয়ারা কিনিয়া ফেল। ক্ষুধা হাসিমুখে তাহাই করিল। ইহাও এক আশ্চর্য ব্যাপার। কাগজে দেখি আজ অমুক মন্ত্রীর বিরুদ্ধে 'নো কনফিডেন্স', তমুক নেতার বিরুদ্ধে ধর্মঘট, হৃদয়রাজ্যে কিন্তু ওসবের নাম-গন্ধও নাই। সকলেই হাসিমুখে ওই স্বেচ্ছাচারীটার আদেশ অবনত মস্তকে পালন করিয়া কৃতার্থ হয়।

ভূমিকায় আপনাদের অনেকখানি সময় নষ্ট করিয়া ফেলিলাম, আসল গল্পটা এখনও আরম্ভ করি নাই। গল্পটা এবার শুনুন।

আমি ডাক্তার। আমাদের ক্ষুধার সুযোগ লইয়া খাদ্য বিক্রেতারা যেমন নিজেদের বহুবিধ ক্ষুধা তৃপ্ত করে, আমাদের লজ্জার সুযোগ লইয়া বস্ত্র-বিক্রেতারা যেমন লাল হইয়া যায় আমিও তেমনি মানুষের অসুস্থতার সুযোগ লইয়া নিজেকে প্রায় অসুস্থ করিয়া তুলিয়াছি। আধুনিক শহরে প্রকাশ্য দিবালোকে অথবা অর্ধ-আলোকিত রাত্রির অন্ধকারে যে স্থানে স্বর্গ এবং নরক পাশাপাশি প্রকট হইয়া ওঠে রাজপথ নামক আধুনিক সেই তীর্থের একপাশে বহুদিন যাবৎ আমিও আমার 'সুলভ ক্লিনিক' নামক ঔষধালয়টি খুলিয়া বসিয়া আছি। বাত এবং ডায়াবিটিস এই উভয় প্রকার দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি বহুদিন হইতে আমাকে পাড়িয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে। এখনও তাহারা সম্পূর্ণ কৃতকার্য হইতে পারে নাই। এখনও উঠিয়া হাঁটিয়া বেড়াইতে পারি। ডাক্তারী জীবনের আনন্দ-বিষাদের কাহিনী শুনাইয়া আপনাদের অমূল্য সময় নষ্ট করিব না, শুধু ডাক্তারি অভিজ্ঞতা হইতে একটি গল্প বলিব।

একবার একটি বৈজ্ঞানিক ব্যক্তির দর্শন লাভ করিয়া ছিলাম। তিনি শুধু বৈজ্ঞানিক নন. তিনি ন্যায়নিষ্ঠ, সহৃদয় এবং আধুনিক। পরিধানে প্যান্ট এবং বুশসার্ট, চোখে রঙীন চশমা। অর্থনৈতিক চাপের জন্যই তিনি যে বাধ্য হইয়া এই অদ্ভুত বেশ ধারণ করিয়াছেন তাহা দেখিলেই বোঝা যায় এবং বুঝিলেই কষ্ট হয়।

সেদিন সকাল হইতে একটিও রোগী আসে নাই। বহমান পথ-নদী-স্রোতে দৃষ্টির ছিপ ফেলিয়া চিন্তা করিতেছিলাম আমাদের নব-নির্বাচিত স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহাশয়ের কর্মনিপুণতাই কি ইহার কারণ? ঘর্ঘরশব্দে বিমান পথে উড়িয়া উড়িয়া দেশের স্বাস্থ্যসম্পদ ফিরাইয়া দিয়া তিনি কি ডাক্তারদের সর্বনাশ সাধন করিতেছেন? তাহা যদি হয় আগামীবারে চেষ্টা করিতে হইবে লোকটা যাহাতে ভোট না পায়। লোকটা··· । চিন্তাধারাকে ব্যাহত করিয়া উক্ত ভদ্রলোক প্রবেশ করিলেন।

"আপনিই কি ডাক্তারবাবু—"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"নমস্কার, আপনার কাছেই এলাম।"

"নমস্কার। বসুন—"

ভদ্রলোকের দৃষ্টি হইতে এক ঝলক সহৃদয়তা যেন চলকাইয়া পড়িল। আমার দিকে আর একবার হাস্যদীপ্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "এখানকার সিভিল সার্জনের সঙ্গে আমার খুব আলাপ আছে। ডাক্তার সরকারও খুব অন্তরঙ্গ লোক আমার কিন্তু আপনার কাছেই এলাম আমি। আপনার খুব নাম শুনেছি—"

আর এক ঝলক সহৃদয় দৃষ্টি চলকাইয়া পড়িল এবং এবার সেটা যেন সূক্ষ্মমূর্তি ধারণ করিয়া আলতো আলতো ভাবে আমার পিঠ চাপড়াইতে লাগিল।

বিগলিত হইয়া বলিলাম, "বলুন আমাকে কি করতে হবে—"

"আমার 'ওয়াইফ'কে দেখতে হবে একবার। আপনার সময় আছে কি এখন, যেতে পারবেন?"

"সময় আছে। কি হয়েছে আপনার স্ত্রীর—"

"কাসি আর জ্বর।"

"ও। কখন জ্বর হয়?"

"সন্ধ্যার দিকে।"

"কতদিন থেকে ভুগছেন?"

"তা প্রায় তিন মাস।"

"বেশ চলুন, দেখে আসি।"

যাহা প্রত্যাশা করিয়াছিলাম গিয়া তাহাই দেখিলাম; কিন্তু আর একটা জিনিস দেখিলাম যাহা অপ্রত্যাশিত। ইতিপূর্বে যক্ষ্মাগ্রস্ত স্ত্রীলোক অনেক দেখিয়াছি, তাহাদের স্বামীদের আচরণ লক্ষ্য করিবার সুযোগও একাধিকবার মিলিয়াছে, কিন্তু এমন বৈজ্ঞানিক মনোভাবসম্পন্ন স্বামী কখনও দেখি নাই। দেখিলাম ছাতে চিলে কোঠার ঘরটিতে স্ত্রীকে রাখিয়াছেন। সেখানে তিনি বিশুদ্ধ বাতাস এবং নিঃশব্দ নির্জনতা উপভোগ করেন। তাঁহার বাসন-পত্র, কাপড়-চোপড় সমস্ত আলাদা। স্ত্রীকে তিনি বিছানা হইতে উঠিতে পর্যন্ত দেন না। নীচে দেখিলাম একটি কমবয়সী চাকরানী গৃহের যাবতীয় কাজকর্ম সামলাইতেছে। ঘরে ঢুকিবার পূর্বে ভদ্রলোক বুশ সার্টের পকেট হইতে রুমাল ও ছোট শিশি বাহির করিলেন। শিশির ছিপি খুলিয়া রুমালে ইউক্যালিপ্‌টাস্‌ অয়েল ঢালিলেন, গন্ধ হইতেই তাহা বুঝিলাম। যতক্ষণ ঘরের ভিতর রহিলেন, রুমালটা নাকের সামনে ধরিয়া রাখিলেন।

যথারীতি আমি বলিলাম, "স্পিউটাম্‌টা পরীক্ষা করতে হবে—এক্সরে করালেও ভাল হয়।"

"দুই-ই করানো হয়েছে।"

"দেখি।"

দেখিলাম কফে যক্ষ্মার বীজাণু পাওয়া যায় নাই। এক্সরের ছবিতে এক জায়গায় সন্দেহজনক একটু কালো দাগ আছে।

পুনরায় বলিলাম, "স্পিউটামটা আর একবার পরীক্ষা করতে চাই।"

"বেশ। স্পিউটাম রাখাই আছে। ওই যে—"

দেখিলাম একটি মুখবন্ধ শিশিতে খানিকটা কফ রহিয়াছে।

ভদ্রলোক বলিলেন, "ওকে বাইরে থুতু ফেলতে মানা করেছি, ওই শিশিতে ফেলে মুখ বন্ধ করে রেখে দেয়, আগে শিশিটায় 'লাইসল' দিয়ে রাখতাম, কিন্তু একদিন ঠোঁটে লেগে গিয়েছিল, তাই এখন এমনিই রাখে। শিশিটা ভরে গেলে ওটা পুড়িয়ে ফেলি—।"

মুগ্ধ হইলাম।

"আপনি ওটা নিয়ে আসুন তাহলে—"

"আচ্ছা।"

চলিয়া আসিলাম। একটু পরে ভদ্রলোক স্পিউটাম লইয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলাম চার পাঁচ পুরু ন্যাকড়া দিয়া বাঁধা শিশিটাকে বাইকের হাতলে ঝুলাইয়া আনিয়াছেন। অতি সন্তর্পণে সেটা বাইকের হাতল হইতে খুলিয়া বাম হস্তে দুইটি অঙ্গুলিতে ঝুলাইয়া ঘরের ভিতর ঢুকিলেন।

"কোথা রাখব বলুন—"

"ওই টেবিলে।"

টেবিলে রাখিয়া হাতটা তুলিয়া রহিলেন।

"সাবান আছে—"

"আছে। জলও ওই বালতিতে আছে—"

প্রায় এক বালতি জল এবং কার্বলিক সাবানটার প্রায় অর্ধেক শেষ করিয়া ফেলিলেন।

"একটু স্পিরিট আছে?"

"আছে—"

"দিন তো—"

বেশ খানিকটা স্পিরিট লইয়া নিজের হাতে এবং বাইকের হাতলে অনেকক্ষণ ধরিয়া লাগাইলেন।

"সাবধানে থাকাই ভাল, কি বলেন—"

"নিশ্চয়।"

"কখন আসব?"

"ঘণ্টা দুই পরে।"

আমিও অনেকক্ষণ চেষ্টা করিয়া যক্ষ্মার জীবাণু আবিষ্কার করিতে পারিলাম না।

ঘণ্টা দুই পরে ভদ্রলোক আসিলেন।

"পেলেন কিছু।"

"না, পেলাম না।"

"কি করা যায় তাহলে বলুন। এক্সরে দেখে কিন্তু সন্দেহ হয়, দেখলেন তো। আচ্ছা, স্যানাটোরিয়ামে পাঠিয়ে দিলে কেমন হয়?"

"খুব ভাল হয়—"

"যাদবপুরে আপনার পরিচিত কেউ আছেন?"

"আছেন একজন।"

"একটা চিঠি লিখে দেবেন স্যার দয়া করে।"

"দেব। কাল আসবেন।"

"আপনার 'ফি'টা এখনও দেওয়া হয় নি। কত দেব?"

"দশ টাকা।"

"দশ টাকা? আমি শুনেছিলাম পাঁচ। বেশ, দশ টাকাই নিন। আপনার ন্যায্য পাওনা থেকে আপনাকে বঞ্চিত করবার ইচ্ছে নেই।"

পকেট হইতে ব্যাগ বাহির করিলেন এবং গণিয়া গণিয়া দশখানি এক টাকার নোট বাহির করিয়া দিলেন। মুখভাব দেখিয়া মনে হইল যেন কোনও মহৎ কর্ম করিলেন।

"টাকাটা গুণে নিন। কাল সকালে আসব কি?"

"আসবেন।"

ভদ্রলোক চলিয়া গেলেন।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছিল। আমার ডিসপেন্সারির সম্মুখে পথের ধারে মিউনিসিপালিটির যে বর্তিকাটি প্রতিদিন প্রজ্বলিত হইয়া যৎসামান্য আলোক বিতরণ করে সেদিন কেন জানি না সেটি জ্বলে নাই। তাই বারান্দার এক কোণে উপবিষ্ট কুসুমিকে দেখিতে পাই নাই। ভদ্রলোক চলিয়া গেলে কুসুমি সামনে আসিয়া দাঁড়াইল।

কম্পাউণ্ডার বাবু বলিলেন, "অনেকক্ষণ থেকে বসে আছে আপনার সঙ্গে দেখা করবে বলে। খানিকটা কফ এনেছে পরীক্ষা করার জন্যে—"

কুসুমির স্বামীর চিকিৎসা করিয়াছিলাম, তাহাকে চিনিতাম। এবার যেন তাহার আরও দুরবস্থা লক্ষ্য করিলাম। পরনে চিট্‌চিটে ময়লা কাপড়, মাথার চুল রুক্ষ, চক্ষু দুইটি লাল। আমার সামনে আসিয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। কাঁদিয়া কাঁদিয়াই সম্ভবত চক্ষু দুইটি লাল হইয়াছিল।

বলিল, তাহার এক সৎ বোনকে সে ছেলেবেলা হইতে মানুষ করিয়াছিল। সর্বস্বান্ত হইয়া কিছুদিন পূর্বে তাহার বিবাহও দিয়াছিল। কিন্তু এমনি তাহার পোড়াকপাল তিন দিন পূর্বে হঠাৎ কাসিতে কাসিতে তাহার দুলালীর মুখ দিয়া রক্ত বাহির হইয়াছে, কিছুতেই রক্ত বন্ধ হইতেছে না। জ্বরও হইতেছে। আমি যদি দয়া করিয়া কফটা পরীক্ষা করিয়া দেখি—।

দেখিলাম সে একটি মাটির সরায় এক সরা রক্তাক্ত কফ নিজের কাপড় দিয়া ঢাকিয়া আনিয়াছে। কাপড়েও খানিকটা কফ লাগিয়া গিয়াছে।

আমি তাহাকে বৈজ্ঞানিক যুক্তি দেখাইয়া সতর্ক করিলাম।

সে বলিল, "ডাক্তারবাবু, আমার দুলালীই যদি না বাঁচে আমার বেঁচে কি হবে।"

পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম যক্ষ্মার জীবাণুতে ভরা। কুসুমি বলিল, "ডাক্তারবাবু, আপনাকে আর একটা অনুরোধ করছি। ওর স্বামী যদি আসে তাকে বলবেন না যেন ওর এই কাল ব্যাধি হয়েছে। তাহলে ও একে ছেড়ে দিয়ে ঠিক আর একটা বিয়ে করবে। সে আপনার কথা খুব মানে, দোহাই আপনার, তাকে সত্যি কথাটা বলবেন না।"

পা জড়াইয়া ধরিল।

নিরুপায় হইয়া প্রতিশ্রুতি দিলাম।

মেয়েটি আঁচলে আমার 'ফি' বাঁধিয়া আনিয়াছিল। একগাদা রেজকি। পয়সা, ডবল-পয়সা, আনি, দুয়ানি আর সিকি। দেখিলেই মনে হয় সে অনেক দিনের সঞ্চিত এই পয়সাগুলি সৎ বোনটির জন্য খরচ করিতেছে।

বলিলাম, "তোকে আর ফি দিতে হবে না—"

"সে কি হয় ডাক্তারবাবু, আপনাকে ফি দেবার সামর্থ্য কি আছে আমার!"

রেজকিগুলি টেবিলের উপর ঢালিয়া দিল।

"আপনার পুরো ফি আনতে পারি নি বাবু—"

"ওগুলো নিয়ে যা না—"

"না বাবু, কিছু না নিলে আমার তৃপ্তি হবে না।"

ঔষধ লইয়া ও ঔষধের পুরা দাম দিয়া কুসুমি চলিয়া গেল।

রাত্রে শুইয়া আছি। চতুর্দিক নিস্তব্ধ। শুনিতে পাইলাম হৃদয়রাজ্যের অধিপতি বিবেক শ্রদ্ধাকে ডাকিয়া প্রশ্ন করিতেছে—"আজ কাকে তোমার পুজোর ঘরে বেদীতে বসিয়েছ—"

"কাউকে বসাই নি এখনও—"

"কাকে বসাবে?"

"আপনি যাকে বলবেন।"

"ওই কুসুমিকে বসাও।"

"সেই বৈজ্ঞানিক ভদ্রলোককে?"

"না।"

কাণ্ড দেখুন!

চতুরীলাল

চতুরীলালের নাম আপনারা নিশ্চয় শোনেন নাই। আমিও শুনি নাই। সে নিজেই আসিয়া সেদিন নিজের পরিচয় ব্যক্ত করিল। বলিল, তাহার দূরসম্পর্কের কোন এক আত্মীয় নাকি আমার চিকিৎসায় দুই বৎসর পূর্বে ভাল হইয়া গিয়াছিল। তাহারই সুপারিশে সে আমার নিকট আসিয়াছে নিজের চিকিৎসা করাইবার জন্য।

বলিলাম, "আপনার হয়েছে কি—"

চতুরীলাল সহসা হাত দুটি জোড় করিয়া ফেলিল।

"সব কথা বলবার আগে একটা কথা জানতে চাই হুজুর। আপনার "ফিস্" কত?"

"দশ টাকা।"

"দশ টাকা দিতে আমার জিব বেরিয়ে যাবে ডাক্তারবাবু। কিছু কম করুন।"

"আপনি সত্যিই যদি দশ টাকা দিতে না পারেন, কম করব বইকি। খুব গরীব যদি হন একেবারেই কিছু নেব না—"

এই কথায় চতুরীলালের চোখে-মুখে যে ভাব পরিস্ফুট হইল, তাহা অপূর্ব। তাহা শ্রদ্ধা, যাহা-ভাবিয়াছিলাম-তাই-ব্যঞ্জক একটা ভাব এবং চতুরতার এক অবর্ণনীয় সমন্বয়। ঘাড়টা অন্যদিকে ফিরাইয়া স্মিতমুখে সে বামগুম্ফ-প্রান্তে ধীরে ধীরে তা দিতে লাগিল। অর্থাৎ ভাবিতে লাগিল অতঃপর কি বলা যায়।

আমি আর একটি রোগী লইয়া পড়িলাম। তাহাকে বিদায় করিয়া চতুরীলালের দিকে চাহিলাম আবার। চতুরীলাল বলিল, "আমার বাড়ির কাছেই একজন ভাল ডাক্তার আছেন। তিনিও এম-বি-বি-এস। কিন্তু আমি তাঁর কাছে যাইনি, আপনার কাছেই এসেছি। আসতে আমার খরচ লেগেছে তিন টাকা বারো আনা। ট্রেন ভাড়া আড়াই টাকা, জলখাবার এক টাকা, রিক্সা ভাড়া চার আনা। ফিরে যেতেও প্রায় ওই খরচই লাগবে। আপনি ফিস কিছু কম করুন ডাক্তারবাবু। দুটি টাকা আপনাকে দেব আমি।"

"আমি তো বলছি সত্যি যদি আপনার দেবার ক্ষমতা না থাকে, ও দু'টাকাও দিতে হবে না। আপনার বিবেক যা বলে তাই করুন। আমি আর কি বলব আপনার মতো ভদ্রলোককে।"

চতুরীলাল এই কথায় নীচের ঠোঁটটি উপরের ঠোঁট দিয়া চাপিয়া ধরিল। তাহার পর বারান্দায় গিয়া নাকটা ঝাড়িয়া আসিল। তাহার পর স্মিতমুখে বলিল, "রাজেন্দর সিং আমাকে বলেছিল, আপনি দয়ার সাগর। যে যা দেয় নিয়ে নেন।"

"আগে হয়তো দয়ার সাগর ছিলাম। কিন্তু ক্রমশই জিনিসপত্রের দাম যে-রকম বেড়ে যাচ্ছে, তাতে সাগর আর থাকতে পাচ্ছি কই, ডোবা হয়ে যাচ্ছি—।" চতুরীলাল উচ্ছ্বসিত আনন্দে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

"ঠিক বলেছেন, সকলেরই অবস্থা সমান। আমার কিছু জমি আছে, ধান মন্দ হয়নি, দামও পেয়েছি খারাপ নয়, কিন্তু খরচ—"

চতুরীলালের খরচের বর্ণনা শুনিবার অবকাশ পাইলাম না। পরিচিত এক ভদ্রলোক মোটরযোগে হন্তদন্ত হইয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার শালীর নাকি নাভিশ্বাস উঠিয়াছে। ভদ্রলোক চাকুরি করেন। ভাল চাকুরি। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। কিন্তু তাঁহার স্কন্ধে ডালপালাসমেত গোটা শ্বশুরবাড়িটাই আসিয়া ভর করিয়াছে। তাহারা পাকিস্তানী এবং বাস্তুহারা, বলিবার কিছু নাই। শালীটি আসিয়াই টাইফয়েডে পড়িয়াছে।

চতুরীলালকে বলিলাম, "আপনি একটু বসুন। আমি আসছি এখনি—"

চলিয়া গেলাম। একটা ইন্‌জেকশন দেওয়ার পর ভাগ্যক্রমে শালী সামলাইয়া গেল। ফিরিলাম প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে। দেখিলাম চতুরীলাল তখনও বসিয়া আছে। বারান্দায় আর একটি রোগিনীও আসিয়া জুটিয়াছে। তাহার নাকটা ফোলা, চোখ দুইটি লাল, মুখময় অসংখ্য ছোট ছোট গুটি। মেয়েটি আমাকে দেখিয়া ঘোমটা টানিয়া সরিয়া বসিল।

চতুরীলাল বলিল, "আপনাকে পাঁচ টাকা দেব ডাক্তারবাবু। নিন, এবার আমার

কথা শুনুন—।" রাগে সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল। কিন্তু রাগ প্রকাশ করাটা শোভন নয়।

হাসিয়া বলিলাম—"পাঁচ টাকার বেশি দেবার আপনার ক্ষমতা নেই নাকি, সত্যি ?"

চতুরীলাল মুচকি হাসিয়া চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর বলিল, "আমি রাজেন্দর সিংয়ের আত্মীয়। আমাকে কিছু খাতির করবেন না ?"

আমিও উত্তরে মুচকি হাসিলাম। আমার হাসি দেখিয়া মরীয়া হইয়া চতুরীলাল বলিল—"বেশ, আপনার কথাও থাক, আমার কথাও থাক। ছ'টাকা—"গণিয়া গণিয়া ছ'টি টাকা সে আমার সম্মুখে রাখিয়া হাত জোড় করিল।

"বেশ কি হয়েছে বলুন—"

চতুরীলাল তাহার রোগের বিবিধ বর্ণনা শুরু করিল। বর্ণনা শুনিয়া বুঝিলাম চতুরীলাল সম্ভবত বহুমূত্র ব্যাধিতে কাবু হইয়াছেন। প্রসাব পরীক্ষা করিলাম, প্রচুর চিনি।

"খুব খান নাকি ?"

"খুব। ছেলেবেলায় খেতে পাই নি। এখন ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন, আপনার আশীর্বাদে খাবার অভাব নেই এখন। খুব খাই—"

চতুরীলালের মুখ হাস্যোদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

"কিন্তু আপনার যা অসুখ হয়েছে, তাতে বেশি খাওয়া তো চলবে না। খাওয়া কমাতে হবে।"

"সেটি পারব না হুজুর। ছেলেবেলায় বাবা মারা গেলেন, ধারে তাঁর মাথার চুল পর্যন্ত বিকিয়ে গিয়েছিল। একবেলা খাওয়া, তাই জুটত না সব দিন। এখন আপনার আশীর্বাদে সামলে উঠেছি অনেকটা। ঘরে গাই আছে, ধান হয়, আলু হয়, আখ হয় —এখন যদি আবার আপনি খাওয়া বন্ধ করে দেন, তাহলে—"

হাত উল্টাইয়া এবং মুচকি হাসিয়া চতুরীলাল বক্তব্য শেষ করিল।

"কিছুদিন সংযম করুন। চিনি, ভাত, আলু এই তিনটে অন্তত ছেড়ে দিন—"

"ওই তিনটেই তো প্রিয় খাদ্য আমার। ও তিনটে ছেড়ে দিলে খাব কি—"

"তাহলে ইনজেকশন নিন। কিন্তু তার আগে আপনার রক্তটা দেখা দরকার, রক্তে চিনির পরিমাণ কত আছে।"

"রক্তেও চিনি থাকে নাকি ?"

"থাকে বইকি। রক্তে চিনির পরিমাণ বেশী হলেই তো সেটা পেচ্ছাপ দিয়ে বেরোয়—"

"ও—"

চতুরীলাল পুনরায় কিছুক্ষণ গুম্ফপ্রান্ত পাকাইয়া অবশেষে বলিল—"তার মানে খরচ—"

"অনেক খরচ। রক্ত পরীক্ষা করতেই ষোল টাকা লাগবে। তারপর ইনজেকশন পিছু খরচ আছে। রোজ অন্তত একটা করে ইনজেকশন দিতে হবে। বেশ খরচ এতে। তার চেয়ে কিছুদিন সংযম করেই দেখুন না—"

চতুরীলাল নীরবে গোঁফে তা দিতে লাগিল। তাহার পর সহসা আমার হাত দুইটি চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "রক্ত পরীক্ষার জন্যে আমি আট টাকার বেশি দিতে পারব না। দয়া করুন একটু—করতেই হবে—"

করিতেই হইল। বুঝিলাম শক্ত পাল্লায় পড়িয়াছি।

চতুরীলালের রক্ত লইলাম। বলিলাম, "আপনি বিকেলে এসে আমার সঙ্গে দেখা করবেন। রক্তটা পরীক্ষা করে তারপর আপনার ব্যবস্থা করব।"

বারান্দায় যে মেয়েটি এতক্ষণ আধ-ঘোমটা দিয়া বসিয়াছিল, সে এবার আসিয়া ঘরে ঢুকিল এবং অত্যন্ত নাটকীয় ভঙ্গীতে একেবারে আমার পা দুইটা জড়াইয়া ধরিল।

"বাঁচান বাবু আমাকে—"

"কি হয়েছে বল আগে, পা ছাড়, পা ছাড়—"

পা ছাড়িয়া সে নতমুখে উঠিয়া দাঁড়াইল।

"ঘোমটা সরাও, দেখি কি হয়েছে—"

দেখিলাম। সংশয় রহিল না, কি হইয়াছে। সিফিলিস। চতুরীলালও ব্যায়ত আননে তাহার দিকে চাহিয়া ছিল। মেয়েটিকে বলিলাম, "তোমার যা হয়েছে, তা সারাতে গেলে অনেক খরচ করতে হবে। পারবে ?"

মেয়েটি দুইটি রূপার বালা আঁচলের তলা হইতে বাহির করিয়া আমার টেবিলের উপর রাখিল।

"এই আমার যথাসর্বস্ব। এই নিয়ে আমার অসুখটা সারিয়ে দিন আপনি ডাক্তারবাবু।"

"বালা নিয়ে কি করব। আমাকে কিছু দিতে হবে না তোমার। ওষুধের যা ন্যায্য দাম—তাই জোগাড় কর—"

"কত দাম—"

"ভাল করে চিকিৎসা করলে প্রায় পঞ্চাশ টাকা পড়বে। তোমার রক্তটাও পরীক্ষা করতে হবে—"

"তার কত লাগবে ?"

"দশ টাকা। তা-ও না হয় আমি ছেড়ে দেব। ওষুধের দাম কিন্তু লাগবেই…"

মেয়েটি নীরবে অশ্রুমোচন করিতে লাগিল।

"বালা দুটোর দাম কত ?—"

"আমি তিরিশ টাকা দিয়ে কিনেছিলাম অনেকদিন আগে। এখন বেচতে গেলে কি দাম পাব জানি না।"

চতুরীলাল বলিল—"দশ টাকার বেশি কেউ দেবে না—ভিতরে গালা আছে—"

মেয়েটি আবার আমার পা জড়াইয়া ধরিবার চেষ্টা করিল। তাহাকে নিবৃত্ত করিয়া বলিলাম—"তুমি বাইরে বস। দেখি আমি কি করতে পারি। হাসপাতালে একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি, দেখ সেখানে যদি বিনাপয়সায় কোনও ব্যবস্থা হয়—"

"সেখানে গিয়েছিলাম। তারাও টাকা চায়—"

"তবে আর কি হবে —"

মেয়েটি চোখে আঁচল দিয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

"কেঁদে কি হবে, আচ্ছা বাইরে গিয়ে বস, দেখি কি করতে পারি।"

কিছুদিন পূর্বে এক বিলাতী কম্পানী কিছু ঔষধ বিনামূল্যে নমুনাস্বরূপ পাঠাইয়াছিল। ভাবিতেছিলাম তাহাই কাজে লাগাইব।

সহসা চতুরীলাল বলিয়া উঠিল, "আচ্ছা ডাক্তারবাবু, পঞ্চাশ টাকা খরচ করলে ও সেরে যাবে ?"

"যাবে—"

চতুরীলাল পুনরায় বামগুম্ফ-প্রান্ত ধরিয়া টানিতে শুরু করিল। ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিল, "দিন ওকে ওষুধ। দাম আমি দেব—"

"আপনি ?"

চতুরীলাল কিছু না বলিয়া কোমর হইতে একটি গেঁজে বাহির করিয়া পাঁচখানি দশ টাকার নোট আমার হাতে দিল।

হাসিয়া বলিল, "মায়া জিনিসটা বড় খারাপ ডাক্তারবাবু। মায়াই ডুবিয়েছে আমাদের—"

চতুরীলালের মুখে এ প্রকার জ্ঞানগর্ভ কথা শুনিব প্রত্যাশা করি নাই। একটা সন্দেহ হইল।

"আপনার কেউ হয় নাকি ?"

"না। তবে—"

চতুরীলাল ইতস্তত করিতে লাগিল।

"খুলেই বলুন না, ব্যাপারটা কি—"

"ব্যাপারটা কিছুই নয়। ওর মুখটা আমার মায়ের মুখের মতো অনেকটা—"

তাহার পর গলা-খাঁকারি দিয়া বলিল, "বাবা মারা যাবার মাসখানেক পরে মা-ও মারা যান। তখন আমাদের অবস্থা এত খারাপ, মায়ের কোন চিকিৎসাই করাতে পারি নি—"

সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিলাম, চতুরীলালের চোখের কোণে অশ্রু টলমল করিতেছে।

বাল্মীকি

অনেক দূরে হাঁটিয়া আসিয়া দেখিতেছি কপাট বন্ধ। সস্তায় হইবে বলিয়াই এত কষ্ট করিয়া এতদূরে হাঁটিয়া আসিয়াছি। ইলেকট্রিক বেলের বোতামটি টিপিয়া দাঁড়াইয়া আছি। বিজন যদি থাকে নিশ্চয়ই নামিয়া আসিবে। ইতিমধ্যে আমার গল্পটি শুনুন।

আমি মশায় একটু মিতব্যয়ী লোক। বাজে খরচ করিবার আমার প্রবৃত্তি নাই। আমি যখন লোক খাওয়াই ঠিক নিক্তির ওজনেই আয়োজন করি। যিনি মিষ্টান্ন খাইবেন না তাঁহার নিষেধ সত্ত্বেও তাঁহার পাতে সন্দেশ-রসগোল্লা ঢালিয়া দিয়া বাহাদুরি দেখাইবার ইচ্ছা আমার হয় না। যে দরজি কম কাপড় লইয়া জামা করিতে পারে আমি তাহার কাছেই যাই। দুই গিরা কাপড় বাঁচাইবার জন্য দুই ক্রোশ হাঁটিতেও আমার আপত্তি নাই। একটি ব্লেডে আমি তিন মাস চালাই। একটু সাবধানতা অবলম্বন করিলেই চালানো যায়। ছেঁড়া কাগজের টুকরা আমি ফেলি না, তাহার যতটুকু অংশ শাদা আমি তাহা সানন্দে কাজে লাগাই। খামে চিঠি আসিলে খামগুলিও আমি সযত্নে রক্ষা করি এবং সুযোগ পাইলেই কাজে লাগাই। যে সব দোকান দোকান-

রূপী যূপকাষ্ঠ সে সব দোকানে আমি কখনও গলা বাড়াইয়া দিই না। অথচ আমি যে বেরসিক তাহাও নয়। মাঝে মাঝে এক আধটা সৌখিন জিনিস কিনি বই কি। সেদিন যেমন একটা মরক্কো চামড়া দিয়া বাঁধানো ছোট হিসাবের খাতাই কিনিয়া ফেলিলাম। সাধারণ একটা খাতা হইলেও চলিত, কিন্তু জানেনই তো লোভেই পা হড়কাইয়া যায়। পা হড়কাইবার মুখেও কিঞ্চিৎ সাবধানতা অবলম্বন করিয়া গলাটি বাঁচাইয়াছি। বিশুর দোকানে কিনিলে সে ঠিক গালে চড় মারিত। চিরন্জিলালের দোকানে গিয়া নগদ চার আনা বাঁচাইয়াছি। কোথায় কোন্ জিনিস শস্তায় পাওয়া যায় তাহা আমার নখদর্পণে। একটা ভুল ধারণা হয়তো ইতিমধ্যে আপনাদের মনে শিকড় গাড়িয়াছে। আপনারা হয়ত অনুকম্পাভরে ভাবিতেছেন ছয় পুত্র—আট কন্যা—খাণ্ডার গৃহিণীর মালিক আমি, ন্যুব্জপৃষ্ঠ হইয়া নতগুম্ফে মিতব্যয়ের সংকীর্ণ পথে কোনক্রমে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেছি। মোটেই তাহা নয়। আমার তিনকুলে কেহ নাই। এই সেদিন পর্যন্ত ব্যাচিলর ছিলাম। সম্প্রতি, মানে মাস দুই আগে, বিবাহ করিয়াছি।

বিবাহ করিতে বাধ্য হইয়াছি। না, না, আপনারা যাহা ভাবিতেছেন তাহা নয়। বিবাহ করিতে বাধ্য হইয়াছি অন্য কোন কারণে নয়, আমার চাকর গোবর্ধনের জ্বালায়। ব্যাটা ভয়ানক চোর। চাল, ডাল, নুন, তেল, আলু, পটল এমনকি পানের ভিতর হইতে সুপারি পর্যন্ত সরায়। আর কিছু না পারুক দুই চারিটা দেশলাইয়ের কাঠি তো পার করিবেই। একা তাহাকে সামলাইতে পারি এমন ক্ষমতা আমার নাই। দালালি করি, সমস্ত দিন বাহিরে বাহিরে কাটাইতে হয়। ভাবিলাম ঘরে একটা লোক থাকা দরকার।

আমার সদ্য-পরিণীতা পত্নীর নাম শ্রীমতী মনোমোহিনী দেবী। আজকাল নারী-মাত্রেই দেবী, মনোমোহিনীকে আমার সম্রাজ্ঞী পদবীতে ভূষিত করিতে ইচ্ছা করে। মনোমোহিনী রূপসী, কিন্তু রূপের জন্যই তাহাকে ধর্মপত্নীতে বরণ করি নাই। অনার্স লইয়া বি-এ পাশ করিয়াছে বলিয়া।

প্রথম সঙ্কোচটা কাটিয়া যাইবাব পর তাহার সহিত আমার নিম্নলিখিতরূপ আলাপ হয়।

"তোমার শাড়ীটা তো বেশ চমৎকার। দাম কত ?"

"সাতাশ টাকা—"

"সাতাশ টাকা ! বল কি ! কোন্ দোকান থেকে কিনেছিলে—"

"ধনেখালি শাড়ীর তো এইরকমই দাম। পিসিমা দিয়েছেন এটা। কোন্ দোকান থেকে কিনেছিলেন জানি না।"

"ঠকিয়েছে। এসেন্স মেখেছ নাকি। ভারি সুন্দর গন্ধ তো।"

"হ্যাঁ, আমার মামাতো বোন টুকু দিয়েছিল একটা 'ইভনিং ইন প্যারিস'।"

"ও।"

দাম জিজ্ঞাসা করিবার সাহস হইল না। তবে সভয়ে লক্ষ্য করিলাম অলঙ্কারে কাপড়ে তিনি যাহা পরিধান করিয়া আছেন, তাহা কিনিয়া দিতে হইলে আমার দম ফুরাইয়া যাইত। জানাশোনা শস্তা দোকানে গেলেও নাভিশ্বাস অনিবার্য হইত। সুতরাং ঠিক করিলাম কাঁচা নগদ পয়সা এখন উহার হাতে দিব না। আগে কিছুদিন

লক্ষ্য করিয়া দেখি। গোবর্ধনের আমলে যেমন নিজেই সব জিনিস কিনিয়া দিতাম, তেমনিই দিতে লাগিলাম। গোবর্ধনের বিষয়েও তাহাকে বিশেষ করিয়া সাবধান করিয়া দিলাম।

বলিলাম, "খুব কড়া নজর রাখবে ওর উপর। বাজার থেকে যা জিনিসপত্র আসবে তা ওজন করে গুণে নেবে, এমন কি আলু, পটল পর্যন্ত। ভাঁড়ার ঘরের চাবি যেখানে সেখানে ফেলে রেখ না। দেশলাইটি খুব সাবধানে রাখবে। তা নাহলে একদিনেই ফাঁকা করে দেবে। রোজ এক বাণ্ডিল করে বিড়ি ফোঁকে। খুব কড়া নজর রেখো -"

মধুর হাসি হাসিয়া মনোমোহিনী বলিল, "রাখব—"

গালে টোল পড়িল। হাসিটি সত্যই বড় সুন্দর। ওই হাসিই আমাকে শেষ পর্যন্ত ডুবাইল।

একদিন কি খেয়াল হইল গোপনে দেশলাইয়ের কাঠিগুলি গণিয়া দেখিলাম। ইতিপূর্বেও গোবর্ধনকে 'চেক' করিবার জন্য মাঝে মাঝে গণিয়া দেখিতাম। দেখিলাম যত খরচ হওয়া উচিত ছিল, তাহার অপেক্ষা অনেক বেশি খরচ হইয়াছে। এক আধটি নয়, দশটি কাঠি অন্তর্ধান করিয়াছে। বুঝিলাম মনু গোবর্ধনকে আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছে না। ভয়ানক রাগ হইল। কিন্তু মনুর আত্মসম্মানে পাছে আঘাত লাগে, এই ভয়ে ইহা লইয়া আর হৈ-চৈ করিলাম না।

ইহার দিন দুই পরে হঠাৎ একদিন বেলা দেড়টার সময় বাসায় ফিরিতে হইল। সাধারণতঃ আমি পাঁচটার আগে ফিরি না। ঢুকিয়াই দেখি গোবর্ধন মনের আনন্দে বিড়ি ফুঁকিতেছে—। আর আত্মসংবরণ করিতে পারিলাম না, সেদিনকার অবরুদ্ধ ক্রোধ বোমার মতো ফাটিয়া পড়িল। গোবর্ধনের গালে ঠাস করিয়া একটা চড় বসাইয়া দিলাম।

গোবর্ধন মহাপুরুষ। বিন্দুমাত্র বিচলিত হইল না। বিড়িটিতে শেষ টান মারিয়া সেটা জানালা দিয়া ফেলিয়া দিল। তাহার পর হেঁট হইয়া আমার জুতার ফিতা খুলিতে লাগিল। জুতা দুইটি খুলিয়া লইয়া স-সম্ভ্রমে বলিল, "বৌমা এই সবে শুয়েছেন, একটু পা টিপে টিপে ওপরে যাবেন বাবু—"

"পা টিপে টিপে? তার মানে—"

"আমাকে তাই তো হুকুম দিয়েছেন, বলেছেন, দেখো সিঁড়িতে যেন কোনও শব্দ না হয়—"

পা টিপিয়া টিপিয়া সন্তর্পণে উপরে উঠিলাম। উঠিয়া যাহা দেখিলাম তাহা, মানে—অচিন্তনীয়—! মনু নিবিষ্টচিত্তে বই পড়িতেছে, বাঁ হাতে জ্বলন্ত সিগারেট, নাক দিয়া ধোঁয়া বাহির হইতেছে! আমাকে দেখিয়া মুচকি হাসিল। গালে টোল পড়িল। বইটি দেখিলাম একটি ইকনমিক্‌স বিষয়ক বই।

দ্বিতীয়বার বোতাম টিপিবার পর কপাট খুলিল। বিজন ডাক্তার চোখ কচলাইতে কচলাইতে নামিয়া আসিয়া সবিস্ময়ে বলিল—"কে মহীতোষ? কি ব্যাপার, এত রাত্রে।"

"একবার গলাটা দেখতো ভাই, বড্ড কষ্ট পাচ্ছি—"

গলা দেখিয়া বিজন মন্তব্য করিল, "সিগারেট ধরেছ নাকি—"

"ধরেছি সম্প্রতি।"

"তাই না কি! সেই জন্যই হয়েছে—"

বিজন একটা প্রেস্‌ক্রিপশন লিখিয়া আমার হাতে দিল। আমি ফিরাইয়া দিয়া বলিলাম—"ফর মহীতোষ না লিখে, লিখে দাও ফর বাল্মীকি—"

দুইটি ছবি

॥ এক ॥

মিস্টার মাজিয়ার আমন্ত্রণে তাঁহার কলিকাতার বাসায় সন্ধ্যাবেলা গিয়াছিলাম। দেখিলাম ভদ্রলোক আহারাদির প্রচুর আয়োজন করিয়াছেন। দেশী-বিদেশী বহুবিধ খাদ্য-পানীয়ের ব্যবস্থা দেখিয়া মনে মনে প্রমাদ গণিলাম। আমি স্বল্পাহারী লোক, সেই বিপুল আয়োজনের মর্যাদা রক্ষা করিবার সামর্থ্য আমার ছিল না। বলিলাম, "রাত্রে আমি কিছু খাই না। নিতান্তই যদি দুঃখিত হন সামান্য কিছু খাইব।" কিন্তু অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান-কুলোদ্ভবা মিসেস মাজিয়ার আন্তরিক আগ্রহ, অসামান্য রূপ, চটুল চাহনি এবং সুমিষ্ট হাসির তোড়ে আমার এ মনোভাব বেশীক্ষণ স্থায়ী হইতে পারিল না। তিনি বলিলেন, "আপনার জন্যই এত সব আয়োজন। দ্বিতীয় কোন লোককে আমরা নিমন্ত্রণ করি নাই। আপনি না খাইলে কি চলে! আপনি যা পারেন, যতটা পারেন খান। না, আমি কোনও কথা শুনিব না আসুন—"

মাথা ঝাঁকাইয়া চোখে-মুখে হাসিমাখা অভিমানের ঝিলিক তুলিয়া তিনি আমার হাত ধরিয়া একেবারে খাইবার টেবিলে লইয়া গেলেন।

মিস্টার মাজিয়া গম্ভীর প্রকৃতির লোক। তিনি একটু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "আপনি আমাদের যে ঋণে আবদ্ধ করিয়াছেন, লুসির বিশ্বাস আপনাকে খাওয়াইয়া সে-ঋণ হইতে অন্তত খানিকটা সে মুক্ত হইবে। আমার বিশ্বাস কিন্তু অন্যরূপ। আমি ভারতবর্ষের আদিবাসী তো—"

আমাদের কথাবার্তা ইংরেজিতেই হইতেছিল। মিস্টার মাজিয়ার সহিত আমার সম্পর্ক রোগী-ডাক্তারের সম্পর্ক। মিস্টার মাজিয়া অথবা লুসি কাহার পা প্রথমে হড়কাইয়াছিল তাহা জানি না। আমার নিকট তাঁহারা যখন আসিয়াছিলেন তখন দেখিয়াছিলাম উভয়েরই গনোরিয়া হইয়াছে। যথারীতি চিকিৎসার পর এখন তাঁহারা অনেকটা সুস্থ হইয়াছেন। লুসি একটি সুস্থ শিশু প্রসব করিয়াছেন কয়েক মাস পূর্বে।

আহারাদির কায়দা সম্পূর্ণ বিলাতী। কোর্সের পর কোর্স আসিতেছে, প্লেটের পর প্লেট বদল হইতেছে, নিঃশব্দ পদসঞ্চারে ধোপদস্ত পোশাক-পরা খানসামারা যাতায়াত করিতেছে। লুসি হাসিয়া হাসিয়া কখনও একটু 'সস্', কখনও একটু 'রাই' আগাইয়া দিতেছেন। পাশের ঘরে রেডিওতে একটা বিলাতী নাচের বাজনা বাজিতেছে।

"আপনি আদিবাসী না কি?"

মিস্টার মাজিয়া বলিলেন, "হাঁ সাহেবগঞ্জের পাহাড়ের উপর আমাদের বাড়ি ছিল।"

"ও, সাহেবগঞ্জ ?"

"হাঁ। আমার বাবার মৃত্যুর পর আমাদের বড় দুরবস্থা হইয়াছিল। একজন সহৃদয় মিশনারি সাহেব আসিয়া আমাদের খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা দেন। তাঁহারই অনুগ্রহে আমি লেখাপড়া শিখি। তিনিই আমাকে এই চাকরি জুটাইয়া দিয়াছেন।"

"ও। আপনার বাবা কি করিতেন ?"

"চাষ-বাস। বাবা খুব পপুলার লোক ছিলেন। মুলুক মাঝিকে এখনও পাহাড়ী সাঁওতালরা মনে করিয়া রাখিয়াছে।"

"মুলুক মাঝি আপনার বাবার নাম ?"

"হাঁ—। মাঝি উপাধিকেই আমি 'মাজিয়া' করিয়াছি।"

॥ দুই ॥

সাহেবগঞ্জ পাহাড়ের উপরে একটি দশ বৎসরের বালক অসহায়ভাবে একটি পাথরের উপর বসিয়া এদিক-ওদিক চাহিতেছিল। বেচারা পথ হারাইয়া ফেলিয়াছিল। যখন পাহাড়ের সংকীর্ণ আঁকাবাঁকা পথ বাহিয়া সে উপরে উঠিতেছিল তখন খেয়াল ছিল না যে, একটু পরেই সূর্য অস্ত যাইবে, অন্ধকারে পথ খুঁজিয়া পাওয়া শক্ত হইবে। বালকটি স্থানীয় স্কুলের ছাত্র, বোর্ডিং-এ থাকে। তাহার আশংকা হইতেছিল দেরিতে বোর্ডিংয়ে ফিরিলে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মহাশয় না জানি কি করিবেন। বড় কড়া লোক। তা ছাড়া আর একটা জনশ্রুতিও সে শুনিয়াছিল। পাহাড়ে নাকি বড় বড় বাঘ আছে, রাত্রিকালে তাহারা বাহির হয়। বালক আর একবার উঠিয়া পথ খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু বৃথা। যেদিকে পা বাড়ায় সেদিকেই হড়কাইয়া যায়। কয়েকবার বৃথা চেষ্টা করিয়া সে পুনরায় গিয়া পাথরটির উপর বসিল। সহসা তাহার নজরে পড়িল, একটি কালো মূর্তি নীচে হইতে উপরের দিকে উঠিতেছে। সাহস সংগ্রহ করিয়া সে ডাক দিল—"কে—"

"আমি মুলুক মাঝি। তু কে বটিস্ ?"

"আমি স্কুলের ছেলে একজন। রাস্তা হারিয়ে ফেলেছি—"

"দাঁড়া আসি।"

মুলুক মাঝি মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই আসিয়া হাজির হইল। সব শুনিয়া বলিল, "তু আজ আমাদের গাঁয়ে চল। কাল ভোরে তুকে নামাই দিব।"

"আমাকে মাস্টাররা বকে যদি—"

"বকবে কেনে ? আমি মুলুক মাঝি তোকে সঙ্গে নিয়ে যাব, বকবে না। তোর হেড মাস্টার আমাকে খুব মানে।"

গত্যন্তর ছিল না। মুলুক মাঝির সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিলাম।

"তু খোঁড়াচ্ছিস্ কেন রে।"

"ডান পা-টা পাথরে কেটে গেছে।"

মুলুক মাঝি বসিয়া পড়িল।

"আমার পিঠে চড়।……"

বালকটির প্রথমে লজ্জা করিতেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত চড়িতেই হইল।

কিছুক্ষণ পরে মুলুক মাঝি তাহাকে লইয়া যখন নিজেদের গ্রামে প্রবেশ করিল তখন আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে।

উঠানের মাঝখানে বালককে বসাইয়া মুলুক হাঁক দিল—"ও মেঝেন, দেখ কে এসেছে—"

দল বাঁধিয়া সকলে আমাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। বিস্ময়ে অবাক হইয়া রহিল খানিকক্ষণ, আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল তাহার পর।

"ওকে খেতে দে আগে।"

ঘরে গাই ছিল। সে দিল এক ঘটি সফেন দুগ্ধ। মেঝেন বাহির করিল চিঁড়া আর গুড়। আহারাদির পর শুরু হইল নাচ-গান; মাদল আর বাঁশি জ্যোৎস্নাকে আকুল করিয়া তুলিল।

চল্লিশ বৎসরের যবনিকা সরিয়া গিয়াছে। মুগ্ধ নেত্রে সেই দৃশ্য আবার প্রত্যক্ষ করিতেছি। আমার মধ্যে সে বালক কি এখনও প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে? মিস্টার মাজিয়ার দৃষ্টির ভিতর দিয়া মুলুক মাঝি কি আমাকে আবার দেখিতেছে? সব কেমন যেন গোলমাল হইয়া গেল। পাশের ঘরে রেডিওতে বাজনাটা উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছে।

"আপনি কি ভাবিতেছেন বলুন তো! কিছুই তো খেলেন না—"

লুসির কথায় চমক ভাঙিল। তাহার হাসিমাখা চোখ দেখিয়া মনে পড়িল ঝুমরীকে। কিশোরী একটি। মুলুক মাঝির উঠানেই সেদিন সে ছিল। আর আমাকে বারবার অনুরোধ করিতেছিল আর একটু খাওয়ার জন্য!

"ডাক্তার, আপনি কি ভাবিতেছেন বলুন তো।" মিস্টার মাজিয়া প্রশ্ন করিলেন।

"কিছুই না। নাথিং—"

উঠিয়া পড়িলাম।

অজ-প্রসঙ্গ

রেসে জিতে ননীগোপাল খাইয়েছিল প্রচুর।

কোলকাতা থেকে রিসড়া গিয়ে আবার রাত্রের ট্রেনে ফিরে আসা খুবই ঝামেলার ব্যাপার। কিন্তু ননী না-ছোড়, যেতেই হলো। বিনয়, সুরেশ আর আমি, তিনজনেই গেলাম। না গেলে ঠকতুম। পাকা মাছ, মুর্গ মসল্লম্ আর পাঁঠার মাংসের মোগলাই কারির সঙ্গে ছিল বিরিয়ানি পোলাও—শাক, চচ্চড়ি এসব বাজে ভেজাল ছিল না। আর একটি অসাধারণ তরকারি খাইয়েছিল ননী সেদিন। অপূর্ব লেগেছিল। বুঝতেই পারিনি কি খাচ্ছি। প্রথমে মনে হয়েছিল বুঝি মেটে চচ্চড়ি, কিন্তু দু' এক টুকরো চিবিয়েই বুঝেছিলাম মেটে চচ্চড়ি নয়, অন্য কিছু! এত ভাল লাগল যে দু'বার চেয়ে নিলাম। খেয়ে উঠে ননীগোপালের কাছে শুনলাম ওটা জিব-কাবাব। অর্থাৎ পাঁঠার

জিব কুঁচিয়ে কাবাব করা হয়েছে। আসল মালটির কিন্তু সেদিন দর্শন পেয়েছিলাম সর্বশেষে। ট্রেনে। খাবার নয়, মানুষ।

খাদ্য প্রসঙ্গ আলোচনা করতে করতেই আমরা স্টেশনে এলাম। সঙ্গে সঙ্গে ট্রেনও এল। খালি ভেবে যে কামরাটিতে উঠলাম সেটি একেবারে খালি ছিল না। কোণের দিকে একটি ভদ্রলোক বসে ছিলেন। তাঁর দিকে একবার চেয়েই পিতৃনাম উচ্চারণ করতে হল। মনে হল আমরা যদি আদা হই উনি কাঁচকলা। নাকের উপর রস-কলি, মাথায় স-ফুল টিকি, গায়ে নামাবলী, পরিধানে পট্টবস্ত্র, হাতে জয়-দেব, পায়ে বিদ্যাসাগরী চটি। দেখবামাত্র কেমন যেন আক্রোশ হ'ল লোকটার উপর। পরের পয়সায় মাছ মুরগী পাঁঠা পোলাও গিলে কোথায় বেশ স্ফূর্তি করতে করতে যাব, তা না কোথা থেকে এক আপদ এসে জুটল। এই মূর্তিমান বেরসিকের সামনে কখনও মুখ খোলা যায়! ঠিক করলাম জ্বালাতে হবে ব্যাটাকে। মানে, বাক্য দিয়ে যতটা সম্ভব।

তিনজনের মধ্যে চোখোচোখি হয়ে গেল। তিনজনেরই মনের ভাব এক।

সবিনয়ে নমস্কার করে আমিই প্রশ্ন করলাম, 'ভটচাজ্‌মশায়ের কতদূর যাওয়া হবে—'

প্রতিনমস্কার করে শান্ত কণ্ঠে তিনি উত্তর দিলেন, 'উত্তরপাড়া।'

হঠাৎ সুরেশ বিনয়কে ধাক্কা মেরে বললে, 'একটু সরে বস, মাইরি। মুখে তোর এখনও পেঁয়াজের গন্ধ ছাড়ছে।' বিনয় উঠে ভট্টাচার্যের পাশে গিয়ে বসল। ভট্টাচার্য নির্বিকার। ফিরে চেয়েও দেখলেন না।

আমি তখন ফুট কাটলাম আবার। 'পাঁঠার জিব-কাবাবটা বেড়ে হয়েছিল মাইরি! কাঁচা পেঁয়াজের রস দিয়েছিল নিশ্চয় নামাবার আগে, তাই বিনেটার মুখে গন্ধ ছাড়ছে। মুখ ধুসনি নাকি ভাল করে?'

বিনয়টা হাসতে লাগল ফ্যাক্ ফ্যাক করে। ভট্‌চাজের দিকে আড়চোখে চেয়ে দেখলাম আবার। কোনও ভাবান্তর লক্ষ্য করলাম না।

সুরেশ দিনকতক কোন এক মেডিকেল স্কুলে পড়েছিল নাকি, তাই সুযোগ পেলেই ডাক্তারি বুকনি ছাড়ে।

সে বললে, 'আমরা পাঁঠার ডাইজেস্‌টিভ ক্যানালটা বোকার মতো বাদ দি। কিন্তু রাঁধতে পারলে ওর তুল্য জিনিস নেই। যাদের আমরা ছোটলোক বলি তারা আমাদের চেয়ে ঢের বেশী বুদ্ধিমান। তাই তারা সস্তায় নাড়িভুঁড়িগুলো কিনে নিয়ে যায়। ঝুনকির বাড়িতে এসা ভুঁড়ি-চচ্চড়ি খেয়েছিলাম একবার মাইরি। মদের ওরকম চাট আর হয় না।'

বিনয় বললে, 'ছোটলোক কেন, পুরুলিয়াতে ভদ্রলোকেরাও নাড়িভুঁড়ি খায়। নাড়িগুলো প্রথমে ধুয়ে পরিষ্কার করে, তারপর সেগুলো দিয়ে পাঁজরার হাড়ে ফাঁস লাগিয়ে লাগিয়ে হাড়-জোড়া তৈরী করে তারা তারপর সেগুলো মাংসের সঙ্গে রান্না করে। দিব্যি খেতে। খাসনি কখনও?'

আমি বললাম, 'হাড়-জোড়া খাইনি, কিন্তু কামা-পাঠা খেয়েছি।'

'সে আবার কি রে?'

'এ-ও মানভূমে হয়। পাঁঠাটাকে জবাই বা বলিদান করবার পর একটা নাপিত এসে

গোটা পাঁঠাটাকে পরিষ্কার করে কামিয়ে দেয়। ক্লীন শেভড্‌, গায়ে একটি লোম থাকবে না। তারপর গোটা পাঁঠাটাকে ভাল করে ধুয়ে চামড়া সুদ্ধ টুক্‌রো করতে হয়। মানে, চামড়াটা ওরা নষ্ট করে না। ওরা বলে চামড়া ছাড়িয়ে নিলে চামড়ার নীচে যে চর্বি থাকে সেটা নষ্ট হয়ে যায়! অনেকে মুরগীরও চামড়া ছাড়ায় না। কামা-পাঁঠার মোগলাই কারি যা খেয়েছি তা দুর্দান্ত—'

আবার আড়চোখে চাইলাম ভট্‌চাজের দিকে। আমাদের কথা যে তার কানে ঢুকছে তা মনেই হল না। নিবিষ্টচিত্তে পড়ে চলেছেন।

সুরেশ হঠবার পাত্র নয়।

সে বলে চলল—'কামা-পাঁঠা খাইনি অবশ্য কিন্তু পোঁতা-পাঠা খেয়েছি।'

'কি রকম! পাঠা পুঁতে পচিয়ে?'

'আরে না, না, টাটকা। শোন তবে। ধানবাদে কতকগুলি আমুদে কাবুলীওলার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল আমার একবার। তারা একদিন নিমন্ত্রণ করেছিল আমাকে। যখন গেলাম তখন রাত আটটা হবে। কিন্তু গিয়ে দেখি খাসি তখনও ব্যা ব্যা করছে, একটু দূরে এক বলিষ্ঠ কাবুলী কোদাল চালিয়ে গর্ত খুঁড়ছে একটা। জিগ্যেস করলাম ব্যাপার কি। কাবুলী বন্ধু হেসে জবাব দিলে, বাংগালী বাবু, শবর্‌ শবর্‌। অর্থাৎ বাঙালীবাবু, সবুর করুন। একটু দূরে একটি জ্বলন্ত কয়লার স্তূপ গন্‌গন্‌ করছিল। গর্তটি যখন বেশ গভীর হ'ল—মানে হাঁটু ভর, তখন একটি কাবুলী কোদাল নিয়ে টেনে টেনে সেই গন্‌গনে কয়লাগুলোকে গর্তে এনে ফেলতে লাগল। গর্তটি ভরে গেল একেবারে। তারপর জবাই করা হলো খাসিটাকে। চামড়াটি ভাল করে ছাড়িয়ে আলাদা রেখে দিলে। তারপর আমরা যেমন মাংস কাটি তেমনি করে কাটলে, তবে টুকরোগুলো বেশ বড় বড়। আমরা যেমন মশলাটশলা মাখাই কসবার আগে, ঠিক তেমনি মশলাও মাখালে, কিন্তু কসলে না। সমস্ত মাংসটা পুরে ফেললে সেই চামড়ার ভিতর। পুরে সেলাই করে দিলে গুণ ছুঁচ দিয়ে। একটা বড় পুঁটুলির মতো হল। তারপর সেই গর্তের ভিতর থেকে জ্বলন্ত কয়লাগুলো বার করে ফেলে পুঁটুলিটা ঢুকিয়ে দিলে তার ভিতরে। তার ওপর মাটি দিলে, মাটির উপর আবার সেই জ্বলন্ত কয়লাগুলো দিলে চাপিয়ে।'

বিনয় হেসে বললে, 'ছেলেবেলা ঠাকুমার কাছে গল্প শুনেছিলাম কোন এক রাণীকে নাকি হেঁটে-কাঁটা, উপরে-কাঁটা দিয়ে পোঁতা হয়েছিল, এ যে অনেকটা সেই রকম দেখছি।'

সুরেশ চটে উঠল।

'কি রকম বেরসিক রে তুই! রাণীর সঙ্গে পাঁঠার উপমা দিচ্ছিস—'

বিনয় চটে কি একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিল আমি থামিয়ে দিলাম।

'গল্পটা আগে শেষ কর। তারপর উপমা নিয়ে ঝগড়া করিস। তারপর কি হল বল—'

'তারপর কাবুলীরা সেই গর্ত ঘিরে বসে নাচ-গান শুরু করে দিলে। দু' ঘণ্টা নাচ-গান চলল।'

'কাবুলী নাচ দেখেছিস কখনও? তাণ্ডব তার কাছে ছেলে মানুষ—'

'আবার বাজে বকছিস তুই। মাংসটা কেমন হয়েছিল তাই বল না।'

'অমৃত।'

ভট্টাচার্যের দিকে এক নজর চেয়ে আমি বললাম, 'এমন অশাস্ত্রীয় ভাবে মাংস খাওয়া কি উচিত? আপনিই বলুন তো ভট্চাজ মশায়।'

ভট্টাচার্য বই থেকে চোখ তুলে আমার মুখের দিকে স্মিতমুখে চেয়ে রইলেন, কোনও উত্তর দিলেন না।

আমি পুনরায় প্রশ্ন করলাম, 'আচ্ছা, পাঁঠার কোন কোন অংশ খাওয়া উচিত, কোন অংশ বাদ দেওয়া উচিত বলুন তো। আপনার মতো একজন বিজ্ঞ লোককে কাছে যখন পেয়েছি জেনেই নি ব্যাপারটা!'

ট্রেন এসে উত্তরপাড়ায় থামল।

ভট্টাচার্য আরও কিছুক্ষণ স্মিতমুখে চেয়ে থেকে উত্তর দিলেন, 'দাড়ি গাছটা ছাড়া আর কিছুই তো ফেলবার নেই।'

বলেই উঠে পড়লেন এবং নেবে গেলেন ট্রেন থেকে।

চঞ্চলা

॥ এক ॥

অনিমেষ ঘোষাল নির্নিমেষ নয়নে পুরাতন প্রকাণ্ড বাড়িটার দিকে চাহিয়াছিল। যে স্থানে সে দাঁড়াইয়া ছিল, তাহা চঞ্চলাদের বাড়ির সীমানার বাহিরে একটা উঁচু টিলার উপর। ওই স্থানে দাঁড়াইলে ত্রিতলের একটা বাতায়ন দেখা যায়। সেই বাতায়নপথে চঞ্চলাকে সে মাঝে মাঝে দেখিয়াছে। সেই আশাতেই সে আসিয়াছিল। পাত্র-হিসাবে অনিমেষ ঘোষাল মন্দ নয়। এম. এ. পাস, ভাল কলেজে চাকুরি পাইয়াছে, পিতামাতা ভাইভগ্নীর ঝামেলা নাই, বলিষ্ঠ দেহ। তথাপি কিন্তু চঞ্চলার পিতা শক্তিধরবাবু তাহার বিবাহের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়াছেন। চঞ্চলাও করিয়াছে। একজন সামান্য প্রফেসারের ঘরণী হইয়া সারাজীবন কৃচ্ছ্রসাধনের বাসনা তাহার নাই। সে রূপসী, সে ধনীর দুলালী, জীবন-সাগরের তরঙ্গশীর্ষে ময়ূরপঙ্খীর মতো সে ভাসিয়া বেড়াইবে, একটা অধ্যাপকের ঘরণী হইতে যাইবে কেন! অনিমেষ তাহাকে ভালবাসে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহার বিনিময়েই জীবনের সমস্ত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আশা-আকাঙ্ক্ষা কি বলিদান দেওয়া যায়?

অনিমেষ চঞ্চলাকে একটি কথা শুধু জানাইয়া দিতে আসিয়াছিল। বলিতে আসিয়াছিল, চঞ্চলা যাহাকে খুশি বিবাহ করুক, তাহার কথা সে যেন স্মরণে রাখে, বিবাহ নামক দুর্নিবার ঘটনাটা যেন তাহাদের মধ্যে কারা-প্রাচীরের দুর্লঙ্ঘ্যতা সৃজন না করে। অনিমেষের দ্বারা চঞ্চলার কখনও যদি কোনও উপকার হয় তাহা করিতে অনিমেষ সর্বদাই প্রস্তুত থাকিবে। এই সব কথাই সে বলিতে আসিয়াছিল, কিন্তু বলিবার সুযোগ পাইল না। দারোয়ান তাহাকে দেখা করিতে দিল না, বলিল, দিদিমণির শরীর ভাল নেই, কাহারও সহিত তিনি দেখা করিবেন না। অথচ অনিমেষ খবর পাইয়াছে, আজই বৈকালে অর্থাৎ আর একটু পরেই চঞ্চলাদের বৈঠকখানায়

নবাগত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটটি আসিবেন এবং সম্ভবত আজই তাঁহার সহিত চঞ্চলার বিবাহের কথাবার্তা পাকা হইয়া যাইবে।

অনিমেষ নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিল। বাতায়নপথে একবার যেন চঞ্চলাকে দেখা গেল। একটি সুসজ্জিত প্রতিমা যেন স্বপ্ন-প্রাসাদের বাতায়নে দেখা দিয়াই বাস্তবের রূঢ়তায় বিলীন হইল। পুরাতন ত্রিতল বাড়িটার দিকে চাহিয়া অনিমেষের অধরে মৃদু একটি হাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিল। চঞ্চলা কিছুদিন পূর্বে কমিউনিজম লইয়া খুব মাতিয়াছিল। সহসা সে ঠিক করিয়া ফেলিল, অপেক্ষা করিবে। এই মাঠেই অপেক্ষা করিবে। চঞ্চলাকে শেষ কথাটা বলিয়া না গেলে সে শান্তি পাইবে না। আর আজ না বলিলে হয়তো বলাই হইবে না। সহসা তাহার নজরে পড়িল, অপরাহ্নের আকাশে মহোৎসব পড়িয়া গিয়াছে, কত বিভিন্ন বর্ণের মেঘমালা কত বিভিন্ন ভঙ্গীতেই না একত্রিত হইয়াছে! নীরবে বহুবর্ণের ঐকতান বাজিতেছে যেন! তাহার সমস্ত চিত্তও ধীরে ধীরে বর্ণাপ্লুত হইয়া গেল। ধীরে ধীরে সে সেই টিলার উপরে বসিয়া পড়িল। যে স্বপ্ন তাহার সমস্ত চিত্তকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল আকাশে তাহার প্রতিচ্ছবি দেখিয়া সে মুগ্ধ হইয়া গেল।

॥ দুই ॥

চঞ্চলাও মর্তলোকে ছিল না। এক অপূর্ব আবেশে তাহার সমস্ত শরীর বিহ্বল হইয়া গিয়াছিল। একটা সেতারে কে যেন সুর বাঁধিয়া রাখিয়াছে। অঙ্গুলিস্পর্শে কোনও রাগিণী এখনও বাজিয়া উঠে নাই, কিন্তু সেতারের প্রতিটি তার যেন তাহার জন্য উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে।

মনে হইতেছিল, আজ তাহাকে এমন একটা বিশেষ ভূমিকায় অভিনয় করিতে হইবে যাহা যুগান্তকারী! আজিকার নির্মল নীল আকাশ, সুরভিত মন্দ সমীরণ, বিহঙ্গকুলের বিচিত্র কাকলী যে রঙ্গমঞ্চের পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছে, সে রঙ্গমঞ্চে চঞ্চলাই যেন আজ প্রধান অভিনেত্রী, পটোত্তোলনের অপেক্ষায় আশা-আকাঙ্ক্ষা-আন্দোলিত চিত্তে অপেক্ষা করিতেছে। অনিমেষের কথা একবার তাহার মনে হইল। এই যুগান্তকারী নাটকে তাহার কি কোন ভূমিকা আছে? মনে হইল, নাই। থাকিতে পারে না। সে নিজেই থাকিতে দেয় নাই।

·· তিনতলায় নিজের ঘরটিতে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল সে। দূরে নদী বহিয়া গিয়াছে। শীতের নদী—স্বল্প-তোয়া, কিন্তু সুন্দর। স্বচ্ছ জলের ধারা জ্যোতির রেখার মতো আঁকিয়া বাঁকিয়া দিগন্তসীমার ওপারে কোথায় চলিয়া গিয়াছে?··· সবিস্ময়ে চঞ্চলা ভাবিতে লাগিল। নদী কোথায় শেষ হইয়াছে, ভৌগোলিক তাহা হয়তো বলিতে পারিবেন, কিন্তু ওই জ্যোতির রেখাটা? যখনই তেতলার এই জানালাটার ধারে সে আসিয়া দাঁড়ায়, তখনই তাহার এ কথাটা মনে হয়। সেদিনও তাহার মনে হইতেছিল চারিদিকে এই যে জীবনের বিচিত্র প্রকাশ, এ কিসের উৎসব। দৃষ্টির বাহিরে, যুক্তিরও বাহিরে কি যেন একটা ঘটিতেছে যাহা দেখা যায় না, ধরা যায় না, কিন্তু বোঝা যায়; যাহা কেবল অনুভূতির পরদায় সূক্ষ্ম শিহরণ তুলিয়া

দুঃখ মোচন করিবে, মঞ্চের উপর দাঁড়াইয়া প্রাণস্পর্শী বক্তৃতায় অসংখ্য শ্রোতার প্রাণমন উদ্বুদ্ধ করিবে। এই তো তাহার অন্তরের কথা। দর্পণের প্রতিবিম্বিত মূর্তিতে তাহার সর্বাঙ্গ দিয়া আজ এ কোন্ নূতন কথার আভা বিচ্ছুরিত হইতেছে ? সে সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিল। অনিমেষের কথা মনে পড়িল আর একবার। তাহাকে প্রত্যাখ্যান না করিলে হয়তো···। সহসা মৃদু সমীরণ-স্পর্শে সে শিহরিয়া উঠিল। বাতায়ন-পথে চাহিয়া দেখিল, নির্মল নীল আকাশ, দিগন্তে অপসৃয়মান জ্যোতির রেখা, বাগানে অসংখ্য ফুলের অসংখ্য ভঙ্গিমা, সকলেই যেন তাহার দিকে তাকাইয়া আছে। তাহার সহিত চোখোচোখি হইবামাত্র সকলেই যেন সমস্বরে বলিয়া উঠিল—আমরা তো প্রস্তুত আছি, তুমি এস এইবার।···সকলেরই আহ্বান সে শুনিতে পাইল, কিন্তু যাহা অমোঘ, যাহা সত্যের নিকটে যাচাই করিয়া তাহার প্রকৃত মূল্য নিরূপণ করিবে তাহার কোন আভাস সে পাইল না। সে কিন্তু নিঃশব্দচরণে আসিয়া অতি নিকটেই দাঁড়াইয়াছিল।

দ্বারপ্রান্তে শব্দ হইল। চঞ্চলা ফিরিয়া দেখিল, বৃদ্ধ ভৃত্য রামকান্ত দাঁড়াইয়া আছে।

"কি রামকু ?"

"ওনারা সব নীচে এসেছেন, কর্তাবাবু খবর দিতে বললেন।"

"আচ্ছা, যাচ্ছি আমি।"

রামকান্ত চলিয়া গেল। চঞ্চলা প্রস্তর-মূর্তিবৎ অনড় হইয়া দাঁড়াইয়া নিজের প্রতিবিম্বটার দিকে চাহিয়া রহিল। পুঞ্জীভূত যৌবনের অবরুদ্ধ আকুতি বিস্ফোরণের অপেক্ষায় যেন উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে। "কর্তাবাবু খবর দিতে বললেন"—রামকুর কথাগুলা তাহার কানের আশেপাশে যেন গুঞ্জন করিতে লাগিল, সে গুঞ্জন ক্রমশ ব্যঙ্গে পরিণত হইল। বাবা কি চান ? সাধারণ পিতার মতো তিনি তো তাহার যথেচ্ছাচারে বাধা দেন না। বরং মনে হয়, কামনার নানা ইন্ধন জোগাইয়া দিয়া আকারে ইঙ্গিতে তিনি যেন বলেন—উপবাস করিও না, ভোগ কর। অথচ মুখে কিছু বলেন না। চূড়ামণি চৌধুরীকে যেদিন প্রথম তিনি সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন সেদিন তাঁহার চোখের দৃষ্টিতে একটা প্রচ্ছন্ন সকৌতুক-হাস্য জ্বলজ্বল করিতেছিল। একজন ম্যাজিস্ট্রেটকে জামাই করিতে পারিলে বৈষয়িক নানারূপ সুবিধা হইবার সম্ভাবনা, তাই কি তিনি চূড়ামণি চৌধুরীকে প্রশ্রয় দিতেছেন ? হয়তো তাই। চূড়ামণি চৌধুরীকে কেন্দ্র করিয়া প্রত্যহ নীচের ঘরে যে আড্ডা বসে তাহা ভদ্র হিন্দু গৃহস্থের বাড়িতে নিতান্তই অশোভন। কিন্তু এই অশোভন ব্যাপারকেই শক্তিধরবাবুর মতো দোর্দণ্ড-প্রতাপ সেকেলে জমিদার সহ্য করিতেছেন কেন ? চঞ্চলা একটা গুজব শুনিয়াছিল। শক্তিধরবাবুর জমিদারিতে সম্প্রতি যে চাঞ্চল্যকর হত্যাকাণ্ড ঘটিয়াছে, তাহার সহিত শক্তিধরবাবু নাকি জড়িত। তাই কি তিনি একজন ম্যাজিস্ট্রেট-জামাইরূপ সহকারী পর্বতের অন্তরালে থাকিতে চান ? এই জন্যই কি তাহাদের বাড়িতে প্রত্যহ আড্ডা বসিতেছে ? শক্তিধরবাবু নিজে কিন্তু কোনদিন আড্ডায় যোগ দেন না। তিনি বাগানের পশ্চিমদিকের বাড়িটায় একা থাকেন। বন্ধু নিত্যনবীন ছাড়া অন্য কাহারও সেখানে প্রবেশাধিকার নাই। চঞ্চলার মা মারা যাইবার পর হইতেই তিনি যেন আত্মসংহরণ করিয়াছেন। একটা দুর্দান্ত ঘোড়া উপল-বন্ধুর পথে ছুটিতে ছুটিতে

হঠাৎ মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়া গিয়াছে এ ধরনের উপমা শক্তিধরবাবুর সম্বন্ধে খাটে না। তিনি মুখ থুবড়াইয়া পড়েন নাই, স্বেচ্ছায় থামিয়া গিয়াছেন। সহস্রবিধ উৎসাহের যিনি একদিন প্রধান নায়ক ছিলেন, তিনি স্বেচ্ছায় আত্মসম্বরণ করিয়াছেন। বাবার অতীত জীবন সম্বন্ধে চঞ্চলারও প্রত্যক্ষ কোন জ্ঞান নাই। সে ছেলেবেলা হইতেই বোর্ডিঙে বোর্ডিঙে মানুষ হইয়াছে। চঞ্চলার মা-ও সমস্ত জীবনটাই প্রায় বাপের বাড়িতে কাটাইয়াছেন। স্বামীর নিরতিশয় বস্তুতান্ত্রিক সান্নিধ্য তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। শক্তিধরও ইহা লইয়া কোনও দিন জবরদস্তি করেন নাই। স্ত্রীর অভাবে তাঁহার জীবনও অচল হয় নাই কোনদিন। তিনি নিজের সৃষ্ট অলকাপুরীতে নিজের খেয়ালে বিবিধ উৎসবে মত্ত হইয়া রঙের নেশায় রসের সমুদ্রে জীবনটাকে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করিয়া গিয়াছেন। অলকাপুরী এখনও ঠিক তেমনি আছে, তিনিই কেবল সরিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

ছুটির সময় চঞ্চলা মায়ের কাছে মামার বাড়িতে যাইত। বাবার সম্বন্ধে নানারূপ অদ্ভুত কথা শুনিত সে। শুনিয়াছিল, তিনি নাকি তান্ত্রিক হইয়াছেন। তাঁহাকে দেখিলে এখনও সে কথা মনে হয়। কপালে প্রকাণ্ড সিঁদুরের টিকা, গলায় রুদ্রাক্ষ স্কন্ধবিলম্বিত কৃষ্ণ কুঞ্চিত বাবরি, জ্বলন্ত দৃষ্টি, খাঁড়ার মতো নাক···চঞ্চলার কেমন যেন ভয় হয়। সহসা তাহার মনে হইল, এই পিতার চক্রান্তে কোথায় চলিয়াছে সে? একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটকে বিবাহ করিলেই কি তাহার জীবন কৃতার্থ হইবে? তাহার শিক্ষা-দীক্ষা আশা-আকাঙ্ক্ষা কি ওই জন্যই? অনিমেষকে যাহা বলিয়া সেদিন সে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল, তাই কি তাহার মনের কথা! ময়ূর-পঙ্খীর মতো ভাসিয়া বেড়ানোই কি তাহার জীবনের-আদর্শ?···কবি শ্বেতকমলের কথা মনে পড়িল। সেও হয়তো আজ আসিয়াছে। কি যে তাহার মনোভাব, চঞ্চলা বুঝিতে পারে না। দুর্বোধ্য কবিতা পড়িয়া শোনায় মাঝে মাঝে। কি তাহার অর্থ? আবার অনিমেষকে মনে পড়িল। মনে পড়িল, অভিমানী অনিমেষ আর আসিবে না। কলকণ্ঠের একটা উচ্চ হাস্য-রোল ভাসিয়া আসিল সহসা। নীচে তাহা হইলে আড্ডা বেশ জমিয়া উঠিয়াছে। কিছুক্ষণ ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল। নিজেকে কেমন যেন অসহায় বোধ হইতে লাগিল। মনে হইল, একটা ফাঁদে সে পা বাড়াইতেছে। ক্ষণকাল ইতস্তত করিল, তাহার পর ধীরে ধীরে নামিয়া গেল।

॥ তিন ॥

কলকণ্ঠের হাসিটা শিখিনী চৌধুরীর। চূড়ামণি চৌধুরীর ভগিনী শিখিনী চৌধুরী ছুটিতে দাদার নিকট বেড়াইতে আসিয়াছেন এবং অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই বেশ জমাইয়া ফেলিয়াছেন। তিনি কোথায় নাকি শিক্ষয়িত্রীগিরি করেন। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে এমন কোন কাজ নাই যাহা তিনি জানেন না। এখানে দোলের সময় প্রতিবৎসর একটা সভা হয়। এবার সেই উৎসবকে কেন্দ্র করিয়া শিখিনী চৌধুরী স্থানীয় মেয়েদের তালিম দিয়া একটা নাচের আয়োজন করিয়াছিলেন। কমিশনার সাহেবকে বিদায়-অভিনন্দন দিবার জন্য স্থানীয় ভদ্রলোকেরা— বিশেষ করিয়া অফিসার

মহল, যে ভোজের আয়োজন করিয়াছিলেন তাহাতে দেশী বিদেশী সমস্ত প্রকার ভোজ্য বস্তু শিখিনী চৌধুরীর তত্ত্বাবধানেই প্রস্তুত হইয়াছিল। স্থানীয় পাঠাগারটিরও সংস্কার-সাধন তিনিই করিয়াছেন, নিজে গিয়া পুস্তকগুলির বিজ্ঞানসম্মত তালিকা প্রস্তুত করিয়া বইগুলি নিজের হাতে গুছাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার ফোটো তুলিবার শখ আছে, টিকিট সংগ্রহ করিবার বাতিক আছে, সাহিত্য চর্চা করেন এবং এত সব করিবার পরও আড্ডা দিবার সময় পান। পিকনিকে অথবা শিকার পার্টিতে নিমন্ত্রিত হইলে কখনও নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন না, প্রতি সপ্তাহে অন্তত একবার সিনেমায় যাওয়া চাই-ই। গুজব, পিতামাতা তাঁহার নাম শিখণ্ডিনী রাখিয়াছিলেন, তিনি সে নাম বদলাইয়া শিখিনী হইয়াছেন। রূপসী নন, কিন্তু মনোহারিণী। এমন সর্বগুণান্বিতা শিখিনী চৌধুরীকে চঞ্চলার কিন্তু ভাল লাগে না। চঞ্চলা প্রবেশ করিয়াই দেখিতে পাইল, শিখিনী শ্বেতকমলের পাশের চেয়ারে বসিয়া আছেন। চঞ্চলাকে দেখিতে পাইবামাত্র বলিয়া উঠিলেন, “শোন চঞ্চলা, শ্বেতকমলবাবু ভারী অদ্ভুত কথা বলেছেন একটা—”

“কি কথা ?”

সকলের সান্নিধ্য এড়াইয়া চঞ্চলা একটু দূরে গিয়া বসিল।

“উনি বলছেন, ভাবের বাহন হিসেবে প্রচলিত কথাগুলো বড় একঘেয়ে হয়ে এসেছে। শুধু একঘেয়ে নয়—অযোগ্য, অপটু। ওঁর মতে ভাবের উপযোগী নূতন নূতন কথা সৃষ্টি করা উচিত। যেমন, মনিরো আহাহু, ইন্নাবিলা—”

শিখিনী চৌধুরী হাসিয়া ফেলিলেন। কবি শ্বেতকমলের মুখটা লজ্জায় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি উঠিয়া পড়িলেন, চঞ্চলার সম্মুখে বসিয়া থাকা অসম্ভব হইয়া উঠিল তাঁহার পক্ষে। উঠিয়া তিনি হলের পূর্বপ্রান্তের খোলা জানালাটার সম্মুখে গিয়া সকলের দিকে পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

শিখিনী চৌধুরী চঞ্চলার দিকে চাহিয়া বাম চক্ষুটি কুঞ্চিত করিলেন একবার। তাহার পর নিম্নকণ্ঠে বলিলেন, “কবির রাগ হ'ল। আর একটা উচ্চাঙ্গের কবিতা পাব বোধ হয় আমরা—”

চঞ্চলা মুচকি হাসিল একটু। কিন্তু তাহার মনে হইতে লাগিল, একটা অদৃশ্য কারাগার যেন ধীরে ধীরে তাহার চারিদিকে মূর্ত হইতেছে।

“তোমাকে আজ গান গাইতে হবে একটা।”

“গলাটা আজ ভাল নেই—”

“সে সব শুনছি না। রবীন্দ্র-সংগীত একখানা, গজল একখানা, আর আধুনিক সংগীত একখানা। এই তিনটে গেয়েই তোমার ছুটি আজ।”

একবার গলা-খাঁকারি দিয়া চঞ্চলা পুনরায় বলিল, “গলাটা কেমন যেন ব্যথা ব্যথা করছে কাল থেকে।”

“গান গাইলেই সেরে যায় ওসব ব্যথা। গান-প্রসবের ব্যথা ওসব।”

শিখিনী চৌধুরীর নয়নে অপূর্ব একটা বিদ্যুৎ-ঝিলিক মূর্ত হইয়া উঠিল।

চূড়ামণি চৌধুরী এক কোণে একটা ইজিচেয়ারে শুইয়া সেদিনকার কাগজখানা পড়িতেছিলেন। তিনি আড়চোখে একবার শ্বেতকমলের দিকে চাহিয়া দেখিলেন।

তাঁহার অজ্ঞাতসারেই অতর্কিতে তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িল—"বাই জোভ !" তাহার পর হাসিভরা চোখে তিনি চঞ্চলার দিকে চাহিলেন একবার। প্রতিমার মতো বসিয়া আছে। মুখে কোনও ভাবান্তর ঘটিতেছে না, চোখের পলক পর্যন্ত পড়িতেছে না। হঠাৎ চূড়ামণি চৌধুরীর নজরে পড়িল, চঞ্চলা তাঁহার দেওয়া ঢাকাই শাড়িখানাই পরিয়া রহিয়াছে। সমস্ত মন কেমন যেন অনবদ্য অপূর্ব রসে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। মনে হইল, ওই তুচ্ছ শাড়িখানার মাধ্যমে সে যেন চঞ্চলার অন্তরলোকের অতি কাছে আসিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও মনে হইল, চঞ্চলা কতদূরে···শাড়িখানা যেন তাহাকে আড়ালই করিয়া ফেলিয়াছে। আবার তিনি খবরের কাগজে মন দিলেন। ঠিক কাগজে মন দিলেন না, কাগজটা মুখের সামনে ধরিয়া নিজের চিত্ত-বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার সম্বন্ধে চঞ্চলার কোনও উল্লাস বা উচ্ছ্বাস লক্ষ্য না করিয়া তিনি যেন একটু অপমানিতই বোধ করিতেছিলেন। চঞ্চলাকে দেখিয়া তাঁহার ভাল লাগিয়াছে, চঞ্চলাকে পত্নীত্বে বরণ করিতেও তাঁহার আপত্তি নাই, কিন্তু চঞ্চলার ব্যবহার বড় বিচিত্র। তাঁহাকে যেন আমলই দিতেছে না। আশ্চর্য, কিন্তু কেন···

অনেক দিন আগে চঞ্চলা ইবসেনের 'ডল্‌স্ হাউস্' পড়িয়াছিল—অন্যমনস্ক হইয়া সেই কথাই সে ভাবিতেছিল।

"নমস্কার - নমস্কার—"

হাস্য বিকিরণ করিতে করিতে মিসেস মৈত্র—মিসেস ললি মৈত্র প্রবেশ করিলেন। চোখে কাজল, মুখে গলায় পাউডারের পালিশ, গালে ঠোঁটে লাল রঙ, কুচকুচে কালো রঙের ব্লাউসে চুমকির ঝিকিমিকি, মাথার সামনের দিকের চুল ফাঁপানো, কানে সবুজ পাথর-বসানো টাপ—কে বলিবে ভদ্রমহিলার বয়স চল্লিশ পার হইয়া গিয়াছে! পরণে যে সাদা সিল্কের শাড়ি রহিয়াছে তাহা পাড়হীন, সীমন্তে সিঁদুর নাই। অথচ তিনি হিন্দু এবং মিস্টার মৈত্র প্রবলভাবে জীবিত। মিস্টার বিজয়কুমার মৈত্র শুধু জীবিত নন, শহরের বেশ গণ্যমান্য ভদ্রলোক, নামকরা উকিল একজন। তিনি তাঁহার পত্নীর এই সব বিসদৃশ আচরণের কোনও প্রতিবাদ কখনও করিয়াছেন কি না, তাহা জানা যায় নাই। প্রকাশ্যে বরং দেখা যায় পত্নীর সম্বন্ধে যখনই তিনি কোন উল্লেখ করেন, তখন বেশ সম্ভ্রমসূচক বাক্যাবলীই ব্যবহার করেন। 'উনি অমুক কাজটা করতে ভালবাসেন', 'ওঁর এই মত'—এই ধরনের কথা শুনিয়া মনে হয় যে, পত্নীকে উনি সম্ভবত শ্রদ্ধাই করেন। বলা বাহুল্য, ললি মৈত্রকে কেন্দ্র করিয়া নানাবিধ গুজব নানা কণ্ঠে নানা সুরে সর্বদাই পল্লবিত হয়। তিনি এসব গ্রাহ্য করেন না—এ কথা বলিলে ভুল হইবে। তাঁহার সম্বন্ধে কে কি বলিতেছে। তাহার প্রত্যেক খবরটি তিনি সংগ্রহ করেন এবং সংগ্রহ করিবার পর বাড়াবাড়ির মাত্রাটা আরও বাড়াইয়া দেন। গালের এবং ঠোঁটের রঙ আরও প্রকট হইয়া উঠে, ব্লাউসের গলাটা আরও খুলিয়া যায়, অবগুণ্ঠন সরাইয়া মাথার চুলটা আরও বে-পরোয়াভাবে আলুলায়িত করিয়া দেন। অর্থাৎ গুজবপরায়ণ সমালোচকদের নাকের সম্মুখে দুইটি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ নাড়িয়া যেন বলিয়া দেন—বেশ করিতেছি আরও করিব। মিসেস ললি মৈত্রের সঙ্গে আসিয়াছিলেন তাঁহার আধুনিকতম পুরুষ বন্ধু, মিস্টার পুরী। তিনিও একজন উচ্চপদস্থ

কর্মচারী। শুধু তাই নয়, তিনি একজন সুদক্ষ তবলা-বাদকও। মিস্টার পুরী স্মিতমুখে সকলকে নমস্কার করিয়া একটি আসন গ্রহণ করিলেন।

"চঞ্চলা তোমাকে আজ সেই কথ্থক নাচটা নাচতে হবে, মিস্টার পুরী বাজাবেন। মিস্টার চৌধুরীর নিশ্চয় আপত্তি নেই এতে—"

"না না, আমার আপত্তি থাকবে কেন—"

"বাস, তাহ'লে আর তোমার ভয় কি চঞ্চলা!"

চঞ্চলা মৃদুকণ্ঠে বলিল, "শরীরটা ভাল নেই আজ।"

"তাই না কি, কি হয়েছে?"

চূড়ামণি চৌধুরীর কণ্ঠস্বরে একটা আকুলতার সুর বাজিয়া উঠিল। চোখ তুলিয়া চাহিতেই পিতার সহিত চোখোচোখি হইয়া গেল চঞ্চলার। পশ্চিম দিকের বারান্দায় স্থিরদৃষ্টিতে তিনি তাহার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। তাঁহার দৃষ্টিতে একটা মৌন ভর্ৎসনা মূর্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সে দৃষ্টি যেন বলিতেছিল—এ তোমার কেমন ব্যবহার! চঞ্চলা দৃষ্টি ফিরাইয়া লইল।

শিখিনী চৌধুরী বলিলেন, 'আগে গান হয়ে যাক একটা। তারপর নাচ হবে।"

"বেশ। অ্যাট্‌মস্‌ফিয়ারটা নাচের উপযোগী হয়ে উঠবে বরং তাতে।"

রামকান্ত চা ও খাবারের সরঞ্জাম লইয়া প্রবেশ করিল।

"রামকান্ত, তুমি ডুগি তবলা আর তানপুরাটা পাঠিয়ে দাও তো। হার্মোনিয়ামটাও।"—শিখিনী বলিলেন।

মিস্টার পুরী হাতুড়ি ঠুকিয়া তবলা বাঁধিতেছিলেন। ললি মৈত্র হার্মোনিয়মে সুর দিতেছিলেন। চূড়ামণি চৌধুরী খবরের কাগজ ছাড়িয়া চঞ্চলার খুব কাছে আসিয়া বসিয়া ছিলেন। শ্বেতকমলও আর বাতায়নে দাঁড়াইয়াছিলেন না। বাতায়ন-পথে বাগানের পুষ্করিণীটার যে রূপ তিনি দেখিয়াছিলেন এবং তাহার সহিত চঞ্চলার যে সম্পর্ক তাঁহার কবিমানসে প্রতিভাত হইয়াছিল তাহাই অন্যমনস্ক করিয়া রাখিয়াছিল তাঁহাকে। তিনি অন্যমনস্ক হইয়া নির্নিমেষে চঞ্চলার মুখের দিকেই চাহিয়াছিলেন। শক্তিধরবাবু পশ্চিমের বারান্দায় প্রত্যক্ষভাবে ছিলেন না। কিন্তু তাঁহার দৃষ্টিটা চঞ্চলার হৃদয়ে শায়কের মতো বিঁধিয়া ছিল।

নতনেত্রে বসিয়াছিল চঞ্চলা। জীবন-সাগরের তরঙ্গশীর্ষে ময়ূরপঙ্খীর মতো ভাসিয়া বেড়াইবার যে কল্পনাটা তাহার মনে কিছুক্ষণ আগেও নেশা ধরাইয়া দিয়াছিল তাহার বর্ণচ্ছটা সহসা যেন মশালের আলোকে রূপান্তরিত হইয়া ঘিরিয়া ধরিয়াছিল তাহাকে। তাহার মনে হইতেছিল, শিকারীর দল তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে, উদ্ধারের আর উপায় নাই, বাবাও উহাদের দলে।

"চঞ্চু, আরম্ভ ক'রে দাও, আর দেরি করছ কেন? আমাকে নটার সময় প্রিন্সিপালের বাড়ি যেতে হবে আবার—"

শিখিনী চৌধুরী তাঁহার সুদৃশ্য সোনার হাতঘড়িটির দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। মিস্টার পুরীর অঙ্গুলিগুলি তবলার উপরে অধীরে আগ্রহে বোল তুলিতে লাগিল।

"আর দেরি নয়, আরম্ভ কর, আরম্ভ কর—"

চঞ্চলা নতনেত্রে বসিয়াছিল। ভাবিতেছিল, যে পাপ সে করিয়াছে তাহার শাস্তি আসন্ন, নরককুণ্ডে লাফাইয়া পড়িতেই হইবে, কিন্তু—

"চঞ্চলা এখানে আছে—?"

সকলে চাহিয়া দেখিলেন দ্বারপ্রান্তে অধ্যাপক অনিমেষ ঘোষাল দাঁড়াইয়া আছেন। চঞ্চলা দাঁড়াইয়া উঠিয়াছিল!

"আমাকে ডাকছেন?"

'হ্যাঁ। শোন, তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে—"

চঞ্চলা বাহির হইয়া গেল। আর ফিরিল না।

বিজয়িনী

খুব লম্বা ঘোমটা টেনেই সুবাসিনী ট্রেন থেকে নাবল। ট্রেনে ঘোমটা টানবার প্রয়োজন হয়নি। প্রথম শ্রেণীর যে কামরাটিতে সে উঠেছিল তাতে আর কেউ ছিল না। তাই যে ছদ্মবেশে সে পুরন্দরপুরে গিয়ে বিজয় মল্লিকের বাসায় উঠবে ঠিক করেছিল. সেটাকে আরও ভালো করে ঠিক করে নেবার সুযোগও পেয়েছিল সে ট্রেনেই। ছদ্মবেশ অবশ্য তেমন চমকপ্রদ কিছু নয়, সাধারণ বৈষ্ণবীর বেশ। গলায় কণ্ঠী, নাকের উপর রসকলি. গায়ে নামাবলী। বিজয় মল্লিকের কুলগুরুর কাছ থেকে চিঠিও একখানা জোগাড় করে এনেছিল সে। সে আশা করেছিল, বিজয় মল্লিক এ চিঠির অমর্যাদা করবেন না। যদিও ধার্মিক বলতে সাধারণতঃ যা বোঝায় বিজয় মল্লিক সে পর্যায়ের লোক নন. মদ আর মেয়েমানুষ নিয়েই জীবনের অধিকাংশ সময় কেটেছে তাঁর, তবু কিন্তু তাঁর অন্তরের গহন প্রদেশে এমন একটা কিছু আছে যা তাঁকে নাস্তিক হতে দেয়নি। তিনি দেব দ্বিজ, মাদুলী কবচ, সিন্নী, স্বপ্ন সবই মানতেন, কেবল মুখে নয় অন্তরের সহিতই। কলেজের ইংরাজী শিক্ষা তাঁর মনের কুসংস্কারগুলোকে দূর তো করতেই পারেনি বরং যেন দৃঢ়তর করেছিল। সুবাসিনী একথা জানত. তাই সে কৌশল করে কুলগুরুর চিঠিখানি হস্তগত করে এনেছিল। সে জানত, এ চিঠির অমর্যাদা বিজয় মল্লিক করবেন না। এ-ও সে জানতো যে, বিজয় মল্লিক যদি তাকে হঠাৎ দেখেও ফেলেন. তাহলেও চিনতে পারবেন না। বিশ বছর আগে যে সুবাসিনী তাঁর হৃদয় হরণ করেছিল—সে আর নেই। সে বদলে গেছে, মরে গেছে বললেও অত্যুক্তি হয় না। এই ঈষৎ স্থূলাঙ্গিনী প্রৌঢ়ার মধ্যে তার কোনও চিহ্নই আর নেই, বিজয় মল্লিকের প্রথম যৌবনের সহচরী তন্বী সুবাসিনী কালের আবর্তে নিশ্চিহ্ন হয়ে তলিয়ে গেছে। একটা চিহ্ন অবশ্য আছে। উল্কি দিয়ে বিজয় মল্লিক সুবাসিনীর বুকে নিজের নামটা লিখেছিলেন একদিন. সেটা এখনও লুপ্ত হয়নি। কিন্তু সেটা দেখবার সুযোগ কাউকে কখনও দেয়নি সে, দেবার ইচ্ছেও নেই। তিন-পুরু জামার নীচে তা লুকোনো আছে। বিজয় মল্লিককে অন্তত সুযোগ সে কখনও দেবে না। যে প্রেমে বিহ্বল হয়ে তিনি তার বুকে নিজের নাম লিখিয়ে ছিলেন আর যে প্রেমের উপর বিশ্বাস করে সে সেটা লিখতে দিয়েছিল, সে প্রেমেরই যখন মর্যাদা রইল না, তখন ওই তুচ্ছ চিহ্নের মূল্য কি। সম্ভব হলে ওটা সে মুছেই ফেলত, কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। সুবাসিনীর চেয়ে হীনতর মনোবৃত্তির কোনও স্ত্রীলোক হয়তো ওটা নিয়ে আস্ফালন করত, সুবাসিনী করেনি। সুবাসিনী আলাদা জাতের মেয়ে। বিজয়

মল্লিক তাকে ত্যাগ করে যখন অন্য আর একজনকে নিয়ে মাতলেন, তখন ক্ষতিপূরণ স্বরূপ তাকে দশ হাজার টাকাও দিয়েছিলেন। সে টাকা নাটকীয় ভঙ্গীতে সে ফেরত দিতে পারত, দেয়নি। সে টাকা খরচও করেনি সে। বিজয় মল্লিক তার নামে একটা বড় ব্যাংকে দশ হাজার টাকা জমা করে তাকে পাশ বুক আর চেক বুক পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। আজ পর্যন্ত একটি চেকও কাটেনি সে। টাকা ব্যাংকেই পড়ে আছে। এটা সম্ভব হয়েছিল অবশ্য তার স্বামীর জন্য। অদ্ভুত প্রকৃতির লোক ছিলেন তিনি। পদস্খলিতা সুবাসিনীকে ঘরে স্থান দিয়েছিলেন তিনি, সে যে বিজয় মল্লিকের রক্ষিতা রূপে কিছুকাল অন্যত্র ছিল—এ ঘটনাটাতে খুব বেশী গুরুত্ব আরোপ করেন নি। তিনি যেই আবিষ্কার করলেন যে বিজয় মল্লিক সুবাসিনীকে ত্যাগ করে চলে গেছে অমনি তাকে ঘরে ফিরিয়ে নিলেন। এমন মহৎ লোককেও কিন্তু সুবাসিনী ভালবাসতে পারেনি। কারণও ছিল এর। এখনও সে বিজয় মল্লিককেই ভালবাসে।

ট্রেন থেকে নেমেই সে পরের স্টেশনের একটি টিকিট কিনে ফেললে। উদ্দেশ্য ওয়েটিং রুমে কিছুক্ষণ থাকবে। একটু বিশ্রাম করে নিয়ে তারপর পুরন্দরপুরের উদ্দেশ্যে রওনা হবে গরুর গাড়ি করে। পেঁছিতে রাত হয়ে যাবে, তা হোক, দিনের আলোয় পুরন্দরপুরে পেঁছিবার ইচ্ছা হল না তার। প্রথম শ্রেণীর ওয়েটিং রুমে কেউ ছিল না। সুবাসিনী স্নান করে, খাওয়া দাওয়া শেষ করে শুয়ে পড়ল। রাতে ট্রেনে ভালো ঘুম হয়নি। ঘুমটা কিন্তু প্রগাঢ় হল না, ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন এল। তার যে বিগত জীবনেরই কথা ভাবতে ভাবতে সে সারাটা পথ এসেছে সেই বিগত জীবনেরই খানিকটা মূর্ত হয়ে উঠল, তার স্বপ্নে। এমন সজীব মূর্ত হয়ে উঠল যেন কালকের ঘটনা।

বিজয় মল্লিক—যুবক বিজয় মল্লিক, মাথায় কোঁকড়ানো চুল, টকটকে রঙ, বাসনা-প্রদীপ্ত দৃষ্টি, সযত্ন লালিত গোঁফ - সুন্দর সুপুরুষ বিজয় মল্লিক তার ঘরে প্রবেশ করলেন, রোজই যেমন করতেন, রাত্রি ন'টার পর। যা বললেন, তা প্রত্যাশাই করছিল সুবাসিনী। রোজই এসে প্রথমে গান করতে বলেন, সেদিনও বললেন। গানটা শেষ হয়ে যাবার পর চোখ বুজে বসে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর চোখ খুলে নির্নিমেষে চেয়ে রইলেন তার দিকে।

"কি দেখছেন অমন করে ?"

"তোমাকে আর দেখতে পাব না কি না, তাই ভাল করে দেখে নিচ্ছি।" কথাটা হেঁয়ালির মতো শুনিয়েছিল প্রথমে।

"তার মানে—?"

"তোমার স্বামী চিঠি লিখেছেন বিশ্বপতিকে।"

"কি লিখেছেন ?"

"লিখেছেন, তুমি যদি ঘরে ফিরে যাও তাহলে তিনি তোমাকে ঘরেই স্থান দেবেন। ত্যাগ করবেন না। তুমি যে আমার কাছে আছ এ খবর তিনি জানেন, কিন্তু কাউকে জানান নি। তাঁর আত্মীয়স্বজনেরা জানে যে তুমি বাপের বাড়ীতে অসুস্থ হয়ে পড়ে আছ। ভদ্রলোক মুশকিলে পড়েছেন মেয়েকে নিয়ে। তোমার যে মেয়ে ছিল তাতো জানতাম না। কত বড় মেয়ে ?"

চুপ করে রইল সুবাসিনী খানিকক্ষণ, তারপর বলল, "বছর খানেকের।" ভ্রূকুঞ্চিত করে রইলেন বিজয় মল্লিক।

তারপর হেসে বললেন—"তাহলে বাড়ীই ফিরে যাও তুমি। এসব জানলে তোমার সঙ্গে এতটা মাখামাখি করতাম না, বিশ্বপতি আমাকে কিছুই বলেনি এসব। অন্তত তোমার বুকে নিজের নামটা লেখাতাম না তাহলে। বল তো ওটা তুলেও দিতে পারি। একটু হয়তো কষ্ট হবে।"

বিজয় মল্লিকের নির্বিকার ভাবভঙ্গী দেখে নির্বাক হয়ে গিয়েছিল সুবাসিনী। সে যেন মানুষ নয়, একটা খেলনা। কিন্তু এ নিয়ে বাদ-প্রতিবাদ করেনি সে। কেমন যেন আত্মসম্মানে বেধেছিল। পেটের মেয়েটার জন্য অবশ্য মন কেমন করত তার—খুবই মন কেমন করত—সুযোগ থাকলে হয়তো তাকে নিয়েই আসত সে—কিন্তু সুযোগ ছিল না। বিশ্বপতির সঙ্গে গভীর রাত্রে সে যখন গৃহত্যাগ করেছিল তখন মেয়ের কাছে শুয়েছিলেন স্বামী। তাঁকে না জাগিয়ে মেয়েকে আনা সম্ভব ছিল না। সে যে সামান্য একটা খেলনা মাত্র, এ ধারণাটা বেশীক্ষণ কিন্তু স্থায়ী হয়নি তার মনে—মেয়ের কাছে ফিরে যাবার সুযোগ এসেছে অপ্রত্যাশিত ভাবে এই আনন্দেই বিভোর হয়ে গিয়েছিল সে, উৎসুক হয়ে উঠেছিল তার মন।

"উল্‌কিটা তুলিয়ে দেবার ব্যবস্থা করব? স্বামীর কাছে ফিরে যাচ্ছ, ওটা থাকা ঠিক নয়!"

স্বামীর আচরণ কি হবে তা না জেনেই নিদারুণ সত্য কথাটা তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল সেদিন।

"স্বামীর কাছে আর ফেরা যাবে না।"

"আমার কাছেই থাকবে তাহলে?"

"তাই বা থাকব কি করে! বিশ্বপতিবাবু বলছিলেন, ময়না বাঈজিকে আপনি বহাল করেছেন।"

"করেছি, কিন্তু তা সত্ত্বেও তোমাকে রাখতে পারতাম! কিন্তু আমার একটা কুসংস্কার আছে। পরস্ত্রীকে আমি সব সময়ে মা বলে ভাবতে পারি না যদিও, কিন্তু যে পরস্ত্রী সত্যি সত্যি মা হয়ে গেছে, তার সংগে আর সংশ্রব রাখতে ইচ্ছে হয় না। আমাদের কুলগুরুর নিষেধও আছে। তাই তোমাকে ছাড়তে যদিও কষ্ট হচ্ছে খুব, তবু উপায় নেই, ছাড়তেই হবে। তোমার স্বামীর কাছে ফিরে যাও তুমি, তিনি যখন এ নিয়ে কোনও গোলমাল করবেন না বলেছেন। একটু আশ্চর্য লাগছে যদিও কথাটা শুনে, এদেশে সাধারণত এরকমটা হয় না। তবু যাও! যদি ভদ্র ব্যবহার করেন ভালোই, আর না যদি করেন তাহলে একটা ব্যবস্থা কোরো কিছু। আমি লয়েড্‌সে তোমার নামে দশ হাজার টাকা জমা করে দিয়েছি, ব্যাংকে গিয়ে কেবল তোমাকে টেস্‌ট্‌ সিগ্‌নেচার প্রভৃতি করতে হবে। বিশ্বপতি নিয়ে যাবে তোমাকে। যদি দরকার হয় আরও কিছু দেব। টাকা দিয়ে যতটা করা সম্ভব তা আমি করব।" আবার নির্নিমেষে চেয়ে রইলেন বিজয় মল্লিক তার মুখের দিকে কিছুক্ষণ। তারপর হেসে বললেন, "কোথা থেকে কি ঘটল দেখ। তোমার মামার বাড়ীর ঠিক পাশেই যদি আমার মামার বাড়ী না হ'ত, আর তোমার সঙ্গে সেখানে যদি ঘনিষ্ঠতা না হ'ত তাহলে এসব কিছুই হ'ত না। ঘনিষ্ঠতা সত্ত্বেও কিছু হ'ত না যদি বিয়েটা হয়ে

যেত। কিন্তু বাদ সাধল কুষ্ঠি। তোমার কুষ্ঠির সঙ্গে আমার কুষ্ঠির মিল তো হলই না, তাছাড়া তোমার বৈধব্য যোগ ছিল, আমাদের কুলগুরু কিছুতেই রাজী হলেন না। যদি হতেন, তাহলে এসব কিছুই হ'ত না। আরও যোগাযোগ দেখ বিশ্বপতি তোমার স্বামীর দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় বেরিয়ে গেল। তার কাছেই খবর পেলাম তোমাকে একজন নিঃসন্তান বুড়ো পণ্ডিত বিয়ে করেছেন—যাক্ ওসব কথা ভেবে আর লাভ নেই।"

এ স্বপ্নটা মিলিয়ে গেল, এল আর একটা স্বপ্ন।

তার স্বামী যেন তাকে বলছেন, "আমি তোমাকে বিয়ে করেছিলাম পুত্রার্থে। কিন্তু তোমার হল একটা মেয়ে। তারপর তুমি কালীঘাট যাবার নাম করে পালিয়ে গেলে বিশ্বপতির সঙ্গে। গিয়ে রইলে একটা লম্পট জমিদারের ছেলের উপপত্নী হয়ে। সে দিন কতক তোমাকে ভোগ করে এখন আর একটা বাঈজি নিয়ে মেতেছে। তোমার বিপদ আসন্ন দেখে বিশ্বপতি আমার ভাগ্নে সুরেনকে এক মিথ্যে কাহিনী রচনা করে চিঠি লিখেছে যে তুমি নাকি কোলকাতার রাস্তায় হারিয়ে গিয়েছিলে, এতদিনে তোমাকে খুঁজে পেয়েছে সে, কিন্তু যেহেতু তুমি না বলে বাড়ী থেকে চলে এসেছ তাই তোমার ফিরতে ভয় করছে। আমি যদি অভয় দি তাহলে তুমি ফিরে আসবে। আসল কথা অবশ্য আমি সব জানতাম। আমার বাড়ীতে যদি দ্বিতীয় লোক থাকতো তাহলে তোমাকে আমি ফিরে আসতে বলতুম না, কিন্তু এই কচি মেয়েটাকে একা সামলাবার সামর্থ্য আমার নেই, এজন্যও বটে আর আমার বংশকে কেলেঙ্কারীর কলঙ্ক থেকে বাঁচাবার জন্যও বটে তোমাকে ফিরিয়ে এনেছি আবার। ঐ নিয়ে কোনও উচ্চবাচ্য করিনি। করবও না। কিন্তু অসতীর সঙ্গে আমি সহবাসও করব না। বুড়োও হয়েছি, আমি কাশী চললাম। ঘর-দোর বিষয়-সম্পত্তি যা কিছু আছে সব রইল, তুমি পার তো বাকী জীবনটা ভদ্রভাবে কাটিয়ে মেয়েটিকে মানুষ কোরো। আমি আর ফিরব না।"

স্বপ্ন মিলিয়ে গেল। ঘুমও ভেঙে গেল। উঠে বসল সুবাসিনী। পুনর্জন্ম হল যেন তার। বিশ বছর আগেকার তার জীবন আবার যেন দেখা দিয়ে গেল তাকে। "স্বামীর কাছে আর ফেরা যাবে না"—বিশ বছর আগে উচ্চারিত এই ভবিষ্যদ্বাণী মর্মান্তিকভাবে সফল হয়েছিল। স্বামী কাশী থেকে আর ফেরেন নি। কাশীতেই দেহ-রক্ষা করেছিলেন তিনি। তাঁর মৃত্যুর পর সুবাসিনী আর গ্রামে থাকেনি। স্বামীর বিষয়সম্পত্তি বিক্রি করে চলে এসেছিল কোলকাতায়। সেইখানেই সে এতদিন ধরে আছে, সযত্নে মানুষ করেছে মেয়েটিকে। বাধা সৃষ্টি করবার মতো কেউ ছিল না শ্বশুরকুলে। পিতৃকুলে বা মাতৃকুলে যাঁরা ছিলেন, তাঁরা এ নিয়ে বেশী মাথা ঘামাতে চাননি। তাঁদের ভয় ছিল পাছে একটা বিধবার ভার তাঁদের কারো ঘাড়ে পড়ে যায়। ঝাড়া-হাত-পা বিধবা নয়, একটা মেয়েও আছে। সুতরাং সুবাসিনী নিজের ব্যবস্থা করে নেওয়াতে আপত্তি করেননি কেউ। সুবাসিনীর মা বাবা যতদিন বেঁচে ছিলেন, ততদিন মেয়ের খোঁজ-খবর নিতেন। তাঁরাও বহুদিন গতাসু হয়েছেন, সুতরাং সুবাসিনী প্রায় নির্ঝঞ্ঝাটেই কোলকাতায় এক গলিতে বাসা ভাড়া করে এই কুড়ি বছর

কাটিয়েছে। তার দুটি লক্ষ্য ছিল। প্রথম মেয়েটিকে শিক্ষা দেওয়া, দ্বিতীয় বিজয় মল্লিককেও শিক্ষা দেওয়া। বিজয় মল্লিককে সে ভোলেনি। বিজয় মল্লিক তাকে যে অপমান করেছিলেন তা-ও সে ভোলেনি। এই কুড়ি বছর ধরে সে ক্রমাগত ভেবেছে ঃ কি করে এই দ্বিতীয় লক্ষটি সে ভেদ করতে পারবে। বিজয় মল্লিক একদিন তাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। কি করে সে অপমানের শোধ তুলবে? বিজয় মল্লিক যেন সকাতরে কর-জোড়ে তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে—এই কাল্পনিক ছবিটাই সে মনের মণিকোঠায় টাঙিয়ে রেখেছিল। এই একই ছবিই ছিল সেখানে, এতদিন ধরে এইটেতেই সে নানারকম রং ফলিয়েছে অহরহ। কিন্তু এই কল্পনা-বিলাস কি করে বাস্তবে রূপ পরিগ্রহ করবে তা এতদিন ভেবে পায়নি সে। মধ্যবিত্ত অসহায় বিধবা কি করে জব্দ করবে অমন প্রতাপশালী জমিদারকে! যে একদিন তাড়িয়ে দিয়েছিল তার কাছে যাবেই বা কি করে। তাই সে এতদিন কল্পনাতেই বিজয় মল্লিককে পদানত করে সুখী ছিল। হঠাৎ কিন্তু অদ্ভুত যোগাযোগ হয়ে গেল একটা অপ্রত্যাশিতভাবে। হঠাৎ চাকাটা ঘুরে গেল, যা অসম্ভব মনে হচ্ছিল তা সম্ভাব্যের সীমায় চলে এল। সুবাসিনীর মেয়ে শুচিতা কলেজে বি. এ. পড়ছিল। সে হঠাৎ একদিন এসে বললে—"মা, এক ভদ্রলোককে রাত্রে আজ খেতে বলেছি। ভালো কিছু রান্না কর!"

"কাকে আবার খেতে বললি?"

শুচিতা হেসে বললে, "আমাদের কলেজের লেক্‌চারার একজন। খুব ভালো পড়ান। আজ তাঁর জন্মদিন। কলেজের ছেলে মেয়েরা তাঁকে চাঁদা করে কত কি কিনে দিয়েছে আজ। আমি তাঁকে রাত্রে নিমন্ত্রণ করেছি, মানে করতে বাধ্য হয়েছি।"

সুবাসিনী প্রথমটা শঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন মনে মনে, "বাধ্য হয়েছি মানে?"

"আমরা তাঁকে একটা ক্যামেরা কিনে দিয়েছি। একটা গ্রুপ ফোটো তুলে তিনি বললেন—সিংগল ছবি কার প্রথমে তুলব বল! লটারি করা হল। আমার উঠল। তিনি আমার ফোটো তুললেন। আমার যা লজ্জা করছিল। তারপর কলেজ থেকে বেরিয়ে তাঁর সংগে আবার দেখা হল রাস্তায়। কথায় কথায় তিনি বললেন, "আজ আমার মাকে মনে পড়ছে। জন্মদিনে তিনি আমাকে নিজে হাতে রেঁধে খাওয়াতেন। কতদিন হল তিনি মারা গেছেন, কিন্তু ঠিক এই দিনটিতে তাঁকে এত মনে পড়ে।" তখন তাঁকে বললাম—"আপনি আজ আমাদের বাড়িতে এসে আমার মায়ের হাতের রান্না খাবেন? আসুন না। মা খুব খুশী হবেন। ও কথা শোনার পর নিমন্ত্রণ না করাটা কি ভালো দেখায়?" তখনও সুবাসিনী জানে না, যে এই লেক্‌চারারই বিজয় মল্লিকের একমাত্র পুত্র অজয় মল্লিক। ক্রমশ সবই জানা গেল। শুধু তাই নয় ক্রমশ এই পরিচয় ঘনিষ্ঠ থেকে ঘনিষ্ঠতর হতে হতে এমন একটা স্তরে গিয়ে পেঁছিুল, যে স্তরের মহিমা সর্বদেশের কাব্যকলার বিষয় বস্তু হয়ে মানব সভ্যতাকে অলঙ্কৃত করছে। অর্থাৎ শুচিতা ও অজয় পরস্পরের প্রেমে পড়ল। সুবাসিনীও এইবার যেন সুযোগ পেলেন। তাঁর মনে হল বিজয় মল্লিককে নিজের আয়ত্তের মধ্যে পাওয়ার একটা রাস্তা হল এইবার বোধ হয়। অর্থাৎ যে বিজয় মল্লিক একেবারে নাগালের বাইরে ছিলেন তিনি হঠাৎ যেন খুব কাছে এসে পড়লেন। তবু কিন্তু ব্যাপারটা আবছা-অস্পষ্ট হয়েই রইল কিছুদিন। বিজয় মল্লিকের ছেলের সংগে তাঁর মেয়ের বিয়ে হবে

গেলেই বা তাঁর প্রতিশোধ-কামনা চরিতার্থ হবে কেমন করে ? তার কল্পনার ছবিতে বিজয় মল্লিক তার কাছে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে আছে, যদি নির্বিঘ্নে বিয়েটা হয়েই যায় বিজয় মল্লিক তার কাছে হাত জোড় করে দাঁড়াতে যাবে কোন দুঃখে ? সে ছেলের বাপ, বাঙালী সমাজে তারই তো উচ্চাসন। সুবাসিনীরই তো সেখানে জোড় হাতে দাঁড়িয়ে থাকবার কথা। কিন্তু হঠাৎ সূত্রটাই ছিঁড়ে যাবার উপক্রম হল। অজয় নাকি শুচিতাকে বিয়ে করবার প্রস্তাব করে তার বাবাকে চিঠি লিখেছিল। বিজয় মল্লিক যা উত্তর দিয়েছেন তা সাংঘাতিক। অজয় সুবাসিনীকে দেখিয়েছিল সে চিঠি। বিজয় মল্লিক লিখেছিলেন—"তুমি বড় হয়েছ, লেখাপড়া শিখেছ, চাকরিও করছ। স্বাধীন ভাবে জীবন যাপন করবার মতো সামর্থ্য তোমার হয়েছে। তবু তুমি বিবাহ বিষয়ে আমার পরামর্শ ও অনুমতি চেয়েছ এতে খুব আনন্দিত হয়েছি, কারণ এতে সুপুত্র-সুলভ শিষ্টাচার প্রকাশ পেয়েছে। আমি যা লিখছি তা হয়তো তোমার মনোমত হবে না। তবু আমার মত যখন চেয়েছ, তখন আমার মতই তোমাকে জানাতে হবে, তোগার মন-রাখা কথা বললে ভণ্ডামি হবে সেটা। আমার মতে বিবাহ ব্যাপারটা একটা সামাজিক ব্যাপার এবং 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা' প্রাচীন এই উক্তিটি মূল্যবান উক্তি। যে পুত্র বংশের মর্যাদা এবং সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হবে, সে পুত্রের জননীকে যেখান সেখান থেকে কুড়িয়ে আনা চলে না। অপরিণত-বুদ্ধি যুবকদের হাতেও সে নির্বাচন ভার অর্পণ করাও খুব সুবুদ্ধির কাজ নয়। কারণ যুবকরা যে কোনও যুবতী মেয়েকে দেখেই সাধারণত মুগ্ধ হয়। তাই ঠিক করেছি আমার পুত্রবধূ আমি নিজে নির্বাচন করব তার কুল, কুষ্ঠি, বংশ, মর্যাদা, রূপ, স্বাস্থ্য সব দেখে। যে ঠাকুরঘরের পূজার আসনে তোমার মা ঠাকুমা বসে পুজো করে গেছেন সে ঠাকুর ঘরে যাকে তাকে আমি ঢুকতে দেব না। তবে আর একটা কথাও তোমাকে স্পষ্ট ভাষায় বলে দিচ্ছি। যদি কোনও মেয়েকে তোমার ভালো লেগে থাকে, থাকো না তাকে নিয়ে দিনকতক, তার জন্যে যদি কিছু খরচ করতে চাও কর, তাতে আমি আপত্তি করব না। তোমার বাল্যে এবং কৈশোরে তোমাকে অনেক রকম খেলনা কিনে দিয়েছি, যৌবনেও কিনে দিতে আপত্তি নেই। আপত্তি করব যদি খেলনাটাকে বিয়ে করতে চাও। আমি নিজেও নানারকম নারীর সংস্পর্শে এসেছি জীবনে তা তোমার অবিদিত নেই, কিন্তু তাদের বিয়ে করে গৃহিনী করবার প্রবৃত্তি আমার কখনও হয়নি। বিলাস-সঙ্গিনীরা গৃহস্থালির বাইরেই মানানসই, তাদের গৃহলক্ষ্মী করবার চেষ্টা করা হাস্যকর এ জ্ঞান আমার বরাবরই ছিল। আমার এই সেকেলে মতামত হয়তো তোমাদের কাছে কুসংস্কারাচ্ছন্ন বা ভাল্‌গার বলে মনে হবে, তা হোক, বাকী জীবনটা ওই কুসংস্কারকেই আঁকড়ে থাকব আমি। তুমি তো জানই নানা রকম কুসংস্কার আছে আমার। পাঁজি মানি, কুষ্ঠি মানি, আমাদের পূর্বপুরুষ ভার্গব মল্লিক সেকালে কোলকাতা থেকে কাঁঠাল কাঠের যে প্রকাণ্ড সিন্দুকটা কিনে এনেছিলেন এবং যার ভিতর রহস্যময়ভাবে একটি পিতলের লক্ষ্মীমূর্তি পাওয়া গিয়েছিল সেই লক্ষ্মীমূর্তিটিকে আমি আমাদের বংশের উন্নতির কারণ বলে মানি এবং তাই আজও সেই সিন্দুকবাহিনী লক্ষ্মীর পুজো সাড়ম্বরে করি। অনেকে পরামর্শ দিয়েছিলেন, লক্ষ্মীকে সিন্দুক থেকে বার করে ঠাকুর ঘরে স্থাপন করতে। কিন্তু আমার পিতা পিতামহ যা করেন নি আমিও তা করতে সাহস

পাইনি। আমার এসব কুসংস্কারের কথা তুমি জানো, এসব জেনেও তুমি এতকাল আমাকে শ্রদ্ধা ভক্তি করে এসেছ। বিবাহ প্রসঙ্গে আমার মতমত তোমাকে জানালাম, আশা করি এটাও তুমি বরদাস্ত করতে পারবে।”

চিঠিটা বজ্রাঘাতের মতো এসে পড়ল ওদের স্বপ্ন-সৌধ-শীর্ষে। ওদের মানে শুচিতা অজয়ের। সুবাসিনীর মনে এ চিঠির প্রতিক্রিয়া কিন্তু হল অন্য রকম। সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে উঠল যেমন করে হোক এ-বিয়ে ঘটাতেই হবে। যে বিজয় মল্লিক তাকে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছিল, তার ঘরেই মেয়েকে সর্বেসর্বা করে তবে সে ছাড়বে। বিজয় মল্লিকের চিঠি পেয়ে তাই অজয়-শুচিতা যদিও খুব মনমরা হয়ে পড়েছিল—শুচিতা নিজের ঘরে লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদত, অজয়ের মুখের হাসি নিবে গিয়েছিল—কিন্তু সুবাসিনী দমল না। ভেবে চিন্তে একটা উপায় আবিষ্কার করে ফেলল সে। প্রথমেই সে ঠিক করল তার পূর্ব-পরিচয় লোপ করে দিতে হবে। কোলকাতায় যে পাড়ায় সে থাকত সে পাড়ায় তার সুবাসিনী নামটা কেউ জানত না। শুচুর মা বলেই তাকে ডাকত সবাই। পিতৃকুল, মাতৃকুল এবং শ্বশুরকুল থেকে অনেকদিন আগেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল সে। তবু যে দুই একজন আত্মীয়স্বজন ছিল, তাদের কাছে সে কল্পিত এক লোকের স্বাক্ষরিত চিঠি পাঠিয়ে জানিয়ে দিলে যে সুবাসিনী আর তার মেয়ে কলেরায় হঠাৎ মারা গেছে। মুমূর্ষু সুবাসিনীর কাছ থেকে ঠিকানা পেয়ে স্বাক্ষরকারী তাকে যেন এই সংবাদটা জানাচ্ছে। আর একটা কাজও করল সুবাসিনী। অনেক আগেই আর একটা খবর জানত সে। তার প্রতিবেশী চতুরবাবু (পুরোনাম চতুর্মুখ সিংহ) স-পরিবারে বিজয় মল্লিকের কুলগুরু মাধবানন্দের কাছে মন্ত্র নিয়েছেন। চতুরবাবুর বাড়িতে আসা-যাওয়া ছিল সুবাসিনীর। সুবাসিনী একদা ইচ্ছা প্রকাশ করলেন যে, তিনিও মাধবানন্দের কাছে মন্ত্র নিতে চান। চতুরবাবুর সহায়তায় এ ইচ্ছা অপূর্ণ রইল না। মাধবানন্দের কাছে মন্ত্র নেওয়ার একদিন পরেই সুবাসিনী তাঁকে বললেন, “গুরুদেব, সংসারে একটি মাত্র বন্ধন আমার ওই মেয়ে। তার যদি বিয়েটা হয়ে যায় তাহনে আমি নিশ্চিন্তমনে আপনার চরণে আত্মসমর্পণ করতে পারি। আপনি যদি একটু সাহায্য করেন তাহলে বিয়েটা হয়ে যায়।”

মাধবানন্দ লোক খারাপ নন। বললেন, “আমার দ্বারা যতটুকু সাহায্য হয় ততটুকু আমি নিশ্চয় করব!”

“পুরন্দরপুরের বিজয় মল্লিক শুনেছি আপনার শিষ্য। তাঁর একটি চমৎকার ছেলে আছে। আপনি যদি একখানা চিঠি লিখে দেন।”

“চিঠি লিখে দিতে আমার আপত্তি নাই। কিন্তু এসব ব্যাপারে কেবল চিঠি লিখে কাজ হয় না। যেতে হবে সেখানে।”

সুবাসিনী চুপ করে রইলেন ক্ষণকাল।

“আমার তো পুরুষ অভিভাবক নেই। তবে আপনি যখন বলছেন তখন আমিই যাব। ভদ্রলোকের বাড়ি যেতে আর আপত্তি কি। তবে আপনি দয়া করে একখানা চিঠি দিয়ে দেবেন।”

“তা দোব।”

মাধবানন্দের কাছ থেকে চিঠিখানি সংগ্রহ করে সে রাখল বটে কিন্তু কল্পনায়

জন্যই সে উৎসুক হয়ে উঠেছিল। তার মনে হল অজয় হয়তো বিশ্বপতির খবর জানতে পারে। বিশ্বপতি বিজয় মল্লিকের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল, বিজয় মল্লিকের বাড়িতে যাতায়াতও ছিল তার এককালে, অজয় হয়তো কিছু খবর দিতে পারবে।

একটু আড়াল পেয়ে সুবাসিনী জিগ্যেস করলে—"বিশ্বপতিবাবু এসেছেন দেখছি। চেন তুমি ওঁকে ?"

"খুব চিনি, বাবার খুব অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন এককালে। আমিই তো ওঁকে কম্‌প্লিমেণ্টারি কার্ড পাঠিয়েছিলাম একটা। আজকাল বড় কষ্টে আছেন বিশুকাকা। আপনি চেনেন নাকি ?"

"আমার দূর সম্পর্কের ভাই হন উনি। অনেকদিন দেখা শোনা নেই। এখানে কোথা থাকেন ?"

"সুকিয়া স্ট্রীটে। বড় কষ্টে আছেন। বাবাই তো ওঁকে বরাবর টাকা কড়ি দিতেন, হঠাৎ বাবার সঙ্গে মনোমালিন্য হয়ে গেছে—বাবা রগচটা মানুষ তো।"

"কি করেন উনি আজকাল ?"

"কিসের যেন দালালি করেন। বিশেষ কিছু হয় না। আমি মাঝেমাঝে কিছু কিছু করে দিই।"

"ছেলে মেয়ে আছে ?"

"না, সংসার বড় নয়, সেইটেই বাঁচোয়া। স্ত্রী একটি মেয়ে রেখে অনেকদিন আগে মারা গেছেন। মেয়েটি তাঁর মাসীর কাছে মানুষ হচ্ছিল। সে-ও মারা গেছে শুনেছি।"

সুবাসিনী একথা শুনে যেন অন্ধকারে আলো দেখতে পেল। এই দুঃসংবাদটাই যেন সুসংবাদ বলে মনে হল তাঁর কাছে। অজয়ের কাছ থেকে তার ঠিকানাটা নিয়ে নিলেন। ঠিক করলেন তার সঙ্গে গিয়ে দেখাই করবেন একদিন। তাকে যদি নিজের দলে টানতে পারেন তাহলে বিজয় মল্লিকের কাছে কথাটা অনায়াসে পাড়া যাবে। আর একটা সুবিধা—বিশ্বপতিবাবুও বিজয় মল্লিকের ঠিক পালটি ঘর। তিনি যদি শুচিতাকে নিজের মেয়ে বলে পরিচয় দিতে রাজি হন তাহলে বংশ-পরিচয়ের হাঙ্গামাটা মিটে যায়।

সুবাসিনী আর বিলম্ব করল না। পরদিন সকালেই কালীঘাট যাবার নাম করে বেরিয়ে পড়ল সে বাড়ি থেকে এবং খুঁজে খুঁজে বিশ্বপতির ঠিকানায় গিয়ে হাজির হল। দেখল একটা তিনতলা বাড়ির নীচের একটি ঘরে তিনি থাকেন। কড়া নাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই বেরিয়ে এলেন। সুবাসিনী এগিয়ে গিয়ে প্রণাম করল তাঁকে।

"আমাকে চিনতে পারেন দাদা ?"

বিশ্বপতির চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ হয়ে পড়েছিল, তিনি ভ্রূকুঞ্চিত করে চেয়ে রইলেন সুবাসিনীর মুখের দিকে।

"না, ঠিক চিনতে পারছি না তো ?"

"আমি সুবাসিনী।"

"ও ?"

বজ্রাহতবৎ দাঁড়িয়ে রইলেন বিশ্বপতি। হঠাৎ সমস্ত মনে পড়ে গেল। টাকার লোভে একদা তিনি সুবাসিনীর কত বড় সর্বনাশ করেছিলেন তার পুরো ইতিহাসটা যেন বিদ্যুতের অক্ষরে জাজ্বল্যমান হয়ে উঠল তাঁর চোখের সামনে। নির্বাক হয়ে

দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। সুবাসিনীও দাঁড়িয়ে রইল ক্ষণকাল। তারপর প্রথমে সুবাসিনীই কথা কইল, "চলুন, ভিতরে চলুন। আপনার সঙ্গে কথা আছে একটু।"

"এস এস!"

ভিতরে গিয়ে বিছানা পত্রের অবস্থা দেখে সুবাসিনীর বুঝতে দেরি হল না যে, বিশ্বপতির আর্থিক অবস্থা শোচনীয়। নিজেই সে কথা ব্যক্ত করলেন তিনি।

"এই একখানি মাত্র ঘর নিয়ে কোন রকমে আছি। অবস্থা তো দেখতেই পাচ্ছ। বস ওই খাটেই বস! আমি এই মোড়াটায় বসছি।"

একটা জীর্ণ মোড়া ঘরের কোণ থেকে নিয়ে বসলেন তিনি। সুবাসিনী প্রশ্ন করল, "এমন দুরবস্থা কেন হল আপনার?"

"ভগবান বলে একজন আছেন তো! জীবনে অনেক পাপ করেছি, তারই প্রায়শ্চিত্ত করছি। তারপর তুমি কি মনে করে?"

"আপনার সাহায্য প্রার্থনা করতে এসেছি। আপনি যদি সাহায্য করেন তাহলে আমার কন্যাদায় উদ্ধার হয়।"

"কি রকম, আমি কি ভাবে সাহায্য করতে পারি তোমাকে? আমি নিজেই তো সহায় সম্বলহীন।"

"বিজয়বাবুর সঙ্গে এখন আপনার সম্পর্কটা কি রকম?"

"খুব খারাপ। সম্পর্ক নেই বললেই চলে। অনেককাল দেখা শোনা নেই, আগে দু'একটা চিঠিপত্র লিখতাম, আজ কাল তাও আর লিখি না।"

"অত ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন আপনারা, হঠাৎ এরকম হল কেন?"

"আর খোশামোদ করতে পারলাম না। ওর খেয়াল মেটাবার জন্যে অনেক কুকাজ করেছি জীবনে। শেষটা আর পারলাম না। একথা জানতে চাইছ কেন, তার কাছে আবার ফিরে যাবার মতলব না কি। তোমার স্বামী তো মারা গেছেন শুনেছি।"

"ফিরে যাবারই মতলব আছে, কিন্তু ভিন্ন পথে। আমার মেয়ে শুচিতার সঙ্গে তার ছেলে অজয়ের বিয়ে দিতে চাই। আমার পদস্খলন হয়েছিল সত্য, কিন্তু সে পদস্খলনের প্রভাব আমার মেয়ের মনে বা দেহে নেই। আমার দুর্মতি হবার আগেই যে ওর জন্ম হয়েছিল তা আপনি জানেন, আমার কলঙ্ক আমারই, আমার মেয়ের নয়, তাই ইচ্ছে করেই ওর নাম রেখেছি শুচিতা। অজয় যে কলেজে পড়ায়, শুচিতা সেই কলেজেই পড়ে। দু'জনের ভাব হয়েছে খুব। অজয় তার বাবাকে চিঠি লিখেছিল বিয়ের প্রস্তাব করে, তার উত্তর তিনি এই দিয়েছেন—"

অজয়ের চিঠিখানি সুবাসিনী অজয়ের কাছ থেকে সংগ্রহ করে রেখেছিল, আসবার সময় সঙ্গেও এনেছিল। বিশ্বপতি চিঠিখানি পড়ে বললেন—"এ চিঠির পর আর কথা কওয়া শক্ত। তোমার মেয়ে দেখতে কেমন?"

"কাল চ্যারিটি শোয়ে যে কথ্থক্ নাচছিল, সেই আমার মেয়ে।"

"ও! সে তো রূপসী।"

"বি. এ. পড়ছে। পড়াশোনায় খুব ভালো।"

"আটকাবে কিন্তু বংশ-পরিচয়ে।"

"শুচিতার বংশ-পরিচয়ে কোন দোষ নেই। সে সদ্বংশের মেয়ে, তার বাবার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছিল।"

"কিন্তু তার মায়ের পরিচয় ঢাকবে কি করে ! বিজয়ের কাছে অন্তত সেটা লুকোনো যাবে না।"

"যাবে, যদি আপনি সাহায্য করেন ! আমি যে শুচিতার মা একথা বিজয়বাবুর কাছ থেকে গোপন রাখতে হবে। আপনার একটি মেয়ে আপনার শালীর কাছে মানুষ হচ্ছিল, সে মারা গেছে শুনেছি। বিজয়বাবুও কি শুনেছেন একথা ?"

"না সে শোনেনি, তার সঙ্গে অনেককাল চিঠিপত্র বন্ধ হয়েছে।"

"আপনি শুচিতাকে নিজের মেয়ে বলে পরিচয় দিন তাহলে। আমি হই তার মাসী। বিজয়বাবুর কুলগুরুর কাছে আমিও মন্ত্র নিয়েছি ! তিনি বিজয়বাবুর নামে একটা চিঠিও দিয়েছেন। আপনি যেন নিজের মেয়ের সঙ্গে অজয়ের সম্বন্ধ করছেন এই ভাবে একটা চিঠি লিখুন। আপনি ওঁর বন্ধু, আপনি ঠিক পালটি ঘরও, কিছু বেমানান হবে না।"

"আমি তা পারব না। এতক্ষণ বলিনি, সে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছে আমাকে একদিন। তার দ্বারস্থ হতে আর পারব না।"

"তাহলে আমি নিজেই যাব গুরুদেবের চিঠি নিয়ে। ঘোমটা দিয়ে থাকব, আমাকে তিনি চিনতে পারবেন না। কিন্তু আপনার মেয়ে বলে শুচিতার পরিচয় দেব। তাতে আপত্তি আছে কি আপনার ?"

বিশ্বপতি চুপ করে রইলেন। তাঁর ইতস্তত ভাব দেখে সুবাসিনী বলল, "একটি কথা শুধু মনে করিয়ে দিতে চাইছি আপনাকে। আমার যে কলঙ্ক আজ আমার নিষ্পাপ মেয়ের ভবিষ্যৎকে অন্ধকার করে তুলেছে, তার জন্য আমিই দায়ী, আমার দোষ আমি ঢাকতে চাইছি না। আমি বিজয়কে সত্যিই ভালবেসেছিলাম, কিন্তু আপনি যদি যোগাযোগ না ঘটাতেন, তাহলে হয়ত বাড়ী থেকে আমি বেরিয়ে যেতাম না। এতে যদি পাপ হয়ে থাকে, আপনারও পাপ কম হয়নি। আমি আজ আপনাকে যা করতে বলছি তা কিন্তু পুণ্য কর্ম। অজয়ের সঙ্গে শুচিতার যদি বিয়ে দিয়ে দিতে পারেন তাহলে সেটা ন্যায় বিচারই হবে। ভেবে দেখুন ভাল করে—অমত করবেন না।"

বিশ্বপতি বললেন, "বেশ ! কিন্তু আমি তাকে চিঠি লিখতে পারব না, যেতেও পারব না। বিজয় যদি আমাকে চিঠি লেখে তাহলে তাকে আমি জানিয়ে দেব যে শুচিতা আমারই মেয়ে। কিন্তু শুচিতা অজয় কি এই মিথ্যাটাকে মেনে নেবে !"

"তাদের এখন জানাবই না। তারপর যদি জানতে পারে তখন সব খুলে বললেই হবে। সব শোনবার পর আমার মনে হয় ওরা আপত্তি করবে না। আমি তাহলে চেষ্টা করে দেখি ?"

"দেখ। কিন্তু আমার মনে হয় হবে না।"

বিশ্বপতির বাসা থেকে বেরিয়ে সুবাসিনী আবার গুরুদেবের কাছে গেল। তাঁকে গিয়ে বলল—"চিঠিতে আপনি লিখেছেন যে শুচিতা আমারই মেয়ে, কিন্তু আসলে ও আমার বোনের মেয়ে, আমার বোন মারা গেছে অনেক দিন আগে, আমিই ওকে মানুষ করেছি। সেই কথাটাই লিখে দিন খুলে।"

মাধবানন্দ তাই লিখে দিলেন।

সুবাসিনী পুরন্দরপুরে যখন পৌঁছল, তখন সন্ধ্যার অন্ধকার বেশ গাঢ় হয়েছে।

বিজয় মল্লিকের প্রকাণ্ড বাড়িটা দৈত্যের মতো দাঁড়িয়ে আছে। সিংহদরজা দিয়ে আধ-ঘোমটা টেনে সে যখন ভিতরের দিকে অগ্রসর হল তখন বিশেষ কেউ বাধা দিল না। গেটে দারোয়ান ছিল, দু'একটা চাকর-বাকরও আনাগোনা করছিল, কিন্তু মেয়েমানুষ বলেই সম্ভবত কেউ তাকে বিশেষ কিছু বলল না। আলোকিত বৈঠকখানার সামনে এসে অবশেষে দাঁড়িয়ে পড়তে হল তাকে। বারান্দায় দু'চার জন লোক ছিল, ঘরের ভিতর থেকে কথাবার্তার আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল।

সুবাসিনী ঘোমটা আর একটু টেনে এগিয়ে গেল এবং মৃদুস্বরে একজনকে ডেকে বলল, "আমি কোলকাতা থেকে এসেছি। বিজয়বাবুর নামে একটা চিঠি আছে।"

লোকটি বিজয়বাবুর গোমস্তা একজন।

"আসুন, এইখানে বসুন। চিঠিটা দিন আমাকে—বাবু বাইরেই আছেন।"

বারান্দার উপর যে বেঞ্চটি ছিল তারই একধারে বসল সে। বসেই শুনতে পেল—সর্বনাশ হয়ে গেছে আমার দারোগাবাবু! চোরে যদি আমার সর্বস্ব চুরি করে নিয়ে যেত তাহলেও আমি গ্রাহ্য করতাম না। কিন্তু আমাদের পূর্বপুরুষের ওই সিন্দুক—যে সিন্দুক আমার প্রপিতামহ ভাগবত মল্লিক নৌকা করে কোলকাতা থেকে এনেছিলেন, যার ভিতর লক্ষ্মীর মূর্তি রহস্যময়ভাবে পাওয়া গিয়েছিল এবং যে সিন্দুক আসবার পর থেকে আমাদের সংসারের সর্বপ্রকার উন্নতি হয়েছে—সেই সিন্দুকটাকে ওরা চেলিয়ে টুকরো টুকরো করে দিলে। লক্ষ্মীর মূর্তিটি পর্যন্ত পাওয়া যাচ্ছে না।—উঃ, এর একটা বিহিত করুন দারোগাবাবু, লক্ষ্মীর মূর্তিটা আমার চাই।"

যদিও অনেকদিন পরে শুনল তবু বিজয় মল্লিকের কণ্ঠস্বর চিনতে ভুল হল না সুবাসিনীর। অজয়ের চিঠিতে এই সিন্ধুকের কথাও সে পড়েছিল। যিনি উত্তর দিলেন তিনিই সম্ভবত দারোগাবাবু। "আমার লোকজনেরা তো খুঁজেছে অনেক, এখনও খুঁজছে। কিন্তু ও মূর্তি আর পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। ওটা পিতলেরই ছিল কি?"

"আমরা তো পিতলের বলেই জানতাম। কিন্তু সত্যি কিসের ছিল তা কি করে বলব বলুন। আমার প্রপিতামহ তো ওটা বাজার থেকে কেনেন নি, তিনি কিনেছিলেন সিন্দুকটা। বাড়ীতে সিন্দুক যখন খোলা হল তখন দেখা গেল তার মধ্যে ওই মূর্তি রয়েছে। তখন আমাদের যিনি কুলগুরু ছিলেন, তিনি বললেন—সিন্দুক থেকে ওঁকে বার কোরো না কখনও। নারিকেল ফলোম্ভুবৎ উনি এসেছেন, ওই ভাবেই থাকুন, ওই বন্ধ সিন্দুকের সামনেই পুজো কর তোমরা। তাই হয়ে এসেছে এতকাল, আমাদের উন্নতিও হয়েছে,—কিন্তু কাল একি কাণ্ড হল বলুন তো। মনে হচ্ছে আমার মেরুদণ্ডটাই যেন ভেঙে গেছে।"

দারোগাবাবু সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—"কি আর করবেন বলুন। আমি আর একবার চেষ্টা করে দেখি যদি কোনও পাত্তা লাগাতে পারি।"

"দেখুন, দেখুন প্লীজ।"

এরপর দারোগাবাবু বেরিয়ে এলেন এবং চলে গেলেন।

গোমস্তাটি চিঠি নিয়ে ভিতরে ঢুকল।

"মেয়ে মানুষ? কি চিঠি এনেছে দেখি।"

বিজয় মল্লিকের গলা আবার শোনা গেল।

চিঠিটা পড়ে তিনি বললেন—"গুরুদেবের কাছ থেকে এসেছেন? আচ্ছা, ওকে ভিতরে পিসিমার কাছে নিয়ে যাও! আমি পরে ওঁর সঙ্গে কথা বলব।"

বিজয় মল্লিকের অন্তঃপুরে গৃহকর্ত্রী ছিলেন এক স্থবিরা পিসীমা। তিনি সুবাসিনীর আগমনের হেতু শুনে পুলকিত হয়ে উঠলেন। অজয়ের বিবাহের জন্য তিনি বহুকাল থেকে উৎসুক হয়ে আছেন। কত সম্বন্ধ এসেছে, কিন্তু বিজয় মল্লিক কাউকে পছন্দ করেন নি। প্রত্যেকেরই একটা না একটা খুঁত বেরিয়ে পড়েছে। সেই সবেরই বিবরণ বলতে লাগলেন তিনি সুবাসিনীকে। শেষে বললেন, "তোমার মেয়ে যখন সুন্দরী, আর ওর বন্ধুর মেয়ে, গুরুদেবও পছন্দ করেছেন বলছ, তখন হয়তো হয়ে যেতে পারে।"

কিন্তু হল না। সেইদিন বিজয় মল্লিক স্পষ্ট ভাষায় বলে দিলেন, "বিশ্বপতির মেয়ের সঙ্গে আমি ছেলের বিয়ে দেব না। ওকে আমি হাড়ে হাড়ে চিনি, মাপ করবেন আমাকে।"

পরদিন ভোরের ট্রেনেই বিফলমনোরথ হয়ে ফিরে আসতে হল সুবাসিনীকে।

সুবাসিনী অজয় আর শুচিতাকে বলেই গিয়েছিল যে সে গুরুদেবের চিঠি নিয়ে পুরন্দরপুরে যাচ্ছে তাদের বিয়ের জন্য চেষ্টা করতে। সে যখন হৃদয় বিদারক দুঃসংবাদটা নিয়ে ফিরে এল, তখন শুচিতার চোখে মুখে একটা সপ্রতিভ হাসি উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল যদিও, কিন্তু সুবাসিনীর কাছে সে হাসির মেকিত্ব ধরা পড়ল অবিলম্বে। তার অন্তর্দৃষ্টির কাছে কিছুই লুকোনো রইল না। সে নিজেই যে একদিন প্রেমে পড়েছিল, শুচিতার হাসির অর্থ বুঝতে একটুও দেরি হল না তার। সুবাসিনী যখন ফিরল তখন অজয় ছিল না। সে এল সন্ধ্যার পর। সে আসতেই শুচিতা হেসে বলল—"মা ফিরে এসেছেন। একেবারে কলকে পাননি সেখানে।"

সুবাসিনী হাসি মুখে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ। তারপর বলল, "আমি একটা খারাপ সময়ে গিয়ে পড়েছিলাম। তোমাদের বাড়ির সেই লক্ষ্মীর সিন্দুক চুরি গেছে। তোমার বাবা অস্থির হয়ে উঠেছেন। তার মনের ভাব দেখে মনে হল আমি যদি তার হারানো লক্ষ্মীকে ফিরিয়ে দিতে পারি তাহলে হয়তো উনি আমার প্রস্তাবে রাজি হলেও হতে পারেন। লক্ষ্মীর জন্যে উনি পাগল হয়ে উঠেছেন।"

"তাই না কি! আমি তো কোনও খবর পাইনি।"

তার পরদিন সকালেই কিন্তু অজয় এসে হাজির হল আবার।

"বাবা জগন্নাথ গোমস্তার হাতে চিঠি পাঠিয়েছেন অবিলম্বে তেমনি একটা সিন্দুক আর তেমনি একটা পেতলের লক্ষ্মী কিনে পাঠাতে। অত বড় সিন্দুক চট করে পাওয়া গেল না। জগন্নাথের হাতে চিঠি লিখে পাঠালাম যে আমি যতশীঘ্র সম্ভব সিন্দুক আর লক্ষ্মী পাঠাচ্ছি। আপনি কাল বলছিলেন তাঁর হারানো লক্ষ্মী ফিরিয়ে দিলে তিনি হয়তো রাজি হবেন। এই শুনে আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে। আপনি যদি রাজি হন আর শুচিতা যদি ভাল করে অভিনয় করতে পারে তাহলে কি হয় বলা যায় না। তবে ব্যাপারটা একটু রিস্কি।"

"কি বলই না শুনি।"

সুবাসিনী শুচিতা দুজনেই উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠল। অজয় মৃদু হেসে চুপ করে রইল কিছুক্ষণ।

সুবাসিনী বলল—"শুনিই না তোমার প্ল্যানটা। অসম্মানকর যদি না হয় আপত্তি করব কেন।"

অজয় হেসে বললে—"ঠিকমতো অভিনয় করতে পারলে বাবার কুসংস্কারের রন্ধ্র দিয়ে শুচিতা আমাদের বাড়িতে হয়তো ঢুকতে পারে।"

"কি করতে হবে"—শুচিতা হেসে জিজ্ঞাসা করলে।

"আমাদের যে সিন্দুক চুরি গেছে তা প্রকাণ্ড সিন্দুক। প্যাসেঞ্জার ট্রেনে তা পাঠানো যাবে না। মাল গাড়িতে যেতে পারে, কিন্তু তাতে অনেক দেরী হবে। বাবা লিখেছেন আগামী বৃহস্পতিবারের আগেই সিন্দুক আর পিতলের লক্ষ্মী পুরন্দরপুরে পৌঁছন চাই। একমাত্র উপায় হচ্ছে লরী করে পাঠানো। আমার এক বন্ধু লরী ড্রাইভার আছে। পুরন্দরপুরে পৌঁছবার ঠিক আগে শুচিতাকে যদি সিন্দুকের মধ্যে পুরে দেওয়া যায়, কেমন হয়! বাবার প্রপিতামহ ভার্গব মল্লিক সিন্দুকের ভিতর রহস্যময় ভাবে পিতলের লক্ষ্মী পেয়েছিলেন, বাবা একেবারে জীবন্ত লক্ষ্মী পেয়ে যাবেন।"

"পাগল নাকি! দম আটকে যাবে না আমার!"

শুচিতা হেসে লুটিয়ে পড়ল।

"দম আটকাবে কেন। প্রকাণ্ড সিন্দুক। আর কতক্ষণই বা থাকবে তার ভিতর। ডালাটা খুলেও বসে থাকতে পার। পুরন্দরপুরে ঢোকবার ঠিক আগে ডালাটা বন্ধ করে দিলেই হবে। আমাদের বাড়িতে গিয়ে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে তো বাবা সিন্দুকের ডালাটা খুলে দেখবেন। সিন্দুকের ভিতরে হাওয়া ঢোকবার একটা ব্যবস্থা করাও অসম্ভব নয়। অনায়াসেই সেটা হতে পারে।" কথাটা শুনে সুবাসিনীর কল্পনা পাখা মেলে উড়তে লাগল। শুচিতা পারবে কি? যদি পারে··! শুচিতার চোখ দুটোও জ্বল-জ্বল করে উঠল সকৌতুক উৎসাহে। তৎক্ষণাৎ সে ঠিক করে ফেলল এই দুঃসাহসিক অভিযানে যেতেই হবে। ব্যাপারটার অভিনবত্বেই উৎসাহিত হয়ে উঠল সে। ঠিক বিয়ের লোভে নয়। বিয়ের সম্বন্ধে সে নিশ্চিন্ত ছিল। সে জানত অজয়কে সে জয় করেছে, বিয়ে একদিন না একদিন হবেই। কিন্তু সিন্দুকের ভিতর থেকে আবির্ভূত হয়ে এক কুসংস্কারাচ্ছন্ন দুঁদে জমিদারকে অভিভূত করে ফেলার মধ্যে যে মজা আছে, সেইটে উপভোগ করবার জন্যেই সে তৎক্ষণাৎ ঠিক করে ফেললে যাবে।

অজয়ের দিকে চেয়ে মুচকি হেসে সে বললে—"সিন্দুক থেকে বেরিয়ে কি বলতে হবে আমাকে?"

"কিছু বলতে হবে না। খুব যেন আশ্চর্য হয়ে গেছ এইরকম ভান করতে হবে শুধু। অনেক পীড়াপীড়ি করলে বলবে—'আমি এই সিন্দুকের মধ্যে কি করে এলাম কিছু বুঝতে পারছি না। আমি আমার বাড়িতে বিছানায় শুয়ে ঘুমুচ্ছিলাম, কিছুই জানি না,' এই ধরনের দুচার কথা বলে সিন্ধুক থেকে বেরিয়ে পরের ট্রেনেই এখানে চলে আসবে।"

"তারপর?" সুবাসিনী রুদ্ধশ্বাসে প্রশ্ন করলে।

"তারপর খুব সম্ভব বাবাও ওর পিছু পিছু আসবেন। তখন আপনিও ওই কথাই বলবেন। ওঁকে এটা বিশ্বাস করিয়ে দিতে হবে যে শুচিতা রাত্রে বিছানায় শুয়ে ঘুমুচ্ছিল, কি করে যে হঠাৎ অন্তর্ধান করল তা আপনি বুঝতে পারছেন না। আপনি থানায় ডায়েরিও একটা করে দিতে পারেন! আচ্ছা বাবা কি আপনাকে দেখেছিলেন?"

"না, তাঁর সঙ্গে আমার দেখাই হয়নি।"

"ভালই হয়েছে! আমিও বাবাকে চিঠি লিখে দিচ্ছি যে মেয়েটিকে আমি বিয়ে করতে চেয়েছিলাম তার সঙ্গে বিয়ে দিতে বাবার যখন আপত্তি আছে তখন আমি সে ইচ্ছা বর্জন করলাম। এটা লেখবার উদ্দেশ্য বাবা যাতে না মনে করেন আমি এই ষড়যন্ত্র করে এই কাণ্ড করেছি।"

"এত বুদ্ধিও তোমার মাথায় খেলে!"

মুচকি হেসে শুচিতা পাশের ঘরে চলে গেল।

সুবাসিনী কিন্তু ব্যাপারটার অভিনবত্বে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। সে আশা করছিল যে অজয় যা বললে তা ঠিক যদি অনুষ্ঠিত হয় তাহলে বিজয় মল্লিক ঠিক তার দ্বারস্থ হবে। এইটেই তো সে চায়।

"তোমার বাবা এসে পড়লে আমি কি করব?"

"কি আবার করবেন। আদর-যত্ন করবেন, আর কথায়-বার্তায় জানিয়ে দেবেন যে, আপনি তাঁর পালটি ঘর। আর কিছু করতে হবে না।"

"বেশ, পারো যদি আমার আপত্তি নেই। এখন দেখ শুচিতা রাজী হয় কি না।"

তারপর সুবাসিনী হঠাৎ প্রশ্ন করল—"তোমার ড্রাইভার বন্ধু নিখিল বেশ বিশ্বাসযোগ্য লোক তো?"

"খুব বিশ্বাসযোগ্য।"

"তাহলে দেখ যদি পারো।"

একটু পরেই আবার ফিরে এল অজয়। তার চোখ মুখ উত্তেজনায় আনন্দে উদ্ভাসিত। সুবাসিনীর সঙ্গেই প্রথমে দেখা হল তার।

"শুচিতা রাজি আছে তো?"

"হবে না আবার। আজকালকার মেয়ে।"

"আমি সিন্ধুকটা কিনেছি, প্রকাণ্ড সিন্দুক, একটা ছোটোখাটো ঘরের মতন। তার একধারে আমি ছোট একটা শ্লাইডিং জানালাও করতে দিয়ে এলাম। আর একটা কাজও করতে হবে। এ ঠিকানাটা বদলাতে হবে আপনাদের।"

"কেন?"

"আপনি যে গুরুদেবের চিঠি নিয়ে বাবার কাছে গিয়েছিলেন। গুরুদেব কি বাসার ঠিকানা জানেন?"

"জানেন বোধ হয়।"

"তাহলে এ বাসায় থাকা চলবে না। আমি একটা খালি বাড়ি পেয়েছি, সেইখানেই চলুন আপনারা। কারণ, বাবা যদি আসেন গুরুদেবের কাছে যাবেনই, তিনি আপনার কথা বলবেন, তাহলেই সব ফাঁস হয়ে যেতে পারে।"

"তা বটে !"

"শুচিতা কোথা ?"

"সে বেরিয়েছে শাড়ি কিনতে। সবুজ রঙের শাড়ি।"

"কেন ?"

"লক্ষ্মীর শাড়ী নাকি সবুজ রঙের। অবনী ঠাকুরের লেখায় আছে না কি ?"

"আমি তাহলে বাড়িটা ঠিক করি গিয়ে। কালই যেতে হবে সেখানে।"

সোৎসাহে বেরিয়ে গেল অজয়।

অপূর্ব অভিনয় করল শুচিতা। নিখিল তালা-বন্ধ বিরাট সিন্দুকটি নাবিয়ে বিজয় মল্লিকের হাতে চাবিটি দিয়ে চলে যাবার পরই সেই বিরাট সিন্দুককে ধরাধরি করে ঘরের ভিতরে আনা হল। বিজয় মল্লিক শঙ্কিত হৃদয়ে স্বহস্তে চাবিটা খুললেন, তারপর ডালা খুলেই চমকে উঠলেন।

"এ কি, সিন্দুকের ভিতর এ কে !"

শুচিতা চোখ বুজে নিঃশব্দে শুয়েছিল, যেন ঘুমুচ্ছে।

বিজয় মল্লিকের হাঁক ডাকে আরও অনেকে এসে জুটে গেল। তারপর শুচিতা উঠে বসল, দুহাতে চোখ কচলে, সবিস্ময়ে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ। তারপর বলল, "আমি কোথায় এসেছি ! এ কি।"

তারপর উঠে দাঁড়াল।

বিজয় মল্লিক স-সম্ভ্রমে সরে গেলেন। যারা ভীড় করে দাঁড়িয়েছিল তারাও পিছিয়ে গেল একটু। এই অপ্রত্যাশিত ব্যাপারের জন্য প্রস্তুত ছিল না কেউ।

"আমাকে বার করে দিন এই সিন্দুক থেকে ! এর ভিতর কি করে এলাম আমি ! আশ্চর্য ! কি করে বার হব আমি এর থেকে।"

বিজয় মল্লিক শশব্যস্ত হয়ে এগিয়ে এলেন নিজেই তাকে ধরে বার করবেন বলে, কিন্তু শুচিতা বলে উঠল—"না, না আমাকে ছোঁবেন না কেউ আপনারা। একটা টুল বা মোড়া দিন, আমি আপনিই বেরুতে পারব। কি আশ্চর্য, আমি কি করে এলাম এর মধ্যে !"

দুটো টুলের সহায়তায় শুচিতা বেরিয়ে পড়ল সিন্দুক থেকে। তারপর ঘরের কোণে যে চেয়ারটা ছিল হঠাৎ তার উপর বসে দুহাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগল।

"কাঁদছেন কেন ? কি হয়েছে খুলেই বলুন না।"

"কাল রাত্রে অদ্ভুত একটা স্বপ্ন দেখেছিলাম, স্বপ্ন দেখে ঘুমটা ভেঙে গিয়েছিল। পাশ ফিরে আবার ঘুমিয়ে পড়লাম। তারপর কি করে যে এই সিন্দুকের মধ্যে এলাম তা বুঝতে পারছি না। মনে হচ্ছে কোনও ভৌতিক কাণ্ড, আমি এখনই ফিরে যেতে চাই, মা হয়তো কান্নাকাটি করছেন।"

"কি স্বপ্ন দেখেছিলেন আপনি।"

বিস্মিত বিজয় মল্লিক প্রশ্ন করলেন।

"দেখলাম যেন একটি অপরূপ সুন্দরী আমাকে এসে বলছেন—মা এইবার তুমি নিজের ঘরে চল। আমি উঠে দাঁড়ালাম, তিনি আমার হাত ধরে নিয়ে চললেন, তারপর ঘুমটা ভেঙে গেল।"

অজয়ের মায়ের বিরাট অয়েল পেণ্টিংটা সামনের দেওয়ালে টাঙানো ছিল। সেটা দেখে তড়িৎস্পৃষ্টবৎ উঠে দাঁড়ালো শুচিতা।

"এঁকেই স্বপ্নে দেখেছিলাম। ইনি কে—ইনি কে?"

বিজয় মল্লিকের বিস্ময় সীমা অতিক্রম করছিল। শুধু নির্বাক নয় ঈষৎ ব্যায়ত আননও হয়ে পড়েছিলেন তিনি।

"কার ছবি এটা বলুন না?"

"আমার স্ত্রীর।"

"কোথায় তিনি?"

"তিনি অনেকদিন আগে মারা গেছেন।"

"মারা গেছেন! তাহলে এটা ভৌতিক কাণ্ড? আমি আর থাকব না, চললুম। আমার বড় ভয় করছে। এখান থেকে স্টেশন কত দূরে? কোলকাতার ট্রেন ক'টায়।"

"চলে যাবেন কেন! থাকুন না—আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।"

"না আমার বড্ড ভয় করছে! আমি চললাম—মাপ করবেন!"

নাটকীয় ভঙ্গিতে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল শুচিতা।

বিজয় মল্লিকও পিছু পিছু বেরিয়ে এলেন। এসে দেখলেন মেয়েটি স্টেশনের রাস্তা ধরে ছুটছে। স্টেশনের রাস্তা কোন দিকে তা অজয়ের কাছ থেকে জেনে এসেছিল শুচিতা। বিজয় মল্লিক কিংকর্তব্যাবিমূঢ় হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলেন ক্ষণকাল। তারপর সম্বিৎ ফিরে পেয়ে চীৎকার করে উঠলেন—"সুজিৎ সিং, মোটর নিকালো জলদি।"

অর্ধ পথেই ধরে ফেললেন তিনি শুচিতাকে।

"চলুন আপনাকে পৌঁছে দি।"

"স্টেশন কতদূরে এখান থেকে! আমি হেঁটেই চলে যাব! আপনি আর কেন কষ্ট করছেন!"

"আমি একেবারে আপনাকে আপনার বাড়িতে পৌঁছে দিচ্ছি। আসুন।" একটু ইতস্তত করে শেষে মোটরে উঠে বসল সে। যতক্ষণ মোটরে ছিল, চুপ করে বসেছিল একধারে জড়-সড় হয়ে, আর মাঝে মাঝে কাঁদছিল।

বিজয় মল্লিক বার বার প্রশ্ন করছিলেন, "তুমি কাঁদছ কেন, কি হয়েছে?"

"শুচিতা উত্তর দেয়নি, মাথা নিচু করে ঘাড় ফিরিয়ে বসে ছিল নীরবে। বিজয় মল্লিক বিস্মিত এবং বিব্রত তো হয়েই ছিলেন, শুচিতার সান্নিধ্যে খানিকক্ষণ থেকে মুগ্ধও হয়ে গেলেন। চমৎকার মেয়েটি। সত্যিই লক্ষ্মীর মতো চেহারা। ফিকে সবুজ শাড়িতে কি অদ্ভুত সুন্দরই না দেখাচ্ছে, কোলকাতার কাছাকাছি এসে শুচিতা হঠাৎ বললে—

"আমার একটা অনুরোধ রাখবেন?"

"রাখবো বই কি। সম্ভব হলেই রাখবো।"

"এই ঘটনার কথা কাউকে বলবেন না। আমার বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে, এ কথা শুনলে হয়তো ভেঙে যাবে।"

"ও।" কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন বিজয় মল্লিক। তারপর প্রশ্ন করলেন, তোমরা কি জাত?"

"আমরা কায়স্থ। ঘোষ আমাদের উপাধি।"

"তাই নাকি! তাহলে তো আমাদের পালটি ঘর।"

শুচিতা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে রইল।

কোলকাতার ভিতর যখন গাড়ী এসে পড়ল তখন বিজয় মল্লিক বললেন, "তোমাদের বাড়িটা কোথা?"

"বাদুড় বাগানে।"

অজয়ের পরামর্শে সুবাসিনী বাসা বদল করেছিল। সেই ঠিকানায় বিজয় মল্লিক শুচিতাকে নিয়ে পৌঁছে গেলেন। বাড়ির ঝিটা আনন্দে চীৎকার করে উঠল—"ওমা, এই যে দিদিমণি গো। মিছিমিছি থানায় খবর দেওয়া হল।"

শুচিতা নেমে সোজা বাড়ির ভিতর চলে গেল।

বিজয় মল্লিক ঝিকেই প্রশ্ন করতে লাগলেন।

"কি হয়েছিল বল তো?"

"তাই কি আমরা জানি। রাত্রে মেয়ে খেয়ে দেয়ে শুল, তারপর কোথায় যেন উপে গেল। ঘরের খিল বন্ধ রয়েছে, সদর দরজায় খিলও বন্ধ রয়েছে অথচ দিদিমণি নেই। সমস্ত দিন শহর তোলপাড় করে বেড়াচ্ছি আমরা। আপনি কোথা পেলেন ওঁকে?"

বিজয় মল্লিক শুচিতাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কথাটা ভাঙলেন না ঝিয়ের কাছে। আর একটা প্রশ্ন করলেন।

"বাড়িতে পুরুষ মানুষ কে আছে?

"কেউ নেই। বিধবা মা আছে শুধু।"

"তার সঙ্গে দেখা হতে পারে?"

"দেখি জিগ্যেস করে।"

ঝি ভিতরে গেল। একটু পরে এসে খবর দিল—"না, উনি দেখা করবেন না।"

বিজয় মল্লিক ভ্রূকুঞ্চিত করে দাঁড়িয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপর সোজা চলে গেলেন গুরুদেবের কাছে। তাঁর মনে হল তিনি ছাড়া এই জটিল রহস্যের সমাধান আর কেউ করতে পারবেন না। এখন তাঁরই উপদেশ অনুসারে চলাই নিরাপদ। সিন্দুকের ভিতর রহস্যময় ভাবে লক্ষ্মী প্রতিমার মতো যে মেয়েটিকে পাওয়া গেল তাকে ছেড়ে দেওয়া কি উচিত?

মাধবানন্দ অতিশয় ভক্তিমান পুরুষ। তাঁর বিশ্বাস-প্রবণতা অসাধারণ। বিজয় মল্লিকের মুখে সমস্ত ঘটনা শুনে তিনি রোমাঞ্চিত হলেন এবং বারবার হাত জোড় করে প্রণাম করতে লাগলেন, কাকে তা ঠিক বোঝা গেল না। তারপর চোখ বুজে বসে রইলেন। বিজয় মল্লিক অস্থির হয়ে উঠেছিলেন মনে মনে। তাঁর ভয় হতে লাগল গুরুদেব যদি সমাধিস্থ হয়ে পড়েন তাহলে দু'তিন ঘণ্টার আগে চোখ খুলবেন না। তাই তিনি মুখ ফুটে বলেই ফেললেন।

"গুরুদেব আমার কি কর্তব্য এখন বলে দিন সেটা আগে।"

গুরুদেব চোখ খুলে বললেন—"ও মেয়েকে তোমার বাড়িতে নিয়ে যেতে হবে।"

"সেটা কি করে সম্ভব। পরের মেয়ে। বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে শুনলাম, বিয়ে হয়ে গেলে পরের বৌ হবে, আমার বাড়িতে নিয়ে যাব কি করে?"

"যেমন করে হোক নিয়ে যেতে হবে। যদি না নিয়ে যেতে পার অমঙ্গল হবে তোমার। এর মধ্যে একটা ইঙ্গিত রয়েছে দেখতে পাচ্ছ না ?"

"পাচ্ছি। কিন্তু কি করে সম্ভব সেটা। আচ্ছা, এক কাজ করলে হয় না ? ওরা আমাদের পালটি ঘর। অজয়ের সঙ্গে ওর বিয়ের প্রস্তাব করব ? সমীচীন হবে কি সেটা ?"

"অন্যায় তো কিছু মনে হচ্ছে না। মহাশক্তি নানারূপে ভক্তের কাছে আসেন. কখনও মা হয়ে, কখনও মেয়ে হয়ে, কখনও প্রিয়া হয়ে। অজস্র উদাহরণ আছে এর পুরাণে। আমার মনে হয় সেই চেষ্টাই কর তুমি। ও মেয়েকে বাড়িতে না নিয়ে যেতে পারলে ঘোর অমঙ্গল আশঙ্কা করছি।" মাধবানন্দের চোখ দুটি আবার বুজে এল। বিজয় মল্লিক উঠে পড়লেন কিন্তু তখনই তাঁর মনে পড়ল বিশ্বপতির শালী তাঁর কাছে গিয়েছিল গুরুদেবের চিঠি নিয়ে। তিনি তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন, কেন করেছেন সে কথাটা গুরুদেবকে বলে যাওয়া উচিত। বললেন, "গুরুদেব, আপনার কাছ থেকে চিঠি নিয়ে বিশ্বপতির শালী আমার কাছে গিয়েছিল, কিন্তু বিশ্বপতিকে আমি অনেকদিন থেকে চিনি. অত্যন্ত খারাপ লোক সে, তার মেয়ের সঙ্গে আমি অজয়ের বিয়ে দেব না। আশা করি এতে আপনি রাগ করবেন না।"

"না, না, রাগ করব কেন। ওই মেয়েটিও কিছুদিন আগে আমার কাছে মন্ত্র নিয়েছে, এসে অনুরোধ করলে তাই চিঠি লিখে দিলাম। এখন তো মনে হচ্ছে সবই মহামায়ার খেলা। তুমি যদি রাজি হয়ে যেতে তাহলেই—বুঝতে পারছ ইঙ্গিতটা।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি তাহলে মেয়েটির মায়ের কাছে বিয়ের প্রস্তাবই করি গিয়ে। কি বলুন ?"

"তাই কর। তোমার ঠিক পালটি ঘরও যখন, তখন আর কথা কি।"

"অজয়ের কাছে যাই আগে, কি বলেন ?"

"হ্যাঁ তাই যাও ! ছেলে তোমার খুব ভাল, সে আপত্তি করবে না !"

বিজয় মল্লিক বেরিয়ে গেলেন অজয়ের উদ্দেশ্যে।

অজয়ও খুব ভাল অভিনয় করল। সে সন্দেহ করতে লাগল এর ভিতর কোনও 'ফাউল প্লে' আছে। সে বিজয় মল্লিককে নিয়ে গেল মোটর ড্রাইভার নিখিলের কাছে। নিখিল বলল, সে তো কিছুই বুঝতে পারেনি। মোটর ছেড়ে কোথাও যায়নি, কোথাও থামেনি পর্যন্ত। সেও খুব বিস্মিত হল শুনে।

"সিন্ধুকের ভিতর পিতলের লক্ষ্মী মূর্তিটা ছিল তো ?"

"না। ছিল ওই জীবন্ত মেয়েটা।"

"কি আশ্চর্য !"

বাবাকে নিয়ে অজয় যখন বাসায় ফিরে এল তখন বিজয় মল্লিক বললেন, "তুমি আশ্চর্য হচ্ছ, কিন্তু গুরুদেব আশ্চর্য হননি। তিনি বললেন পুরাণে এরকম অজস্র উদাহরণ আছে। আচ্ছা, তুমি যে মেয়েটির কথা লিখেছিলে তার কি হল ?"

"কি আবার হবে। আপনার চিঠিটা পাঠিয়ে দিলাম তাদের। তারপর তারা আর আসেনি।"

"আমার এখন মনে হচ্ছে, গুরুদেবও বলছেন, মেয়েটির সঙ্গে তোমার বিয়ের সম্বন্ধ করি।"

"এই মেয়েটির সঙ্গে !"

ভ্রুযুগল উর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত করে অজয় এমন ভাবে চেয়ে রইল যেন এই অপ্রত্যাশিত কথা শুনে সে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছে।

বিজয় মল্লিক বললেন, "ক্ষতি কি। মেয়েটি দেখতে চমৎকার, আমাদের পালটি ঘর, তাছাড়া গুরুদেব যা বলছেন, তা যদি মানতে হয়, উনি যদি সত্যিই আমাদের ঘরের লক্ষ্মীই হন তাহলে ওকে বরণ করে নিয়ে যাওয়াই উচিত। এ সুযোগ ত্যাগ করলে হয়তো আজীবন পস্তাতে হবে।"

অজয় কিছুক্ষণ চুপ করে রইল।

তারপর বলল—"যা ভাল বোঝেন করুন। আমার আর বলবার কি থাকতে পারে।"

"তাহলে আমি মেয়ের মায়ের কাছে কথাটি পাড়ি গিয়ে ?"

"পাড়ুন।"

সুবাসিনী সুযোগ পেলেন।

যে ছবিটিকে তিনি মনের মণিকোঠায় এতদিন টাঙিয়ে রেখেছিলেন সেই ছবিটি সত্যই এবার জীবন্ত হ'য়ে ওঠবার উপক্রম করল। সুবাসিনী বিজয় মল্লিকের সঙ্গে দেখা করতে সম্মত হলেন না। আড়াল থেকে কথাবার্তা হল। বিজয় মল্লিক যখন খোঁজ নিলেন যে তাঁর মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছিল তার কি হল তখন সুবাসিনী বললেন—"আমার মেয়ের বিয়ে হবে না। আমার মেয়ের জন্মের পর আমার স্বামী সন্ন্যাসী হয়ে চলে যান। তিনি যাবার আগে মেয়ের বিয়ের যে সব সর্ত দিয়ে গেছেন তা এ যুগে কেউ মানবে না। তিনি বলে গেছেন মেয়ের বিয়ে যদি না হয় তাহলে তাকে দীক্ষা দিয়ে কোনও ভাল মঠে পাঠিয়ে দিতে।"

"কি কি সর্ত দিয়ে গেছেন তিনি।"

"প্রথম আমার কাছে হাতজোড় করে মেয়েটিকে চাইতে হবে, দ্বিতীয় বিয়ের আগে আমাদের বংশ পরিচয় জানতে চাইতে পারবেন না, আমার যা খুশী তাই আমি দেব। আপনি বুঝতে পারছেন এ যুগের কোনও ছেলের বাপই এর একটা সর্ত মানতে চাইবেন না। তারপর এই যে অলৌকিক ঘটনাটা ঘটল এটা যদি জানাজানি হ'য়ে যায় তাহলে তো—"

বিজয় মল্লিক তাড়াতাড়ি বললেন—"না, তা জানাজানি হবে না। আচ্ছা, এখন উঠি পরে আপনার সঙ্গে দেখা করব আবার।"

"আবার দেখা করতে চাইছেন কেন ?"

"সে তখনই বলব।"

বিজয় মল্লিক বেশ একটু দ্বিধায় পড়ে গেলেন। ছেলের বিয়েতে মোটা পণ নেবার আকাঙ্ক্ষা তাঁর ছিল না। পণ না হয় না-ই পাওয়া গেল। কিন্তু আর দুটো সর্ত যে বড় ভয়ঙ্কর! হাতজোড় করে মেয়ে চাইতেই হবে ? ছি ছি! তাছাড়া মেয়ের বংশ-পরিচয় না জেনে বিয়ে দেওয়াটা কি ঠিক ? একমাত্র ছেলে তাঁর। অনেক ভেবে চিন্তে ঠিক করলেন এ বিয়ে দেবেন না। যেমন ছিল তেমনি একটা লক্ষ্মী প্রতিমাই কিনে

নিয়ে গিয়ে প্রতিষ্ঠা করবেন সিন্ধুকের ভিতর। এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু একটা অঘটন ঘটে গেল। তাঁর একটা ব্যাংকে কয়েক হাজার টাকা ছিল, সেই ব্যাংকটা ফেল করল হঠাৎ। অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়লেন বিজয় মল্লিক। ছুটে চলে গেলেন আবার গুরুদেবের কাছে।

গুরুদেব সব শুনে বললেন—"ওই মেয়েকেই বরণ ক'রে নিয়ে যাও তুমি। আর দ্বিমত কোরো না।"

"কিন্তু মেয়ের মায়ের সর্ত তো শুনলেন।"

"সেই জন্যই আমার দৃঢ় বিশ্বাস হচ্ছে ও মেয়ে সাধারণ মেয়ে নয়। ওর পিতা সে কথা জানতেন, তাই হাত জোড় ক'রে চাইবার আদেশ দিয়ে গেছেন। আর ওকে যদি লক্ষ্মী বলেই মনে কর তাহলে হাত জোড় করতে আপত্তিই বা কি। আর বংশ-পরিচয়? কার বংশের কতটুকু পরিচয় তুমি পেতে পার! ও মানুষ এইটিই কি ওর শ্রেষ্ঠ পরিচয় না? 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই' চণ্ডীদাসের এই উক্তি কি শোননি?"

"শুনেছি। কিন্তু—।"

"আর কিন্তু কোরো না!—আমার মনে হচ্ছে তোমার সিন্দুক চুরিটাও মা লক্ষ্মীর লীলা, এর ভিতরও নিগূঢ় ইঙ্গিত আছে একটা। তা না হলে অতবড় সিন্দুক চুরি করা কি সহজ ব্যাপার! তুমি আর ইতস্তত কোরো না।"

বিজয় মল্লিক বাসায় ফিরে আর একটি দুঃসংবাদ পেলেন। জমিদারীতে একটা দাঙ্গা হয়ে গেছে, নায়েব মশাইকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। খুবই ঘাবড়ে গেলেন তিনি। তাঁর মনে হ'তে লাগল অপমানিত লক্ষ্মীর অভিশাপেই এই সব হচ্ছে বুঝি। আর বেশী দেরী করলে হয়তো সর্বনাশ হ'য়ে যাবে। তিনি স্থির করলেন সর্তগুলির কথা অজয়কে জানাবেন না। আজকালকার ছেলে, হয়তো বলে বসবে ও সর্তে আমি বিয়ে করব না।

গোপনেই তিনি গেলেন পরদিন সুবাসিনীর বাসায়। ঝিকে দিয়ে খবর পাঠালেন। পাশের ঘরের পর্দার অন্তরালে সুবাসিনী এসে দাঁড়াল আবার।

"কি জন্যে ডেকেছেন আমাকে?"

"আমার একমাত্র ছেলে অজয়ের সঙ্গে আপনার মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এসেছি। পণের কোনও দাবী আমার নেই। অন্য সর্ত দুটিও আমি পালন করব। তবে ঝিটাকে বাইরে যেতে বলুন।"

সুবাসিনীর আদেশে ঝি বাইরে চলে গেল।

বিজয় মল্লিক তখন করজোড়ে বললেন—"আপনার মেয়েটিকে আমি পুত্রবধূ করতে চাই, দয়া করে অনুমতি দিন। আপনার বংশ-পরিচয় এখন জানতে চাই না। কিন্তু বিয়ে হয়ে যাবার পরও কি সেটা জানাবেন না?"

সুবাসিনী বললেন, "জানাব। কিন্তু কেবল আপনাকে।"

"বেশ!"

মহাসমারোহে বিবাহ হ'য়ে গেল।

কিন্তু নাটকটা জমল বিয়ের গোলমাল চুকে যাবার পর। এক নির্জন দুপুরে

বিজয় মল্লিক এসে বংশ-পরিচয়টা জানতে চাইলেন সুবাসিনীর কাছে। সুবাসিনী এতদিন আত্মপ্রকাশ করেনি, আড়ালে আড়ালেই ছিল। সেদিন হঠাৎ সে সামনে এসে দাঁড়াল। তারপর বলল, "বংশ-পরিচয় জানতে চাইছেন ? এই দেখুন।"

বুকের কাপড়টা সরিয়ে দেখাল—বিজয়ে মল্লিকের নামটা জ্বলজ্বল করছে সেখানে।

সুবাসিনী হেসে বলল—"পণও আমি দেব। আপনি আমাকে যে দশ হাজার টাকা দিয়েছেন তার থেকে একটি পয়সাও আমি খরচ করিনি। চেক বুক আর পাশ বুক যেমনকার তেমনি আছে। এই নিন।"

বিজয় মল্লিক প্রস্তরমূর্তিবৎ দাঁড়িয়ে রইলেন।

দাবি

ডাক্তার অরূপকুমার ক্রমাগত চিৎকার করিতেছেন, "আর কার কার দাবি আছে জানতে চাই।"

ব্যাপারটা তাহা হইলে গোড়া হইতে শুনুন।

ডাক্তার অরূপকুমার নিজে অবশ্য উদরের দাবিতে ব্যাপারটিতে লিপ্ত হইয়াছিলেন। প্রাজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই জানেন, কোন ব্যাপারেই নির্বিঘ্নে লিপ্ত হওয়া যায় না। সুখাদ্যও কেহ যদি মুখে পুরিয়া দেয়, তবু তাহা চর্বণ করিয়া গলাধঃকরণ করিতে হয়। দাঁতের ফাঁকে খাবারের টুকরা আটকাইয়া এই সরল ব্যাপারটাও সমস্যার সৃষ্টি করিতে পারে, তুচ্ছ একটা খড়্কের জন্য তখন অস্থির হইয়া পড়িতে হয়।

ডাক্তার অরূপকুমারকেও বিবিধ সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইল। তিনি যদি সোজাসুজি ডিস্পেনসারি খুলিয়া আর পাঁচজন ডাক্তারের মতো প্র্যাকটিস করিতে বসিতেন, তাহা হইলে তাঁহার সমস্যা হয়তো এতটা জটিল হইত না। কিন্তু তিনি মফঃস্বল শহরে প্যাথোলজিস্ট হইয়া ডাব্লিউ. আর (W. R) নামক দুরূহ রক্ত পরীক্ষা করিয়া অর্থোপার্জন করিবেন মনস্থ করিলেন, সুতরাং প্রথমেই তাঁহাকে গিনিপিগের সন্ধানে ট্যারা পাখি-ওলাটার শরণাপন্ন হইতে হইল। কলিকাতা শহর নয়, মফঃস্বলে গিনিপিগ জোগাড় করা শক্ত। ট্যারা পাখি-ওলাটাই জোগাড় করিয়া দিতে পারে। অরূপ জানিতেন, লোকটা চড়াই পাখিকে 'আগ্‌গিন' এবং বাঁশপাখিকে 'হরবোলা' বলিয়া চালায়, অজ্ঞ ব্যক্তির নিকট সাধারণ পায়রাই 'গেরবাজ' নাম দিয়া বিক্রয় করে। চুরির অপরাধে একবার জেলও খাটিয়াছিল। কিন্তু এই লোকটার খোশামোদ না করিলে মফঃস্বলে গিনিপিগ জোগাড় করা শক্ত। কেবলমাত্র পয়সায় কাজ হইবে না। কলিকাতা হইতে অবশ্য আনানো যায়, কিন্তু তাহা বড়ই ব্যয়সাধ্য। সুতরাং তাঁহাকে ট্যারা পাখি-ওলাটার শরণ লইতে হইল। প্রথমে সে তেমন গা করিল না। অনেক অনুরোধ করার পর বলিল, চেষ্টা করিয়া দেখিবে। চার পাঁচ দিন পরে দেখা গেল,

তাহার চেষ্টা নিষ্ফল হয় নাই, কয়েকটি শীর্ণ লোম-ওঠা গিনিপিগ আনিয়া সে হাজির করিয়াছে। বলিল, অনেক কষ্টে গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া সংগ্রহ করিতে হইয়াছে। সুতরাং প্রতিটি গিনিপিগের জন্য পাঁচ টাকা করিয়া দিতে হইবে। বলিল, ডাক্তারবাবুকে খাতির করে বলিয়া সে কম দামই চাহিতেছে। যদিও আত্মসম্মানে আঘাত লাগিতে লাগিল, তবু ডাক্তার অরূপকুমার দরদস্তুর করিতে ছাড়িলেন না। অবশেষে তিন টাকাতে রফা হইল। গিনিপিগ জুটিল, এবার খরগোস এবং ভেড়া চাই।

পাখি-ওলা বলিল, "আমিই আপনাকে খরগোস দিতে পারতাম। কিন্তু এ অঞ্চলের যত খরগোস সব দীনু মিঞা কিনে চালান দিচ্ছে। আপনি তাকে ধরুন। আমার কাছে মাঝে মাঝে সাঁওতালরা জংলী খরগোস বিক্রী করে যায়। তা-ও আমি দীনু মিঞার কাছেই পাঠিয়ে দিই। তার কাছেই আপনি খরগোস পাবেন।"

দাড়িতে মেহেদি লাগানো দীনু মিঞাকে অরূপবাবু মৎস্য-ব্যবসায়ী বলিয়াই জানিতেন। সে যে খরগোসের ব্যবসায় ধরিয়াছে, তাহা তাঁহার অবিদিত ছিল। দীনু মিঞার সহিত দেখা করিয়া তিনি দেখিলেন শুধু খরগোস নয়, নেউল, ইঁদুর, কাছিম, জোঁক প্রভৃতি জানোয়ার দীনু মিঞা নানাস্থানে চালান দেয়। এসব নাকি তাহার শাখা-ব্যবসায়। অরূপবাবুকে বলিল, "সাদা খরগোস তো সব চালান হয়ে গেছে। তবে ব্রৌন কাবুলী খরগোস একজোড়া আছে। দাম একটু বেশী লাগবে। পঁচিশ টাকা জোড়ায় বেচি, আপনি কুড়ি টাকা দেবেন।"

অরূপকুমার কাবুলী বিড়ালের কথা আগে শুনিয়াছিলেন, কাবুলী খরগোসের কথা প্রথম শুনিলেন। দীনু মিঞা খরগোস যখন বাহির করিল, তখন কিন্তু দেখা গেল 'কাবুলী' বিশেষণ সত্ত্বেও খরগোস দুইটি সাধারণ খরগোসের মতোই। রঙটা কেবল বাদামী। পুনরায় দরদস্তুর। কিছু দাম কমিল। অরূপবাবু বলিলেন, "আমার একটা ভেড়াও চাই মিঞা সাহেব।"

"ভেড়া তো আমি রাখি না। আপনি কিষণগঞ্জের হাটে লোক পাঠান। সেখানে সস্তায় ভেড়া পাবেন।"

ষোল টাকা দামে একটি ছোট ভেড়াও পাওয়া গেল।

এই ব্যাপারের জন্য ডাক্তারবাবুকে কয়েকটি মূল্যবান যন্ত্রপাতিও ইতিপূর্বে কিনিতে হইয়াছিল। দরদস্তুর করিবার সুযোগ পান নাই; কারণ যন্ত্রগুলি সবই বিদেশী, কিংবা বিদেশী জিনিসের স্বদেশী সমন্বয়, দাম একেবারে বাঁধাধরা। ইলেক্‌ট্রিক ওয়াটারবাথ, ইনকিউবেটার, সেনট্রিফিউজ, রেফ্রিজারেটার, কেমিক্যাল ব্যালান্স এবং খুঁটিনাটি আরও নানারকম কাচের জিনিসপত্র কিনিতে প্রায় হাজার পাঁচেক টাকা লাগিয়া গিয়াছিল। টাকাটা তাঁহার শ্বশুর দিয়াছিলেন।

অতঃপর, তিনি কাজ শুরু করিলেন। হিতৈষী ডাক্তারদের সুপারিশে পরীক্ষা করিবার জন্য রক্তও জুটিতে লাগিল। ডাক্তার অরূপের ক্লিনিকে সিফিলিস রোগাক্রান্ত নরনারীরা ভিড় করিতে লাগিলেন। তিনি গিনিপিগ, খরগোস এবং ভেড়ার রক্তের সহিত রোগী-রোগিণীর রক্ত মিশাইয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলেন কাহার রক্তে ভাসারম্যান রিয়াক্‌শন (Wassermann Reaction) কিরূপ। এই টেস্‌ট পজিটিভ হইলে বোঝা যায় রোগীর রক্তে উপদংশের বিষ আছে কি না।

কিছুদিন তাঁহার ব্যবসায় ভালই চলিল। গুরুতর সমস্যাটি দেখা দিল পরে। দাবির প্রশ্নটা সম্ভবত খবরের কাগজের মাধ্যমেই তাঁহার মনে সঞ্চারিত হইয়াছিল। আমাদের দেশের কাগজে কাগজে সীমানা-বিভাগ লইয়া তুমুল আন্দোলন শুরু হইয়াছিল, ঠিক ইহার কিছুদিন পূর্বে। প্রত্যেক প্রদেশবাসী তার-স্বরে ঘোষণা করিতেছিল, ভারতবর্ষের মাটির উপর কাহার কতখানি দাবি। বিনোবাজীর ভূদান যজ্ঞেও এই একই দাবির প্রশ্ন—জমিতে আসল দাবি কাহার, জমিদারের, না চাষীর? প্রতিদিন দাবি-বিষয়ক প্রবন্ধ পড়িতে পড়িতেই সম্ভবত ডাক্তার অরূপের মাথা গরম হইয়া উঠিয়াছিল, কারণ তিনি অতিশয় ভাবপ্রবণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি প্রবন্ধ লিখিলেন না, তর্ক করিলেন না, বক্তৃতাও করিলেন না। স্বপ্ন দেখিলেন। অদ্ভুত একটা স্বপ্ন।

দেখিলেন—একটি রঙ্গমঞ্চের সম্মুখে তিনি এবং একটি বলিষ্ঠকায় ব্যক্তি যেন মুখোমুখি দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। বলিষ্ঠকায় ব্যক্তিটি তাঁহার দিকে কিছুক্ষণ কটমট করিয়া চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর বলিলেন, "তুমি যে রক্ত পরীক্ষা করে রোগী-পিছু ষোল টাকা করে 'ফী' নাও, সে টাকায় কি তোমার একার দাবি? কতগুলি দাবিদার আছে দেখ।···"

যবনিকা সরিয়া গেল। অরূপ ডাক্তার সবিস্ময়ে দেখিলেন ট্যারা পাখি-ওলা এবং দাড়িতে মেহেদি-লাগানো দীনু মিঞা দাঁড়াইয়া আছে। তাহারা হাসিয়া বলিল, "আমরা আপনার জন্যে যা করেছি ক'টা টাকা দিয়ে কি তার মূল্য শোধ করা যায়। আপনি শিক্ষিত লোক, আমাদের আসল দাবির কথাটা আশা করি মনে রাখবেন। আমাদের দাবি সর্বাগ্রে।"

কথা কয়টি বলিয়া তাহারা চলিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে শিং উঁচাইয়া প্রবেশ করিল ভেড়াটা। চোখোচোখি হইবামাত্র শুদ্ধ ভাষায় বলিল, "সপ্তাহে দুইবার করিয়া আমার রক্ত লইয়াছ। আমার দাবির কথা বিস্মৃত হইও না।" ভেড়া অন্তর্হিত হইল। তাহার পর আসিল গিনিপিগ্-খরগোশ-পার্টির সম্মিলিত শোভাযাত্রা। ডাক্তার অরূপ আশ্চর্য হইয়া গেলেন। প্রত্যেকেই পিছনের পায়ে দাঁড়াইয়া মানুষের মতো চলিতেছে। প্রত্যেকের হাতে রক্তবর্ণ পতাকা, তাহাতে বড় বড় করিয়া লেখা রহিয়াছে—"আমরা বুকের রক্ত দিয়েছি···" শোভাযাত্রা চলিয়া গেল। তাহার পর আসিলেন তিনজন বিদেশী। ভাষা শুনিয়া বোঝা গেল ঃ একজন জার্মান, একজন সুইস্ এবং আর একজন ইংরেজ। তাঁহারা প্রত্যেকে নিজ নিজ ভাষায় বলিলেন, "আমরা যন্ত্র আবিষ্কার করিয়া তোমাকে যদি সরবরাহ না করিতাম তাহা হইলে কি তুমি রক্ত পরীক্ষা করিতে পারিতে? পাখি-ওলা এবং দীনু মিঞা ঠিক কথাই বলিয়াছে, কেবলমাত্র অর্থমূল্য দিলেই দাবি শেষ হয় না। ইহার একটা নৈতিক মূল্যও আছে। একটু ভাবিয়া দেখিও। গুড্ বাই···।"

ডাক্তার অরূপ একটু বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। বিদেশী তিনজন চলিয়া যাইবার পর যিনি আসিলেন তাহাকে দেখিয়া ডাক্তারবাবু অপ্রস্তুতও হইলেন। তিনি অন্য কেহ নন, তাঁহার পূজনীয় শ্বশুরমশায়, যিনি যন্ত্রাদি কিনিবার জন্য টাকা দিয়াছিলেন। তিনি অবশ্য কিছু বলিলেন না, তাঁহার দিকে চাহিয়া একটু হাসিয়া চলিয়া গেলেন। তাহার পর একে একে আসিতে লাগিলেন তাঁহার শিক্ষকবৃন্দ। পাঠশালার

পণ্ডিতমহাশয় হইতে শুরু করিয়া মেডিকেল কলেজের প্রফেসাররা পর্যন্ত। ইহারাও কেহ কোন কথা বলিলেন না। তাঁহার দিকে গম্ভীরভাবে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর একে একে চলিয়া গেলেন। অরূপবাবুর বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, তাঁহাদের দাবিও তুচ্ছ করিবার মতো নয়। বেশ ঘাবড়াইয়া গেলেন। পর মুহূর্তেই কিন্তু আরও ঘাবড়াইতে হইল। শিক্ষকরা চলিয়া গেলে আসিলেন সেইসব ডাক্তারেরা যাঁহারা তাঁহাকে বরাবর রোগী সরবরাহ করিয়াছেন। তাঁহারাও মুখে কেহ কিছু বলিলেন না, দুই-একজন ডাক্তার কেবল ভুরু নাচাইলেন মাত্র, কিন্তু তাঁহাদের বক্তব্য বুঝিতে অরূপবাবুর কোনও কষ্ট হইল না। তিনি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহারাও তাঁহার উপার্জনের কিছু অংশ দাবি করেন। ডাক্তাররা চলিয়া যাইবার পর যাহা ঘটিল, তাহা অপ্রত্যাশিত এবং রোমাঞ্চকর। অরূপবাবুর মৃত পিতামাতা আসিয়া রঙ্গমঞ্চে দেখা দিলেন। পিতা বলিলেন, "আমরাই তোমাকে জন্মদান করিয়াছি, লালন-পালন করিয়াছি, লেখাপড়া শিখাইয়াছি। তোমার উপার্জনে আমরাও কিছু দাবি রাখি।" তাঁহারা অন্তর্হিত হইবার পর যাহা পর পর ঘটিল, তাহা আরও চমকপ্রদ। আরও দুই জোড়া বৃদ্ধ-বৃদ্ধা দেখা দিলেন। এক জোড়া বলিলেন, "আমরা তোমার মাতামহ-মাতামহী।" তাহার পর চারজনেই সমস্বরে বলিলেন, "আমাদের ভুলো না।" বলিয়া অদৃশ্য হইয়া গেলেন। তাহার পর বহু বৃদ্ধ-বৃদ্ধার সমাগম হইল, সমস্ত রঙ্গমঞ্চটা যেন ভরিয়া গেল। প্র-বৃদ্ধ অতি-বৃদ্ধ পিতামহ-পিতামহী মাতামহ-মাতামহীরা আসিয়া নিজ নিজ দাবির কথা বলিতে লাগিলেন। ডাক্তারবাবুর মনে হইল ঊর্ধ্বতন চতুর্দশ পুরুষের সকলেই বোধহয় আসিয়াছেন। তাঁহারা কিছুক্ষণ কলরব করিলেন, তাহার পর সহসা একযোগে অন্তর্হিত হইলেন। তাহার পর দেখা দিল ভবিষ্যৎ বংশধরেরা। অম্লান কুসুমের মতো একদল শিশু। আধো আধো ভাষায় তাহারা বলিল, "আমরা এখনও জন্মাইনি, কিন্তু আমাদের কথাও মনে রেখ। আমাদের জন্যেও কিছু রেখ।" শিশুরা দেখিতে দেখিতে মিলাইয়া গেল, রঙ্গমঞ্চ কয়েক মুহূর্তের জন্য নির্জন হইল। তাহার পর কলকণ্ঠের একটা হাসি ভাসিয়া আসিল। পরক্ষণেই স্খলিতবসনা স্খলিতচরণা এক তরুণীর পিছু পিছু দুই হাত বাড়াইয়া ছুটিয়া আসিল এক তরুণ। তাহারা দুইজনেই ডাক্তারবাবুর দিকে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "আমরা দুজনে যদি বিপথে না যেতাম তাহলে কার রক্ত নিয়ে ডব্লিউ আর করতেন আপনি? সুতরাং আমাদেরও কিছু দাবি আছে, মনে রাখবেন!"—হাসিতে হাসিতে তাহারা চলিয়া গেল।

অরূপকুমার প্রত্যহ এই স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। রাত্রে তো বটেই, দিনেও। চোখ বুজিলেই রঙ্গমঞ্চটা চোখের সামনে ফুটিয়া ওঠে।

শেষে তিনি ক্ষেপিয়া গেলেন।

পাগলা গারদে বসিয়া দিনরাত চিৎকার করেন, "আর কার কার দাবি আছে জানতে চাই।"

পাগলা-গারদের ডাক্তার দাবি করিয়াছেন, "ডাক্তার অরূপকুমারের রক্ত ডব্লিউ. আর পরীক্ষার জন্য পাঠানো হউক।"

অরূপকুমার রক্ত দিতে চান নাই। অনেক ধস্তাধস্তি করিয়া রক্ত লওয়া হইয়াছে। ফলাফল এখনও জানা যায় নাই।

শূন্যের দান

ভাদুড়ী মহাশয় গঙ্গার ধারে তাঁহার নির্দিষ্ট স্থানটিতে গিয়া সেদিনও উপবেশন করিলেন। রোজই উপবেশন করেন। বৈকালে রোদটা যখন পড়িয়া আসে, তখন তিনি আর ঘরে থাকিতে পারেন না। একটা অদ্ভুত আকর্ষণ তাঁহাকে গঙ্গার ওই স্থানটির দিকে টানিতে থাকে।

স্থানটির যে বিশেষ কোন একটা বৈশিষ্ট্য আছে তাহাও নয়। হেলিয়া পড়া একটা বটগাছের আড়ালে সামান্য একটু স্থান। আশেপাশে ঝোপ-ঝাড়, ময়লা আবর্জনাও আছে। ভাদুড়ী মহাশয় যে স্থানে প্রত্যহ বসেন, কেবল সেই স্থানটি ছোট আসনের মতো একটু জায়গা—বেশ পরিচ্ছন্ন। মনে হয় কেহ যেন পরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছে। আসলে কিন্তু তাহা নয়, ভাদুড়ী মহাশয় রোজ ওই স্থানটিতে বসেন বলিয়া স্থানটি তৃণশূন্য। ভাদুড়ী মহাশয় প্রত্যহ আসিয়া যখন বসিতে যান তখন ওই তৃণশূন্য স্থানটুকু তাঁহার মনে অদ্ভুত একটা ভাবের সঞ্চার করে। একটু তিক্ত হাসি হাসিয়া ভাবেন, "আমার ছোঁয়াচ লেগে কচি ঘাসগুলো পর্যন্ত পুড়ে গেল!" ভাবেন, কিন্তু ঠিক সেই স্থানটিতেই আবার উপবেশন করেন। উপবেশন করিবার পূর্বে পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া স্থানটি একবার ঝাড়িয়া লন। বহুদিন হইতেই এই একই ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি চলিতেছে।

ভাদুড়ী মহাশয়ের বয়স সত্তরের কাছাকাছি। গভর্ণমেণ্ট চাকুরি করিতেন। ভাল চাকুরিই করিতেন, পঞ্চান্ন বছর বয়সে রিটায়ার করিয়াছেন। যখন চাকুরি করিতেন, তখন তাঁহার মোটর ছিল, আরদালি-চাপরাশি ছিল, মান-সম্ভ্রম ছিল, অনেক লোক ঝুঁকিয়া সেলাম করিত, ভাল ভাল বাড়িতে বাস করিতেন, তিন পুত্র এবং রূপসী পত্নী লইয়া তিনি বহুলোকের ঈর্ষাভাজন হইয়াছিলেন। কিন্তু এখন আর কিছু নাই, সব গিয়াছে। বড় ছেলেটি কুসঙ্গে পড়িয়া বহুদিন পূর্বে নিরুদ্দেশ হইয়া গিয়াছে, অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহার কোন খবর তিনি আর সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। মেজ ছেলের পত্নীর সহিত তাঁহার পত্নীর বনিবনাও হয় নাই, সে বহুকাল পূর্বে পৃথক হইয়া গিয়াছে। এখন মীরাটে চাকরি করে। চিঠি-পত্রও লেখে না। মেজ ছেলের সহিত বিচ্ছেদ ঘটিবার ঠিক পরেই তিনি রিটায়ার করেন।

ঠিক এই সময়ে তাঁহার ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরানন্দ স্বামীর সহিত দেখা হয়। তাঁহার এক বন্ধু স্বামিজীর নিকট মন্ত্র লইয়াছিলেন। বন্ধুর সহিত কয়েকদিন স্বামিজীর নিকট যাতায়াত করিয়া সংসারের অনিত্যতা সম্বন্ধে যে সব কথা তিনি শুনিলেন, তাহা নিজের অভিজ্ঞতার সহিতও মিলিয়া গেল। ইহাও তাঁহার মনে হইল এতকাল তো সংসারের মোহে আবদ্ধ হইয়া কলুর বলদের মতো ঘানি টানিয়াছেন, এখন রিটায়ার করার পরও সংসার-পঙ্কে ডুবিয়া থাকার কোন অর্থ হয় না। এইবার পরলোকের চিন্তায় মন দেওয়া উচিত। তাঁহার বন্ধু বিনোদ লস্কর যখন দুই ভ্রূর মধ্যবর্তী

স্থানে আলো দেখিতে পাইয়াছেন, মারোয়াড়ী পূরণমল যখন মন্ত্রের সাহায্যে নিজের আসন হইতে প্রায় এক বিঘৎ উঠিয়া শূন্যে অবস্থান করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তখন তিনিই বা ব্যর্থকাম হইবেন কেন ? ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধি করিবার উহাই যদি পথ হয়, তাহা হইলে সে পথে চলিবার যোগ্যতা তাঁহারও নিশ্চয় আছে কিংবা হইবে। বিনোদ লস্কর স্কুলে, কলেজে, চাকুরির ক্ষেত্রে সব সময়ই তাঁহার তুলনায় হীনপ্রভ ছিলেন। স্বামিজীও তাঁহাকে উৎসাহিত করিলেন। সুতরাং রিটায়ার করার পর তিনি দীক্ষা লইয়া গুরু-প্রদর্শিত পন্থায় ভগবানের স্বরূপ উদ্ঘাটনে ব্যাপৃত রহিলেন।

কিছুদিন ইহা লইয়া, আর কিছু না হোক, সময়টা বেশ কাটিতে লাগিল। নির্জন একটা ঘরে পদ্মাসনে বা সুখাসনে বসিয়া প্রাণায়াম করিতে ভালই লাগিল। সেই সময়টা অন্তত গৃহিণীর বাক্যবাণ হইতে রেহাই পাওয়া যাইত। এই পথে লাগিয়া থাকিলে হয়ত তিনিও ভ্রূ-যুগলের মধ্যে আলোক-বিন্দু দেখিতে পাইতেন, শূন্যেও হয়ত উঠিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি লাগিয়া থাকিতে পারিলেন না। প্রথমত তাঁহার কৃতী তৃতীয় পুত্রটি হঠাৎ যখন যক্ষ্মারোগে মারা গেল, তখন তিনি সহসা ধর্মেই বিশ্বাস হারাইয়া ফেলিলেন। কোনও করুণাময় সর্বশক্তিমান সত্তার অস্তিত্বে বিশ্বাস করিবার শক্তিই যেন তাঁহার আর রহিল না। দ্বিতীয়ত, কিছুদিন হইতে প্রাণায়াম করিবার সময় বুকের এক পাশে তিনি একটা বেদনা অনুভব করিতেছিলেন, একথা শুনিয়া একজন ডাক্তার তাঁহাকে প্রাণায়াম করিতে নিষেধ করিলেন। সুতরাং গুরু-প্রদর্শিত পথে তিনি চলিতে পারিলেন না। গুরুর সংস্রবও তাঁহাকে ত্যাগ করিতে হইল। কারণ রিটায়ার করিয়া কলিকাতার যে বাসাটি ভাড়া করিয়া তিনি ছিলেন, পুত্রের মৃত্যুর পর সে বাসায় থাকা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। তিনি দেশে চলিয়া গেলেন।

গঙ্গার তীরে এক অখ্যাত পল্লীতে বহুকাল পূর্বে তাঁহার পূর্বপুরুষেরা বাস করিতেন। ভাদুড়ী মহাশয়ের পিতাও রিটায়ার করিবার পর দেশে গিয়াই বাস করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর দেশের বাড়ি খালি পড়িয়া ছিল। ভাদুড়ী মহাশয়ের কল্পনা ছিল সুবিধা মত খরিদ্দার পাইলে বাড়িটা বিক্রয় করিয়া দিবেন। স্থির করিয়াছিলেন কলিকাতাতেই বাকি জীবনটা অতিবাহিত করিবেন। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ ছিল। যে পুত্রের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকে কেন্দ্র করিয়া তিনি কলিকাতার গৃহস্থালী পাতিয়াছিলেন, সেই পুত্রই যখন বাঁচিল না তখন কলিকাতার সম্বন্ধে আর কোনও মোহ তাঁহার রহিল না। এমনিতেই কলিকাতায় বাস তাঁহার পক্ষে সুখকর ছিল না। যখন চাকুরি করিতেন, ফাঁকা জায়গায় সুনির্মিত বড় বড় বাড়িতে তাঁহার থাকিবার স্থান নির্দিষ্ট হইত। সে সব বাড়ির তুলনায় কলিকাতার এঁদো গলির মধ্যে অবস্থিত সংকীর্ণ বাসাটি নরকবৎ। তাছাড়া প্রত্যহ থলি হাতে ভিড় ঠেলিয়া বাজার করা অত্যন্ত অপ্রীতিকর ব্যাপার ছিল তাঁহার পক্ষে। এ সব কাজ পূর্বে তাঁহার আরদালিরা করিত। কিন্তু এখন অত বেতন দিয়া চাকর রাখিবার সামর্থ্য নাই। নিজেকেই বাজার করিতে হয়। আয় কমিয়া গিয়াছিল, তৃতীয় পুত্রের পড়া তখনও শেষ হয় নাই। তাছাড়া চিররুগ্না গৃহিণীর চিকিৎসার জন্য অনেক খরচ হইত। চাকর রাখিবার মতো উদ্বৃত্ত অর্থ হাতে থাকিত না। পুত্রের জন্যই কষ্ট করিয়া

কলিকাতায় ছিলেন, পুত্রই যখন চলিয়া গেল, তখন তিনি কলিকাতার বাসা তুলিয়া দিয়া পূর্বপুরুষদের ভিটায় ফিরিয়া আসিলেন।

প্রথম প্রথম কিছুদিন বেশ সুখেই ছিলেন। বাড়িটি পাকা, বেশ প্রশস্ত উঠান। পাশেই একটি পুষ্করিণী। উঠানে তরিতরকারি লাগাইয়া, পুকুরে মাছ ধরিয়া, পাড়া-পড়শীদের সুখদুঃখের সঙ্গে নিজেকে জড়িত করিয়া একটা নূতন জীবনের স্বাদ কিছু দিনের জন্য তিনি পাইয়াছিলেন। কিন্তু মাত্র কিছু দিনের জন্য। গৃহিণীর স্বাস্থ্য পূর্বেই ভাঙিয়া পড়িয়াছিল, বাতের প্রকোপে তিনি সাধারণত শয্যাগতই থাকিতেন, পল্লীগ্রামে আসিয়া ইহার উপর তাঁহাকে ম্যালেরিয়ায় ধরিল। ডাক্তার থাকেন দুই ক্রোশ দূরে। পদব্রজে গিয়া তাঁহাকে খবর দিতে হয়। খবর দিবার পরও তিনি সঙ্গে সঙ্গে আসেন না, আসিতে পারেন না। অনেক সময় একদিন, কখনও কখনও দুইদিন পরে আসেন। পোস্টাফিস হইতে ম্যালেরিয়ার জন্য কুইনিন কিনিয়া কিছুদিন চালাইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু পোস্টাফিসও কাছে নয়, প্রায় মাইল দুই দূরে। কুইনিন ফুরাইয়া গেলে পোস্টাফিস হইতেও আনা সব সময় হইয়া উঠিত না। কারণ তিনি নিজেও মাঝে মাঝে অসুস্থ হইয়া পড়িতেন। কম্প দিয়া জ্বর আসিত, পেটে গোলমাল তো ছিলই, তাছাড়া বয়স ক্রমশ বাড়িতেছিল, দুর্বল হইয়া পড়িতেছিলেন। সুতরাং এমন দিনও মাঝে মাঝে উপস্থিত হইতে লাগিল যখন স্বামী-স্ত্রী উভয়েই অসুখে পড়িয়া আছেন, ঔষধপথ্যের ব্যবস্থা করিবার লোক নাই। পল্লীগ্রামে চাকর বা রাঁধুনী পাওয়া সহজ নয়, অনেক খোশামোদ করিয়া একটি স্থবিরা ব্রাহ্মণীকে তিনি পাচিকা-রূপে নিযুক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সে-ও মাঝে মাঝে অসুস্থ হইয়া পড়িত। একটি বাগ্দী বউ আসিয়া কাপড়-কাচা, বাসন-মাজা প্রভৃতি করিত। কিন্তু তাহাকে লইয়াও শান্তি ছিল না। সে যুবতী ছিল, কথায় কথায় ফিক ফিক করিয়া হাসিত, ভাদুড়ী মহাশয়ের সহধর্মিণী সন্দেহ করিতে লাগিলেন যে, বৃদ্ধ ভাদুড়ী মহাশয় গোপন গোপনে হয়ত উহার সহিত অবৈধ প্রণয়সূত্রে আবদ্ধ হইতেছেন। কোনও প্রমাণ ছিল না। কিন্তু সন্দেহ প্রমাণের উপর নির্ভর করে না।

ভাদুড়ী মহাশয় চলৎশক্তিরহিত না হইলে প্রায়ই বাড়ির বাহিরে চলিয়া যাইতেন। কিন্তু বাহিরে গিয়া তাঁহাকে আরও বিপদে পড়িতে হইত। বাহিরে বসিবার স্থান কোথায়? একটু দূরে মিত্র মহাশয়ও আছেন, ভাদুড়ী মহাশয় গেলে তিনি অভ্যর্থনাও করেন, কিন্তু ভাদুড়ী মহাশয় সেখানে যাইতে চান না। পরনিন্দা, পরচর্চা, বর্তমান গভর্নমেন্টের অক্ষমতা, খাদ্যদ্রব্যের অভাব প্রভৃতি ছাড়া অন্য কোনও প্রকার আলোচনা করিতে মিত্র মহাশয় হয় অপারগ না হয় অনিচ্ছুক। ভাদুড়ী মহাশয়ের ওসব ভাল লাগে না। সুতরাং তিনি মিত্র মহাশয়কে পারতপক্ষে এড়াইয়া চলেন।

মিত্র মহাশয়কে বাদ দিলে কাছাকাছি আর দুইটি মাত্র বাড়ি বাকি থাকে। কিন্তু সে দুইটিও অগম্য। একটি চৌধুরীদের বাড়ি, সেখানে নানাবয়সের বহু বিধবা বাড়ির বৃদ্ধ চাকর নিতাইচরণের তত্ত্বাবধানে থাকে। বাড়ির কর্তা কলিকাতার 'চৌধুরী অ্যান্ড দাস' নামক লৌহব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের অর্ধস্বত্বাধিকারী। তিনি নিজে সপরিবারে কলিকাতায় বাস করেন, আত্মীয় বিধবাগুলিকে তিনি দেশের বাড়িটি ছাড়িয়া দিয়াছেন। কিছু জমি আছে, বৃদ্ধ ভৃত্য নিতাইচরণের আনুকূল্যে সেই জমি হইতে বৎসরের খাবারটা সংগৃহীত হয়। চৌধুরী মহাশয় মাসে মাসে ত্রিশটি টাকাও

নিতাইচরণের নিকট পাঠান। জনশ্রুতি এই ত্রিশ টাকার অংশ লইয়া বারটি বিধবার মধ্যে মাঝে মাঝে তুমুল কলহ বাধিয়া যায়। যেদিন পিওন আসিয়া টাকাটি দিয়া যায় তাহার পর তিন চারদিন বাড়িতে নাকি কাক-চিল পর্যন্ত বসিতে সাহস করে না।

দ্বিতীয় বাড়িটি অপুত্রক কেনারাম চক্রবর্তীর। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই শুচি বায়ুগ্রস্ত। স্নান করা, হাত ধোয়া, চতুর্দিকে গোবরজল এবং গঙ্গাজল ছিটানো এই সব লইয়াই থাকেন তাঁহারা। ভাদুড়ী মহাশয় দুই একবার তাঁহাদের বাড়িতে গিয়া আলাপ জমাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। চক্রবর্তী মহাশয় লোক খারাপ নন, হাসিমুখেই আলাপ করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রতিবারই ভাদুড়ী মহাশয়ের কেমন যেন সন্দেহ হইয়াছিল যে যদিও কেনারামবাবু মুখে ভদ্রতার চূড়ান্ত করিতেছেন, কিন্তু মনে মনে তাঁহার একটা অস্বস্তি হইতেছে। তাঁহার চোখের ভাষা অন্যরকম। একদিন তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন যে, তিনি উঠিয়া আসিবার পরই চক্রবর্তী-গৃহিণী ভিতর হইতে এক বালতি গোবরজল পাঠাইয়া দিলেন এবং যে স্থানে ভাদুড়ী মহাশয় বসিয়াছিলেন সেই স্থানটি চক্রবর্তী মহাশয় স্বহস্তে পূর্ণ উদ্যম সহকারে ধুইতে লাগিলেন। ইহার পর ভাদুড়ী মহাশয় আর চক্রবর্তী মহাশয়ের বাড়িতে পদার্পণ করেন নাই।

সুতরাং বাড়ি হইতে বাহির হইয়া ভাদুড়ী মহাশয় একটু মুশকিলে পড়িয়া যাইতেন। কোথাও আশ্রয় নাই। কলিকাতার পার্কগুলির কথা মনে পড়িত, চায়ের দোকানগুলি বিশেষ করিয়া বোস মহাশয়ের ছোট দোকানটির ছবি মানসপটে ফুটিয়া উঠিত। কিন্তু কলিকাতায় ফিরিবার আর উপায় নাই, ইচ্ছাও নাই। লজ্জার মাথা খাইয়া মেজছেলেকে একটা চিঠি লিখিয়াছিলেন, মেজছেলে তাহার উত্তরও দিয়াছিল। লিখিয়াছিল 'আপনি ও মা এখানে চলিয়া আসুন। দেশে কষ্ট করিয়া পড়িয়া থাকিবার দরকার কি!' তাঁহার স্ত্রী কিন্তু যাইতে সম্মত হইলেন না। বলিলেন, শ্বশুরের ভিটা আঁকড়াইয়া শত কষ্ট সহ্য করিয়াও তিনি গ্রামে পড়িয়া থাকিবেন তবু পুত্রবধূর হাত তোলা হইয়া থাকিতে পারিবেন না। স্বামীর আত্মসম্মানহীনতার জন্য তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি গঞ্জনাও দিলেন। ভাদুড়ী মহাশয় অনুভব করিলেন তিনি পঙ্কে অর্থাৎ কর্দমে আটকাইয়া গিয়াছেন এবং এইভাবেই বাকী জীবনটা কাটাইতে হইবে। কাটাইতে তাঁহার আপত্তি ছিল না, অসুস্থ এবং রুগ্ন স্ত্রীর বাক্যযন্ত্রণা সহ্য করিয়া, ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া, এই অজ পাড়াগাঁয়ে বাকী জীবনটা কাটাইতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু সমস্যা দাঁড়াইয়াছিল কি লইয়া থাকিবেন? মনের কিছু একটা অবলম্বন চাই তো। ধর্মের উপর আর আস্থা ছিল না, সময় পাইলে মাঝে মাঝে বই পড়িতেন. কিছু বই তাঁহার ছিল। কিন্তু কতক্ষণ বই পড়া যায়? সর্বাপেক্ষা মুস্কিল হইত বিকাল বেলাটা। যখন চাকুরী করিতেন. ক্লাবের মেম্বর ছিলেন. টেনিস খেলিতেন, ব্রিজ খেলিতেন, সময় কাটাইবার কত উপায় ছিল। কিন্তু এই গ্রামে ক্লাব দূরের কথা, পোস্টাফিস নাই, রেলওয়ে স্টেশন নাই। গঙ্গার ওপারে স্টেশন। সেখানে নামিয়া নৌকাযোগে এখানে আসিতে হয়।

ভাদুড়ী মহাশয় অবশেষে বাধ্য হইয়া একদিন গঙ্গাতীরে গিয়া বসিলেন। দেখিলেন ওই স্থানটুকু ছাড়া গ্রামে নির্ঝঞ্ঝাটে বসিবার আর কোন স্থান নাই। এদিক-ওদিক চাহিয়া হেলিয়া-পড়া বটগাছটার নীচে ওই স্থানটুকু তিনি আবিষ্কার করিলেন। গঙ্গাতীরে ওই স্থানটুকু যে তাহার সমস্যার সমাধান করিবে একথা অবশ্য তিনি

কল্পনা করেন নাই। কিন্তু বসিবামাত্র তিনি অনুভব করিলেন—ঠিক কি যে অনুভব করিলেন তাহা বর্ণনা করা শক্ত—তবে একটা অননুভূতপূর্ব আরাম যেন তাঁহার সত্তাকে সহসা আচ্ছন্ন করিয়া দিল। আকাশের দিকে চাহিয়া সহসা তিনি মুগ্ধ হইয়া গেলেন, নির্নিমেষে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। উত্তরবাহিনী গঙ্গা সোজা গিয়া উত্তর আকাশে মিশিয়াছে, বামে পশ্চিম আকাশের মেঘমালায় অস্তায়মান সূর্যের বিচিত্র বর্ণমালা, সে বর্ণের আভা গঙ্গার বুকে এবং উত্তর আকাশে স্তূপীকৃত মেঘে প্রতিফলিত হইয়াছে। গঙ্গা চিরকালই বহিতেছে, আকাশে মেঘের আবির্ভাবও কোনও নূতন ঘটনা নহে, কিন্তু সেদিন তাঁহার চক্ষে সবই যেন বড় নূতন ঠেকিল। তিনি মুগ্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। তাহার পর হইতে রোজই তিনি ওই স্থানটিতে গিয়া বসেন। গত দশ বছর হইতে প্রত্যহ বসিতেছেন। প্রতিদিন ওই উত্তর আকাশে নূতন ছবি দেখিতে পান। কোনদিন মেঘ থাকে, কোনদিন থাকে না। যে দিন থাকে সেদিন নূতন ধরনে থাকে, কখনও একই জিনিসের পুনরাবৃত্তি হয় না। রোজই নূতন ছবি, সে ছবিও চোখের সামনেই ধীরে ধীরে বদলাইতে থাকে। পশ্চিম আকাশেও ঠিক তাই। প্রতিদিনে নূতন ঢং নূতন দৃশ্য। গঙ্গার তরঙ্গমালাও যেন প্রতিদিন নূতন রূপে সাজিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করে। বৈকালের এই সময়টুকুর জন্য ভাদুড়ী মহাশয় উন্মুখ হইয়া বসিয়া থাকেন, এই সময়টুকুও যেন অভিনব সাজে সাজিয়া তাঁহার জন্য অপেক্ষা করে। এই দশ বৎসরে অনেক ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। তাঁহার স্ত্রী-বিয়োগ হইয়াছে, তাঁহার মেজছেলেটিও আর নাই, প্লেগে আক্রান্ত হইয়া সে সপরিবারে মারা গিয়াছে। যে স্থবিরা ব্রাহ্মণী তাঁহার বাড়িতে রাঁধুনীর কাজ করিত, সে বহুপূর্বেই দেহরক্ষা করিয়াছে। বাগ্দী মেয়েটি শ্বশুরালয়ে চলিয়া গিয়াছে। ভাদুড়ী মহাশয় এখন সম্পূর্ণ একা—একবেলা স্বপাকে খান। রান্নার আয়োজন করিতে সকালটুকু কাটিয়া যায়। আহার করিয়া সামান্য একটু বিশ্রাম করেন, তাহার পর গঙ্গার ধারের ওই স্থানটুকুতে গিয়া বসেন।

যেদিনের কথা বলিতেছি সেদিন ভাদুড়ী মহাশয় আহারাদির পর একটা পুরাতন মাসিক পত্রিকা খুলিয়াছিলেন। তাহাতে ঋগ্বেদের অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহাতে তিনি একটা অদ্ভুত জিনিস পাঠ করিলেন—'যখন অস্তিত্বও ছিল না, নাস্তিত্বও ছিল না, যখন পৃথিবী ছিল না, পৃথিবীর ঊর্ধ্বে আকাশও ছিল না, তখন কি ছিল ? তখন কে সেই মহা অন্ধকারের গর্ভে নিহিত ছিলেন ? যখন মৃত্যু ছিল না, অমৃত্যুও ছিল না, দিবারাত্রির বিভেদ যখন ছিল না, তখন সেই নিগূঢ় অন্ধকারের মধ্যে, সেই মহাশূন্যে অপ্রত্যক্ষভাবে তিনিই স্পন্দিত হইতেছিলেন। তিনিই কালক্রমে তেজোরূপে আত্মপ্রকাশ করিলেন। প্রথমে আবির্ভূত হইল কামনা…'

এই ধরনের অনেক কথা ছিল। পড়িতে পড়িতে ভাদুড়ী মহাশয় ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন। গঙ্গার তীরে বসিয়া কথাগুলি পুনরায় তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল মহাশূন্যের মধ্যেই সৃষ্টি-সম্ভাবনা প্রচ্ছন্ন ছিল, তাঁহার জীবনও তো এখন মহাশূন্যে, সে শূন্যতার মধ্যে কোনও সম্ভাবনা লুকাইয়া আছে কি ? তাঁহার অজ্ঞাতসারেই তাঁহার মুখে একটা তিক্ত অবিশ্বাসের হাসি ফুটিয়া উঠিল। তিনি উত্তর আকাশের মহাশূন্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বসিয়া রহিলেন। উত্তর আকাশে কিছু

দুগ্ধ-শুভ্র স্তুপ-মেঘ একধারে স্তুপীকৃত হইয়া পড়িয়াছিল। সহসা ভাদুড়ী মহাশয়ের ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া গেল। তাঁহার মনে হইল খানিকটা মেঘ আকাশ হইতে খুলিয়া গিয়া যেন তাঁহার দিকে ভাসিয়া আসিতেছে। একটু পরেই অবশ্য তাঁহার ভুল ভাঙিল। মেঘ নয়, নৌকার পাল। নৌকাটির দিকেই তিনি চাহিয়া রহিলেন। কতক্ষণ চাহিয়া ছিলেন তাঁহার খেয়াল ছিল না। হঠাৎ লক্ষ্য করিলেন নৌকাটি খুব কাছে আসিয়া পড়িয়াছে। নিকটের ঘাটেই ভিড়িল। নৌকায় একজন ভদ্রলোক বসিয়া আছেন। পাশেই একটি সুন্দরী মহিলা। চার পাঁচটি নানা বয়সের ছেলেমেয়েও রহিয়াছে।

ভদ্রলোক নৌকা হইতে নামিয়া ভাদুড়ী মহাশয়কেই প্রশ্ন করিলেন, "বলতে পারেন হরনাথ ভাদুড়ীর বাড়ি কোনটা ?"

"কেন—তাঁর বাড়ি খুঁজছেন কেন আপনি ?"

"আমি তাঁর বড় ছেলে। অনেকদিন বিদেশে ছিলাম। অনেকদিন পরে ফিরছি। কলকাতায় তাঁর এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তিনি বললেন বাবা এখানেই আছেন।"

"কে, নবু ?"

প্রৌঢ় ভদ্রলোক কয়েক মুহূর্ত সবিস্ময়ে ভাদুড়ীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। নবকুমার পিতাকে সত্যই চিনিতে পারে নাই। তাহার পর হঠাৎ পারিলেন এবং আসিয়া প্রণাম করিলেন।

"এরা কে ?"

"আমি রেঙ্গুনে বিয়ে করেছিলাম। সবাইকে নিয়ে এসেছি।"

সকলে আসিয়া একে একে প্রণাম করিতে লাগিল। পুত্র, পুত্রবধূ, পৌত্র, পৌত্রী সবাই আবার তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। তাঁহার শূন্য জীবন অপ্রত্যাশিতভাবে আবার পূর্ণ হইয়া গেল।

ভ্রাতৃপ্রেম

প্রৌঢ় ভবানন্দ সেন নিজের চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। তখন কালাজ্বরের অব্যর্থ ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই। ডাক্তার ব্রহ্মচারী তখন সবে তাঁহার গবেষণা আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহার ঔষধ বাজারে তখনও চালু হয় নাই। ভবানন্দ সেনের কালাজ্বর হইয়াছিল। স্বয়ং ব্রহ্মচারীই চিকিৎসার ভার লইয়াছিলেন, ভবানন্দের পুত্র শ্যামানন্দ মেডিকেল কলেজে পড়িত, সুতরাং ছোট বড় মাঝারি আরও কয়েকজন ডাক্তারও জুটিয়াছিলেন, কিন্তু কোনও ফলই হইতেছিল না। সকলে হিম-সিম খাইতেছিলেন মাত্র। কুইনাইন এবং আর্সেনিকের শ্রাদ্ধ হইতেছিল, তাহার সঙ্গে গোপনে গোপনে চলিতেছিল হোমিওপ্যাথি এবং কবিরাজি পাঁচন। বাংলা দেশের অনেকেই সময়নিষ্ঠ নহেন, জ্বর কিন্তু এক মিনিটও দেরী করে না। ঠিক যথাসময়ে আসে। ভবানন্দের বেলাতেও ইহার অনাথা হইল না। ঠিক ঘড়ির কাঁটা ধরিয়া জ্বর প্রত্যহ দুইবার করিয়া হাজিরা দিতে লাগিল। ভবানন্দ-গৃহিণী তখন অনন্যোপায় হইয়া কুলপুরোহিত কালিকানন্দ শর্মাকে খবর দিলেন।

তিনি আসিয়া ব্যবস্থা দিলেন চণ্ডীপাঠের এবং কালীপূজার। তাহাও চলিতে লাগিল।

ডাক্তাররা সকলেই একটি কথা বরাবর বলিয়া যাইতে লাগিলেন, সাবধান পেট যেন না খারাপ হয়। পেট ভাঙিলেই সর্বনাশ হইয়া যাইবে। কালাজ্বর রোগীরা সাধারণত খুব লোভী হয়, কুপথ্য করার দিকেই তাহাদের ঝোঁক বেশী। ও বিষয়ে যেন একটু কড়া নজর রাখা হয়। পুত্র শ্যামানন্দ এবং গৃহিণী মৃন্ময়ী সর্বতোভাবে মনোযোগী হইলেন এ বিষয়ে। বাড়িতে মশলা কেনাই বন্ধ হইয়া গেল। মৌরলা মাছ ছাড়া অন্য কোনও প্রকার মাছও আর তাঁহারা কিনিতে সাহস করিল না। কিন্তু এ সব সাবধানতা সত্ত্বেও একদিন পেটের গোলমাল দেখা দিল।

ডাক্তাররা আসিয়া মৃন্ময়ীকে জেরা করিতে লাগিলেন। মৃন্ময়ী বলিলেন দশ বৎসরের পুরাতন চাউল এবং মৌরলা মাছের মশলাহীন ঝোলের অপেক্ষা গুরুতর কোনও পথ্য স্বামীকে তিনি দেন না।

একজন ডাক্তার প্রশ্ন করিলেন, "দুধ কতটা খাচ্ছেন ?"

"দু-বেলায় তিন পোয়া।"

"জল মিশিয়ে দেন তো !"

"না, জল মেশাই না। কোলকাতার দুধে এমনিই তো জল অনেক থাকে।"

"না জল মিশিয়ে দেবেন।"

জল মিশাইতে গিয়া মৃন্ময়ী অনুভব করিলেন যে জল মিশাইলে দুধের রং-ও বজায় থাকিবে না। কিন্তু ডাক্তারের নির্দেশ অমান্য করিতে তিনি সাহস করিলেন না।

পেটের গোলমাল কিন্তু যেমন চলিতেছিল, তেমনি চলিতে লাগিল। জ্বরও। ভবানন্দ দেখিলেন ডাক্তাররা তাঁহার খাবার ছাড়া আর কিছুই কমাইতে পারিতেছেন না। হঠাৎ তিনি মরীয়া হইয়া উঠিলেন। মৃন্ময়ীকে ডাকিয়া বলিলেন, "এরা আমাকে না খেতে দিয়েই মেরে ফেলবে দেখছি। এদের কথা আমি আর শুনব না। আমি আজ রাত্রে আর বার্লি খাব না, লুচি খাব !"

"লুচি ?"

"হ্যাঁ, গরম ফুলকো লুচি খেলে পেটটা ধ'রে যেতে পারে। আমার নিজের অভিজ্ঞতা আছে।"

"কিন্তু শামু এসে যদি শোনে আমি তোমাকে লুচি দিয়েছি তাহলে কুরুক্ষেত্র কাণ্ড করবে সে।"

"তাকে শোনাবার দরকার কি। সে তো সাড়ে আটটার আগে ফিরবে না। তার আগেই আমি খেয়ে নেব।"

"কিন্তু সেটা কি ঠিক হবে ?"

"খুব ঠিক হবে, আমি যা বলছি তাই কর। বেশী নয়, গোটা পাঁচ ছয় লুচি বেগুন ভাজা দিয়ে খাব। আমার আয়ু শেষ হয়ে এসেছে, আমার ইচ্ছায় আর তোমরা বাধা দিও না।"

মৃন্ময়ীর চোখে জল আসিয়া পড়িল। তিনি লুচি ভাজিবারই আয়োজন করিতে গেলেন।

…উনুনের কাছেই ভবানন্দ খাইতে বসিয়াছিলেন। সবে একখানি মাত্র লুচি থালার উপর দেওয়া হইয়াছে, অত্যন্ত গরম বলিয়া ভবানন্দ সেটি তখনও ভালভাবে আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। এমন সময় পুত্র শ্যামানন্দ আসিয়া উপস্থিত।

"এ কি!"

"উনি লুচি খাবেন বলে জেদ ধরেছেন"—মৃন্ময়ী বলিলেন।

"ডাক্তাররা বার্লি দিতে বলেছে, তুমি লুচি দিচ্ছ?"

"আমি কি করব বাবা! ওঁকে বল।"

ভবানন্দ দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন, "আমি লুচি খাবই। তোমার ও ডাক্তারেরা গবেট, কিছু জানে না।"

"না, লুচি খাওয়া হবে না।"

"আমি খাবই"—ভবানন্দ গর্জন করিয়া উঠিলেন। শ্যামানন্দ তর্ক না করিয়া লুচি শুদ্ধ থালাটা তুলিয়া লইল। ভবানন্দ রাগ করিয়া উঠিয়া গেলেন। সেদিন রাত্রে জলস্পর্শ পর্যন্ত করিলেন না।

পরদিন প্রভাতে ভবানন্দ পাটনা-প্রবাসী ভ্রাতা পরমানন্দকে নিম্নলিখিত পত্রটি লিখিলেন।

কল্যাণবরেষু,

কিছু টাকার জন্য ইতিপূর্বে একটি পত্র লিখিয়াছিলাম। কিন্তু তুমি তাহার কোনও উত্তর পর্যন্ত দিলে না। এখানে জলের মতো অর্থব্যয় হইতেছে, কিন্তু অসুখের কোনও উপশম নাই। মনে হইতেছে আর বেশী দিন বাঁচিব না। তোমার বউদিদি এবং শামুও আমার সহিত অসদ্ব্যবহার করিতেছে। ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। হাতী কাদায় পড়িলে ব্যাঙেও তাহাকে লাথি মারে। তুমি যদি আমাকে শেষ দেখা দেখিতে চাও, এই পত্রকে টেলিগ্রাম জ্ঞান করিয়া অবিলম্বে চলিয়া আসিবে। হাতে পয়সা থাকিলে টেলিগ্রামই করিতাম, কিন্তু পয়সা তোমার বউদির কাছে থাকে। চাহিলে দেয় না। তাহার ধারণা হাতে পয়সা পাইলে আমি কুপথ্য কিনিয়া খাইব। এখন মরাই আমার পক্ষে শ্রেয়। তুমি পত্র পাইয়াই চলিয়া আসিবে। সাক্ষাতে সব কথাই বলিব। আশীর্বাদ জানিবে। ইতি—

আশীর্বাদক
ভবানন্দ সেন

পরমানন্দ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সকলেরই চোখে জল আসিয়া পড়িল। এমন কি শ্যামসুন্দরেরও।

"আপনি এসেছেন, ভালই হয়েছে। আমরা বাবাকে আর সামলাতে পাচ্ছি না।"

চক্ষু মুছিতে মুছিতে পরমানন্দ উত্তর দিলেন, "ভয় কি সব ঠিক হয়ে যাবে।"

শ্যামানন্দ নিশ্চিন্ত হইয়া কলেজে চলিয়া গেল।

ইহার কিছুক্ষণ পরে ঘরে খিল বন্ধ করিয়া দুই ভ্রাতায় মিলিয়া কি যে পরামর্শ করিলেন তাহা মৃন্ময়ী টের পাইলেন না। দ্বারে কান দিয়া শুনিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু বিশেষ কিছু শুনিতে পান নাই।

বেলা তিনটার সময় পরমানন্দ দিবানিদ্রা সাঙ্গ করিয়া উঠিলেন। রাত্রে ট্রেনে নাকি ঘুম হয় নাই।

মৃন্ময়ী প্রশ্ন করিলেন, "চা করে দেব ঠাকুরপো?"

"না। দাদাকে নিয়ে এখুনি একবার বেরুব। আমার পরিচিত একটি ভালো হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার আছেন, তাঁকে একবার দেখিয়ে নিয়ে আসি। অনেক কালাজ্বর রোগী তিনি আরাম করেছেন শুনেছি।"

"তাঁকে বাড়িতেই 'কল' দাও না। তোমার দাদা কি যেতে পারবেন?"

"তিনি 'কল' দিলে আসেন না। তাঁর বাড়িতে যেতে হয়। আমরা গাড়ি করে যাব। তুমি চাকরটাকে বল একটা রিক্‌শা ডেকে দিক।"

"এই পাড়াতেই একটা রিকশা-ওলা থাকে, চেনা-শোনা লোক। মোহন দেখ তো চামরু যদি থাকে তাকে ডেকে আন!"

চামরুর রিক্‌শাতে আরোহণ করিয়া দুর্গা দুর্গা বলিতে বলিতে দুই ভাই রিক্‌শাতে চড়িয়া যাত্রা করিলেন। ফিরিলেন ঘণ্টা দুই পরে।

শ্যামানন্দও তখন কলেজ হইতে ফিরিয়াছিল। সে খুড়ামহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিল, "কোন ডাক্তারের কাছে বাবাকে নিয়ে গিয়েছিলেন?"

"সে তুই চিনবি না, আমার এক গুরু ভাই। বেলেঘাটায় থাকে।"

রাত্রে শুইবার সময় পরমানন্দ লক্ষ্য করিলেন টেবিলের উপর একটি মোমবাতি জ্বালাইয়া ভবানন্দ খবরের কাগজ পড়িতেছেন। 'বাল্‌ব'টা হঠাৎ ফিউজ হইয়া গিয়াছিল। শুইয়া শুইয়া কিছুক্ষণ না পড়িলে ভবানন্দের ঘুম আসে না। মোমবাতির কাছে মশারিটা বাতাসে দুলিতেছে। পরমানন্দের আশঙ্কা হইতে লাগিল মশারিতে আগুন ধরিয়া গেলেই মুশকিল!...এই চিন্তা করিতে করিতে তিনি ঘুমাইয়া পড়িলেন।

"পর্মা, ওরে পর্মা।"

ভবানন্দের কাতর ডাকে পরমানন্দের নিদ্রাভঙ্গ হইল। মশারির ভিতর তিনি ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিলেন। সঙ্গে সঙ্গে একটি উজ্জ্বল আলো তাঁহার চোখ ধাঁধাইয়া দিল। ভবানন্দের পাশেই যে বাথরুম এবং তাহাতে যে একটি বেশ শক্তিশালী 'বাল্‌ব' লাগানো আছে তাহা পরমানন্দ জানিতেন না। তিনি মশারির ভিতর বসিয়াই পট পট করিয়া নিজের মশারির দড়িগুলি ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। তাহার পরই শশব্যস্ত হইয়া উঠিয়া পড়িলেন।

ইহার একটু পরেই গুরুভার পতনের শব্দে শ্যামানন্দের নিদ্রাভঙ্গ হইল। সে বাহির হইয়া আসিয়া দেখিল আপাদমস্তক মশারি জড়াইয়া পরমানন্দ পড়িয়া গিয়াছেন। তাঁহার মস্তকে গুরুতর চোট লাগিয়াছে।

ভবানন্দ ক্ষীণকণ্ঠে বাথরুম হইতে বলিলেন, "শামু এখানে আয়। আমি উঠতে পাচ্ছি না। জলের মতো পায়খানা হয়ে যাচ্ছে খালি।"

শামু একটা ট্যাক্সি ডাকিয়া উভয়কে লইয়া মেডিকেল কলেজে চলিয়া গেল।

পরদিন রিক্‌শা-চালক চামরু বলিল, উঁহারা কোন ডাক্তারের কাছে যান নাই, একটি খাবারের দোকানে বসিয়া লুচি, বুটের ডাল, আলুর দম এবং রাজভোগ খাইয়াছেন।

আর একটি উল্লেখযোগ্য কথা এখনও উল্লেখ করি নাই। ভবানন্দ সেন একজন প্রবীণ ডাক্তার এবং পরমানন্দ সেন প্রবীণ শিক্ষক।

•

বীরেন্দ্রনারায়ণ

শীতের রাত্রি। সকাল সকাল খাওয়া দাওয়া শেষ করিয়া লেপ মুড়ি দিয়া শুইয়াছিলাম। সদ্য বিবাহিতা পত্নী পাশের ঘরে সেতার সাধিতেছিলেন। কাফির গৎটা বেশ জমিয়া উঠিয়াছিল। হঠাৎ রস-ভঙ্গ হইল। নীচে কড়াটা নড়িয়া উঠিল এবং একটু পরে ভৃত্য মণিলাল একটি পত্র হস্তে প্রবেশ করিল।

"নবীপুরের জমিদার বাড়ি থেকে আপনাকে ডাকতে এসেছে।"

লেপ ছাড়িয়া উঠিতে হইল। পত্রটি দেখিলাম স্বয়ং জমিদারবাবুই লিখিয়াছেন।

ডাক্তারবাবু,

আমার ছেলেটি বড় অসুস্থ। আপনি পত্র পাইবামাত্র চলিয়া আসুন। আপনার জন্য নৌকা পাঠাইলাম। ইতি -

বীরেন্দ্রনারায়ণ

পত্রপাঠ অভব্য ভঙ্গীতে আত্মসম্মান ঈষৎ আহত হইল। আমি উহার খাতকও নহি, কর্মচারিও নহি। আমাকে এমন আদেশের ভঙ্গীতে চিঠি লেখার অর্থ কি? একটা 'নমস্কারান্তে নিবেদন' বা 'বিনীত বীরেন্দ্রনারায়ণ' লিখিলে ক্ষতি কি ছিল! লোকটা শুনিয়াছি দুর্দান্ত জমিদার। টাকার জোরে সত্যকে মিথ্যা এবং দিনকে রাত্রি করিয়া নিজের জমিদারির সকলকে সন্ত্রস্ত করিয়া রাখিয়াছে, বাহিরের লোকদেরও নিস্তার নাই। সকলকে শাসাইয়া চোখ রাঙাইয়া নিজের মহিমা-পতাকাটাকে সদর্পে সমুচ্চ করিয়া রাখাটাই যেন লোকটার একমাত্র লক্ষ্য। আমি মাত্র মাসখানেক আগে এই গ্রামে প্র্যাকটিস করিতে আসিয়াছি। গ্রামটি বীরেন্দ্রনারায়ণেরই জমিদারিভুক্ত, কিন্তু তাহার সহিত চাক্ষুস আলাপ এখনও পর্যন্ত হয় নাই। লোকটার সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছিলাম তাহাতে আলাপ করিবার আগ্রহও মনে জাগে নাই।

চিঠিটার দিকে কয়েক মুহূর্ত ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া চাহিয়া থাকিয়া অবশেষে যাওয়াই স্থির করিলাম। 'আমার ছেলেটি বড় অসুস্থ'—এই কথা কয়টিই আমাকে যাইতে বাধ্য করিল।

রাত্রি বারোটার সময় জমিদার ভবনে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম জমিদারের ম্যানেজার জমদগ্নি মিশ্র আমার অপেক্ষায় বসিয়া আছেন। লোকটার দুঃশমনের মতো চেহারা। মুখে চাপ চাপ গোঁফদাড়ি, যে অংশটুকু রোমহীন তাহাতে বসন্তের দাগ। নাকটা যেন ছোট একটি উই ঢিপি। "নমস্কার ডাক্তারবাবু। আসুন বসুন। পথে আশা করি কোনও কষ্ট হয়নি।"

"এখানে বসে আর কি হবে? চলুন একেবারে রোগীর ঘরে যাই।"

"আমিই রোগী। আপনার ফি-টা আগে নিয়ে নিন।" তিনি একটা টাকার থলি আমার দিকে আগাইয়া দিলেন। "পাঁচ শ' টাকা আছে ওতে। যদি আরও চান আরও দেব। আমাকে কিন্তু বাঁচাতে হবে।"

"ব্যাপারটা কি ?"

"একটা খুনের মোকদ্দমায় জড়িয়ে পড়েছি। দাঙ্গা হয়েছিল, একটা লোক মারা গেছে। বিপক্ষ দলেরা আমাকে আসামী করেছে। উকীল পরামর্শ দিয়েছেন যে ডাক্তারের সার্টিফিকেট জোগাড় করতে হবে। তাতে লেখা থাকবে, যে তারিখে ওই খুনটা হয়েছে সেই তারিখে আমি কঠিন রোগে আপনার বাসায় আপনার চিকিৎসাধীন ছিলাম।"

বজ্রাহতবৎ দাঁড়াইয়া রহিলাম।

জমদগ্নি আমার মুখের দিকে সোৎসুকে চাহিয়া চাপদাড়িতে ধীরে ধীরে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতে লাগিলেন।

"ফাঁসির দড়ি গলায় জড়িয়ে গেছে ডাক্তারবাবু। বাঁচান আমাকে দয়া করে।"

"আমাকে মাপ করবেন। আমি ডাক্তার, মিথ্যা সার্টিফিকেট লেখা আমার পেশা নয়। এমনভাবে এত রাত্রে আমাকে ডেকে এনে খুবই অন্যায় করেছেন আপনারা। যাক, আমি চললাম। নমস্কার।"

আমি গমনোন্মুখ হইয়া দ্বারের দিকে ফিরিয়াছি এমন সময় জমদগ্নি বলিলেন, "যাবার আগে একটা কথা শুনে যান, নবীপুরে চোখ রাঙাবার অধিকার মাত্র একটি লোকেরই আছে, তিনি জমিদার বীরেন্দ্রনারায়ণ। তিনি যদি বিরূপ হন তাহলে তাঁর জমিদারিতে আপনি বাস করতে পারবেন না।"

"বেশ, বাস করব না। কালই না পারি দু'একদিনের মধ্যেই আমি অন্যত্র চলে যাব। আপনাদের এই ব্যবহারের পর আমারই আর এখানে থাকবার প্রবৃত্তি হবে না। আচ্ছা চলি।"

"শুনুন আর একটা কথা। পাঁচ-শ'র জায়গায় যদি পাঁচ হাজার টাকা দিই, তাহলেও আপনি এই উপকারটি করবেন না ?"

"লক্ষ টাকা দিলেও করব না।" বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া গৃহিণীকে বলিলাম, "এখানকার বাস উঠল। জিনিসপত্তর গুছিয়ে ফেল। কাল সন্ধ্যার ট্রেনেই চল কোলকাতায় চলে যাই।"

"কেন, হঠাৎ ?"

সমস্ত শুনিয়া গৃহিণীও আমার সহিত একমত হইলেন।

পরদিন দ্বিপ্রহরে একটা গরুর গাড়িতে আমার জিনিসপত্র বোঝাই করিতেছি এমন সময় ধাববান অশ্বপৃষ্ঠে একজন বলিষ্ঠ সুদর্শন যুবক আসিয়া আমার বাসার সামনে অশ্বের গতিরোধ করিলেন। অশ্বের ঘর্মাক্ত কলেবর দেখিয়া বুঝিলাম, বেশ দ্রুতবেগেই তাহাকে আসিতে হইয়াছে।

অশ্বপৃষ্ঠ হইতে নামিয়া যুবক সহাস্য মুখে আগাইয়া আসিলেন।

"নমস্কার। আপনিই ডাক্তারবাবু ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনি ?"

"আমি বীরেন্দ্রনারায়ণ। আপনার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছি। এসব কি ?"

গরুর গাড়ির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিলেন।

"আমার মালপত্র। আমি আজই চলে যাচ্ছি এখান থেকে।"

"পাগল না কি ! আপনাকে কিছুতেই আমি যেতে দেব না। আপনার মতো লোকের সঙ্গ লাভ করা একটা সৌভাগ্য ! টাকা খরচ করলে মিথ্যে সার্টিফিকেট অনেক পাওয়া যায়—জমদগ্নি সিভিল সার্জনের কাছ থেকেই সার্টিফিকেট এনেছে, কিন্তু আপনার কথা শুনে মুগ্ধ হয়ে গেছি আমি। দুপুর রোদে তাই নিজেই ছুটে এলাম। যাওয়া আপনার হবে না, প্লীজ।"

বীরেন্দ্রনারায়ণ হাতজোড় করিলেন।

যাওয়া হইল না।

বন্য মহিষ

রাত বারোটা বেজে গেছে। নীলমণিবাবু তখনও ফেরেন নি। নীলমণি-পত্নী সুলোচনা লোচন দুটি রক্তবর্ণ করে বসে আছেন রেগে। নীলমণিবাবুর বিধবা বোন মায়াও বসে আছেন একটু কুণ্ঠিত হয়ে। বৌদি দাদার নামে যে সব কটূক্তি করছেন তার প্রতিবাদ করতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু করবার সাহস নেই। বৌদির অনুগ্রহ না থাকলে এ বাড়িতে টেকা সম্ভব নয়।

…ঘড়িতে টং করে যখন সাড়ে বারোটা বাজল তখন সুলোচনা পুনরায় তিক্তকণ্ঠে মায়াকে বললেন, "কাণ্ডখানা দেখছ তোমার দাদার। তা-ও যদি বুঝতাম নিজের কাজের জন্যে এত খেটে মরছে তাহলেও বা মানে ছিল। কিন্তু কোথাকার কে হাড়হাবাতে মাছের ব্যবসা করবে তার জন্যে ওর ঘুম হচ্ছে না। সারা জীবনটা এই করছে। ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর সীমা আছে তো একটা।"

নীলুবাবু ফিরলেন রাত দেড়টার সময় কিছু টাটকা বাটা মাছ নিয়ে। নিদ্রিতা সুলোচনাকে ঘুম থেকে তুলে বললেন, "ওগো, শুনছ, ফার্স্ট'ক্লাস বাটা মাছ পেয়ে গেলাম মহলদারের কাছে। ভদ্রলোকের ভাগ্য ভালো, ঝাল করে ফেল দিকি মাছগুলোর—!"

"এখন, এত রাত্রে ? উনুনে আঁচ নেই—তোমার আক্কেলও কি নেই ?"

"আঁচ দিয়ে দাও, কতক্ষণ লাগবে ! আমি মাছগুলো বেছে দিচ্ছি। মাছ সঙ্গে করে নিয়ে এলুম, ভদ্রলোককে নিরামিষ খেতে কি দেওয়া যায় !"

মায়া বলল—"আমি সব করে দিচ্ছি।"

দুই ভাই বোনে মহা উৎসাহে লেগে পড়ল। সুলোচনাকেও লাগতে হ'ল, সে কিন্তু গজগজ করতে লাগল সমানে। যাই হোক, রাত্রি আড়াইটের সময় উক্ত আগন্তুক ভদ্রলোককে পরিতৃপ্তি সহকারে মাছ-ভাত খাইয়ে নীলুবাবু সত্যই পরিতৃপ্ত হলেন।

যে ঘটনাটা বললাম সেটা একটা উদাহরণ মাত্র। নীলমণিবাবু সারাজীবন ধরে এই কাজ করে এসেছেন। তিনি সামান্য লোক, স্থানীয় জমিদারের স্টেটে সামান্য গোমস্তার কাজ করেন। কিন্তু তাঁর এমন দিল-দরিয়া স্বভাব যে বিশ্বের যাবতীয় লোককে দু'হাত বাড়িয়ে সাদরে অভ্যর্থনা করবার সাহস তাঁর আছে। ঘরের খেয়ে অনেক বুনো মোষ তাড়িয়েছেন তিনি জীবনে ! আর সুলোচনাও এ নিয়ে অনেক বাক্যযন্ত্রণা দিয়েছে তাঁকে। কিন্তু তিনি গ্রাহ্য করেন নি।

একবার অসুস্থ হয়ে কোলকাতা শহরে গিয়ে পড়তে হল নীলুবাবুকে। গ্রামের ডাক্তার তাঁর অসুখ সারাতে পারলেন না। কোলকাতা শহরে নীলুবাবু বড়ই বেকায়দায় পড়ে গেলেন। এখানে কেউ তাঁকে চেনে না। প্রতি পদক্ষেপে পয়সা দরকার। দিলদরিয়া নীলুবাবু জীবনে বিশেষ কিছু জমাতে পারেন নি। জমিদারের কাছ থেকে শ' দুই টাকা ধার করে নিয়ে এসেছিলেন তিনি। এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন একটি খোলার ঘরে। যে ডাক্তারবাবুটির চিকিৎসায় তিনি আত্মসমর্পণ করলেন তাঁর ফি আট টাকা। তাঁকে বার দুই ডেকেই নীলুবাবুর জিব বেরিয়ে পড়ল। অবশেষে ডাক্তারবাবুকে নিজের অর্থ কৃচ্ছ্রতার কথা নিবেদন করলেন। ডাক্তারবাবু বললেন, "আমার প্রত্যহ আসবার দরকার নেই। সাতদিন পরে পরে আমি আসব। আপনি সকাল বিকেল একটু একটু বেড়াবেন পার্কে গিয়ে। যে ওষুধ দিয়ে গেলাম ওইটেই এখন চলুক।"

নীলুবাবু সুলোচনাকে এবং নিজের একটি অবিবাহিতা কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। মায়া গ্রামের বাড়িতে ছিল। সবাই চলে এলে ঘরদোর দেখবে কে? আর তাঁর একমাত্র পুত্র জগন্নাথ ছিল বোর্ডিংয়ে। গ্রামে হাইস্কুল ছিল না, তাই তাকে বিদেশ পাঠাতে হয়েছিল। সে যেখানে ছিল সেটাও একটা গ্রাম। শহরে পাঠাবার সামর্থ্য নীলমণির ছিল না।

ডাক্তারের কথা শুনে নীলমণি বললেন—"জগুকে না হয় আসতে লিখি। একা একা বেড়ানো আমার পক্ষে অসম্ভব এই কোলকাতা শহরে।"

সুলোচনা বললে—"জগুই বা কোলকাতা শহরের কি চেনে। সেও তো কখনও আসেনি।"

"তবু সঙ্গে একটা কেউ থাকলে ভরসা হয়। রাস্তাঘাট দু'দিনেই চিনে নেবে।"

"তাহলে জগুকে লিখে দাও সে যেন কাউকে সঙ্গে নিয়ে আসে। কখনও তো কোলকাতায় আসেনি। হাওড়া স্টেশনে নেমে এই গলির গলি তস্য গলির ঠিকানা সে কি বার করতে পারবে?"

"আমি হরেনকে লিখে দিচ্ছি। সেই ওকে পৌঁছে দিয়ে যাবে।"

নীলমণিবাবুর বন্ধু হরেন জগুকে পৌঁছে দিয়ে গেলেন। এর পরই সমস্যাটা হঠাৎ খুব জটিল হ'য়ে উঠল। নীলমণিবাবু ঠিক করেছিলেন ট্রামে চড়ে হেদো পর্যন্ত যাবেন, হেদোয় গিয়ে বেড়াবেন। জগুকে সঙ্গে নিয়ে বেরুলেন তিনি। ট্রাম স্টপেজের কাছে গিয়ে জগুকে তিনি বললেন, "ট্রামটা এলেই টপ্ করে উঠে পড়বি। ট্রাম বেশীক্ষণ থামবে না।" ট্রাম যখন এল তখন জগু ঠিক চড়ে পড়ল, কিন্তু চড়তে পারলেন না নীলমণিবাবু। তিনি দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন, ভীড় ঠেলে ওঠা সম্ভবপর হ'ল না তাঁর পক্ষে। তিনি চেঁচিয়ে জগুকে বললেন, পরের স্টপেজে নেমে পড়িস। জগু সে কথা শুনতে পেলে না। ট্রাম যখন কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে গিয়ে থামল তখন নামল সে। কণ্ডাক্‌টার নামিয়ে দিলে। নেমেই দিশাহারা হয়ে পড়ল বেচারী। কেবল আশা করতে লাগল বাবা হয়তো পরের ট্রামেই এসে পড়বেন। কিন্তু উপর্যুপরি তিন চারটে ট্রাম এল, বাবা এলেন না। নীলমণিবাবু আসতেন, কিন্তু তাঁর এমন মাথা ঘুরতে লাগল যে তিনি আর ট্রামে উঠতে সাহসই করলেন না। আস্তে আস্তে বাড়িই ফিরে এলেন। ভাবলেন জগু ঠিক ফিরে আসতে পারবে। কিন্তু সে এল না।

বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হ'ল, ক্রমশ রাত্রি আটটা বাজল তবু জগুর দেখা নেই। কান্না জুড়ে দিলেন সুলোচনা। নীলমণিবাবুও খুব চিন্তিত হলেন। অসুস্থ শরীর নিয়েই বেরিয়ে পড়লেন আবার। প্রতিবেশী জীবনবাবুর কাছে গেলেন। জীবনবাবুর ফোন ছিল। তিনি ফোন করে হাসপাতালগুলোতে খোঁজ নিলেন, দু'চারটে থানাতেও খবর দিলেন। তারপর বললেন, "আপনি বাড়ি যান। যদি কোনও খবর আসে আমি আপনাকে বলে আসব। চোদ্দ পনর বছরের ছেলে যখন, তখন ভয় নেই। রাস্তা হারিয়ে ফেলেছে, ঠিক ফিরে আসবে—হয়তো একটু দেরি হবে, আসবে ঠিক।"

"আপনার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক মশাই। খবর পেলে দয়া করে জানাবেন আমাকে। আমরা জেগেই থাকব।"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়, সে কথা আর বলতে।"

রাত দশটা পর্যন্ত জগু এল না। নীলমণিবাবু এবং সুলোচনার মনোভাব অবর্ণনীয়। দুজনেই কাতর ভাবে ভগবানকে ডাকছিলেন। আর কিছু করবার ছিল না।

যা ঘটেছিল তা এই।

জগু প্রায় ঘণ্টাখানেক কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে দাঁড়িয়ে বাবার জন্যে অপেক্ষা করল। যখন অন্ধকার হ'য়ে এল, তখন তার মনে হল এবার ফেরা উচিত। কিন্তু এখান থেকে হেঁটে সে কি বাড়ি ফিরতে পারবে? সরকার বাই লেন নামটা মনে আছে, কিন্তু সেটা ঠিক কোনখান থেকে বেরিয়েছে তা তো ঠিক মনে নেই। ট্রামে যাবার উপায়ও বন্ধ, সঙ্গে পয়সা নেই একটিও। টিকিট ছিল না বলেই ট্রাম কণ্ডাক্টার নামিয়ে দিয়েছিল তাকে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে চিন্তা করল সে অনেকক্ষণ। তারপর একটা বুদ্ধি মাথায় এল। একটা রিক্সায় চড়ে গেলে কেমন হয়। ওরা অনেক লেনের খবর জানে। বাড়ি গিয়ে ওকে পয়সা দিলেই হবে। একটা রিক্সাওয়ালাকে জিজ্ঞেস করলে—"সরকার বাই লেন চেন?"

"খুব চিনি আসুন।"

রিকসা যখন চলতে লাগল তখন জগুর মনে হল সে ঠিক উল্টো দিকে চলেছে। বলল সে কথা। কিন্তু রিক্সাওয়ালা ধমকে উঠল—"ঠিক নিয়ে যাচ্ছি বাবু, আপনি বৈসে থাকুন না।"

পাড়াগাঁয়ের ছেলে জগু, চুপ করে রইল। তার মনে হল কোন 'শর্ট কাট্' দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে হয়তো। খানিকক্ষণ পরে সে জগুকে নিয়ে যে লেনে ঢুকল তা যে সরকার বাই লেন নয় তা বুঝতে জগুর দেরি হল না। চেহারাই সে রকম নয়।

"এ কোথায় নিয়ে এলে আমাকে?"

"এইতো শাঁখারিটোলা লেন।"

"আমি বললাম সরকার বাই লেনে যাব—"

"সরকার বাই লেন কোথা! তখন বললেন শাঁখারিটোলা, এখন অন্য বাত বলছেন!"

"সরকার বাই লেনে নিয়ে যেতে গোড়াতেই বলেছি।"

"সরকার বাই লেন কোথা আমি জানি না। আপনি আমার ভাড়া দিয়ে দিন, অন্য সোয়ারি করে যান।"

"আমার কাছে পয়সা নেই যে। আমাকে বাড়ি নিয়ে চল তখন পয়সা দেব।"

"সরকার বাই লেন আমি চিনি না।"

বচসা শুরু হল। কোলকাতার রিক্‌সাওয়ালা সহজে ছাড়বার পাত্র নয়। জগুও নিরুপায়। কথা কাটাকাটি চলতে লাগল। গোলমাল শুনে একটা বাড়ির দরজা খুলে গেল।

"কি হয়েছে খোকা?"

জগুর তখন চোখে জল। সে সব কথা খুলে বলল ভদ্রলোককে।

"ও, তুমি এই প্রথম কোলকাতা এসেছ বুঝি। কোথায় বাড়ি তোমার?"

"মানসাই। পূর্ণিয়া জেলায়।"

"ও! তোমার বাবার নাম কি?"

"নীলমণি মুখোপাধ্যায়।"

"নীলমণিবাবুর ছেলে তুমি? এস এস।"

ভদ্রলোক রিক্‌সাওয়ালাকে বিদায় করলেন। তারপর বললেন, "সরকার বাই লেন কোথায় তা আমিও চিনি না। তবে বার করতে পারব আশা করি। তুমি ততক্ষণ একটু কিছু খাও।" জগুর ক্ষিধে পেয়েছিল, সে আর আপত্তি করলে না। প্রচুর খাওয়ালেন ভদ্রলোক। তারপর একটা বই খুলে সরকার বাই-লেনের পাত্তা লাগালেন।

"এইবার চল, তোমাকে পেঁছে দিয়ে আসি।"

বিরাট মোটর বার করলেন একটা গ্যারেজ থেকে। দশ মিনিটের মধ্যে এসে হাজির হলেন নীলমণিবাবুর বাসায় রাত্রি সাড়ে দশটায়।

"চিনতে পারেন আমাকে?"

নীলমণিবাবু চিনতে পারলেন না।

"সেই যে মাছের ব্যবসা উপলক্ষে আপনার কাছে গিয়েছিলাম বছর কয়েক আগে? সেই যে রাত্রে বাটা মাছের ঝোল দিয়ে গরম গরম ভাত খাইয়েছিলেন, মনে নেই?"

নীলমণিবাবুর তখন সব মনে পড়ল।

"আপনার আশীর্বাদে মাছের ব্যবসা করে ভালই হয়েছে আমার। আপনার সাহায্যেই আমার প্রথম হাতে খড়ি। যোগাযোগ দেখুন, কতদিন পরে আবার দেখা। এখানে এসেছেন অসুখের চিকিৎসা করাতে? কোন্ ডাক্তার দেখছে?"

"ডাক্তার এস. কে. মিত্র।"

"আমি কাল নীলরতন সরকারকে নিয়ে আসব। তিনি আমার বাড়ির ডাক্তার। এটি কে? মেয়ে? বা চমৎকার দেখতে তো। বিয়ে হয়নি দেখছি। সুপাত্র আছে হাতে। আমার ভাগ্নে। আচ্ছা সে সব কথা পরে হবে এখন। আগে সেরে উঠুন।"

নীলমণিবাবু সেরে উঠলেন। তাঁর মেয়েরও বিয়ে হ'য়ে গেল ভদ্রলোকের ভাগ্নের সঙ্গে। নীলমণিবাবু খুব আনন্দিত হলেন অবশ্য, কিন্তু খুব বেশী বিস্মিত বা বিচলিত হলেন না। তাঁর মনে হ'ল যা ঘটা উচিত ছিল তাই ঘটল, এর মধ্যে অপ্রত্যাশিত বা বিস্ময়কর তিনি কিছু দেখ্‌তে পেলেন না। উক্ত মৎস্যব্যবসায়ী যদি এসব না করতেন, তাহলেই বরং তিনি আশ্চর্য হতেন। ভদ্রলোকমাত্রেই তো ভদ্রতা করবে, এতে আশ্চর্য হবার কি আছে!

সুলোচনা কিন্তু ঈষৎ অপ্রতিভ হয়ে পড়েছিলেন।

কোলকাতা থেকে ফিরে আসবার প্রায় মাস ছয়েক পরে একদিন নীলমণিবাবু প্রতিবেশী মহাদেববাবুর গাভীটির সেবা করছিলেন, নিজের হাতেই ঘাস দিচ্ছিলেন তাকে। কারণ মহাদেববাবু আসন্নপ্রসবা গাভীটিকে তাঁর কাছে রেখে নিশ্চিন্তমনে তীর্থ-ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। এমন সময় জন দুই কনস্টেবল সঙ্গে নিয়ে থানার নূতন দারোগাটি এসে হাজির হলেন।

বললেন, "দিন সাতেক আগে দুটি ভদ্রলোক কি আপনার বাড়িতে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন?"

"হ্যাঁ। কেন বলুন তো? খদ্দরধারী দুটি ছোকরা।"

"তারা পলিটিকাল আসামী। আপনাকে আমার সঙ্গে থানায় যেতে হবে।"

"চলুন।"

হাত ধুয়ে তিনি পুলিশদের অনুগমন করলেন। আর ফিরলেন না। বিচারে তাঁর জেল হ'ল এবং জেলে মৃত্যু হল।

পাঁচ বছর পরে বিধবা সুলোচনা এই নিয়ে দুঃখ করছিলেন তাঁর বোনের কাছে।

"চিরকালটা ভাই ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়িয়ে গেছেন। কত মানা করতাম, কিন্তু আমার কথা কানে তুলতেন না। কোথা থেকে যে অচেনা দুটো লোক এল! আর বাড়িতে কোন লোক এলে তো ওঁর জ্ঞান থাকত না, একেবারে অস্থির হয়ে উঠতেন। কত মানা করতাম আমি। এখন হাতে পয়সা নেই, জগুরও চাকরি হয়নি।"

হঠাৎ জগন্নাথ উত্তেজিত হ'য়ে এসে ঢুকল।

"মা, আমার চাকরি হয়ে গেল। অনেক ভালো ভালো ক্যাণ্ডিডেট ছিল। কিন্তু আমারই হয়ে গেল। কি করে হ'ল জান? সেই যে দুটি লোক একবার আমাদের বাড়িতে এসেছিল যার জন্যে বাবাকে পুলিশে ধরে নিয়ে যায়, তাদেরই একজন মিনিস্টার এখন। আমার পরিচয় শুনে বললেন—'ও তুমি নীলমণিবাবুর ছেলে? তোমাকে নিশ্চয়ই নেব। তোমার বাবা সেদিন রাত্রে আশ্রয় না দিলে হয়তো ফাঁসিই হয়ে যেত আমার। বস, বস।' খুব আদর-যত্ন করলেন। তারপর বললেন, "তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ি যাও, তোমার চাকরি হয়ে যাবে।"

সুলোচনা অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন। তারপর আঁচলে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগলেন।

নীলকণ্ঠ

নীলকণ্ঠ বন্দ্যোপাধ্যায় যে গুণী লোক এর একটা অকাট্য প্রমাণ আমি এসেই পেয়েছিলাম। আমার এক মাস্টার মশাই আমাকে বলেছিলেন যদি কোনও শহরে গিয়ে কোনও লোকের নামে নিন্দা শোন, তৎক্ষণাৎ তার সঙ্গে আলাপ কোরো, জেনো লোকটির মধ্যে বস্তু আছে কিছু। বাঙালী যতটা সমঝদার জাত, শ্রী-র স্বরূপ চিনতে দেরি হয় হয় না তাদের, কিন্তু সেই শ্রী পর-শ্রী হলে বেচারারা কাতর হয়ে পড়ে একটু। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাকে মর্যাদা দেয় খুব, সেলামই করে, কিন্তু বাঁ হাত দিয়ে। বাঙালীর মুখনিঃসৃত নিন্দাটা প্রশংসারই নামান্তর যেন। বাজে লোকের নিন্দা তারা

করে না। মাস্টার মশাই-এর এ উপদেশটা যে নিতান্ত বাজে নয় তার প্রমাণ একাধিকবার পেয়েছি।

নীলকণ্ঠবাবুর সঙ্গে আলাপ করা অবশ্য শক্ত একটু। তিনি থাকেন শহর থেকে বেশ একটু দূরে। তাঁর বাড়ির সিংহ দরজাটি লৌহনির্মিত এবং সেটি প্রায় সর্বদাই বন্ধ থাকে। সেটি খুলতে হলে গলার বেশ জোর থাকা চাই। কারণ যে ভৃত্য সেটি খোলে সম্ভবত সে একটু বধির, থাকেও সে বাড়ির ভিতর দিকে। উচ্চকণ্ঠে অনেক ডাকাডাকি না করলে তাকে কর্তব্য বিষয়ে সচেতন করা যায় না। তাছাড়া কুকুর আছে একটি, সেটি আবার কর্তব্য বিষয়ে একটু বেশী সচেতন। গেটের কাছে কেউ এসে দাঁড়ালেই হল, তার দাঁড়ানোর সন্তোষজনক হেতুনির্ণয় না হওয়া পর্যন্ত সে তারস্বরে চীৎকার করে। সম্ভবত তার চীৎকারেই নীলকণ্ঠবাবুর অর্ধবধির দ্বারপাল বুঝতে পারে যে কেউ এসেছে।

এত রকম বাধা থাকা সত্ত্বেও নীলকণ্ঠবাবুর সঙ্গে আমি দেখা করেছিলাম। খুব ভাল লেগেছিল ভদ্রলোককে। সাহিত্যবিষয়ে দু'চারটি মাত্র কথা বলেছিলেন। একটি কথা এখনও মনে আছে।

বলেছিলেন, "বাংলাসাহিত্যক্ষেত্রে বেকার সমস্যা দেখা দিয়েছে লক্ষ্য করেছেন কি?"

ব্যাপারটা ঠিক ধরতে পারলাম না। "কি ধরনের বেকার সমস্যা! আমাদের দেশে সাহিত্যিক মাত্রেই বোধহয় বেকার।"

"না, তা ঠিক নয়। যাঁরা কোনরকম সার্থক সৃষ্টি করেন না, অথচ যাঁরা লেখেন হয় পেটের দায়ে, না হয় মানসিক কণ্ডূয়ন নিবৃত্তির জন্য তাঁদেরই আমি বেকার বলছি। এঁরা প্রায়ই দেখবেন সমালোচক হন। এঁদের চেহারা দেখিনি কারও, কিন্তু আমার মনে হয় এঁরা সকলেই বোধহয় রোগা। সাহিত্য এবং সাহিত্যিকদের নিয়ে এঁরা যে-রকম ভাবনা ভাবেন, তাতে মনে হয় রাত্রে ঘুমই হয় না হয়তো অনেকের। বাংলাসাহিত্যের এই গার্জেনদের জটিল ভাষায় লেখা প্রবন্ধগুলো পড়লেই বুঝতে পারি বাংলা সাহিত্যের প্রাঙ্গনেও বেকারের দল ভীড় করছে। ওদের প্রবন্ধ পড়লে আমার একজনকে মনে পড়ে।" বলে তিনি স্মিতমুখে চুপ করে রইলেন। তারপরে বললেন, "মনে পড়ে নিধু পাগলাকে। নিধু পাগলা গাছেদের লক্ষ্য ক'রে হাত-পা নেড়ে ক্রমাগত উপদেশ দিত। একবার দেখেছিলাম একটা ফলন্ত কাঁঠাল গাছকে লক্ষ্য করে নিধু বলছে—একটিও কাঁঠাল ভাল হয়নি বাপু তোমার। এক দুই তিন চার পাঁচ ছয়, যাক আর গুনে সময় নষ্ট করতে চাই না, অনেক কাঁঠাল ফলিয়েছ মানছি, কিন্তু একটিও ভাল ফল হয়নি। আমাদের অনেক সমালোচকদের সেই দশা। এঁদের কেউ মানে না কিন্তু এঁরা সব মোড়ল সেজে বসেছেন।"

গুরুগম্ভীর সমালোচকদের তিনি নিধু পাগলার সঙ্গে তুলনা করলেন শুনে বেশ মজা লেগেছিল সেদিন। লোকটিকে কিন্তু আরও ভাল লেগেছিল। আমি যখন গেলাম তখন তিনি খুব ধুমধাম ক'রে ঘরে ধুনো দিচ্ছিলেন। চতুর্দিক গন্ধে ও ধূমে পরিপূর্ণ। বড় বড় চারটে পেতলের ধুনুচিতে জ্বলছিল ধুনো, গুগ্গুল, অগুরু আর চন্দন, কিছুদূরে বনবন ক'রে ঘুরছিল বড় ইলেকট্রিক ফ্যান একখানা, দেখে মনে হল ধুনুচির আগুন যাতে নিবে না যায় তাই এই ব্যবস্থা।

লোকটি প্রৌঢ়, ঈষৎ স্থূলকায়। মুখে কিন্তু শিশুর সারল্য! মনে হল আরও কাঁচ।

আমাকে বললেন, "কিসমিস খাবেন? অনেকদিন কিসমিস খাইনি, তাই কিছু আনিয়েছিলাম কাল।" নিজেই ব্যস্ত সমস্ত হয়ে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। একটু পরেই একটা শাদা পাথরের রেকাবি ক'রে প্রচুর কিসমিস এনে বললেন, "খান। একটু গোলাপ জলে ভিজিয়ে রেখেছিলাম। গোলাপ জলের গন্ধ ভাল লাগে তো আপনার। এই সবই হল আসল কাব্য! আসুন।"

প্রচুর কিসমিস খেয়েছিলাম সেদিন।

"আসুন, আর একটা মজার জিনিস দেখাই আপনাকে। টবের উপর ওটা কি বলুন তো, চেনেন?"

দেখলাম লতা একটা, ঠিক চিনতে পারলাম না। একটু অপ্রস্তুত মুখে চুপ ক'রে রইলাম।

"অপ্রস্তুত হবার দরকার নেই। এদেশে কেউ কিছু চেনে না। আমিও চিনতাম না কিছুদিন আগে। ওটা লজ্জাবতী লতা। কিন্তু এখন আর লজ্জা নেই, বেহায়া হয়ে গেছে. ছুঁয়ে দেখুন।"

ছুঁয়ে দেখলাম, বিশেষ কোনও পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম না।

"আগে ছোঁওয়ামাত্র পাতাগুলো মুড়ে যেত। এখন ক্রমাগত ছুঁয়ে ছুঁয়ে লজ্জাহীনা করে তুলেছি ওকে।"

কেমন যেন অদ্ভুতভাবে চেয়ে রইলেন আমার দিকে। তারপর একটু হেসে একটু শিস্ দিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন। পরমুহূর্তেই দেওয়ালের দিকে ভুরু কুঁচকে চাইলেন। দেখলাম সবুজ পোকা একটা চঞ্চলভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

"চেনেন ওটাকে?"

"না।"

"কাচপোকা। আমার স্ত্রীর খুব সখ ছিল কাচপোকার টিপ পরবার। অনেক টিপ পরিয়েছি তাকে। সে এখন নেই, পোকাগুলোকে দেখলে তার কথা মনে পড়ে। ভাবি ভাগ্যে তার টিপ পরার সখ ছিল তাই পোকাগুলো আর পোকা নেই, সবুজ স্মৃতি হয়ে গেছে আমার চোখে।"

আরও হয়তো আলাপ চলত কিছুক্ষণ। কিন্তু একটা ছোঁড়া চাকর এসে বললে, "খোকাবাবু ডাকছে আপনাকে ওপরে।"

"এই রে মাটি করেছে! আপনি এসেছেন টের পেয়ে গেছে বোধহয়। আমার কাছে কোনও লোক আসে, এটা ও পছন্দ করে না। আচ্ছা চললুম।" নমস্কার করে দ্রুতপদে চলে গেলেন। মনে হল মনিবের ডাকে চাকর ছুটে গেল বুঝি।

•

আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম নীলকণ্ঠবাবুকে দেখে সেদিন। এত বড় বিদ্বান লোক, ইয়োরোপের বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে বহু দিন কাটিয়েছেন, ফরাসী, জার্মানী, ইংরেজী ভাষায় ভাল ভাল বইও রচনা করেছেন অনেক—লোকটি কিন্তু একেবারে ছেলেমানুষ যেন।

ও'র নিন্দায় কিন্তু সকলেই শতমুখ। লোকটি নাকি অহঙ্কারী, স্বভাব-চরিত্রও

নাকি ভাল নয়, ও'র বইও নাকি ও'র লেখা নয়, বিদেশে কোন মেমসাহেবের প্রেমে পড়েছিলেন, সেই নাকি সব বই ও'র নামে লিখে দিয়েছিল, বড়লোকের ছেলে বলেই সব মানিয়ে যাচ্ছে ইত্যাদি অনেক রকম কথাই ওঁর বিরুদ্ধে শুনেছিলাম। ওঁর ছেলেটি এম-এ'তে ফার্স্ট হয়েছিল, কিন্তু লোকে বলত তা-ও নাকি অনেক রকম তদ্বির করার ফলে হয়েছে। টাকা ঢাললে সবই সম্ভব আজকাল।

যাই হোক যে প্রসঙ্গে নীলকণ্ঠবাবুর নামটা মনে পড়ল, সেই প্রসঙ্গটা এবার বলি। শহরে একটি ছোটখাটো লাইব্রেরী ছিল। ছেলে-ছোকরাদের শখ হল সেই লাইব্রেরীতে একটি বাংলাসাহিত্য সভা স্থাপন করবার। আমাদের শখ আছে—কিন্তু সামর্থ্যে কুলোয় না। শখ মেটাবার জন্যেও ভিক্ষাপাত্র হাতে করে দ্বারে দ্বারে ঘুরতে হয়, ঘুরেও সব সময় আশানুরূপ অর্থ জোটে না। একজন উপদেশ দিলেন, 'এখন যে নূতন কমিশনার সাহেব এসেছেন (তখনও আমরা স্বাধীনতা পাইনি) তিনি একজন সাহিত্যমোদী ব্যক্তি, তিনি ইচ্ছে করলে গবর্ণমেণ্টের তহবিল থেকে কিছু সাহায্য করতে পারেন।' কয়েকজন মিলে কমিশনার সাহেবের কাছে গেলেন। কমিশনার সব শুনে বললেন, "শুনেছি নীলকণ্ঠ ব্যানার্জি এখানে থাকেন। আমি তাঁর সঙ্গে অক্সফোর্ডে পড়তাম। তিনি যদি তোমাদের সভার ভার নেন তাহলে আমি শ'পাঁচেক টাকা দেব তোমাদের।"

নীলকণ্ঠ ব্যানার্জির উপর কেউ প্রসন্ন নন, কিন্তু স্বয়ং কমিশনার যখন তাঁর উপর প্রসন্ন তখন আর কথা কি। লোকটাকে দলে টানলে যদি শ'পাঁচেক টাকা পাওয়া যায় মন্দ কি! তাকেই না হয় সাহিত্যসভার সভাপতি করে দেওয়া যাক। উপায় কি তাছাড়া। কথা ছিল শহরের একজন বড় উকিলকে সভাপতি করা হবে। তিনি নগদ পাঁচ টাকা চাঁদাও দিয়েছিলেন। কেবল মাসিকপত্রের পাতা উল্টে সাহিত্যিক হতে চান যাঁরা তাঁদের মধ্যে একজন উক্ত উকিলকে ভোটে হারিয়ে দিয়ে নিজেই সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করবেন ভেবেছিলেন, কিন্তু সব ভেস্তে গেল। ওই অহঙ্কারী লোকটারই দ্বারস্থ হতে হল শেষকালে সবাইকে।

নীলকণ্ঠবাবু রাজি হলেন না। বললেন, "আমি নিজের পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত থাকি, ওসব ঝামেলার মধ্যে আমি যেতে পারব না। আমাকে মাপ করুন আপনারা। যদি কিছু চাঁদা চান, দিয়ে দিচ্ছি।"

লোকটার স্পর্ধা দেখে মনে মনে সবাই জ্বলে গেলেন কিন্তু মুখে খোশামোদ করে যেতে হল। প্রথমত কমিশনার সাহেব, দ্বিতীয়ত পাঁচশ টাকা। কমিশনার সাহেবের একজন ক্লার্ক (যাঁর পাকা মাথা থেকে বিলেতের মেমসাহেবের কাহিনীটা বেরিয়েছিল) গললগ্নীকৃতবাসে শেষকালে বলে বসলেন, "আপনি যদি এ সভায় না যোগ দেন, তাহলে আমার চাকরি যাবে। সাহেব যখন গোঁ ধরেছে তখন আর উপায় নেই। আপনি না গেলে একটি পয়সা তো দেবেই না আমাদের উপর খড়্গহস্ত হয়ে উঠবে। আপনি দয়া করুন। অন্তত যেদিন সভার উদ্বোধন হবে সেদিনটি আপনি সভাপতি হোন।"

নীলকণ্ঠবাবু আর আপত্তি করতে পারলেন না। সভার দিন স্থির হল। নীলকণ্ঠবাবু প্রতিশ্রুতি দিলেন তিনি ঠিক পাঁচটার সময় সভায় উপস্থিত হবেন।

কিন্তু তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করলেন না। পাঁচটা, সওয়া পাঁচটা, সাড়ে পাঁচটা বেজে গেল তবু নীলকণ্ঠবাবুর দেখা নেই।

সভায় লোক গিসগিস করছে, মাঝে মাঝে হাত-তালি শিস-দেওয়া যথারীতি চলছে, কলরবে চীৎকারে কান পাতবার উপায় নেই, সভার উদ্যোক্তারা এদিক ওদিক ছুটোছুটি করছেন কিন্তু নীলকণ্ঠবাবুর দেখা নেই। কাছে-পিঠে বাড়ি হলে কেউ ডাকতে যেত, কিন্তু তাঁর বাড়ি শহর থেকে বেশ দূরে, তাছাড়া তাঁর লোহার গেট, কালা চাকর আর কুকুরের কথা ভেবে যেতেও উৎসাহ হচ্ছিল না কারো, একটা বাইক জোগাড় করে আমিই যাব ভাবছিলাম এমন সময় তাঁর মোটরটা দেখা গেল।

সভায় যথারীতি সম্বর্ধনা-সঙ্গীত, অঙ্গভঙ্গী সহকারে আবৃত্তি, গীত-বিতান হারমোনিয়ামের উপর রেখে নাকিস্বরে রবীন্দ্র-সঙ্গীত প্রভৃতি প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে একে একে হল। সভাপতি তাঁর ভাষণে শেষকালে বললেন যে, সভায় ঠিক সময় আসতে পারেননি বলে তিনি দুঃখিত। তাঁর বাড়িতে একজন অতিথি কিছুদিন ছিলেন, তিনি হঠাৎ চলে গেলেন, তাঁর বিদায়কালীন ব্যবস্থা করতে গিয়ে বিলম্ব হয়ে গেল একটু। সবাই যেন তাঁকে ক্ষমা করেন। তারপর সাহিত্য সম্বন্ধে বেশ একটি সারগর্ভ বক্তৃতা দিলেন।

সভা শেষ হয়ে যাবার পর জানা গেল তাঁর একমাত্র ছেলেটি ঠিক সাড়ে চারটের সময় হার্টফেল করে মারা গেছে। সে নাকি অনেকদিন থেকে হৃদ্‌রোগে ভুগছিল।

চক্রবৎ পরিবর্তন্তে

উমাশংকরবাবু বিনয়কে যখন দেখিয়াছিলেন তখন তাহাকে পর্যবেক্ষণ করিতে পারেন নাই। পর্যবেক্ষণ করিবার সুবিধা ছিল না। বিনয় ট্রেনের একটি কামরা হইতে মুখ বাড়াইয়া প্ল্যাটফর্মের উপর কাহার সহিত যেন কথা কহিতেছিল, উমাশংকরের বন্ধু তিনকড়ি দেখাইয়া দিয়াছিল, “যে ছেলেটির কথা তোমাকে বলছিলাম ওই দেখ সেই ছেলেটি। চমৎকার দেখতে নয় ?”

তিনকড়িও বিনয়কে ভাল করিয়া চিনিতেন না। তিনিও তাঁহার বন্ধু হরপ্রসাদের নিকট সন্ধানটি পাইয়াছিলেন এবং কলিকাতার ট্রামে তাহাকে একবার মাত্র দেখিয়াছিলেন। দৈবাৎ আজ ট্রেনে আবার তিনি বিনয়কে দেখিতে পাইলেন এবং উমাশংকরকে দেখাইয়া দিলেন। কন্যাদায়গ্রস্ত উমাশংকরের কন্যা প্রতিমার জন্য তিনি সৎপাত্রের খোঁজে ছিলেন। হরপ্রসাদ তাঁহাকে বিনয়ের সন্ধান দিয়াছিলেন।

উমাশঙ্কর এবং তিনকড়ি স্টেশনে আসিয়াছিলেন অন্য প্রয়োজনে। অপ্রত্যাশিতভাবে বিনয়ের দেখা পাওয়া গেল। বলিষ্ঠ সুন্দর চেহারা। উমাশংকরের খুব পছন্দ হইয়া গেল। কিন্তু তাহাকে ভালো করিয়া দেখিবার (শুদ্ধ বাংলায় যাহাকে পর্যবেক্ষণ করা বলে) সুযোগ পাওয়া গেল না। ট্রেন ছাড়িয়া গেল। উমাশংকরবাবু ইহার পরেও বিনয়কে দেখিবার সুযোগ পান নাই। বিনয় থাকে বেরিলিতে, উমাশংকরবাবু থাকেন

বর্ধমানে। বিনয়কে দেখিতে হইলে অনেকগুলি গাঁটের পয়সা খরচ করিতে হয়। প্রয়োজন বুঝিলে উমাশঙ্করবাবু হয়তো তাহা করিতেন, কিন্তু তিনি প্রয়োজনই বোধ করিলেন না। পাত্রের অঙ্গসৌষ্ঠব দেখিবার জন্য কেহই বিশেষ ব্যগ্র হয় না, পাত্রী হইলে বরং কথা ছিল। সুতরাং বিনয়কে ট্রেনের কামরায় একনজর দেখিয়াই উমাশঙ্কর সন্তুষ্ট রহিলেন।

বিবাহের কথাবার্তা কিন্তু চলিতে লাগিল। তিনকড়ির সঙ্গেই একদা উমাশঙ্কর কলিকাতানিবাসী হরপ্রসাদের দ্বারস্থ হইলেন। হরপ্রসাদ বলিলেন, "বিনয়ের বাবাকে আমি চিনতাম। এক আপিসেই আমরা কাজ করতাম সিমলায়। তিনি অবশ্য মারা গেছেন, বিনয়ের মা-ও নেই। কিছু বিষয়-সম্পত্তি আছে ওদের, ছেলেটিও ভালো। বিয়ের মালিক ও নিজেই। লিখে দেখি ও যদি রাজী হয়। আপনি ছেলেটিকে দেখেছেন তো?"

"দেখেছি, খুব পছন্দ হয়েছে আমার।"

"ওর আর একটা ঝোঁক আছে। ও লেখাপড়া জানা মেয়ে বিয়ে করতে চায়। আপনার মেয়ে লেখাপড়া করেছে কতদূর?"

"বি-এ পাশ করেছে। বাংলায় এম-এ পড়ছে।"

"বাঃ, তাহলে তো ভালই। আমি তাকে চিঠি লিখছি, আপনিও লিখুন, ঠিকানা দিচ্ছি আপনাকে। ছেলেটিকে আপনি দেখেছেন তো ভাল করে, না দেখে থাকেন তো গিয়ে দেখে আসুন।"

"না, আর দেখবার দরকার নেই, যতটুকু দেখেছি তাই যথেষ্ট।"

"তাহলে বিবাহের প্রস্তাব করে চিঠি লিখুন, আমিও লিখছি. আমার মনে হয় হয়ে যাবে। বিনয় আদর্শবাদী ছেলে, পণ টন-ও আপনার লাগবে না তেমন।"

হরপ্রসাদ আসল কথাটি জানিতেন, কিন্তু ভাঙিলেন না। বন্ধুপুত্র বিনয়ের একটি ভালো বিবাহ দিবার জন্য তিনিও বহুদিন হইতে চেষ্টিত ছিলেন।

চিঠিপত্র চলিতে লাগিল। বিনয়ের পত্র পাইয়া উমাশঙ্কর অবাক হইয়া গেলেন। এ যুগে এমনটা হওয়া যে সম্ভব তাহা তাঁহার কল্পনাতীত ছিল। বিনয় মেয়ে পর্যন্ত দেখিতে চাহিল না। লিখিয়াছে 'আপনার কন্যা বি-এ পাশ করিয়াছে, তাহাকে দেখিতে গেলে সে হয়তো অপমানিত বোধ করিবে। ভাবী বধূকে অপমান করিবার ইচ্ছা আমার নাই। আপনি তো লিখিয়াছেনই মেয়েটি স্বাস্থ্যবতী ও সুন্দরী, ইহার পর মেয়ে দেখিতে যাওয়ার অর্থ আপনাকে অবিশ্বাস করা। তাহা করা কি উচিত? এই সব ভাবিয়া স্থির করিলাম মেয়ে দেখিতে যাইব না।'

উমাশঙ্কর অভিভূত হইয়া পড়িলেন। সত্যই এতটা তিনি প্রত্যাশা করেন নাই। তাঁহার আশা হইল এতদিনে বোধহয় মেয়েটার সদ্‌গতি হইবে। একমাত্র মেয়ে, উমাশঙ্করের অবস্থাও নিতান্ত খারাপ নয়, তবু তিনি কন্যার জন্য সৎপাত্র জুটাইতে পারেন নাই। যখনকার কথা বলিতেছি তখন ইংরেজের আমল, স্বদেশী আন্দোলনের অগ্নিযুগ চলিতেছে, বাঙলার নব জাগ্রত যৌবনকে নিষ্পিষ্ট করিয়া দিবার জন্য প্রতাপশালী ইংরেজ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। প্রতিটি যুবক-যুবতীর পিছনে স্পাই ঘুরিতেছে। যাঁহারা সরকারী চাকরি করেন, অথবা যাঁহারা ইংরেজের পদলেহী তাঁহারা বোমারুদের

সংস্রব যথাসাধ্য এড়াইয়া চলেন, সুযোগ পাইলে কেহ কেহ আবার তাহাদের ধরাইয়াও দেন। তাহাদের প্রতি সহানুভূতিশীল একদল লোকও অবশ্য ছিলেন, তাঁহারা তাঁহাদের ভক্তি করিতেন, কেহ কেহ সাহায্যও করিতেন। উমাশঙ্কর এই শেষোক্ত দলের লোক। গোপনে গোপনে তিনি বোমারুদের অর্থ সাহায্য করিতেন, মাঝে মাঝে দুই একজন পলাতক বোমারুকে আশ্রয়ও দিয়াছিলেন। তাঁহার মাতৃহীন কন্যা নন্দিনীরও অনুরূপ মনোভাব ছিল, শোনা যায় বাক্সের ভিতর সে ক্ষুদিরাম, কানাই, যতীন, উল্লাসকরের ছবিও নাকি লুকাইয়া রাখিত। ব্যাপারটা কিন্তু বেশী দিন চাপা থাকে নাই, অনেকেই জানিয়া ফেলিয়াছিল যে উমাশঙ্কর বোমারুদের প্রতি সহানুভূতিশীল। চাকুরিয়া এবং পদলেহীরা তাঁহাকে তাই এড়াইয়া চলিত। কন্যার জন্য পাত্র সংগ্রহ করাও তাই তাঁহার পক্ষে দুরূহ হইয়া উঠিয়াছিল। যে সম্প্রদায় হইতে মধ্যবিত্ত ব্যক্তিগণ সাধারণতঃ কন্যার জন্য পাত্র সংগ্রহ করেন, সে সম্প্রদায়ের অধিকাংশই চাকুরিজীবী। তাহারা যেই শুনিল যে উমাশঙ্করবাবুর সহিত টেররিস্টদের সম্পর্ক আছে, অমনি তাহারা পিছাইয়া গেল। ওই বাড়ীতে বিবাহ দিয়া কে পুলিশের কবলে পড়িতে যাইবে! পিতৃনাম স্মরণ করিয়া সকলেই তাঁহাকে এড়াইয়া যাইতে লাগিল।

উমাশঙ্করবাবু সত্যই বড় বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনকড়ির সহায়তায় বিনয়ের নাগাল পাইয়া তিনি যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন। বিনয় নামটাও তাঁহার খুব পছন্দ হইয়া গেল। বিপ্লবীদের ইতিহাসে 'বিনয়' নামটি স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। বলা বাহুল্য, নন্দিনীও মনে মনে খুব খুসী হইয়াছিল। বিনয়ের চিঠি পড়িয়া তাহার আনন্দের আর সীমা রহিল না। উমাশঙ্করবাবু তো আনন্দের সপ্তম স্বর্গে উত্তীর্ণ হইলেন।

স্বর্গ হইতে কিন্তু পতন হইল। বিবাহের দিন বিনয় যখন ট্রেন হইতে নামিল তখন উমাশঙ্করবাবুর চক্ষু কপালে উঠিল। তিনি এবং পাড়ার আর একজন মাতব্বর লোক মোটর লইয়া বিনয়কে স্টেশন হইতে আনিতে গিয়াছিলেন, দেখিলেন বিনয় ন্যাংচাইতে ন্যাংচাইতে ট্রেন হইতে নামিল। বিনয় খোঁড়া, ভয়ঙ্কর খোঁড়া। লাঠির সাহায্য ছাড়া চলিতেই পারে না। সঙ্গে বরযাত্রী একজনও নাই। সে একাই আসিয়াছে। উমাশঙ্করবাবু বজ্রাহতবৎ দাঁড়াইয়া রহিলেন। যে মাতব্বরটি সঙ্গে আসিয়াছিলেন তিনি একবার উমাশঙ্করের দিকে চাহিয়া উপরের ঠোঁট দিয়া নীচের ঠোঁটটি চাপিয়া ধরিলেন, তাঁহার নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত হইল, চক্ষুদ্বয় জ্বলজ্বল করিতে লাগিল। কিন্তু স্টেশনে ইহা লইয়া হুজ্জৎ করা শোভন নহে। খোঁড়া বিনয়কেই মোটরে চড়াইয়া তাঁহারা বর ও বরযাত্রীদের জন্য নির্দিষ্ট বাড়িটিতে লইয়া গেলেন। মাতব্বর ব্যক্তিটি যাইবার পূর্বে আড়ালে উমাশঙ্করকে ডাকিয়া বলিয়া গেলেন, "খাইয়ে-দাইয়ে বিদেয় করে দাও। ব্যাটাচ্ছেলে, জোচ্চোর!"

"সেটা কি ভালো হবে।"

"তোমার একমাত্র মেয়েকে খোঁড়া পাত্রের হাতে সম্প্রদান করবে না কি! যারা ঘটক তারা কোথায়?"

"তাদের তো আসবার কথা ছিল, কিন্তু কেউ এখনও পর্যন্ত এসে পেঁছয় নি।"

"সব যোগসাজস, ষড়যন্ত্র, বুঝতে পারছ না, দূর করে দাও ব্যাটাকে।" মোটরে

চাড়িয়া মাতব্বর ব্যক্তি চলিয়া গেলেন। মোটরটি তাঁহারই। উমাশংকর ক্ষণকাল ইতস্তত করিয়া অবশেষে বিনয়কে জিজ্ঞাসা করাই সমীচীন মনে করিলেন। গত্যন্তরও ছিল না।

"আচ্ছা, তোমার পা এমনভাবে খোঁড়া হয়ে গেল কি করে?"

"হাঁটুতে খুব চোট লেগেছিল একবার, বছর পাঁচেক আগে।"

"কি করে চোট লাগল, খেলতে গিয়ে কি?"

"মাপ করবেন, তা আমি বলতে পারব না।"

"কেন বলতে বাধাটা কি?"

"বলতে বাধা আছে।"

এ উত্তর শুনিয়া উমাশংকর স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। গোপন করিবার অর্থ কি? বিশেষত, হবু-শ্বশুরের কাছে! উমাশংকর কয়েক মুহূর্ত নীরব থাকিয়া দ্বিতীয় প্রশ্নটি করিলেন।

"তোমার সঙ্গে একজনও বরযাত্রী আসেনি কেন?"

"দু'চারজন আসতে চেয়েছিল কিন্তু ইচ্ছে করেই আনিনি। আমার হাঁটুতে কি হয়েছিল সেটা দু'একজন জানে, তাদের মুখ থেকে কথাটা হয়তো প্রকাশ হয়ে যাবে এই ভয়ে তাদের এড়িয়ে একলাই চলে এসেছি।"

"হরপ্রসাদবাবু কি জানেন ব্যাপারটা?"

"জানেন। কিন্তু তিনি আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, ব্যাপারটা কোথাও ফাঁস করবেন না।"

বিনয় হাসি মুখে উমাশংকরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

উমাশংকর আর সেখানে দাঁড়াইতে পারিলেন না। তাঁহারও সন্দেহ হইল ইহার অন্তরালে কোনও ভীষণ ষড়যন্ত্র প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে।

পাড়ায় একটা হৈ-চৈ পড়িয়া গেল। যাঁহারা কোনও কালেই উমাশংকরের হিতৈষী ছিলেন না তাঁহারা সহসা অত্যন্ত হিতৈষী হইয়া পড়িলেন। সকলেই লাঠি উঁচাইয়া বলিল, "ব্যাটা, জোচ্চরকে মেরে দূর করে দাও!"

উমাশংকরের অনেক আত্মীয়-স্বজন বিবাহ উপলক্ষে আসিয়াছিলেন। তাঁহারাও সকলে এ বিষয়ে একমত ছিলেন। উমাশংকরের বিষয়টি হস্তগত করিবার আশায় পাড়ার লক্ষ্মীকান্তবাবু তাঁহার নন-ম্যাট্রিক পুত্রটির সহিত নন্দিনীর বিবাহের প্রস্তাব করিয়া একদা বিফলমনোরথ হইয়াছিলেন, তাঁহার হৃদয়ে পুনরায় আশার সঞ্চার হইল। তিনি পুনরায় প্রস্তাবটি করিলেন।

"ওই খোঁড়া অজ্ঞাতকুলশীল লোকটার হাতে মেয়ে দেওয়ার চেয়ে আমার গদাইয়ের হাতে দেওয়া শতগুণে ভাল। ঘরের মেয়ে ঘরেই থাকবে। গদাই আজকাল কণ্ট্রাক্টরি করে বেশ রোজগার করছে।"

উমাশংকর হাঁ-না কিছুই বলিলেন না। সত্যই তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিলেন। উমাশংকরের দূরসম্পর্কীয় যে মাতুলটি আসিয়াছিলেন তিনিই অবশেষে বলিলেন, "ওর হাতে আমরা মেয়ে দেব না। তোমার বলতে যদি চক্ষুলজ্জা হয়, আমিই বলে আসছি গিয়ে।"

তিনি গিয়া দেখিলেন, বিনয় নাই।

চাকরটি মুচকি হাসিয়া বলিল, "তিনি নিজেই গাড়ি ডাকিয়ে স্টেশনে চলে গেছেন।"

ইহার খানিকক্ষণ পরেই কলিকাতা হইতে হরপ্রসাদ এবং তিনকড়ি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কি একটা বিশেষ কাজে আটকাইয়া পড়িয়াছিলেন বলিয়া সময় মতো উপস্থিত হইতে পারেন নাই।

সেইদিনই সন্ধ্যার পর স্টেশনের ওয়েটিং রুমে যে ঘটনা ঘটিল তাহাকে নাটকীয় আখ্যা দিলে অত্যুক্তি হইবে না। দৃশ্যটা এইরূপ। উমাশঙ্কর, উমাশঙ্করের মাতুল এবং তিনকড়ি তিনজনেই করজোড়ে বিনয়ের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন, বিনয় স্মিতমুখে তাঁহাদের বক্তব্য শুনিতেছেন।

উমাশঙ্কর বলিতেছেন, "আমাদের অপরাধ নিও না বাবা, আমরা তো জানতাম না, হরপ্রসাদবাবুর কাছে সব শুনলাম। রাত তিনটের সময় আর একটা লগ্ন আছে, চল।"

বিনয় প্রশ্ন করিল, "আপনার মেয়ের মত নিয়েছেন ?"

মাতুল বলিলেন, "সে বলছে আপনার সঙ্গে যদি বিয়ে না হয় তাহলে সে আর বিয়েই করবে না।"

তিনকড়ি বলিলেন, "উমাশঙ্করবাবু মেয়ের বাপ, তাঁর মনোভাবটা নিশ্চয়ই আপনি বুঝতে পারবেন, আপনি শিক্ষিত লোক, আপনাকে বেশী বলা বৃথা। চলুন।"

বিনয় বলিল, "যেতে পারি একটি সর্তে। তামা তুলসী গঙ্গাজল আর গীতা স্পর্শ করে আপনাদের শপথ করতে হবে যে যা শুনেছেন তা জীবনে কখনও প্রকাশ করবেন না।"

তিনজনেই সমস্বরে উত্তর দিলেন—"আমাদের কিছু আপত্তি নেই।"

বিনয় ন্যাংচাইতে ন্যাংচাইতে গিয়া পুনরায় মোটরে উঠিল।

হরপ্রসাদবাবু পরিস্থিতির গুরুত্ব দেখিয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়াছিলেন। প্রকাশ করিয়া দিয়াছিলেন যে বিনয় একদা একটি বিপ্লবী দলে ছিল। একবার সেই দল স্বদেশী ডাকাতি করিতে গিয়াছিল। পুলিশের সহিত সংঘর্ষের ফলে তাঁহার হাঁটুতে গুলি লাগে, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে পুলিশ তাহাকে ধরিতে পারে নাই, তাদের দলের লোকেরা তাহাকে কাঁধে করিয়া নিরাপদ স্থানে লইয়া যায়। দলের কেহই ধরা পড়ে নাই। তাহাদের মধ্যে দুই চারিজন এখন চাকরিও করিতেছে। কথাটা প্রকাশ হইয়া গেলে তাহাদের চাকরি থাকিবে না। তাই বিনয়ের এই সাবধানতা।

নির্বিঘ্নে বিবাহ হইয়া গেল।

পালোয়ান

আপনারা আজকালকার ছেলেদের যত বোকা মনে করেন তত বোকা তারা নয়। তাদের প্যাণ্ট পরা, গোঁফ ছাঁটা, তাদের পরীক্ষায় ফেল করা, তাদের গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়িয়ে বেড়ানো প্রভৃতি নিয়ে যাঁরা মাথা ঘামিয়ে অমূল্য সময় নষ্ট করেন তাঁদের

কাছে সবিনয়ে আমি একটি নিবেদন কেবল করব। তাঁরা আজকালকার ছেলেদের চেনেন না, চিনলে অতটা হতাশ হয়তো হতেন না। ইংরেজরা প্রথমে যখন এদেশে এসেছিলেন তখন আমাদের দেশের যে কি দুর্দশা ছিল তা ইতিহাসের পাতা ওলটালেই বুঝতে পারবেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদের পূর্বপুরুষেরা যে কত রকম কসরৎ করে, কত রকম ইংরেজী অভিধান মুখস্থ করে, কত রকম কায়দায় ইংরেজদের সেলাম করে, তাদের বাণিজ্য বিস্তারে সহায়তা করে তাদের সভ্যতার নকল করে যে জীবনযুদ্ধে জয়ী হয়েছিলেন তা-ও ইতিহাসের পাতা ওলটালেই জানতে পারবেন। আপনারা আড্ডায়, খবরের কাগজে, সভায় যাদের নিন্দা পঞ্চমুখে করেও শেষ করতে পারছেন না, আমি সবিনয়ে আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, তারাও পূর্বোক্ত ঐতিহাসিক মহাজনদেরই আধুনিকতম বংশধর। জীব জগতে কোথাও যা হয় না, মানুষের বেলাতেই বা তা হবে কেন ? আম গাছে আমই ফলবে, আমড়া নয়। ফলছেও, বাঙালীর ছেলের ঘিলু এখনও গোবর হয়ে যায়নি, কেবল রাজনীতির ছটকা একটু বদলে গেছে বলে বেচারা চাকরি পাচ্ছে না। কিন্তু তবু তারা দমে যায়নি, তার প্রমাণ চোখ মেললেই দেখতে পাবেন। কোনও সিনেমা, কোনও ফুটবল ম্যাচ, কোনও নাচ-গানের জলসা, কোনও সাহিত্যের মজলিশ, কোনও রাজনৈতিক সভা তারা বাদ দেয় না। তাঁদের পোষাক পরিচ্ছদ দেখুন, মনে হবে কি যে এই ছোকরা বেকার ? হবে না। তারা তাদের বাইরের মর্যাদাটুকু অন্তত অক্ষুণ্ণ রেখেছে। পালোয়ান পাকড়াশীর কাণ্ড দেখে সত্যি তাই মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়েছি।

বার চারেক ম্যাট্রিকুলেশন ফেল করে পালোয়ান আবিষ্কার করলে যে, সে চৌকাণা চৌকষ লোক, ম্যাট্রিকুলেশনের গোল গর্তে তার পক্ষে ঢোকা অসম্ভব। বাবাকে সে কথা বোঝাতেও চেষ্টা করলে, বাবা কিন্তু সেকেলে মানুষ, বুঝতে পারলেন না ব্যাপারটা, দাঁত মুখ খিঁচিয়ে জুতো নিয়ে তাড়া করে গেলেন। এরকম অবুঝ লোকের অধীনে বাস করে নিজের ভবিষ্যৎ নষ্ট করবার ছেলে পালোয়ান নয়। পালোয়ান পালাল একদিন বাড়ি থেকে। ছেলে পালিয়ে যাওয়া নিয়ে অনেকেই দেখি আজকাল নানারকম মন্তব্য করে, আড্ডায় আসর গুলজার করেন। একটা কথা তাঁরা ভুলে যান, বুদ্ধদেবও বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন, সেকালে খবরের কাগজ থাকলে সম্ভবত রাজা শুদ্ধোধনও 'নিরুদ্দেশ' শিরোনামা দিয়ে কাগজের সাহায্যে ছেলের খোঁজ করতেন।

পলাতক পালোয়ান পাকড়াশীও সিদ্ধার্থের মতো স্বকীয় ভাবনা অনুযায়ী সিদ্ধিলাভ করেছিল। যে সিদ্ধিলাভের জন্য বাঙালীর ছেলে নোটবুক মুখস্থ করে দলে দলে পরীক্ষা পাশ করছে সেই সিদ্ধিই লাভ করেছিল সে।

আমাদের ধর্মশাস্ত্রে বলে গঙ্গাই সর্বসিদ্ধি-প্রদায়িনী, কিন্তু এ যুগে আমরা জেনেছি ওটা বাজে কথা। সর্বসিদ্ধি-প্রদায়িনী যদি কিছু থাকে তার নাম রাজনীতি। পালোয়ান বাড়ি থেকে পালিয়ে রাজনীতি তরঙ্গে গা ভাসিয়ে দিয়েছিল। সিন্ধু-সমুদ্র-মুখিনী এ তরঙ্গিনীর বৈশিষ্ট্য অন্য তরঙ্গিনীর মতোই। এর তরঙ্গে গা ভাসালেও এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকা সম্ভবপর হয় না। প্রগতিশীলা এ তরঙ্গিনীর প্রবাহে একবার পড়লে নানা ঘাটের জল খেতে হয়।

পালোয়ানকেও খেতে হয়েছিল। সেও ক্রমান্বয়ে কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী, বামপন্থী, সমাজতন্ত্রী কমিউনিস্ট, র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্র্যাট প্রভৃতি হয়ে নানা ঘাটের জল খেয়ে শেষকালে যখন তীরে উঠল তখন চাকরি জুটে গেছে তার একটা। মাইনে বেশী নয়, কিন্তু ভবিষ্যৎ উন্নতির আশা আছে।

এই সময় তার সঙ্গে আমার দেখা হল একদিন হঠাৎ রাস্তায়। সহপাঠী ছিল, অনেকদিন পরে দেখা হওয়াতে আনন্দিত হলাম। কথা কইতে কইতে কখন যে কলেজ স্ট্রীট থেকে জগুবাবুর বাজারের কাছাকাছি এসে গেছি খেয়াল ছিল না। হেঁটেই যাচ্ছিলাম, পালোয়ানের রাজনৈতিক জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কাহিনী শুনতে শুনতে।

পালোয়ান হঠাৎ থেমে বললে—"এই কাছেই আমার মেস, যাবি ?"

গেলাম তার মেসে। তেতলার একখানি পুরো ঘর নিয়ে পালোয়ান থাকে দেখলাম। মার্জিত রুচির পরিচয় ঘরের চতুর্দিকে ছড়ানো। বললে মাত্র একশ কুড়ি টাকা মাইনে পায়, তাতে এরকম ভাবে থাকে কি করে ? প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আর একটি আরও বিস্ময়জনক ঘটনা ঘটল। এ ঘটনার পূর্বাভাস পেলে পালোয়ান আমাকে তার মেসে নিয়ে যেত না হয়তো।

একটি লোক ঘরে ঢুকে বলল—"সুখলালবাবু, আপনাকে নীচে ফোনে ডাকছে।"

"ও আচ্ছা, যাচ্ছি আমি !" আমার দিকে ফিরে বললে—"আসছি ভাই এখুনি—" সঙ্গে সঙ্গে চলে গেল।

আমি অবাক হয়ে ভাবতে লাগলাম—পালোয়ানের ভাল নাম কি সুখলাল ? জানতাম না তো ? টেবিলের উপর দেখলাম চিঠি রয়েছে অনেক। প্রত্যেকটির উপর যে নাম রয়েছে তা পালোয়ান পাকড়াশী নয়, সুখলাল রায়। সত্যিই বেশ অবাক হয়ে গেলাম। একটু পরেই পালোয়ান ফিরে এল। জিজ্ঞাসা করলাম "সুখলাল নাম তোর আগে শুনিনি।"

পালোয়ান স্মিতমুখে চুপ করে রইল ক্ষণকাল। তারপর হেসে বললে—"নাম বদলেছি। নামটা তো বাইরের পোষাক, দরকার মতো ওটা বদলাতে হয়। সুখলাল রায় নামটা কি খারাপ হয়েছে ? চমৎকার গোল নাম, নিজেকে বাঙালী, বেহারী, ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ এমন কি হরিজন বলেও চালানো যায়।"

তারপর আর একটু হেসে বললে, "চা খাবি, না কফি।"

"কিছু দরকার নেই। তুই নামটা বদলালি কেন সেইটেই বরং বল, অবশ্য বলতে যদি বাধা না থাকে।"

"না, তোকে বলতে আর বাধা কি। তবে কথাটা ব'লে বেড়াস না যেন। চল, বেরুই তাহলে, রাস্তায় যেতে যেতে বলব। আমাকে যেতেও হবে এক জায়গায়।"

দু'জনে বেরিয়ে পড়লাম।

পালোয়ান হেসে বললে, "এক জায়গায় মেয়ে দেখতে যাচ্ছি। যাবি ?"

"মেয়ে ? কার জন্যে ?"

"তোর যদি পছন্দ হয় তুইই বিয়ে করতে পারিস। তোকে আমার ভাই বলে পরিচয় দেব।"

ব'লে হাসলে একটু। তারপর আসল কথাটা বললে। মেয়ে দেখে বেড়ানো ওর

পেশা একটা। রোজ দু'টো করে মেয়ে দেখে, একটা সকালে, একটা বিকেলে। ওতেই প্রায় দু' বেলার খাওয়াটা হয়ে যায়। কন্যাপক্ষরা অভ্যর্থনার ত্রুটি করেন না।

বছর খানেক পরে—তখন আমি মেডিকেল কলেজে হাউস সার্জন, হঠাৎ একদিন ইডেনের সামনে পালোয়ানের সঙ্গে আবার দেখা।

"কিরে এখানে কেন ?"

"আমার বউ-এর পেটে অপারেশন হয়েছে।"

"কি অপারেশন ?"

"হিস্টেরেক্‌টমি। জরায়ুটা কেটে বাদ দিয়েছে একেবারে।"

"ছেলে পিলে হয়েছে তোর ?"

"না।"

"চল দেখে আসি।"

গিয়ে দেখলাম পালোয়ানের বউকে। বেশ রূপসী বউ। দুঃখ হ'ল তার আর ছেলে-মেয়ে হবে না ভেবে। অমন সুন্দরী মেয়ে, মা হলে কি চমৎকার মানাতো! নিঃসন্তান জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে বেচারার।

একেবারে ব্যর্থ কিন্তু হয়নি। উক্ত ঘটনার বছর খানেক পরে আবার দেখা হয়েছিল পালোয়ানের সঙ্গে চৌরঙ্গীতে। দেখলাম একটা দামী মোটরে সে তার বউকে তুলে দিচ্ছে। আমি যে ঠিক পেছনেই দাঁড়িয়েছিলাম তা সে টের পায়নি। মোটরটা যখন চ'লে গেল তখন ফিরেই সে আমাকে দেখতে পেল।

জিজ্ঞাসা করলাম—"মোটরে তোর বউ গেল, না ?"

"হ্যাঁ।"

"প্রাইভেট কার দেখলাম। তোর না তোর শ্বশুরের ?"

পালোয়ান হাসল একটু।

"চল, ওপরে চল, সব বলছি। হ্যাঁ, এই সিঁড়ি, আজকাল এইখানেই থাকি। ওপরে একটা ফ্ল্যাট্ নিয়েছি।"

আমার চক্ষু বিস্ফারিত হয়ে গিয়েছিল, এখানে ফ্ল্যাট্ নিয়ে থাকা সোজা নয়, অনেক পয়সা লাগে।

ওপরে গিয়ে একেবারে হকচকিয়ে গেলাম। রীতিমত আমিরী কাণ্ড কারখানা।

পালোয়ান হঠাৎ আমার দু' কাঁধে দুটো হাত রেখে বললে—"তোর কাছে লুকোব না কিছু! বউকে আমি ভাড়া দিই। মাসে অ্যাভারেজে হাজার দুই টাকা রোজগার হয়!"

বজ্রপাত হলেও আমি অত বিস্মিত হ'তাম না।

"তোর বউ আপত্তি করে না ?"

"প্রথম প্রথম করত, এখন আর করে না। কিছুদিন পরে ছবির পর্দাতেও ওকে দেখতে পাবি।"

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে জিজ্ঞাসা করলাম, "তুই নিজে এতে সুখী হয়েছিস্ ?"

"আমি আর একটা বিয়ে করেছি। সাদামাটা গেরস্ত ঘরের মেয়ে। মাস দুই আগে একটি খোকা হয়েছে। তোকে নিয়ে যাব একদিন সেখানে। যাবি ?"

গিয়েছিলাম। সত্যিই পালোয়ানের ছোট্ট সংসারটি চমৎকার। তার স্ত্রী অবশ্য একথা জানত না যে তার সংসার খরচের টাকা জোগাচ্ছে তার সুন্দরী সতীন। সতীনও পালোয়ানের দ্বিতীয় সংসারের খবর জানত না।

কিছুদিন আগেই চার্লি চ্যাপলিনের মঁশিয়ে ভারদু দেখেছিলাম, দেখে মুগ্ধও হয়েছিলাম। সুতরাং পালোয়ানের উপর রাগ করতে পারলাম না।

আপনারাও করবেন না।

কাক চরিত্র

আমি যেখানে বসিয়া লিখি তাহার ঠিক সামনেই একটি জানালা আছে। জানালা দিয়া খানিকটা আকাশ এবং একটি সজিনা গাছ দেখা যায়। সজিনা গাছের একটি ডাল আমার জানালার দিকে প্রসারিত। মনে হয় সে যেন আমার ঘরে ঢুকিয়া আমার সহিত আলাপ জমাইতে চায়। তাহার পত্র-পল্লব-ফুল-ফলের নীরব আলাপ দূরে হইতেই রোজ শুনি, প্রতি ঋতুতে তাহার আলাপের সুর বদলাইয়া যায় তাহাও লক্ষ্য করি, কিন্তু সবটা যে বুঝিতে পারি তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু তবু রোজ চাহিয়া থাকি। প্রত্যহ লিখিতে বসিয়া ওই তরুণ সজিনা-শাখাটির জন্য অনেকটা সময় ব্যয় করিতে হয়। একদিন এই সজিনা-শাখায় একটি কাক আসিয়া বসিল। শুধু বসিল না, নানাভাবে ঘাড় বাঁকাইয়া আমাকে দেখিতে লাগিল। মনে হইল সে-ও যেন আমার সহিত আলাপ করিতে উৎসুক। এ বিষয়ে আমার ঔৎসুক্য কম নয়। আড্ডা দিতে চিরকালই ভালবাসি। অবশ্য আড্ডাটা যদি মনোমত হয়। মানে তাহাতে যদি পরনিন্দা এবং পরচর্চার মশলা থাকে। সাধারণ লোকেদের সহিত এ বিষয়ে আমাদের (মানে, লেখকদের) বিশেষ কোনও তফাৎ নাই। একটু তফাৎ অবশ্য আছে। সাধারণ লোকেরা সকলের সহিত সমানভাবে আড্ডা দিতে পারে না। লেখকেরা পারে। আকাশ, বাতাস, ফুল, পশু, পক্ষী সকলেরই সহিত আড্ডা দিবার ক্ষমতা আছে তাহাদের, এ সব ক্ষেত্রে যে ভাষাও তাহারা ব্যবহার করে তাহা সাধারণ মানুষের ভাষা নয়, হৃদয়ের ভাষা। কল্পনার ভাষাও বলিতে পারেন।

এই ভাষায় উক্ত কাকের সহিত আমার আলাপ জমিয়া গেল। আপনাদের সুবিধার জন্য সে আলাপ বঙ্গভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া দিতেছি। হয়তো কিছু মজা পাইবেন।

"আপনাকে মশায় রোজ ঐ টেবিলে বসে থাকতে দেখি। কখনও হাঁটু দোলান, কখনও দাড়ির ভিতর আঙুল চালান, কখনও আকাশের দিকে চেয়ে শিস দেন। কি করেন বলুন তো ওখানে বসে ?"

"লিখি।"

"মানুষদের মধ্যে অনেকেই লেখেন দেখেছি। আমাদের খাজাঞ্চি মশাইও রোজ হিসেব লেখেন। আপনি ?"

"আমি গল্প লিখি, কবিতাও লিখি।"

"কিসের গল্প ?"

"মানুষেরই গল্প। তাদের সুখ-দুঃখ, রং-ঢং এই সব আর কি।"

"ও, তা আমি আপনাকে অনেক গল্প বলতে পারি। অনেক লোকের বাড়িতে যাই তো, অনেকেরই হাঁড়ির খবর রাখি। আমার কাছে কেউ কিছু গোপন করে না, মনে করে ও একটা কাক তো ! কিন্তু আমি সব বুঝতে পারি। বেশ মজা লাগে। আপনি আপনার পাশের বাড়ির লোকের যে খবর জানেন না, আমি তা জানি।"

"পাশের বাড়িতে তো নগেনবাবু থাকেন।"

"হ্যাঁ। তার কি খবর জানেন আপনি বলুন !"

"পোষাক-পরিচ্ছদ দেখে ভদ্রলোক বলেই তো মনে হয়। কথাবার্তাও ভালো। খুব দামী সুট প'রে রোজ বেরিয়ে যান আপিসে, মনে হয় ভালো চাকরিই করেন।"

"চাকরির খবর জানি না, কিন্তু বাড়িতে কি খান তা জানি। একবেলা মুড়ি, আর একবেলা এক-তরকারি ভাত, তাও নিরামিষ। ন'মাসে ছ'মাসে মাছ ঢোকে বাড়িতে। ভদ্দরলোক বাইরে খুব ফিটফাট বটে কিন্তু বগলে দাদ আছে, রোজ আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মলম লাগান। জানতেন এ-সব কথা ?"

স্বীকার করতে হইল জানিতাম না।

ঘাড়টি বাঁকাইয়া কাক পুনরায় সুরু করিল—"নিকুঞ্জবাবুকে চেনেন ?"

"চিনি বই কি। খুব গোঁড়া ধার্মিক লোক।"

"কক্ কক্ কক্।"

মনে হইল হাসিতেছে।

"নিকুঞ্জবাবু ধার্মিক হয় তো, কিন্তু ওঁর স্ত্রীটি ডুবে ডুবে জল খান। আমি রোজ সেই সময় ওদের উঠোনে গিয়ে ওদের এঁটো থালা-বাসন হাঁটকে দেখি যদি খাবারের টুকরোটাক্‌রা পাওয়া যায় কিছু। প্রায়ই থাকে না, ওরা অধিকাংশ দিনই ডিম খায় কি না।"

"নিকুঞ্জবাবর অতবড় টিকি, গলায় কণ্ঠি, কপালে তিলক, উনিও ডিম খান ?"

"উনি ডিমের যম একটি !"

কাক পুনরায় কক্ কক্ করিয়া হাসিতে লাগিল।

"দেখুন, আপনি আপনার পাড়া-পড়শীর কোন খবরই রাখেন না। আপনার জানালা দিয়ে দূরে ওই যে প্রকাণ্ড সাদা দোতলা বাড়িটা দেখছেন ওর খবর রাখেন কিছু ?"

"ওটা তো শালিকপুরের জমিদারের বাড়ি।"

"এককালে ছিল হয়তো। এখন ওর বংশের একগাদা ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাতনী হয়েছে। শালিকপুরের জমিদারি ভাগ হয়ে হয়ে চটকস্য মাংসের চেয়েও কম পড়েছে প্রত্যেকের ভাগে। কিন্তু ওদের ঠাট্‌টা দেখেছেন ?"

"তাতো দেখেছি।"

"পয়সা আসে কোত্থেকে ?"

"তাতো জানি না।"

"শুনুন তাহলে। হাবুলবাবু কালোবাজারের দালালী করেন, কমলবাবু করেন ঘুসের দালালী। বড় বড় অফিসাররা ওঁর মারফৎ ঘুস নেয়, উনি কমিশন মারেন।

চামেলী মেয়েটা একটা মাড়োয়ারীর সঙ্গে ভাব করেছে। রোজ বিকেলে প্রকাণ্ড একখানা মাস্টার বুইক আসে দেখেন নি? শেফালী সিনেমা-ডিরেক্টারকে বিয়ে করেছে। মণ্টু জুয়ার আড্ডায় ভিড়েছে। জানতেন এসব খবর?"

"না।"

"আরও শুনুন।"

কাক ক্রমাগত বলিয়া যাইতে লাগিল। অবাক হইয়া গেলাম। এতগুলি প্রতারক দুশ্চরিত্র নর-নারীর সান্নিধ্যে বাস করিতেছি, অথচ তাহাদের সম্বন্ধে কিছুই জানিতাম না। একটা লোকও ভাল নয়। কি আশ্চর্য!

"আবার আসব। আরও অনেক গল্প শোনাব আপনাকে।"

কাক উড়িয়া গেল। স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলাম। মনে হইল সজিনার ডালটাও যেন আমার দিকে চাহিয়া মুচকি মুচকি হাসিতেছে।

কাকটি উপর্যুপরি তিন দিন আসিল না।

চতুর্থ দিনে পুনরায় তাহার দেখা পাইলাম। মনে হইল কেমন যেন বিমর্ষ উস্‌কো-খুসকো ভাব।

"কি খবর?"

"খবর খুব সাংঘাতিক।"

"কি রকম?"

"এখনই আবিষ্কার করলাম যে বাচ্ছাগুলিকে এতদিন নিজের ব'লে মনে করছিলাম—সেগুলি আমার বাচ্ছা নয়, কোকিলের বাচ্ছা। একটিও আমার নয়।"

তাহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম কি করিয়া ইহা সম্ভব হইয়াছে।

কাক উত্তর দিল—"আমাকে কি আপনি নিকুঞ্জবাবু পেয়েছেন? কি করে সম্ভব হয়েছে তা আমার বিলক্ষণ জানা আছে। ওর সঙ্গে আর পোষাবে না। থাকুক ও কোকিলের বাচ্ছা নিয়ে। আমি আবার একটা জুটিয়ে নেব। ওদের তো অভাব নেই।"

কা কা করিতে করিতে কাক উড়িয়া গেল।

ছবি

ভ্রমর কুসুমকে ঘিরিয়া গান করে, চিরকালই করিতেছে। ইহাতে নূতনত্ব কিছু নাই। সেদিন কিন্তু কিছু নূতনত্ব হইল। যে যুবক-ভ্রমরটি অর্ধ-স্ফুট মালতীমুকুলের দিকে আবেগভরে উড়িয়া আসিতেছিল, সে সহসা থামিয়া গেল। মালতীমুকুলের কাছে ওটা কী? সাপ না কি! সাপের মতোই ফণা তুলিয়া আছে যেন! ভ্রমর দূর হইতেই উড়িয়া উড়িয়া দেখিতে লাগিল ব্যাপারটা কি। দেখিল জিনিসটা অনড়। সাপ হইলে নড়িত নিশ্চয়। সহসা খানিকটা রোদের ঝলক পড়িল তাহার উপর। চক্‌চক্‌ করিয়া উঠিল। ভ্রমরের বিস্ময় বাড়িয়া উঠিল। কি ওটা!…

সহসা তাহার চোখে পড়িল মালতীমুকুল আর একটু ফুটিয়াছে। আর সে আত্মসম্বরণ করিতে পারিল না। উড়িয়া গিয়া তাহাকে ঘিরিয়া গুঞ্জন করিতে লাগিল।

ঠিক পাশেই সাপের মতো ফণা তুলিয়া যে অদ্ভুত জিনিসটা ছিল তাহার অস্তিত্বই সে ভুলিয়া গেল।

কাছেই আরও দুইজন লোক আরও কয়েকরকম যন্ত্র লইয়া বসিয়াছিল, ভ্রমর তাহাদেরও দেখিতে পাইল না।

দুই বৎসর কাটিয়া গিয়াছে।

দেখিতেছি সেই ভ্রমর এখনও সেই মালতীমুকুলকে ঘিরিয়া গুঞ্জন করিতেছে। অর্ধ-স্ফুট মুকুল এখনও পূর্ণ প্রস্ফুটিত হয় নাই। যেমন ছিল, তেমনি আছে। সবই আছে, নাই কেবল······

"ছি, ছি কি করছ, ছাড় লাগে !'

"দুষ্টু কোথাকার, মিথ্যুক !"

"সত্যি লাগছে !"

হঠাৎ অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিলাম। আর একটা ছবি মানসপটে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। কি বলিতেছিলাম ? সবই আছে, নাই কেবল সেই সজীব শ্যামল কানন-কুঞ্জটি। ভ্রমর গুঞ্জন করিতেছে ছায়া-ছবির পরদায়। দুই বৎসর পূর্বে কৌশলী বিজ্ঞানীরা তাহার অভিসার-লীলার ছবি তুলিয়া লইয়া গিয়াছিল। সহসা মনে হইল দ্বিতীয় যে ছবিটি আমার মানসপটে জাগিল, যাহা বহুকাল পূর্বে হারাইয়া গিয়াছে, তাহা কি কোথাও কোনও ছায়াছবিতে এমনি করিয়া বাঁচিয়া আছে ?

দ্বিবিধ দৃষ্টিকোণ

তিনি বলিতেছিলেন, সকলে উদ্‌গ্রীব হইয়া শুনিতেছিল।

"দেখ, আমরা সকলেই ভ্রমণশীল, কেহই এক স্থানে স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে পারি না। বসিয়া থাকিবার উপায় নাই, জীবনই আমাদের চালিত করিতেছে, আন্তরিক প্রেরণার বশবর্তী হইয়াই আমরা ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছি। কত স্থানে যে গিয়াছি তাহার আর ইয়ত্তা নাই। কিন্তু সেদিন যে অদ্ভুত দেশে আমি গিয়া পড়িয়াছিলাম, তেমন বিচিত্র দেশে আমি আর কখনও যাই নাই, যাইব বলিয়া কল্পনাও করি নাই। সে দেশের গল্পই আজ তোমাদের শুনাইব।

আমি সেদিন যে ভ্রমণের উদ্দেশ্যেই বাহির হইয়াছিলাম তাহা নয়। আমি বাহির হইয়াছিলাম খাদ্যসন্ধানে। যে স্থানে প্রত্যহ খাদ্য পাই, সেই স্থানেই আমি গিয়াছিলাম, খাদ্যের সন্ধানও পাইয়াছিলাম। একাগ্র চিত্তে খাদ্য সংগ্রহ করিতেছি, এমন সময় এক প্রলয় কাণ্ড ঘটিয়া গেল। আমি যে স্থানটায় ছিলাম, সেই স্থানটাই যেন উৎক্ষিপ্ত হইয়া দূরে ছিট্‌কাইয়া পড়িল। আমি স্থানচ্যুত হইয়া একটা ঘন জঙ্গলের ভিতর পড়িয়া গেলাম। বিস্ময়ের ভাবটা যখন কাটিয়া গেল চারিদিকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিলাম, স্থানটা নিতান্ত মন্দ নহে। মোটামুটি খাদ্যদ্রব্য সবই পাওয়া যায়। কিছু কিছু সংগ্রহ করিলাম। তাহার পর ইচ্ছা হইল বাড়ি ফিরি,

আমার বিলম্ব দেখিয়া তোমরা হয়তো ভাবিতেছ। কি যে ঘটিয়াছে তাহা তোমাদের বলিবার জন্যও মনটা ছটফট করিতেছিল। সেই ঘন অরণ্য হইতে বাহির হইয়া কিন্তু ঘরের দিকে ফিরিতে পারিলাম না। একটা অপরূপ গন্ধ আমাকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। কিসের গন্ধ তাহা বুঝিতে পারিলাম না, কিন্তু ইহা নিঃসংশয়ে অনুভব করিলাম, ওই গন্ধকে অনুসরণ করা ছাড়া আমার উপায় নাই। একটা অদৃশ্য হস্ত যেন আমাকে টানিয়া লইয়া চলিল। কতক্ষণ চলিয়াছিলাম জানি না, কিছুক্ষণ পরে আবিষ্কার করিলাম আমি একটা কালো রঙের ঢিপির উপর উঠিয়াছি। ঢিপি হইতে নামিতে যাইব এমন সময় দেখিলাম, ঢিপিটাই চলিতেছে। সে-ও যেন গন্ধটাকেই অনুসরণ করিতেছে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া খানিকক্ষণ বসিয়া রহিলাম। তাহার পর লক্ষ্য করিলাম, ঢিপির উপর লম্বা গাছের মতো কি যেন রহিয়াছে। সেটা বাহিয়া উঠিতে লাগিলাম, কিছুদূর উঠিয়াই কিন্তু বিপন্ন হইতে হইল। কে যেন ঝট্‌কা মারিয়া আমাকে ফেলিয়া দিল। যেখানে আমি পড়িলাম তাহা পাথরের মতো কঠিন, ঘোর রক্তবর্ণ এবং অতিশয় মসৃণ। এরূপ দেশ পূর্বে কখনও দেখি নাই। সবুজের কোন চিহ্ন বা মাটির কোনও আভাস কুত্রাপি দেখিতে পাইলাম না। সেই মধুর গন্ধটা কিন্তু আরও তীব্র—আরও হৃদয়গ্রাহী হইয়া উঠিল। তাহা যেন আমার সমস্ত সত্তাকে আবিষ্ট করিয়া ফেলিল। আমি আচ্ছন্নের মতো দ্রুতপদে সেই মসৃণ কঠিন রক্তবর্ণ দেশ অতিক্রম করিতে লাগিলাম, সেই মধুর গন্ধই যেন আমার বাহক হইল। কিছুক্ষণ চলিবার পর আর একটি আশ্চর্যজনক বৃক্ষ দেখিলাম। বাদামী রঙ, সোজা উপরের দিকে উঠিয়া গিয়াছে। কিছুক্ষণ পূর্বে এইরূপ একটি অদ্ভুত বৃক্ষে আরোহণ করিয়া বিপন্ন হইয়াছিলাম, এই বৃক্ষটিতে উঠিব কি না ইতস্তত করিতে লাগিলাম। আমার ইতস্তত ভাব কিন্তু বেশীক্ষণ টিকিল না। যে গন্ধ আমাকে আকৃষ্ট করিতেছিল মনে হইল তাহার উৎস যেন ঊর্ধ্বে, অদৃশ্য শতধারায় তাহা যেন শূন্য হইতে বর্ষিত হইতেছে। আর আত্মসংবরণ করিতে পারিলাম না, সেই অদ্ভুত বৃক্ষে আরোহণ করিতে লাগিলাম। এবার কিন্তু কোনও বিপদ হইল না। বৃক্ষশীর্ষে উঠিয়া দেখিলাম, আর একটি নূতন দেশে উপনীত হইয়াছি। চতুর্দিক শ্যামল। এমন অদ্ভুত সবুজ রঙ্ আমি ইতিপূর্বে আর দেখি নাই। মুগ্ধ হইয়া গেলাম। মনে হইল, ইহাই বুঝি স্বর্গ। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া আরও মুগ্ধ হইতে হইল। দেখিলাম, বিরাট এক দুধের নদী সেই শ্যামল দেশের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত প্রবাহিত হইতেছে। বিস্ময়ে অবাক হইয়া গেলাম। তাহার পর আগাইয়া গিয়া দুগ্ধ পান করিতে লাগিলাম। আকণ্ঠ পান করিলাম। এমন সুস্বাদু সুমিষ্ট দুগ্ধ বহুকাল পান করি নাই। তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিতেছিল, বুকটা যেন জুড়াইয়া গেল। সেই সুমধুর গন্ধ কিন্তু তখনও আমাকে উন্মনা করিয়া তুলিতেছিল। চারিদিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিলাম, কাছাকাছি কোনও ফুল ফুটিয়াছে কি না। ফুল দেখিতে পাইলাম না, কিন্তু গন্ধের উৎসটি দেখিতে পাইলাম। দুগ্ধ-নদীর পরপারে বিরাট একটি হ্রদ রহিয়াছে, জলপূর্ণ হ্রদ নয়, মধুপূর্ণ হ্রদ। সেই হ্রদ হইতেই যে এই অপূর্ব সৌরভ নিঃসৃত হইতেছে তাহাতে সন্দেহ রহিল না। সেই হ্রদের সমীপবর্তী হইবার জন্য আকুল হইয়া উঠিলাম। কিন্তু সেই বিরাট দুগ্ধনদী অতিক্রম করিব কিরূপে? শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া তাহা সমস্ত দেশটাই জুড়িয়া রহিয়াছে। নদীর

তীরে তীরে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম, যদি সন্তরণযোগ্য কোনও ক্ষীণ ধারা পাই।…”

যিনি কাহিনীটি বলিতেছিলেন তিনি রবিনসন্ ক্রুশো, গ্যালিভার অথবা সিন্ধবাদ নহেন, সামান্য একটি পিপীলিকা মাত্র। তাঁহার দৃষ্টি দিয়া তিনি যাহা দেখিয়াছিলেন মানবীয় দৃষ্টিতে তাহা এইরূপ—

এক কাঠুরিয়া একটি গাছের ডাল কাটিতেছিল। ডাল যখন ছিন্ন হইল, তখন তাহা একটি ঝোপের মধ্যে পড়িল। ডালে একটি পিপীলিকা ছিল, সেটিও ঝোপে পড়িয়া গেল। যে ব্যক্তি গাছের ডাল কাটাইতেছিলেন তিনি ঝোপের নিকটে দাঁড়াইয়া ছিলেন। পিপীলিকা ঝোপ হইতে বাহির হইয়া তাঁহার জুতার উপর উঠিল। তিনি যখন বাড়ি ফিরিলেন তখন পিপীলিকা তাঁহার পা বাহিয়া হাঁটুতে উঠিয়াছে। তিনি হাত দিয়া তাহাকে ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। পিপীলিকা তখন লাল সিমেণ্ট বাঁধানো ঘরের মেঝের উপর পড়িল। সেখান হইতে সে একটা টেবিলের নিকট উপনীত হইল। টেবিলের পায়া বাহিয়া সে সবুজ অয়েল-ক্লথ-মোড়া টেবিলে আরোহণ করিল। টেবিলের উপর একটু আগে খানিকটা দুধ পড়িয়া গিয়া নানা ধারায় বহিয়া যাইতেছিল। টেবিলের উপর একটি বড় কাচ পাত্রে খানিকটা মধুও ছিল।

শিল্পী

অহির সহিত নকুলের অথবা ঘাসের সহিত ছাগলের বন্ধুত্ব আছে ইহা কল্পনা করা কঠিন। জিতুবাবুর সহিত কিন্তু পানুর বন্ধুত্ব ছিল, যদিও তাহাদের খাদ্য-খাদক সম্পর্ক। জিতুবাবু সুদখোর মহাজন আর পানু তাঁহার কবলস্থ খাতক। উভয়ের মধ্যে কোন সাদৃশ্যই ছিল না, চেহারারও নয়, বয়সেরও নয়। জিতুবাবুর বয়স ষাটের কাছাকাছি, পানুর বয়স চল্লিশের নীচে। জিতুবাবু কালো, বেঁটে এবং ঈষৎ কুঁজো, সামনের দিকে ঝুঁকিয়া থাকেন, সোজা দাঁড়াইতে পারেন না। পানু ছিপছিপে লম্বা, উন্নত মস্তক এবং সুদর্শন। মতেরও কিছু মিল নাই। জিতুবাবু সুদখোর মহাজন, অর্থসঞ্চয় করাই তাঁহার জীবনের লক্ষ্য এবং আনন্দ। পানু চিত্রকর, ছবি আঁকিয়া আনন্দ পায়, রং আর তুলি লইয়া খেলা করে এবং পয়সা পাইলে উড়াইয়া দেয়। তবু দুইজনের বন্ধুত্ব আছে এবং তাকে প্রগাঢ় বিশেষণে ভূষিত করিলেও মিথ্যাভাষণ হয় না। জিতুবাবু কখনও যাহা করেন না পানুর ক্ষেত্রে তাহা করেন অর্থাৎ বিনা সুদে, বিনা হ্যাণ্ডনোটে তাহাকে টাকা দেন। আর পানুও কখনও যাহা করে না, জিতুবাবুর ক্ষেত্রে তাহা করে—অর্থাৎ প্রতিশ্রুতি মতো ঠিক দিনে ঋণটি পরিশোধ করিয়া দেয়। দুই চারিদিন পর আবার তাহাকে জিতুবাবুর নিকট হাত পাতিতে হয়, জিতুবাবুও পুনরায় টাকা দিতে আপত্তি করেন না। এইভাবেই বহুকাল হইতে চলিতেছে। জিতুবাবুর ধারণা ঃ পানু একটা লক্ষ্মী-ছাড়া, পানুর ধারণা ঃ জিতুবাবু লোকটি স্বল্পবুদ্ধি জানোয়ার বিশেষ। পরস্পর পরস্পরের প্রতি অনুকম্পাশীল, অথচ বন্ধুত্বও খুব।

সেদিন জিতুবাবু পানুর ঘরে ঢুকিয়া থমকাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন। তাঁহার আনন ঈষৎ ব্যায়ত হইয়া গেল। জিতুবাবু নিঃশব্দ চরণে প্রবেশ করিয়াছিলেন। পানু টের পায় নাই। সে পিছন ফিরিয়া ছবি আঁকিতেছিল। কুব্জ জিতুবাবু কয়েক মুহূর্ত নীরবে নির্ণিমেষে চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর কথা কহিলেন।

"ওটা কি আঁকছ, পেত্নীর ছবি না কি।"

পানু ঘাড় ফিরাইয়া মৃদু হাসিল।

"আর একটু দূরে থেকে দেখুন, তা হ'লে বুঝতে পারবেন।"

জিতুবাবু একটু পিছাইয়া গেলেন। ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া আর একবার দেখিয়া বলিলেন, "সুঁট্‌কো কালো মেয়েমানুষ একটা সামনের দিকে একটু ঝুঁকে রয়েছে। এই তো? বুকের কাছটা কি বিশ্রী করেছ, এ যে অশ্লীল একেবারে হে! দাঁত বার করে হাসছে আবার। এই ছবি বাজারে বার করবে না কি?"

"বহরমপুরের এক জমিদার হাজার টাকা দিয়ে কিনেছেন ছবিটা।"

"বল কি! হাজার টাকা! পেয়েছ টাকাটা?"

"না পাইনি এখনও। ছবি যেদিন নেবেন সেইদিনই টাকাটা দেবেন বলে গেছেন।"

"ও।"

জিতুবাবু কপালের উপর বাম হাতটা রাখিয়া পুনরায় ছবিটি দেখিলেন। তাহার পর মন্তব্য করিলেন, "আমার বিশ্বাস তিনি আর আসবেন না। বদ্ধ পাগল না হলে এ ছবি পয়সা দিয়ে কেউ কেনে না। মেয়েমানুষই যদি আঁকলে একটা ভদ্র চেহারা আঁকলে না কেন। এই সুঁট্‌কো মেয়ে আঁকবার কল্পনা তোমার হল কি করে?"

পানু ক্ষণকাল স্মিতমুখে জিতুবাবুর দিকে চাহিয়া রহিল।

তাহার পর প্রশ্ন করিল—"কালিদাস কে জানেন?"

"জানি বই কি। ব্যাংকের সেই কেরাণী ছোক্‌রা তো?"

"না, আমি কবি কালিদাসের কথা বলছি।"

"ও, হ্যাঁ হ্যাঁ—শুনেছি নামটা।"

"তাঁর মেঘদূতের সঙ্গে যদি পরিচয় থাকত তাহলে বুঝতে পারতেন ছবির মানেটা।"

"কি রকম।"

"তাতে কবি যক্ষ-প্রিয়ার যে বর্ণনাটা দিয়েছেন তা অনেকটা এই রকম—

তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠি
মধ্যে শ্যামা চকিত হরিণী প্রেক্ষণা
নিম্ননাভিঃ॥
শ্রোণীভারাদলসগমনা স্তোকনম্রা
স্তনাভ্যাং
যা তত্র স্যাদ যুবতিবিষয়ে সৃষ্টিরাদ্যেব
ধাতুঃ—"

জিতুবাবু ঈষৎ ব্যায়ত আননে মন্দাক্রান্তা ছন্দে রচিত বিখ্যাত শ্লোকটির আবৃত্তি শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া মনে মনে ভাবিলেন: ছোক্‌রার গুণ আছে অনেক। এই সব কারণেই পানুকে ভালবাসেন তিনি।

"শ্লোকের মানে কি ?"

"যক্ষ-প্রিয়ার চেহারা কেমন ? না, তিনি তন্বী, মানে ছিপছিপে, আপনার ভাষায় সুঁটকো, শ্যামা কিনা শ্যামাঙ্গিনী, শিখরিদশনা মানে যার দাঁতের অগ্রভাগ সূক্ষ্ম, পক্কবিম্বাধরোষ্ঠি মানে যার নীচের ঠোঁট পাকা তেলাকুচো ফলের মতো, মধ্যে শ্যামা, যার কোমর খুব সরু, চকিত হরিণীপ্রেক্ষণা—যার ছোট চোখ দুটি চকিত হরিণীর মতো, নিম্ননাভিঃ—যার নাভিদেশ খুব গভীর, শ্রোণীভারদলস-গমনা যিনি নিতম্বের ভারে আস্তে আস্তে চলেন, স্তোকনম্রা স্তনাভ্যাং—স্তনের ভারে যিনি ঈষৎ অবনত—"

জিতুবাবু হাত তুলিয়া পানুকে থামাইয়া দিলেন।

"হয়েছে হয়েছে থাম। আমি তো গোড়াতেই বলেছিলাম—পেত্নী! কবি কালিদাস না হয় সংস্কৃতে বলেছেন যক্ষ-প্রিয়া। যক্ষ মানে ভূত! যাক—আমি যেজন্য এসেছিলাম বলি। টাকাটা সোমবার দিতে পারবে ?"

"আমার তো টাকা দেবার কথা বুধবার।"

"তা জানি। কিন্তু সোমবার পেলে আমার ভাল হত!"

"আপনি তো ব্যাংকে জমা দেবেন ? বুধবারেই দেবেন না হয়, সেদিনও তো ব্যাংক খোলা।"

"ব্যাংকে জমা দেব না। অন্য কাজ আছে।"

"কেন আমাকে মিছে ধাপ্পা দিচ্ছেন। আমি জানি এ টাকা আপনি একটিও খরচ করেন না, সব জমা দেন।"

জিতুবাবুও হাসিয়া ফেলিলেন।

"না খরচ করব না। তবে ব্যাংকেও পাঠাব না।"

"পুঁতবেন না কি ?"

জিতুবাবু বিস্মিত হইয়া গেলেন।

"কি করে জানলে তুমি ?"

"আন্দাজ করলুম।"

"কথাটা ঘুণাক্ষরে যেন প্রকাশ না পায় ভাই। ইনকাম ট্যাক্সের যে রকম ব্যাপার ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট দেখতে চায়। তাই ভেবেছি যে সব টাকার খবর খাতায় নেই সেগুলো পুঁতে রাখব।"

"বেশ, বুধবারেই পুঁতবেন।"

"সোমবার ভাল দিন। আমি দু'তিনজনকে দিয়ে পাঁজি দেখিয়েছি। মাত্র একশোটা টাকা তো—দিয়ে দিও ভাই।"

"আমার কাছে এক কপর্দকও নেই এখন। বহরমপুরের জমিদার মঙ্গলবার লোক পাঠাবেন বলে গেছেন, সেই দিনই না হয় টাকাটা দিয়ে দেব আপনাকে সন্ধ্যাবেলা।"

"না, সোমবার সকালে আমার চাই। দিও বুঝলে।"

জিতুবাবু পানুর হাত দুইটি ধরিয়া ফেলিলেন।

পানু স্মিতমুখে বিপন্ন জিতুবাবুর মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত চাহিয়া থাকিয়া হাসিয়া ফেলিল। কি অসহায় জীব!"

"বেশ, চেষ্টা করব ।"

"চেষ্টা নয়, চাই-ই সেদিন !"

"বেশ ।"

শুক্রবার সকালে পানু এক ঝুড়ি লিচু লইয়া জিতুবাবুর বাসায় হাজির হইল । হাতে একটি পাঁজি । পাঁজি খুলিয়া পানু বলিল, "আজও দিন ভাল, এই দেখুন । শিবু ভট্‌চাজ দেখে দিয়েছে ।"

"সোমবার দিন তো আমি কাজ চুকিয়ে ফেলেছি । আর ভাল দিন দেখে কি হবে !"

পানু হাসিয়া বলিল—"আমি সেদিন আপনাকে যে একশ টাকার নোটটা দিয়েছিলাম সেটা বার করে এই টাকাগুলো সেখানে রেখে দিন ।"

"কেন ?"

"সে নোটটা জাল ছিল । আমি এঁকে দিয়েছিলাম । আপনি নিজেকে খুব বুদ্ধিমান মনে করেন, কিন্তু আপনার চোখে ধুলো দেওয়া কত সহজ দেখুন । এই নিন—একশ টাকার কয়েন ।"

গণিয়া গণিয়া টাকাগুলি জিতুবাবুর সম্মুখে রাখিয়া পানু বলিল, "আপনি লিচু ভালবাসেন তাই আপনার জন্য কিছু লিচু কিনে নিয়ে এলাম । আপনার জন্যে খুব ভাল একটা স্টীল-বক্‌সেরও অর্ডার দিয়েছি । কাল নাগাদ পেয়ে যাবেন ।"

জিতুবাবু বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে গিয়াছিলেন ।

"এসব বলছ কি তুমি ?"

"ঠিকই বলছি । বহরমপুরের জমিদার মঙ্গলবার দিন এসে ছবিটা নিয়ে গেছেন । আমি বুধবারেই আসতাম, কিন্তু শিবু ভট্‌চাজ বললে বুধ বৃহস্পতি দুটো দিনই খারাপ । তাই আজ এসেছি, আজ দিন ভালো । নোটটা আমাকে বার করে দিন ।"

"হাজার টাকা দিয়ে ছবিটা কিনে নিয়ে গেল ?"

"হ্যাঁ । আগামী সপ্তাহে কিন্তু আমার কিছু চাই । বেশী নয় গোটা পঞ্চাশেক ।"

"হাজার টাকা তো পেয়েছ ?"

"সব ফুঁকে দিয়েছি ।"

পানুর চোখের দৃষ্টিতে হাসি ঝলমল করিতে লাগিল ।

রূপান্তর

দৈত্যটিকে দেখে আমি মোটেই ভয় পেলাম না, বরং খুশীই হলাম । দৈত্য আমার দিকে খানিকক্ষণ হাসিমুখে চেয়ে রইল, তারপর বলল, "আমি সর্বশক্তিমান, তোমার কি চাই বল ?"

"একটি চাকরি ।"

"কি রকম চাকরি ?"

"ভালো চাকরি ।"

"বেশ, তাহলে তুমি এইখানে অপেক্ষা কর । আমি একটু ঘুরে আসি ।"

প্রকাণ্ড দৈত্য লম্বা লম্বা পা ফেলে চলে গেল। আমি চুপ করে বসে রইলাম। দৈত্যটির গগনচুম্বী শির, তালগাছের মতো প্রকাণ্ড বড় বড় চোখ দেখে আমি বসে বসে আশা করতে লাগলাম, এত বড় শক্তিমান পুরুষ নিশ্চয়ই আমার জন্যে ভাল চাকরি জোগাড় করতে পারবেন একটা।

কিছুক্ষণ পরে দৈত্য ফিরল। তার বগলে প্রচুর কাগজ, হাতে একটা ফাউণ্টেন পেন।

"দরখাস্ত লেখ।"

"কোথায় দরখাস্ত লিখতে হবে?"

"ঠিকনা এনেছি।"

কয়েকটি খবরের কাগজ আমার সামনে ফেলে দিয়ে দৈত্য বললে—"এগুলোর মধ্যে অনেক চাকরির খবর আছে। সব জায়গায় দরখাস্ত করে দাও। তারপর আমি ওগুলো নিয়ে টাইপ করিয়ে যেখানে যেখানে দেবার দিয়ে আসব।"

পঁচিশ খানা দরখাস্ত লিখে দৈত্যের হাতে দিলাম। দৈত্য চলে গেল। খানিকক্ষণ পরে যখন সে আবার ফিরল তখন বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেলাম দৈত্য আর দৈত্য নেই বামন হয়ে গেছে। আমার সামনে দাঁড়িয়ে সে মুচকি মুচকি হাসতে লাগল।

"কি হল?"

কোনও কথা বললে না, দু'হাতের বুড়ো আঙুল নাড়তে লাগল শুধু।

"আপনি অত ছোট হয়ে গেলেন কি করে?"

"অপমানে! আগে বুঝিনি, কিন্তু এখন বুঝছি চাকরি দেবার যাঁরা মালিক তাঁরা আমার চেয়েও ঢের বেশী শক্তিমান।"

"আমার গতি তাহলে কি হবে?"

"গতি করেছি একটা।"

বামন পিছন দিকে ঘাড় ফিরিয়ে একটু ইশারা করতেই একটি ভদ্রলোক শূন্য থেকে আবির্ভূত হলেন।

"এঁর একটি সুন্দরী বয়স্থা মেয়ে আছে। তাকে তুমি বিয়ে কর। ইনি তোমাকে নগদ পাঁচ হাজার টাকা পণ দেবেন। সেই টাকা দিয়ে ছোটখাটো ব্যবসা কর একটা।"

এই বলে বামন অদৃশ্য হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পূর্বে যার ললাট গগন স্পর্শ করেছিল দেখতে দেখতে শূন্যে মিলিয়ে গেল সে।

বামনের আদেশ অমান্য করিনি। এই যে মনোহারী দোকানটি দেখছেন এটি আমার শ্বশুর মশায়ের টাকাতেই করেছি।

দৈত্য আর বামনের কথা শুনে আপনারা হয়তো অবিশ্বাসের হাসি হাসছেন, ভাবছেন হয়তো গাঁজা-টাজা খাই।

না, সে সব কিছু নয়। জ্ঞান-সমুদ্রে আমি যে জালটি ফেলেছিলাম তাতে একটি কলসী উঠেছিল, আর সেই কলসীর ভিতর ছিল ওই দৈত্যটি! কলসীটির নাম ডিগ্রি আর দৈত্যটির নাম অহমিকা। আরব্য উপন্যাসে এই কাহিনীরই আপনারা যে রূপ দেখেছেন এ গল্পে সে রূপ নেই। থাকবে কি করে? আমি তো আরবী নই আমি বাঙালী, আর দেশটাও আরব নয়, ভারতবর্ষ।

প্রারব্ধ

রাত্রি দশটা বাজিয়া গেল, বিশ্বম্ভর তখনও আপিস হইতে ফিরিল না। পত্নী দুর্গামণি খোকাকে ঘুম পাড়াইয়া তাহার পাশেই শুইয়া ছিল। পাশের বাড়ির ঘড়িতে দশটা বাজার শব্দে উঠিয়া বসিল। এখনও উনি আপিস হইতে ফিরিলেন না কেন? বিশ্বম্ভর ব্যাংকে কাজ করে, আপিস হইতে ফিরিতে তাঁহার একটু দেরী-ই হয়, কিন্তু এতো দেরী তো কোনদিন হয় না। ইহার পর দুর্গামণির মনে পড়িল ও-বেলার রাঁধা ভাত ডাল তরকারি খারাপ হইয়া গেল না তো! চাল ডাল ফুরাইয়াছে, এবেলা তাই সে রাঁধিতে পারে নাই। বাজার করিতে গিয়াই কি উনি এত দেরি করিতেছেন? কিন্তু আজ তো মাহিনা পাইবার দিন নয়, কাল মুদির দোকান হইতে ধারেই জিনিসপত্র কিনিয়া দিবেন বলিয়া গিয়াছেন, এত রাত্রে কি মুদির দোকান খোলা আছে? এই ধরনের নানা চিন্তা দুর্গামণির মনে জাগিতে লাগিল। তাহার পর মনে পড়িল এ মাসে কাপড়ও কিনিতে হইবে। একটা মশারি কিনিলেও ভালো হয়, যে মশারিটা আছে তাহা বড়ই পুরাতন হইয়া গিয়াছে, একটু টান পড়িলেই ছিঁড়িয়া যায়, তালির পর তালি পড়িয়াছে, আর কত তালি দেওয়া যায়, দিয়া লাভও নাই, ঠিক তালির পাশটিতেই ছিঁড়িয়া যায় আবার। তাহার পর মনে পড়িল দুই মাসের বাড়ি-ভাড়া বাকী পড়িয়াছে। বাড়ি-ওলা প্রত্যহ আসিতেছে। সেমিজ ছিঁড়িয়াছে, বালিশের ওয়াড় নাই। এসব কথা স্বামীর কাছে বলিতেও তাহার সংকোচ হয়। মাত্র পঁচাত্তর টাকা তো মাহিনা। আগে কিছু বাঁচিত কিন্তু খোকা হওয়ার পর, খরচ বাড়িয়াছে। দুধের রোজ করিতে হইয়াছে, টুকিটাকি নানা জিনিসও কিনিতে হয়। উনি সংসারের ন্যায্য খরচের বিষয় কৃপণ, কিন্তু খোকনের বেলায় দিলদরিয়া। সেদিন পট্ করিয়া গোটা দুই রঙীন ফ্রক কিনিয়া আনিয়াছেন, কিছুই দরকার ছিল না অথচ সমস্ত মাসের খরচ দুই সের ডাল তাহা প্রাণে ধরিয়া কিনিয়া দিতে পারেন না। বলেন দেড় সের হইলেই চলিয়া যাইবে। খোকনের বয়স তিনমাস হইতে না হইতেই তাহার জন্য একটি রঙীন ঝাড়া কিনিয়া আনিয়াছিলেন, নগদ দুই টাকা খরচ করিয়া! এমনি নানা কথা মনে পড়িতে লাগিল দুর্গামণির। কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া সে আবার খোকনের পাশে শুইয়া পড়িল।

বিশ্বম্ভর ফিরিল রাত্রি বারোটার পর। দুর্গামণি ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল।

"তুমি কি ক'রে এলে, সদর দরজা তো বন্ধ!"

"চুপ! আমি জানলা গ'লে ঢুকেছি!"

"কেন?"

"চেঁচিও না, সব বলছি। এই নাও।"

বিশ্বম্ভর একটা কাগজের প্রকাণ্ড পুলিন্দা দিলেন।

"কি এতে?"

"টাকা। ত্রিশ হাজার টাকা।"

"ত্রিশ হাজার টাকা! কোথা পেলে?"

"কালই জানতে পারবে। আমি এখন চললুম। টাকাটা সাবধানে রেখ, লুকিয়ে রেখ। এই টাকা দিয়ে খোকনকে মানুষ কোরো, আমি হয়তো আর ফিরব না, ফিরতে পারব না। কিন্তু তোমরা সুখে আছ, টাকার অভাবে কষ্ট পাচ্ছ না, এ ধারণাটাকেই আঁকড়ে যেখানেই থাকি আমি সুখে থাকব। টাকাটা কিন্তু সাবধানে রেখ আর পারো তো কালই বাপের বাড়ি পালিয়ে যেও—আমি চললুম। খোকন ঘুমুচ্ছে?"

ঘুমন্ত খোকনকে বুকে তুলিয়া বিশ্বম্ভর চুম্বন করিল। দুর্গামণিকেও করিল। তাহার পর ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। আবার ফিরিয়া আসিল।

"ভেবে দেখলাম তোমাদের এখানে থাকা ঠিক নয়। তোমরাও আমার সঙ্গে চল। তোমাকে বাপের বাড়িতে রেখে দিয়ে যাই। টাকাটা তা না হলে হয়তো বেহাত হ'য়ে যাবে। এখুনি হয়তো পুলিশ এসে পড়বে।"

পরদিন জানা গেল ব্যাংকের খাজাঞ্চিকে হত্যা করিয়া বিশ্বম্ভর ত্রিশ হাজার টাকা অপহরণ করিয়াছে। যথারীতি পুলিশ তদন্ত করিতে লাগিল। বিশ্বম্ভর কিন্তু ধরা পড়িল না। পুলিশ বিশ্বম্ভরের শ্বশুরবাড়িতে গিয়াও হানা দিয়াছিল, কিন্তু দুর্গামণির নিকট হইতে কোনও কথা বাহির করিতে পারে নাই। দুর্গামণি বলিয়াছিল বিশ্বম্ভর তাহাদের সেই রাত্রেই এখানে জোর করিয়া লইয়া আসিয়াছিল। কেন, কি বৃত্তান্ত কিছুই বলে নাই। সেই রাত্রেই বিশ্বম্ভর চলিয়া গিয়াছে, তাহার পর আর ফেরে নাই, কোনও খবরও দেয় নাই।

পুলিশ প্রশ্ন করিয়াছিল—"টাকার কথা কিছু জান?"

"না।"

বিশ্বম্ভর স্বহস্তে টাকাটা মাটির নীচে পুঁতিয়া দিয়া গিয়াছিল। কোথায় পুঁতিয়াছে তাহা অবশ্য দুর্গামণির অবিদিত ছিল না।

বিশ্বম্ভর রাত্রির অন্ধকারে হাঁটিতে লাগিল। হাঁটিতে হাঁটিতে সে অবশেষে খড়্গপুর স্টেশনে পৌঁছিল। শুনিল একটু পরেই নাকি মাদ্রাজ মেল আসিবে। মাদ্রাজেরই একটা টিকিট কাটিয়া সে মাদ্রাজ মেলে চড়িয়া বসিল। মাদ্রাজে পৌঁছিয়া সে বেশ পরিবর্তন করিয়া কুলি সাজিল। কিছুদিন কুলি-গিরি করিয়াই কাটাইল। তাহার পর একটা মিলে কিছুদিন কাজ করিল। রিক্‌শা টানিল কিছুদিন। দেখিতে দেখিতে দুই বৎসর কাটিয়া গেল। তাহার পর আসিল গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলন। একজন নেতা দোকানে পিকেটিং করিবার জন্য 'ভাড়া-করা' ভলান্টিয়ার নিযুক্ত করিতেছিলেন। বেশী মজুরির লোভে বিশ্বম্ভর কিছুদিন ভলান্টিয়ারিও করিল। কিন্তু বেশীদিন করিতে সাহস করিল না, মনে করিল পুলিশের সংস্রব এড়াইয়া চলাই ভালো। একটা হোটেলে কিছুদিন কাজ করিল, নানারকম রান্না শিখিল। তাহার পর একটা সাহেবের খানসামা হইয়া গেল। সাহেবের সিংহলে নারিকেলের ব্যবসা ছিল, মাদ্রাজ হইতে তিনি সিংহলে গেলেন। বিশ্বম্ভরও তাঁহার সহিত গেল। সাহেবের নারিকেল ব্যবসায় সিংহলেই সীমাবদ্ধ ছিল না, সুমাত্রা, জাভা, বোর্নিয়ো প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জেও বিস্তৃত কারবার ছিল তাঁহার। বিশ্বম্ভর তাঁহার ভৃত্যরূপে সর্বত্র ভ্রমণ করিল। তাহার আচার-ব্যবহার, বেশ-বাস, ভাব-ভঙ্গীর অনেক পরিবর্তন ঘটিল, পূর্বপরিচিত অনেক কিছুই সে ভুলিয়া গেল, কিন্তু দুর্গামণি ও খোকনকে এক নিমেষের জন্য ভুলিল না। তাহারা যে সুখে আছে, অর্থাভাবে কষ্ট পাইতেছে না, এই ধারণায় মশগুল হইয়া সে সর্বপ্রকার দুঃখকে তুচ্ছ করিতে লাগিল।

প্রায় ত্রিশ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। যে সাহেবের অধীনে বিশ্বম্ভর চাকরি করিতেছিল সে সাহেবও আর বাঁচিয়া নাই। বিশ্বম্ভরের কর্ম-তৎপরতায় সন্তুষ্ট হইয়া তিনি বিশ্বম্ভরকে তাঁহার একটা কুঠির ম্যানেজার পদে উন্নীত করিয়া গিয়াছেন। বিশ্বম্ভরের আজ অর্থাভাব ঘুচিয়াছে। তাঁহার ব্যাংকে বেশ কিছু টাকা জমিয়াছে। হঠাৎ কিন্তু একদিন একটা বিপর্যয় ঘটিয়া গেল। মানসিক বিপর্যয়। বিশ্বম্ভরের মনে হইল সে নিজের স্ত্রী পুত্রের জন্য প্রচুর অর্থ রাখিয়া আসিয়াছে বটে কিন্তু যে নিরীহ খাজাঞ্চিকে হত্যা করিয়া সে টাকাটা সংগ্রহ করিয়াছিল তাহার পরিবারের জন্য সে তো কিছুই করে নাই! খাজাঞ্চি লোক খারাপ ছিল না, তাহার বিস্ফারিত চক্ষু যুগল, রক্তাক্ত দেহটা বিশ্বম্ভরের মানসপটে ফুটিয়া উঠিল। হাতুড়ির এক আঘাতেই তাহার মৃত্যু হইয়াছিল, সে ভালো করিয়া আর্তনাদও করিতে পারে নাই। সে-ই হয়তো পরিবারের একমাত্র ভরসাস্থল ছিল…চিন্তাটা ক্রমশ তাহাকে পাইয়া বসিল। সে অস্থির হইয়া উঠিল, তাহার আশংকা হইতে লাগিল এই পাপের ফলে দুর্গামণি এবং খোকনও হয়তো কষ্ট পাইতেছে। টাকা পাইয়াও হয়তো কিছু সুবিধা হয় নাই, হয়তো পুলিশে টের পাইয়াছে, হয়তো চোরে বা ডাকাতে চুরি করিয়া লইয়াছে…। বিশ্বম্ভর বিনিদ্র রজনী যাপন করিতে লাগিল। অবশেষে সে ঠিক করিল দেশে ফিরিবে, খাজাঞ্চির খোঁজ করিয়া, তাহার পরিবারবর্গকে কিছু অর্থ দিয়া আসিবে। সম্ভব হইলে দুর্গামণি ও খোকনের খবরও লইবে।

বিশ্বম্ভর দেশে ফিরিয়া প্রথমে খাজাঞ্চিরই খোঁজ করিল। শুনিল তাহার একটি পুত্র এক সওদাগরি অফিসে চাকুরি করে। ঠিকানা সংগ্রহ করিয়া সে তাহাদের বাসায় গিয়া হাজির হইল। বলিল, "আমি আপনাকে কিছু টাকা দিতে এসেছি। বিশ্বম্ভর বাবু টাকাটা পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

"বিশ্বম্ভর বাবু কে!"

"যিনি আপনার বাবাকে খুন করেছিলেন।"

"ও! কোথায় তিনি?"

"মারা গেছেন। আমাকে দশ হাজার টাকা দিয়ে গেছেন, বলে গেছেন আমি যেন টাকাটা আপনাকে দিয়ে দিই।"

"আপনার সঙ্গে তাঁর দেখা হ'ল কি করে?"

"সিলোনে আমরা একসঙ্গে ছিলাম।"

"ও, আচ্ছা। সন্ধ্যাবেলা আসবেন, তখনই টাকা নেব। এখন আমি একটু দরকারে বাইরে বেরুচ্ছি।"

বিশ্বম্ভর ভাবিয়াছিল ছেলেটির চোখে সে ধুলা দিতে পারিয়াছে। সন্ধ্যাবেলায় ফিরিয়া আসিয়া কিন্তু তাহার ভুল ভাঙিল। ছেলেটি পুলিশে খবর দিয়াছিল। ঘরে ঢুকিতেই তাহাকে বন্দী করিয়া ফেলিল। বিশ্বম্ভর আর স্ত্রী-পুত্রের সন্ধান লইবার সময় পাইল না।

বিচারে বিশ্বম্ভরের ফাঁসি হইয়া গেল।

একটি খবর জানিতে পারিলে বিশ্বম্ভরের মনোভাব কি হইত তাহা জানি না। হয়তো হাসিমুখে মৃত্যুবরণ করিত, কিংবা অদৃষ্টের নির্মম পরিহাসে বিস্মিত হইত। যে বিচারক তাহার ফাঁসির হুকুম দিল সে তাহার খোকন। যে অর্থ সে রাখিয়া গিয়াছিল সেই অর্থে-ই সুশিক্ষিত হইয়া বিলাত হইতে আই. সি. এস. পাশ করিয়া খোকন জজ হইয়াছিল।

চুনোপুঁটি

পাঁচ বৎসর পরে পুঁটি দেশে ফিরিতেছে। দেশ মানে, মোহনপুর গ্রাম। এই মোহনপুর হইতে পুঁটিকে একদা পলায়ন করিতে হইয়াছিল। সে চুরি কিম্বা খুন করে নাই, বস্তুত পিনাল কোডের কোনও ধারাই তাহার গ্রাম-ত্যাগের হেতু ছিল না। তাহার অপরাধ—সে কালো। তদুপরি পিতৃহীন এবং দরিদ্র। শতাধিক লোক তাহাকে দেখিতে আসিয়াছিল, কিন্তু কেহই তাহাকে বধূরূপে নির্বাচন করিবার প্রেরণা পায় নাই। পুঁটির বিধবা মা একজনের পায়ে পর্যন্ত ধরিয়াছিলেন তবু তাহার মন গলে নাই। শরৎবাবুর 'অরক্ষণীয়া' গল্পেরই পুনরাবৃত্তি চলিতেছিল। এক্ষেত্রেও একজন বড়লোকের ছেলে ছিল। গ্রামেরই একজন ধনী মহাজনের পুত্র, ধীরেশ। পালটি ঘর বলিয়া পুঁটির মা সসংকোচে একদিন তাহার নিকট কথাটা পাড়িয়াছিলেন। ধীরেশ তাহার প্রিয় বন্ধু কদমের সহিত বেড়াইতে বাহির হইয়াছিল, পুঁটির বিধবা মা পুকুরে জল আনিতে যাইতেছিলেন। সুযোগ দেখিয়া পুঁটির মা কথাটা তাহার কাছে পাড়েন। তাহার উদ্দেশ্য ছিল, ধীরেশ যদি আশ্বাস দেয় তাহা হইলে তাহার বাবার পায়ে গিয়া আছড়াইয়া পড়িবেন। কথাটা শুনিয়া ধীরেশ কয়েক মুহূর্ত ভ্রূযুগল উত্তোলন করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ছোকরা বি-এস-সি পর্যন্ত পড়িয়াছিল।

হঠাৎ প্রশ্ন করিল—“নেপচুনের নাম শুনেছেন?”

“নেপচুন? না। নেপালের নাম শুনেছি। ও হ্যাঁ, আমাদের ফুলুর খোঁড়া ছেলের নাম নেংচু রেখেছিল, তার কথাই বলছ কি, ওরা তো এখানে নেই।”

কদম বলিল—“ও কথা ছেড়ে দিন মাসীমা। ধীরুর বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে এক জায়গায়।”

“ও, তাতো জানতুম না বাবা। আমার পুঁটির জন্যে একটি পাত্র দেখে দাও না বাবা তোমরা।”

“চেষ্টা করব।”

পুঁটির মা চলিয়া গেলে কদম জিজ্ঞাসা করিল।

“হঠাৎ নেপচুনের কথা ওঁকে জিগ্যেস করলে কেন?”

“বামন হয়ে চাঁদে হাত কথাটা প্রচলিত আছে। কিন্তু বামন হয়ে নেপচুনে হাত দিতে চাইছেন উনি। সেই কথাটাই ওঁকে বুঝিয়ে দিতে চাইছিলাম।”

“কল্পনা বটে তোমার।”

কদম মুগ্ধ দৃষ্টিতে ধীরেশের দিকে চাহিয়া রহিল। ধীরেশ বলিল, “মেয়েটার রং যদি আর একটু ফরসা হ'ত তাহলেও ভেবে দেখতাম। মুখ চোখ গড়ন ভালই, কি বলিস।”

কদম বাম চক্ষুটি কুঞ্চিত করিয়া মনোভাব প্রকাশ করিল।

ইহার পর হইতে পুঁটির বাড়ির চারিদিকে গ্রামের যুবকদের আনাগোনা শুরু হইয়া গেল। কেহ 'সিটি' দিত, কেহ বাঁশি বাজাইত, কেহ কেহবা জটলা করিত।

পুঁটির মা অবশেষে পুঁটিকে লইয়া গভীর রাত্রিতে একদিন গ্রাম ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। কাহাকেও বলিয়া গেলেন না, কোথায় যাইতেছেন।

পাঁচ বৎসর পরে পুঁটি তাহাদের জ্ঞাতিপুত্র চঞ্চলকুমারকে জানাইয়াছে যে সে তাহার স্বামীর সহিত মোহনপুরে আসিতেছে। চঞ্চলকুমার যেন তাহার বাড়িটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করাইয়া রাখে। ইহার জন্য সে দুইশত টাকা টেলিগ্রাফিক মণিঅর্ডার যোগে পাঠাইয়াও দিয়াছে।

সকলে অবাক হইয়া গেল।

নির্দিষ্ট দিনে পুঁটি ও তাহার স্বামী আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদের দেখিয়া গ্রামবাসীদের বিস্ময়ের মাত্রা আরও বাড়িয়া গেল। পুঁটির সাজসজ্জা রাণীর মতো। সঙ্গে তিনজন চাকর, দুইজন ঝি। পুঁটির স্বামী অনিন্দ্যকান্তি, ঠিক যেন রাজপুত্র ! চোখ ধাঁধিয়া গেল সকলের। পুঁটি বলিল, "বছর খানেক আগে মা মারা গিয়েছেন। তাঁর শেষ ইচ্ছে ছিল বাৎসরিক শ্রাদ্ধের পর গ্রামের লোকদের ভাল করে খাওয়াতে। সেই জন্যই বিশেষ ক'রে এসেছি আমরা।"

বিরাট আয়োজন করিয়া বিরাট ভোজের আয়োজন করিল সে। গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা, আপামর চণ্ডাল, ইতর ভদ্র কেউই বাদ গেল না। গরীব দুঃখীদের কাপড় দিল, পয়সা দিল। গ্রামের স্কুলে, মন্দিরে মোটা টাকা চাঁদা দিল। ধীরেশ এবং কদমেরও তাক লাগিয়া গেল। গরীব দুঃখীরা ধন্য ধন্য করিতে লাগিল।

গ্রামের পাড়াপড়শীরা যাহারা পূর্বে পুঁটির রূপ লইয়া কত ঠাট্টা, কত বিদ্রূপ করিত তাহারা দলবদ্ধ হইয়া আসিয়া শতমুখে পুঁটির রূপের এবং ভাগ্যের প্রশংসা করিতে লজ্জাবোধ করিল না। পুঁটির স্বামীকে লইয়া গ্রামের ছোকরারা উন্মত্ত হইয়া উঠিল। যেমন রূপ, তেমনি গুণ, যেমন ধনী, তেমনি দিলদরিয়া মেজাজ। চাহিতে না চাহিতে গ্রামের ফুটবল ক্লাবে, শখের থিয়েটারে, হরিসভায় ঝনাৎ ঝনাৎ করিয়া চাঁদা দিল। সকলের সহিত একদিন থিয়েটারও করিল। গানের কি গলা !

দুই সপ্তাহ মোহনপুরকে মাতাইয়া অবশেষে বিদায় লইল তাহারা।

বর্ধমান স্টেশন।

পুঁটি বলিল, "চুণো দা এইখানেই নাববে ?"

"হ্যাঁ। টাকাটা দিয়ে দাও।"

"দিচ্ছি। দুশো টাকাই নেবে ?"

"বাঃ, তাই তো কথা হয়েছিল।"

"বেশ নাও।"

টাকাটা বাহির করিয়া দিল। তাহার পর বলিল, "কেমন যেন স্বপ্নের মতো পনেরটা দিন কেটে গেল ! আহা, যদি সত্য হত।"

"স্বপ্ন কখনও সত্যি হয় ? চললুম, আবার স্টুডিওতে দেখা হবে।"

চুণো দা—ওরফে চুণীলাল নামিয়া গেল।

চুণীলাল এবং পুঁটি উভয়েই অভিনেতা অভিনেত্রী। মায়ের শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য পুঁটি চুণীলালসহ গ্রামে গিয়া স্বামী স্ত্রীর অভিনয় করিয়া আসিল।

ট্রেন চলিতেছে। প্রথম শ্রেণীর কামরায় খোলা জানলার সামনে দিগন্তের দিকে চাহিয়া পুঁটি একা বসিয়া আছে। মাথার চুল উড়িতেছে, শাড়িটা এলোমেলো হইয়া যাইতেছে, কিন্তু সেদিকে তাহার লক্ষ্য নাই, নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছে সে।

অনেক টাকা রোজগার করিয়াছে সে। বাড়ি গাড়ি সব হইয়াছে। অনেক শাড়ি, অনেক জামা, অনেক গহনা কিনিয়াছে, অনেক লোক তাহার পিছু পিছু ঘোরে। কিন্তু—।

সহসা তাহার চোখ দিয়া কয়েক ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল।

ভদ্রলোক

ভদ্রলোকের বিবেকেই গলদ ছিল, তাহার উপর ট্রেনটা ছিল লেট্। তিনি হাওড়া স্টেশনে নামিয়া ঘড়িটার দিকে চাহিয়া দেখিলেন। সাড়ে দশটা বাজিয়া গিয়াছে। প্রয়োজন ছিল না, তবু আরও কয়েক সেকেন্ড ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ঘড়িটার দিকেই চাহিয়া রহিলেন। ঘড়ি কোন সান্ত্বনা দিল না। প্লাটফর্মের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত চাহিয়া দেখিলেন, কেহই আসে নাই। একটু আরাম বোধ করিলেন। ভদ্রলোকের সহিত মুখোমুখি হইয়া গেলে একটু অপ্রস্তুত হইতে হইত। ভদ্রলোক আর একবার ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন। স্টেশনে না আসিবার অসংখ্য কারণ থাকিতে পারে—ব্যাপারটা ইচ্ছাকৃত নিশ্চয়ই নয়, হইতেই পারে না, কিন্তু যতীনবাবুকে স্টেশনে অনুপস্থিত দেখিয়া তিনি বেশ একটু আরাম বোধ করিলেন। কারণ তাঁহার বিবেকে একটু গলদ ছিল। বিবেকে যে গলদ আছে, তাঁহার আচরণ যে অশোভন হইতেছে, এতকাল তিনি যাহা ভাবিয়াছেন, লিখিয়াছেন, কার্যকালে যে ঠিক তাহার বিপরীত আচরণ করিতেছেন, একথা যতীনবাবু নিশ্চয়ই বুঝিয়াছেন। চিঠিতে অবশ্য সে কথার আভাস পর্যন্ত দেন নাই, বুদ্ধিমান লোক তো কিন্তু মনে মনে হাসিয়াছেন নিশ্চয়ই। আবার তিনি ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন, গৃহিণীর উপর রাগ হইল। উহারই প্ররোচনায় তিনি এই অপকর্মটি করিতে রাজি হইয়াছেন! সহধর্মিণী! হঠাৎ তাঁহার অজ্ঞাতসারে মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িল 'কচু'! যে কুলিটি তাঁহার স্যুটকেসটি নামাইয়াছিল সে জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিতেই তিনি অপ্রস্তুত হইয়া গেলেন। কান দুইটি লাল হইয়া উঠিল। বলিলেন, "আমাকে একটা ট্যাক্সিতে তুলে দাও।"

কুলি বলিল, "ট্যাক্সি পাওয়া যাবে না।"

"কেন?"

"রাত হয়েছে। এত রাত্রে ট্যাক্সি আজকাল থাকে না। তার উপর হাল্লা হয়েছে মেছুয়াবাজারে একটা দাঙ্গা হয়ে গেছে নাকি—সব ভেগেছে তাই।"

"রায়ট্?"

"ঠিক জানি না। রিক্সা, ঘোড়াগাড়ী পাবেন।"

ভদ্রলোকের ভ্রূযুগল আর একবার কুঞ্চিত হইল। ভাবিলেন, এই ওজুহাতে ফিরিয়া গেলে কেমন হয়!

"সাহেবগঞ্জ ফেরার ট্রেন কখন ?"

"সকালের আগে কোনও ট্রেন নেই" অর্থাৎ সমস্ত রাত স্টেশনে বসিয়া থাকিতে হইবে। সহধর্মিণী দাক্ষায়ণীর মুখটাও মনে পড়িল। ভারী মাংসল মুখ। ভদ্রলোক মত পরিবর্তন করিলেন। দাঙ্গা বা যুদ্ধ যা-ই হোক, হাওড়া পর্যন্ত আসিয়া ফিরিয়া যাওয়া চলিবে না। গেলে দাম্পত্য-সৌধ-শীর্ষে বজ্রপাত হইবে। যদিও লাইটনিং কণ্ডাক্টার আছে, ভিত্তিও বেশ মজবুত, তবু ভদ্রলোক সাহস করিলেন না।

কুলিটি তাঁহাকে একটি ঘোড়ার গাড়িতেই তুলিয়া দিয়াছিল। গাড়োয়ান প্রথমে কিছু বলে নাই, কিন্তু কলেজ স্ট্রীট হ্যারিসন রোড জাংসানে গাড়োয়ানী ভাষায় ব্যক্ত করিল যে, সে শ্যামবাজার অভিমুখে যাইবে না, কারণ তাহার ঘোড়া দুইটি ক্ষুধার্ত এবং পিপাসার্ত হইয়াছে। সে তাহাদের এইবার বউবাজারে অবস্থিত আস্থাবলে লইয়া যাইতে চায়।

ভদ্রলোব ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ক্ষণকাল চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর নামিয়া পড়িলেন। ঘোড়ার দুঃখে বিগলিত হইয়া নয়, একটি রিক্সা দেখিয়া। নিজের শক্তি সম্বন্ধে তিনি সচেতন ছিলেন, রাতদুপুরে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়াইয়া গাড়োয়ানের সহিত বচসা করা যে তাঁহার সাধ্যাতীত ইহা তিনি জানিতেন, রিক্সাটা আসিয়া পড়াতে সমস্যার সমাধান হইয়া গেল। তিনি সঙ্গে সঙ্গে নামিয়া গাড়োয়ানের ভাড়া মিটাইয়া দিলেন। সোজা রিক্সায় উঠিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু রিক্সাওয়ালাও তেমন যেন উৎসাহ দেখাইল না। সন্দেহপূর্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। ভদ্রলোকের মুখে বেশ ঘন কাঁচা-পাকা চাপদাড়ি, গোঁফও বেশ ঝাঁকড়া, ভ্রূ-দুইটি যেন দুইটি শুঁয়োপোকা। মাথায় বাবরি। চেহারাটা বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষ-ছাগলের মতো। ইহার উপর ভদ্রলোকের পরিধানে মোটা খদ্দরের জামা কাপড়। রিক্সাওয়ালার বিশেষ দোষ নাই।

"কোথা যাবেন ?" রিক্সাওয়ালা প্রশ্ন করিল।

"হেদোর ধারে নামিয়ে দিলেই হবে।"

সুযোগ বুঝিয়াই হোক বা তাঁহাকে এড়াইয়া যাইবার জন্যই হোক, রিক্সাওয়ালা বলিল,—

"দেড় টাকা ভাড়া লাগবে বাবু !"

"তাই দেব, চল !"

ভদ্রলোক উঠিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু রিক্সাওয়ালা হঠাৎ মত পরিবর্তন করিয়া ফেলিল।

"আমার অন্য একটা সোয়ারি আছে বাবু, হেদুয়া পর্যন্ত যেতে পারব না।"

বলিয়া সোজা শিয়ালদহের দিকে ছুট দিল। ভাগ্যি প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আর একটা রিক্সা পাইয়া গেলেন, তাহা না হইলে একটু বিপদে পড়িতে হইত। দ্বিতীয় রিক্সাওয়ালাটিকে দেখিয়া তিনি ভরসা পাইলেন। বেশ গম্ভীর লোক—আট আনা চাহিল।

কিছুদূর গিয়া তিনি প্রশ্ন করিলেন, "এ অঞ্চলে কোন দাঙ্গা হয়েছে না কি ?"

"মেছোবাজারে ঘটেছিল একটা হাল্লা। কতকগুলো মাতালের কাণ্ড। এখন সব ঠাণ্ডা হয়ে গেছে··· ।"

ভদ্রলোকের সন্দেহ রহিল না যে, কিছু একটা ঘটিয়াছিল। তিনি রিক্সা হইতে অবতরণ করিয়া একটু মুশকিলে পড়িলেন। সুটকেশটি ফুটপাথে নামাইয়া বাড়ির দরজার কড়া নাড়িতে লাগিলেন। দরজা খুলিল না। তাঁহার ইচ্ছা ছিল রিক্সাওয়ালাকে দিয়াই সুটকেসটি ভিতরে বহন করাইবেন। কিন্তু কয়েকবার কড়া নাড়িয়াও যখন উত্তর পাইলেন না, তখন রিক্সাওয়ালাকে ছাড়িয়া দিতে হইল। রিক্সাওয়ালা চলিয়া গেলে বাড়ির নম্বরটি আর একবার ভাল করিয়া দেখিলেন। না, নম্বর ভুল হয় নাই। উপরের জানালা খুলিয়া গেল।

"কে ?"

"আমি।"

"আমি কে ? নাম বলুন।"

"যজ্ঞেশ্বর আইচ।"

"কি চান ?"

"যতীনবাবুর সঙ্গে দেখা করব।"

পূর্বেই বলেছি ভদ্রলোকের বিবেকে গলদ ছিল। যতীনবাবুর সহিত এইবার অনিবার্যভাবে দেখা হইয়া যাইবে এই আশঙ্কায় তাঁহার বুকের ভিতরটা কেমন যেন করিতে লাগিল। তিনি একবার গলা খাঁকারি দিলেন। যে কোনও গলার আওয়াজ এমন কি নিজের গলার আওয়াজও বিপদের সময় মনে কিঞ্চিৎ বল-সঞ্চার করে। করিল। যতীনবাবুর সম্মুখীন হইবার জন্য সপ্রতিভতার ভান করিতে সক্ষম হইলেন। উপরের জানালা হইতে উত্তর আসিল—

"বাবা বাড়ি নেই।"

ভদ্রলোক একটু যেন আরাম বোধ করিলেন। কিন্তু পরমুহূর্তেই সমস্যাটার অপর দিকটা মনে পড়াতে আবার একটু বিব্রতও হইলেন।

প্রশ্ন করিলেন—"তোমার মা কোথায় ?"

"মাও বাবার সঙ্গে গেছেন।"

"কখন ফিরবেন ?"

"তার ঠিক নেই। দু'তিন দিন দেরি হতে পারে। মামার অসুখের টেলিগ্রাম পেয়ে গেছেন।"

"তুমি যতীনবাবুর কে হও ?"

"আমি তাঁর বড় মেয়ে। আমার কলেজ কামাই হবে বলে, আমাকে নিয়ে যাননি। আপনার কি দরকার বলে যান তিনি এলে তাঁকে বলব।"

"কপাটটা খোল তাহলে।"

"আপনাকে আমি চিনি না, কপাট খুলব কেমন করে ?···"

পাশের বাড়ির ছাদ হইতে কে একজন প্রশ্ন করিলেন, "বিজলী, কার সঙ্গে কথা কইছিস ?"

"কি জানি আমি চিনি না। কপাট খুলতে বলছেন।"

"খবরদার খুলিস নি। দাঁড়া আমি দেখছি।"

হঠাৎ একটা টর্চের আলো ভদ্রলোকের মুখে পড়ল।

"ওরে বাবা, এ যে চাপদাড়ি। টম্! টম্!—" পরমুহূর্তেই প্রকাণ্ড একটা আলসেশিয়ান পাশের বাড়ির ছাদ হইতে উঁকি দিল। ঠিক সেই মুহূর্তে একটি ট্যাক্সিও মোড় ঘুরিল। ভদ্রলোক আকুল কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"রোকো।"

উপরের জানলা হইতে শোনা গেল—

"বীরেন দা তোমার কুকুর ডেকে নাও। ছি, ছি, কি করছ তুমি।"

"যে রকম চেহারা। কিছু বলা যায় না।"—ট্যাক্সি চলিতে আরম্ভ করিল এবং ভদ্রলোক উহাদের কথাবার্তা আর শুনিতে পাইলেন না। পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া ঘর্মাক্ত কপালটিকে মুছিয়া ফেলিলেন।

দিন চারেক পরে যতীনবাবু যজ্ঞেশ্বর আইচের নিকট হইতে যে পত্রটি পাইলেন তাহা এই—

নমস্কারান্তে নিবেদন,

বিবাহের সময় মেয়েদের যে গরু ভেড়ার মতো করিয়া দেখা উচিত নয় এই মতবাদ আমি বহুকাল হইতেই পোষণ করিতেছি। তথাপি নিজের ভাবী পুত্র-বধূকে ঘটা করিয়া দেখিতে গিয়াছিলাম। সমুচিত শিক্ষা হইয়াছে। আপনাকে একটি পোস্টকার্ড লিখিয়াছিলাম, বোধহয় সেটি পান নাই। ভালই হইয়াছে, পাইলে হয়তো আপনি থাকিতেন এবং চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী বিজলীর চুল, দাঁত, নখ, রং, চেহারা দেখিয়া, তাহার গান শুনিয়া, সে কি কি রান্না করিতে পারে তাহার ফর্দ লইয়া বিবেককে বলিদান দিয়া আসিতাম। আপনার হয়তো অসুস্থ আত্মীয়ের রোগ-শয্যাপার্শ্বে যাওয়া ঘটিয়া উঠিত না। পরমেশ্বর যাহা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন। তবু বিজলীকে আমি দেখিয়া আসিয়াছি, আমার খুব পছন্দ হইয়াছে। আপনার সুবিধা মতো যে দিন স্থির করিবেন সেইদিনই তাহাকে পুত্র-বধূরূপে বরণ করিয়া আনিব। আমার নমস্কার জানিবেন। বিজলীর মামা কেমন আছেন জানাইবেন। আশা করি আশঙ্কার কিছু নাই। ইতি—

ভবদীয়
শ্রীযজ্ঞেশ্বর আইচ

ঋণশোধ

ছকুর কাছে এসেছিলাম। আমার দিকে এক নজর চেয়েই ছকু বুঝতে পারল কেন এসেছি। প্রায়ই আমাকে আসতে হয় এবং একই উদ্দেশ্যে আসতে হয়। ছকুর কাছে কিছু টাকা পাব, কিন্তু কিছুতেই সেটা পাচ্ছি না। প্রথম প্রথম দু'চারবার তাগাদা করেছিলাম, এখন আর তাগাদাও করি না। নিজেরই চক্ষুলজ্জা হয়। তবে আসি রোজ। তার দোকানটিতে বসে খবরের কাগজটি পড়ি, রাজনীতি নিয়ে দু'চারটে টুকরো আলাপ করি, আর মনে মনে প্রত্যাশা করে থাকি ঃ হয়তো ছকুই নিজে থেকে

ঋণশোধের প্রসঙ্গটা তুলবে। কিন্তু তোলে না। ঘড়িতে টং টং করে ন'টা বাজলে ছকু হাই তুলে টুস্‌কি দিয়ে সামনের দেওয়ালে রক্ষিত গণেশকে প্রণাম করে দোকান বন্ধ করবার আয়োজন করে। আমিও উঠে বাড়ী চলে যাই। আবার তার পরদিন সন্ধ্যায় হাজির হই। এমনি বহুকাল ধরে চলছে। ব্যাংক থেকে করকরে পাঁচশ টাকা ধার করে আমিই একদিন ছকুর এই ঘড়ির দোকানটি করে দিয়েছিলাম।

বি. এ. ফেল করে বাড়িতে বসেছিল বেচারা, নানারকম চেষ্টা করে কোথাও কিছু জোগাড় করতে পারছিল না, আমিই তাকে পরামর্শ দিই—"এ শহরে ভালো ঘড়ির দোকান নেই, তুমি একটা ঘড়ির দোকান কর। আগে ঘড়ি সারাতে শিখে এস, তারপর বাজারের মাঝখানে একটা ঘর ভাড়া করে বসে যাও, কিছু কিছু হবেই।" ছকু হেসে উত্তর দিয়েছিল—"তা কি আমি জানি না, কিন্তু ক্যাপিটাল পাচ্ছি কোথায়!" হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে আমি বলে বসলাম, "যা ক্যাপিটাল লাগে আমি ধার দেব তোমাকে, তুমি লেগে পড়!"

ছকু লেগে পড়ল। আমার চেনা-শোনা এক ঘড়ির কারিগর ছিল কোলকাতায়। তার নামে একখানা চিঠি দিয়ে পাঠিয়ে দিলাম ছকুকে। ছকু কোলকাতায় গিয়ে প্রায় বছরখানেক রইল। থাকবার কোনও অসুবিধা হয়নি, ছকুর এক পিসেমশায় চাকরি করতেন খিদিরপুরে। তার স্কন্ধারূঢ় হ'য়ে ঘড়ি সারানো বিদ্যেটা আয়ত্ত করে ফেললে সে। তারপর আমাকে একদিন এসে বললে, "এইবার ক্যাপিটাল দিন। বাজারের ঠিক মাঝখানে ভালো ঘর খালি হয়েছে একটা। গোটা পঞ্চাশেক টাকা দিয়ে আজই ওটাকে 'বুক' করে ফেলি, কিছু আসবাবপত্রও কিনতে হবে, ভাঙা ঘড়ি জোগাড় করেছি কয়েকটা, আপনার ঘরে যে দেওয়াল ঘড়িটা আছে সেটাও আমি দোকানে টাঙাব, আপনার একটা 'টাইম্‌পীস' তো রয়েছে, নতুন ঘড়িও কিনতে হবে দু'চারটে, ঘড়ির ব্যাণ্ড, কাচ, এসব-ও চাই"·· হড়হড় করে বলে যেতে লাগল।

আমি একটু ভীত হ'য়ে পড়ছিলাম। বেশী টাকা তো আমার নেই, রিটায়ার করেছি প্রভিডেণ্ট ফণ্ডটুকুই সম্বল। বললাম, "আমি শ'দুই টাকার বেশী দিতে পারব না, ওতেই কুলিয়ে নাও এখন।" ছকু চক্ষু দুটি কপালে তুলে বলল—"আপনি ক্ষেপেছেন না কি! বিড়ির দোকান নয়, ঘড়ির দোকান! অন্তত হাজার খানেক টাকা ক্যাপিটাল না পেলে আরম্ভই করা যাবে না যে, পরে আরও লাগবে। এই দেখুন না লিস্ট।" আবি লিস্ট দেখিনি। বলেছিলাম, "দেখ হাজার টাকা দেওয়া আমার সাধ্যের বাইরে। খুব মেরে কেটে পাঁচশ টাকা পর্যন্ত দিতে পারি।" ছকু চোখ বড় বড় করে নাক ফুলিয়ে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ আমার দিকে। তারপর বললে—"আপনি শেষে এমনভাবে বিট্রে (betray) করবেন জানলে আমি সাউথ আফ্রিকায় সেই চাকরিটা নিয়েই চলে যেতাম।" সাউথ আফ্রিকায় কোনও চাকরি অবশ্য সে পায়নি, খবরের কাগজের একটা বিজ্ঞাপন দেখে দু'একদিন জল্পনা করেছিল মাত্র যাবে কি না। পাঁচশ টাকাতেই রফা হল শেষ পর্যন্ত। ছকু ঘড়ির দোকান করে ফেললে। এ প্রায় বছর পাঁচেক আগেকার কথা। দোকান নিশ্চয়ই ভালো চলছে। কারণ যে স্টাইলে সে থাকে তাতে মনে হয় টাকাকড়ি রোজগার করে নিশ্চয়। তা না-হলে অত সিগারেট, অত সিনেমা অমন ছিমছাম হয়ে থাকা সম্ভব হ'ত না। চার পাঁচ রকম জুতোই পারে

দেয়। এক জামা কখনও দুদিন পরে না সে উপর্যুপরি। সুতরাং মনে হয় দোকান মন্দ চলছে না। আমাকে কিন্তু একটি পয়সা দেয়নি এখনও পর্যন্ত। আমি কিন্তু প্রায়ই যাই সন্ধ্যার পর। বসি খানিকক্ষণ। আশা করে থাকি ছকু নিজেই হয়তো কথাটা তুলবে, কিন্তু তোলে না। আগেই বলেছি এখন আর মুখ ফুটে তাগাদা করতে পারি না, মনে মনে কাঁরি। কিন্তু সেদিন যে ঘটনা প্রত্যক্ষ করলাম এবং ছকুর মুখে তার যে ইতিহাস-সম্মত ব্যাখ্যা শুনলাম তাতে আশা ছাড়তে হ'ল।

দোকানের কোণটিতে বসে রোজ যেমন করি সেদিনও তেমনি খবরের কাগজ খুলে কোরিয়া এবং লাল-চীন নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিলাম, এমন সময়ে একটি ছেলে দোকানে এসে ঢুকল। তার হাতে একটি ঘড়ির বাক্স।

"ছকু বাবু, এই রিস্ট ওয়াচটি বদলে দিতে হবে। এর পিছন দিকে একটা দাগ রয়েছে, তখন লক্ষ্য করে দেখিনি, এই দেখুন।"

ছেলেটি বাক্স থেকে রিস্ট ওয়াচটি বার করে দেখালে। পিছন দিকে সত্যিই একটা আঁচড়ের মতো দাগ ছিল।

ছকু মৃদু হেসে বললে—"সরি, এখন আর বদলে দিতে পারব না। নেবার সময় আপনার দেখে নেওয়া উচিত ছিল!"

ছেলেটি একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়ল।

"তা অবশ্য ছিল, আমার দোষ হয়েছে সেটা। কিন্তু বিশ্বাস করুন ওটা, মানে ওই দাগটা, আপনার দোকান থেকেই হয়েছে। আমরা কেউ হাতও দিইনি ও ঘড়িতে, আজ হঠাৎ উল্টে দেখি।"

ছকু নির্বিকারভাবে উত্তর দিলে—"বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্ন নয়, প্রশ্ন প্রিন্সিপ্‌লের। জিনিস নেবার সময় সেটা ভালো করে দেখে না নিলে উভয়তই মুশকিল। মাপ করুন আমাকে। পিছন দিকে ওটুকু দাগ থাকলে ক্ষতিই বা কি।"

"এমনিতে কোনও ক্ষতি ছিল না, কিন্তু বিয়ের উপহার কি না, দাগী জিনিস দেওয়া যাবে না। আচ্ছা ঠিক আছে, এটা আমিই ব্যবহার করব, আমাকে আর একটা দিন।"

ছকু তাকে আর একটি ঘড়ি বিক্রি করলে। ছেলেটি এবার উল্‌টে পাল্‌টে ভাল করে দেখে নিয়ে চলে গেল।

আসল কথাটি আমি জানতাম। ঘড়িটা কোলকাতা থেকে ছকু যখন এনেছিল তখন ছকুই দেখিয়েছিল আমাকে দাগটা। বলেছিল—"এই দাগটুকুর জন্যে দাম পাঁচটাকা কম দিয়েছি। কিন্তু দেখবেন ঠিক কাউকে ক্যাটালগ প্রাইসে ঝেড়ে দেব।"

ছোকরাটি চলে গেলে ছকু উদ্ভাসিত দৃষ্টি তুলে চাইলে আমার দিকে। আমি কেবল দু'টি মাত্র কথা বললাম—"অন্যায় করেছ"।

ছকু ইতিহাসের ছাত্র। সে ইতিহাসের নজীর তুলে বললে—"ব্যবসার সঙ্গে যুদ্ধের যে কত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তা যদি মানেন তাহলে কিছুই অন্যায় করিনি। জিতেছি এইটেই আমার সবচেয়ে বড় যুক্তি। এভ্‌রিথিং ইজ ফেয়ার ইন্ ওয়ার এন্ড লাভ্।"

"ব্যবসার সঙ্গে যুদ্ধের সম্পর্ক কি, ঠিক বুঝলাম না।"

"ইতিহাস পড়লেই বুঝতে পারবেন। আজকালকার যত যুদ্ধ তার মূলে আছে ব্যবসা। পুরাকালেও তাই ছিল। ক্রুজেডাররা ধর্মের জন্য যুদ্ধে নামে নি, নেমেছিল বাণিজ্যপথ দখল করবার জন্য। আমার মতে ব্যবসাটাই যুদ্ধ। খদ্দের হ'ল শত্রুপক্ষ, যে কোনও প্যাঁচে ফেলে তার পকেট থেকে পয়সাগুলো কেড়ে নিতে হবে। মিষ্টি কথা বলে, পিঠে হাত বুলিয়ে, লোভ দেখিয়ে, চোখ রাঙিয়ে যেমন করে হোক।"

ছকুর বিদ্যাবত্তা আর চিন্তাশীলতা দেখে অবাক হয়ে গেলাম। ছকু উত্তেজিত হয়েছিল, সে বলেই যেতে লাগল—"এই হালের কথাই ধরুন না। ইংরেজরা যখন প্রথমে এদেশে এসেছিল তখন তাদের ব্যবসা বুদ্ধি ভালো ছিল, তাই তারা এদেশে রাজ্য স্থাপন করতে পেরেছিল। ক্লাইভ উমিচাঁদকে লাল-কাগজ শাদা কাগজের ভেল্‌কি দেখিয়ে ঠকিয়েছিল, হেস্টিংস নন্দকুমারকে ফাঁসী দিয়েছিল, আরও কত কি করেছিল। অর্থাৎ তখন তারা খাঁটি ব্যবসাদার ছিল। তাই শুধু ব্যবসা নয়, এত বড় সাম্রাজ্যও স্থাপন করতে পেরেছিল। কিন্তু এদেশে কিছুদিন থাকবার পর এদেশের জল হাওয়ার ফল ফলল। জল হাওয়ার গুণ যাবে কোথা, মহৎ হ'য়ে উঠল ব্যাটারা। তাদের ব্যবসাদারগুলো পর্যন্ত মহৎ হ'য়ে উঠল। বছর তিনেক আগের একটা ঘটনা বলছি শুনুন, আমার পার্সোনাল এক্‌স্‌পীরিয়েন্স। ঘটনাটা এতদিন কাউকে বলিনি। মল্লিকদের বাড়ির বিয়ের কথা মনে আছে আপনার? সেই যে কোলকাতা থেকে সানাই এসেছিল? ঘেঁটু মল্লিকের মেয়ের বিয়ে।"

"মনে আছে।"

"আমি তখন কোলকাতায়। ঘেঁটু মল্লিক আমাকে চিঠি লিখলে: 'ভাই, তুমি জামাইয়ের জন্য ভালো দেখে একটি রিস্টওয়াচ কিনে এনো। পাঁচশো টাকা পর্যন্ত দাম দিতে রাজি আছি। ঘড়িটি সোনার হওয়া চাই।' একটা নামজাদা সায়েবী দোকানে গিয়ে খুব ভাল ঘড়ি একটা কিনে ফেললাম। দোকানের নামটা আর বলব না, নামটা প্রকাশ করতে চাই না। ঘড়িটা কেনবার পর আরও দু' তিন দিন কোলকাতায় থাকতে হয়েছিল আমাকে। কি যে দুর্বুদ্ধি হল ঘড়িটা হাতে পরে বেড়াতে লাগলাম। শ্যামবাজারে নরুদের বাড়ী গেছেন আপনি? তাদের বৈঠকখানার ফ্যানটা দেখেছেন? এমন নীচু করে টাঙানো যে কোনও লম্বা লোক যদি হাত তোলে হাতে ব্লেড ঠেকে যায়। আমি জানেনই তো ছ'ফুট দু'ইঞ্চি। নরুদের বাড়ী গেছি, বন্‌ বন্‌ করে ফ্যানটা ঘুরছে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা কইতে কইতে হাতটা তুলেছি—বাস্‌! ব্লেড্‌ লেগে ঘড়ির কাচটা চুরমার, কাঁটাও একটা ভেঙ্গে গেল। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে পড়লাম খানিকক্ষণের জন্য। পাঁচশ টাকা দিয়ে নতুন ঘড়ি কিনে দেবার সামর্থ্য নেই আমার, কি করা যায়, ভাবতে ভাবতে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম। হঠাৎ একটা বুদ্ধি খেলে গেল মাথায়। ভাঙা ঘড়িটা ঘড়ির বাক্সে পুরে ক্যাশমেমোটা নিয়ে হাজির হলাম সেই ঘড়ির দোকানে গিয়ে। দেখা করলাম বড় সাহেবের সঙ্গে। বললাম আমি এই ঘড়িটা যখন নিয়ে গিয়েছিলাম তখন দেখে নিইনি, আজ খুলে দেখছি ঘড়িটা ভাঙ্গা। যদি কাইন্ড্‌লি বদলে দেন, এটা ম্যারেজ প্রেজেন্ট। সাহেব কয়েক সেকেন্ড আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন, চোখের উপর পাতা দুটো উঠল-পড়ল বার কয়েক, তারপর বললেন—'আপনি দেখে

নেন নি ? ও আচ্ছা, বসুন।' টং করে ঘণ্টা বাজালেন, কর্মচারী এল একজন। সাহেব তাকে বললেন—'এই ঘড়িটা বদলে নিয়ে আসুন।' নতুন ঘড়ি নিয়ে সাহেবকে অনেক ধন্যবাদ দিয়ে আমি বেরিয়ে এলাম বটে, কিন্তু মনে মনে বুঝলাম ব্যাটাদের মরণ এবার ঘনিয়ে এসেছে। এইবার চাটিবাটি গুটিয়ে সরে পড়তে হবে। পড়তেও হল। মহাত্মাজি যেই কুট্ করে বললেন ঃ কুইট্ ইণ্ডিয়া—অমনি সুট সুট করে চলে যেতে হ'ল।"

ছকুর ব্যবসা-নীতি এবং ইতিহাস-বিশ্লেষণের ক্ষমতা দেখে সেদিন আমার দৃঢ় ধারণা হয়ে গেল আমার টাকা আর ফেরত পাব না। ছকু কিন্তু আমার ঋণ শোধ করেছিল, যদিও একটু তির্যক পথে। একদিন ছকুর বাড়িতে গিয়ে দেখি বাদল স্যাকরা বসে আছে। প্রশ্ন করলাম—এখানে কেন ? সে বলল, ছকুবাবুর স্ত্রীর জন্য একটা হার গড়িয়ে এনেছি। হারটি আমাকে দেখালে সে। বেশ ভাল হার।

"দাম কত পড়ল ?"

"পাঁচ-শো টাকা।"

"টাকাটা পেয়ে গেছ তো ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা লাভ করলাম। আমি না পেলেও আমার মেয়ে তো পেল পাঁচ-শো টাকা। গল্পের রস হানি হবে বলে আগে বলিনি ছকু আমার জামাই।

ভেক

পিওন ডাক দিয়ে গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের নূতন প্রতিবেশী রামলোচন ঘোষ মহাশয় আসিয়া প্রবেশ করিলেন। তিনি একটি শুভ-সংবাদ বহন করিয়া আনিয়াছিলেন। আগামীকল্য তাঁহার কন্যা বিনোদিনীর বিবাহ, আমি যেন শুভকার্যে যোগদান করিয়া তাঁহাকে বাধিত করি। প্রতিশ্রুতি দিলাম, বাধিত করিব। ঘোষ মহাশয় চলিয়া গেলেন। তখন ডাকের চিঠিগুলি খুলিতে লাগিলাম। প্রতিদিন ডাকে একটি না একটি কৌতুকজনক পত্র থাকে, সেদিনও ছিল। যাঁহারা সাহিত্য-চর্চা করেন, তাঁহাদের ইহা অবিদিত নাই যে, সাহিত্যজগতে এমন কতকগুলি জীব বিচরণ করেন যাহারা নিজেরা সাহিত্যিক নহেন, কিন্তু সাহিত্য ও সাহিত্যিকই যাঁহাদের সব। ইহাদের ঠিক শ্রদ্ধা করা যায় না, এড়ানোও যায় না। সাহিত্যিকদের নানারূপ সঙ্গত-অসঙ্গত ফাই-ফরমাস ইহারা অকুণ্ঠিতচিত্তে খাটেন বলিয়া অনেক সময় ইহাদের সঙ্গ অপরিহার্য হইয়া পড়ে, অনেক সময় ইহারা স্নেহভাজনও হন। শ্রীমান রাইমোহন মাইতি আমার জীবনে এইরূপ একটি লোক। রাইমোহন লিখিতেছে—

শ্রীচরণেষু

দাদা, নূতন একটি কবির সন্ধান পেয়েছি। আমার মনে হয়, এঁর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। এঁর দুটি কবিতা এই সঙ্গে পাঠাচ্ছি। আমার বিশ্বাস আপনার ভাল

লাগবে। যদি কোনও পত্রিকায় প্রকাশের ব্যবস্থা করতে পারেন ভাল হয়। আজকাল ভাল কবিতা তো চোখেই পড়ে না। মনে হয়, যে কোন সম্পাদক এ দুটি পেলে লুফে নেবেন। ইনি 'ভেক' এই ছদ্মনামে লিখতে চান। আপনার অমূল্য সময় আর নষ্ট করব না। আমার প্রণাম জানবেন। ইতি,

প্রণত—রাইমোহন মাইতি।

এইবার কবিতা দুইটি শুনুন।—

সাগরের প্রতি

আমার মনের গোপন কথাটি জেনেছ তুমি
অথচ বল না কিছু
তোমার না-বলা-কথা-আলেয়ারে ধরিব বলি
ফিরি তার পিছু পিছু।
ধরিতে পারি না, ঠিকানা জানি না তার
আনমনে শুধু ঘোরাটাই হয় সার
ফুলেরা পাখিরা সূর্য-তারারা
আসে যায় বার বার
পথের চেহারা কভু সমতল,
কভু উঁচু, কভু নীচু।
অনেক আকাশ নেমেছে নেমেছে
অনেক সাগর-কোলে
তাদের মিতালি আমার শিথানে
নিদালি স্বপনে দোলে।—"ভেক"

কূপের প্রতি

তোমার মনের গোপন কথাটি জেনেছি আমি
তবু আছি নিশ্চুপ
দেখিতেছি শুধু নীরব বেদনে আপন মনে
জ্বলিছে মৌন ধূপ।
সাগরে ভাসিবে ময়ূর-পংখী মোর
তাহারই আশায় কত নিশি ভোর
জাগর-নয়নে নিদ নাহি নামে
সাগর যে মন-চোর।
তুমি তারে ওগো কেন চাও বল
তুমি যে ক্ষুদ্র কুপ।
আমি যে ভুখারী, আমি যে দিশারী
আমি যে ভাজন ভট
বুলবুলি-চরা মাঠে মাঠে আমি
গড়ি যে প্রেমের মঠ।—"ভেক"

কবিতা দুইটি বার দুই পড়িয়া রাখিয়া দিলাম। কাহাকে যে উল্লিখিত রত্ন-যুগল লুফিয়া লইবার সুযোগ দিব, সহসা ঠিক করিতে পারিলাম না।

পরদিন সকালে স্বয়ং রাইমোহন আসিয়া উপস্থিত। সে যে কলিকাতা হইতে সশরীরে আসিয়া উপস্থিত হইবে প্রত্যাশা করি নাই।

"কি রাইমোহন, হঠাৎ এসে পড়লে যে ?"

"যে কবিতা দুটো পাঠিয়েছিলাম, পেয়েছেন ?"

"পেয়েছি।"

"কোথাও পাঠিয়েছেন নাকি ?"

"না।"

"যাক, বাঁচা গেল। কোথাও পাঠাতে হবে না, কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ফেলে দিন।"

"কেন, ব্যাপার কি ?"

"যত সব বোগাস।"

একবার শিস দিবার চেষ্টা করিল, তাহার পর মাথার সামনের দিকের লম্বা চুলের গোছাটা দক্ষিণ মুষ্টিতে চাপিয়া ধরিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল কয়েক মুহূর্ত। বুঝিলাম, যে কারণেই হোক, ছোকরা বেশ বিচলিত হইয়াছে।

"ব্যাপার কি বল তো ?"

"বলছি। কিছু খাওয়ান, বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে। শেষ মুহূর্তে যখন খবর পেলাম, ছুটে ট্রেন ধরেছি। পয়সাও বেশি ছিল না সঙ্গে। সমস্ত রাত অনাহারে অনিদ্রায় কেটেছে।"

চাকরকে ডাকিয়া চা ও খাবার আনিতে বলিলাম।

"ব্যাপারটা কি বল দেখি ?"

"পরশু পর্যন্ত আমাকে যা চিঠি লিখেছে, এখনও সঙ্গে আছে আমার, বিশ্বাস না হয় নিজের চোখেই দেখুন আপনি।"

"কে চিঠি লিখেছে ?"

"ওই ভেক ভেক, যার কবিতা আপনাকে পাঠিয়েছি। ও শেষে কুয়ার ভেতরেই লাফিয়ে পড়ল। আপনারই পাশের বাড়িতে আছে তো। নিমন্ত্রণ-পত্র পান নি ?"

এতক্ষণে যেন কিঞ্চিৎ আলোক দেখিতে পাইলাম।

"ভেক মেয়েছেলে নাকি ?"

"হ্যাঁ, বিনোদিনী। এম এ. পাস, মার্জিত রুচি, কিন্তু বিয়ে করছে কাকে জানেন ? একটা নন্-ম্যাট্রিক জরদ্গবকে।"

"কেন ?"

"কলকাতায় তার সাতখানা বাড়ি আছে। মিলও আছে একটা। ছি ছি, এতটা আশা করিনি। করা সম্ভব ? আপনিই বলুন। আমাকে পরশু পর্যন্ত যে চিঠি লিখেছে, দেখুন আপনি।"

"তা না হয় দেখব। কিন্তু আমি —।" থামিয়া গেলাম। কারণ আবার সে শিস দিবার চেষ্টা করিল, আবার চুল মুঠা করিয়া ধরিল। ধৃত-কেশ অবস্থায় নতমস্তকে বসিয়া রহিল খানিকক্ষণ। তাহার রকম-সকম দেখিয়া আশঙ্কা হইতে লাগিল যে, গুরুতর কিছু ঘটিয়াছে নিশ্চয়।

"ব্যাপারটা কি, বল দেখি খুলে। হঠাৎ এলে কেন তুমি?"

"ট্র্যাজেডিটা স্বচক্ষে দেখব ব'লে এলাম। গ্রিম্ ট্র্যাজেডি। উঃ!"

আর সে আত্মসম্বরণ করিতে পারিল না। দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল।

কূপের খবর পাইয়াছিলাম। এইবার সাগরের খবর পাইলাম। প্রশান্ত মহাসাগর নয়, বঙ্গোপসাগর।

নারীর মন

সুমিতা ঘরে এসে সুইচ টিপল, কিন্তু আলো জ্বলল না, একটু বিব্রত হয়ে পড়ল বেচারী। বাল্‌বটা ফিউজ্ হ'য়ে গেল না কি? হাতে একটিও পয়সা নেই, মাইনে পেতে এখনও দিন পাঁচেক দেরি আছে। অথচ আলো একটা না হলেও চলবে না। নবেন্দু থাকলে তার কাছ থেকে কিছু ধার চাওয়া যেত। কিন্তু সে-ও তো আজ বাড়ি চলে গেল। দুপুরে দেখা করতে এসেছিল, তখনই যদি চেয়ে রাখত। কথাটা মনে হয়েছিল কিন্তু চাইতে লজ্জা করল। কেন লজ্জা করল? নবেন্দু তাকে ভালবাসে, চাইলে সে খুশীই হ'ত হয়তো, তবু কিন্তু চাইতে পারেনি। কেন? নবেন্দু যদি তার স্বামী হ'ত তাহলে এ সংকোচ নিশ্চই হ'ত না। অন্ধকারে একা দাঁড়িয়ে তার মনে হল নবেন্দু তাকে বিয়ে করবে কি? কই, কোন দিন তো মুখ ফুটে কিছু বলেনি। সঙ্গে সঙ্গে সুরেনের কথাও মনে পড়ল। সুরেনও আসে তার কাছে। তারও ভাবভঙ্গী থেকে মনে হয় সে-ও যেন তাকে চায়, কিন্তু সে-ও মুখ ফুটে বলেনি এখনও।

...অন্ধকার ঘরে একা দাঁড়িয়ে নিঃস্ব সুমিতা বড় অসহায় বোধ করতে লাগল। সে রোজগার করে, মাসে ষাট টাকা মাইনে পায়। কিন্তু কিছুতেই কুলোতে পারে না ওই ক'টা টাকায়। সিনেমা দেখতে ইচ্ছে করে, ভাল শাড়ি দেখলে লোভ সামলাতেই পারে না। তুচ্ছ পাথরের একটা হার, তাই কিনতেই দশটা টাকা বেরিয়ে গেল সেদিন। বুঝতে পারে অন্যায় করছে কিন্তু নিজেকে সামলাতে পারে না কিছুতে। ওই হারটা না কিনলে মাসের শেষে এমন নিঃস্ব হ'য়ে পড়তে হত না। যদি একজন সঙ্গী থাকত তাহলে দু'জনের রোজগারে স্বচ্ছন্দে চ'লে যেত জীবন। অন্ধকারে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল সুমিতা। এমন পয়সা নেই যে একটা মোমবাতি কিনে আনে। একটা বোর্ডিংয়ে খায় সে, মাইনে পেলে তাদের টাকা দিয়ে দেয়। একটা মনোহারী দোকানের সঙ্গে চেনা আছে, তারা মাঝে মাঝে তাকে স্নো পাউডার ধারে দিয়েছে, তাদের কাছে মোমবাতি পাওয়া যাবে কি? হঠাৎ চমকে উঠল সুমিতা। দুয়ারে কে কড়া নাড়ছে। সুরেন নিশ্চয়। কিন্তু এই অন্ধকার ঘরে সুরেনকে ডেকে আনা কি ঠিক হবে? চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল সে। কোন সাড়া দিলে না। কড়া কিন্তু সমানে নড়ে চলেছে। শেষে ডাকও শোনা গেল।

"সুমিতা, সুমিতা, ঘুমিয়ে পড়লে না কি!"

সুরেনের গলা। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল সুমিতা। কপাট খুলে বললে—

"ও, তুমি এসেছ। আমি বেরুচ্ছি একটু।"

"কোথায়?"

"এই এমনি বেড়াতে।"

"চল, আমিও যাই। আমি তোমার সঙ্গে গল্প করবার জন্যেই এসেছিলাম।"

বেরিয়ে পড়ল দুজনে।

সুমিতা বললে—"আমার কাছে কিন্তু একটাও পয়সা নেই, হাঁটতে হবে।"

"আমার কাছে আছে। চল মাঠেই যাওয়া যাক।"

একটা ট্রামে উঠে বসল দু'জনে। সুমিতার সমস্ত অন্তঃকরণ যেন সংকুচিত হয়ে গেল লজ্জায়। কেন সে সুরেনের পয়সায় ট্রামে চড়ল? কেন সে তাকে বলতে পারল না যে আমি হেঁটেই যাব, আমার সান্নিধ্য তোমার যদি কাম্য হয় হেঁটেই চল আমার সঙ্গে। কেন একথা সে বলতে পারল না! পারেনি বলে কেমন যেন লজ্জিত হয়ে পড়ল সে মনে মনে। মনে হল বরাবরই কাঙালিনীর মতো নিজের অজ্ঞাতসারেই কোন না কোন পুরুষের দাক্ষিণ্যের উপর নির্ভর করে আছে সে মনে মনে। এই একটু আগে যে জীবনসঙ্গীর কথা সে ভাবছিল সে তার এই কাঙাল মনোবৃত্তিরই সৃষ্টি।...

"চল এবার নাবা যাক।"

মাঠে এসে পড়েছিল তারা। একটা নির্জন জায়গায় গিয়ে পাশাপাশি বসল দুজনে। কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে সুরেন গলা-খাঁকারি দিয়ে বললে—

"আজ একটা কথা বলব বলে এসেছিলাম।"

"কি কথা?"

"তোমার যদি আপত্তি না থাকে তাহলে তোমাকে আমি বিয়ে করতে চাই।"

সুমিতার সর্বাঙ্গে একটা বিদ্যুৎ শিহরণ বয়ে গেল। তবু কিন্তু স্থির হয়ে বসে রইল সে। তারপর আত্মসম্বরণ করে ধীর কণ্ঠে বললে,

"আমি যতদিন পর্যন্ত ভালভাবে রোজগার করতে না পারি ততদিন বিয়ে করব না ঠিক করেছি। কারো গলগ্রহ হবার ইচ্ছে আমার নেই।"

"স্ত্রী কি কখনও স্বামীর গলগ্রহ হয়?"

"হয়।"

সুরেন অনেক রকম যুক্তির অবতারণা করে বোঝাবার চেষ্টা করল। কিন্তু সুমিতা কিছুতেই বুঝল না। আত্মসম্মানের যে তুঙ্গশিখরে সে সহসা নীত হয়েছিল সেখানে সুরেন তার নাগাল পেল না কিছুতে। হেঁটেই বাড়ি ফিরল সে। বাড়ি ফিরে অন্ধকার ঘরে খিল দিয়ে শুয়ে পড়ল। শুয়ে কাঁদতে লাগল। আবার দুয়ারে কড়া নড়ল একটু পরে।

"কে?"

"আমি নবেন্দু।"

"আমার ঘরের আলোটা ফিউজ হয়ে গেছে। শুয়ে পড়েছি আমি।"

"কপাট খোল। আমি বাল্‌ব এনেছি।"

আশ্চর্য হয়ে গেল সুমিতা। নবেন্দু কি করে জানলে যে তার 'বাল্‌ব'টা ফিউজ্ হয়ে গেছে! কপাট খুলে সেই প্রশ্নই করল সে।

"দুপুরে তুমি যখন চান করবার জন্যে বেরিয়ে গেলে তখন আমিই তোমার ভাল 'বাল্‌ব'টা খুলে নিয়ে তার জায়গায় ফিউজ্‌ড্ বাল্‌ব লাগিয়ে দিয়েছিলাম একটা।"

"সে কি ! কেন ?"

"সুরেনকে ঠকাবার জন্যে। ভাবলাম ঘর অন্ধকার দেখলে সে হয়তো বসবে না।"

সুমিতার কর্ণমূলে অরুণিমা দেখা দিল।

"কেন, এলোই বা সুরেন ! তোমার তাতে আপত্তি কিসের ?"

"ঘোর আপত্তি ! সে তোমাকে বিয়ে করবার তালে আছে। তোমার সঙ্গে তাকে একলা থাকবার সুযোগ কি আমি দিতে পারি ?—দাঁড়াও আলোটা লাগিয়ে দিই।"

টর্চের সাহায্যে বাল্‌বটা লাগিয়ে দিলে নবেন্দু।

সুমিতা মুচকি হেসে বললে, "সুরেনের সঙ্গে মাঠে গিয়েছিলাম। বিয়ের প্রস্তাব সে করছে।"

"তাই নাকি ! তুমি কি উত্তর দিলে।"

"বলেছি যতক্ষণ পর্যন্ত ভালো রোজগার করতে না পারছি ততক্ষণ বিয়ে করব না। আমি স্বামীর গলগ্রহ হতে চাই না।"

"বেশ বলছ !—কিন্তু—"

বিবর্ণ মুখে চুপ করে গেল নবেন্দু। তারপর মুখে হাসি টেনে এনে বলল—

"কিন্তু আমাকেও কি তুমি ওই উত্তর দেবে ?"

সুমিতা বলতে পারলে না, 'দেব—'। সহসা বিপর্যয় ঘটে গেল তার মনে। বললে—

"তা জানি না। রাত হয়েছে, বাড়ি যাও তুমি !"

তারপর হেসে ফেললে।

সাঁতারের পোষাক

আমি মফঃস্বল হইতে যখন কলিকাতা মেডিকেল কলেজে পড়িতে গেলাম তখন কলেজের ছাত্র-ছাত্রী মহলে সাঁতার শেখার হুজুক খুব প্রবল। হেদুয়া পুষ্করিণী প্রত্যহ সকালে-বিকালে সাঁতারুদের এবং সন্তরণ-দর্শনার্থিদের কলরবে মুখরিত। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত পর্যন্ত হুজুককে মাতিয়াছেন। আমারও বাসনা হইল সাঁতার শিখি। বন্ধুবর নগেন্দ্র হেদুয়ার সাঁতার-ক্লাবের একজন সভ্য। তাহারই শরণাপন্ন হইলাম। সে বলিল, "এ তো খুব ভাল কথা। কালই তোকে ক্লাবে নিয়ে যাব। তুই সাঁতার একেবারে জানিস না ?"

"জানি। কতবার গঙ্গা পার হয়েছি। সাঁতার জানি বই কি।"

"বাঃ। তোকে পেয়ে আমাদের ক্লাবের লাভই হবে তাহলে। শান্তিদা তোকে লুফে নেবে একেবারে। আসছে বছর আমরা লম্বা একটা রেসে নাবব শান্তিদা বলছিলেন। তোর সুইমিং কস্ট্যুম আছে ?"

"না।"

"কিনতে হবে একটা। চৌরঙ্গীর একটা সাহেবী দোকানে নানারকম ভালো ভালো কস্ট্যুম এসেছে শুনেছি। কাল নিয়ে যাব তোকে।"

হেদুয়া ক্লাবে ভরতি হইয়া গেলাম। আমার সাঁতার দেখিয়া শান্তিদা খুব সন্তুষ্ট হইলেন। তিনিও অবিলম্বে সুইমিং কস্ট্যুম কিনিয়া ফেলিবার পরামর্শ দিলেন।

নগেনের সঙ্গে সেই দিনই বৈকালে গেলাম চৌরঙ্গীর সেই দোকানে। নগেনের সমস্তই জানা-শোনা ছিল, যেখানে গেলে সুইমিং কস্ট্যুম পাওয়া যাইবে, সেইখানেই সে আমাকে লইয়া গেল। কস্ট্যুম বাহির করিয়া আনিল একটি রূপসী তরুণী। অপরূপ সুন্দরী। কিন্তু যে কস্ট্যুম সে বাহির করিয়াছিল নগেনের তাহা পছন্দ হইল না।

"এ ছাড়া অন্য কোন রকম নেই ?"

"আছে বই কি।"

ঘাড় দুলাইয়া মুচকি হাসিয়া তরুণী চলিয়া গেল এবং আর এক রকম বাহির করিয়া আনিল। এটাও নগেনের পছন্দ হইল না, আমারও হইল না।

"আর কিছু নেই ?"

"আছে।"

সে আর একবার ভিতরে গেল এবং তৃতীয় প্রকার কস্ট্যুম আনিল। বলিল, "এটা বিশেষ রকম মজবুত সুতায় প্রস্তুত। অস্ট্রেলিয়ার সাঁতারুদের খুব প্রিয়।"

কিন্তু গেঞ্জির কলারটা বড় বেশী লম্বা। পছন্দ হইল না।

"আরও দেখাচ্ছি আপনাদের।"

সুমিষ্ট হাসিয়া মেয়েটি আবার ভিতরে চলিয়া গেল এবং এবার একসঙ্গে চার পাঁচ রকম কস্ট্যুম বাহির করিয়া আনিল। একটাও পছন্দ হইল না।

"আর নেই ?"

"আছে বই কি। প্লীজ ওয়েট্ এ মিনিট।"

আবার সে দ্রুতপদে ভিতরে গেল, আবার একগোছা বাহির করিয়া আনিল।

কিন্তু নগেনের পছন্দ-অপছন্দের মানদণ্ড এমনি সূক্ষ্ম যে, এবারও একটাও পছন্দ হইল না। কোনটার কলার ছোট, কোনটার বড়, কোনটার রং খারাপ, কোনটার বুনোট ভালো নয়, কোনটার হাতা ঢিলা, কোনটার বেশী টাইট্। কস্ট্যুম স্তুপীকৃত হইয়া গেল।

"আর নেই ?"

"বাইরে আর নেই। ওয়েট্ এ বিট্—আজ নতুন একটা চালান এসেছে, তাতে হয়তো থাকতে পারে।"

মধুর হাসিয়া তরুণী আবার চলিয়া গেল। এবার সে যে-কস্ট্যুমগুলি লইয়া আসিল, সেগুলি বাস্তবিকই চমৎকার। আমাদের দু'জনেরই খুব পছন্দ হইল।

"দাম কত ?"

"বেশী নয়। পাঁচ টাকা চোদ্দ আনা।"

এইবার একটু মুশকিলে পড়িতে হইল। আমাদের কাছে পাঁচ টাকার বেশী ছিল না। গলা খাঁকারি দিয়া নগেন বলিল, "আমাদের কাছে পাঁচ টাকা মাত্র আছে। ভেবেছিলাম পাঁচ টাকাতেই হয়ে যাবে। এইটেই কিন্তু আমাদের চাই। কাইন্ড্লি এটা একটু আলাদা করে রেখে দিন। এখনি এসে নিয়ে যাব আমরা।"

মেয়েটি হাসিয়া বলিল, "ও ইয়েস্! আলাদা প্যাকেট করে রেখে দিচ্ছি।"

লজ্জায় মাথা কাটা যাইতেছিল। পর-মুহূর্তেই আমরা রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িলাম।

নগেন বলিল, "এখনই এসে নিয়ে যেতে হবে ওটা।"

"নিশ্চয়ই !"

সিগারেট ফুঁকিতে ফুঁকিতে চলিতেছিলাম, হঠাৎ 'বাবু বাবু' ডাক শুনিয়া পিছন ফিরিয়া তাকাইতে হইল। দেখিলাম একটি চাপরাশি গোছের লোক হাতছানি দিয়া আমাদেরই ডাকিতেছে। দাঁড়াইয়া পড়িলাম।

"আপনারাই কি সুইমিং কস্ট্যুম কিনছিলেন !"

"হ্যাঁ।"

"বড় সাহেব আপনাদের ডাকছেন !"

"কোন্ বড় সাহেব ?"

"দোকানের। চলুন না।"

একটু অবাক হইয়া গেলাম।

নগেন বলিল, "চল না শোনাই যাক– কী বলে !"

চাপরাশি আমাদের একটি প্রশান্ত-বদন সাহেবের কাছে লইয়া গেল। সাহেব দূরের একটি ঘরে বসিয়া আমাদের পোষাক-নির্বাচন-লীলা দেখিয়াছিলেন। আমরা যাইতেই বলিলেন, "আপনারা অতগুলো কস্ট্যুম দেখলেন, কিন্তু একটিও তো নিলেন না, পছন্দ হল না বুঝি ?"

অপ্রস্তুত মুখে সত্য কথাটা বলিলাম।

"কত কম পড়েছে ?"

"চোদ্দ আনা।"

সাহেব ঘণ্টা টিপিলেন। চাপরাশি পুনরায় প্রবেশ করিল।

"মিস জোসিকো সেলাম দেও !"

যে তরুণী আমাদের কস্ট্যুম দেখাইতেছিলেন, তিনি আসিলেন। তিনি প্রবেশ করিতেই সাহেব নিজের পকেট হইতে চোদ্দ আনা পয়সা বাহির করিয়া তাহার হাতে দিয়া বলিলেন, "এঁদের যে পয়সাটা শর্ট পড়েছে সেটা আমি দিয়ে দিচ্ছি। ওঁদের কস্ট্যুমটা দিয়ে ক্যাশমেমো দিয়ে দিন।"

তাহার পর আমাদের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "আপনারা খেলা টেলা দেখতে নিশ্চয়ই এদিকে আসেন, তখন পয়সাটা আমাকে দিয়ে যাবেন।"

বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম। আমার সাঁতারু-জীবনের প্রবেশদ্বারে সেই হাস্যমুখ সাহেবটির ছবি আজও টাঙানো আছে। আরও দুইটি ছবিও আছে। সে দুইটির কথাও শুনুন। আমি ডাক্তারি পাশ করিতে পারি নাই, সাঁতারটা অবশ্য ভাল করিয়া শিখিয়াছিলাম। একটি সাঁতারু মেয়েকে বিবাহ করিয়া সাঁতারু-জীবনই যাপন করিতেছি।

সাঁতারের পোষাক সম্বন্ধে আমার দ্বিতীয় অভিজ্ঞতাটি হইয়াছিল একটি মফঃস্বল শহরে। একটি সন্তরণ প্রতিযোগিতায় যোগদান করিবার জন্য সেখানে গিয়াছিলাম। এমনি দুর্দৈব, আমার সুটকেসটি ট্রেনে চুরি গেল। ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম, কে নামাইয়া লইয়াছে। সুটকেসের ভিতর আমার সাঁতারের পোষাক ছিল। সুতরাং ট্রেন হইতে নামিয়াই সাঁতারের পোষাক কিনিবার জন্য বাজারে বাহির হইয়া পড়িতে হইল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই কিন্তু হতাশ হইলাম। অধিকাংশ দোকানদার সুইমিং কস্ট্যুমের নাম পর্যন্ত শোনে নাই। অধিকাংশ দোকানেই ধুতি, শাড়ী, গামছা, ছিট্। একজন বলিল, "এখানকার সবচেয়ে বড় দোকান 'ভবতারণ ভাণ্ডার', সেখানে গেলে পেতে পারেন।" ভবতারণ ভাণ্ডারেই গেলাম। সেখানে দেখিলাম বিরাট এক তাকিয়ায় হেলান দিয়া এক বিরাট পুরুষ গড়গড়া সহযোগে তাম্রকুট সেবন করিতে করিতে তাঁহারই অনুরূপ ভীমকান্ত আর এক ভদ্রলোকের সহিত রাজনীতি আলোচনায় ব্যাপৃত রহিয়াছেন। আমি দোকানে প্রবেশ করিলাম, তাঁহারা বিশেষ ভ্রুক্ষেপ করিলেন না। মডারেট্‌রা ভাল, না একস্‌ট্রিমিস্ট্‌রা ভাল, এই আলোচনাই করিতে লাগিলেন।

"সুইমিং কস্ট্যুম আছে কি?"

"পাশের দোকানে যান, আমরা কাটা কাপড় বেচি, পাশেই ডাক্তার মিত্তিরের ডিস্‌পেনসারি, সেখানেই খোঁজ করুন।"

বুঝিলাম, তাঁহারা সুইমিং কস্ট্যুমের নাম পর্যন্ত শোনেন নাই, ভাবিয়াছেন আমি বুঝি কোন ঔষধ কিনিতে আসিয়াছি। তখনই আমার চলিয়া আসা উচিত ছিল, কিন্তু ললাট-লিপি খণ্ডন করা যায় না, তাই আমি বাংলা করিয়া বলিলাম, "ওষুধ নয়, আমি সাঁতারের পোষাক খুঁজছি।" বুঝাইয়া বলিলাম।

"ও, বুঝেছি। কাগজে টাইট্ গেঞ্জি-প্যাণ্ট-পরা ছোক্‌রা-ছুক্‌রিদের ছবি দেখি বটে মাঝে মাঝে। না মশাই, ওসব জিনিস আমার দোকানে পাবেন না!"

দ্বিতীয় ভদ্রলোকটি বলিলেন, "আজ এখানে শীলেদের বাঁধে সাঁতার কম্পিটিশন হবে যে। কলকাতার বিখ্যাত সাঁতারু দুলালচাঁদ আসছেন।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ শুনেছি বটে। লোকটা নামী লোক।"

আর আমি আত্মসম্বরণ করিতে পারিলাম না। নিজের পরিচয় দিলাম।

"ও, আপনিই দুলালচাঁদ, বসুন, বসুন।"

উভয়েই খুব উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন।

আমি উপবেশন করিলাম, এবং তাঁহাদের বুঝাইতে লাগিলাম সাঁতার কাটিতে হইলে সাঁতারের পোষাক কেন প্রয়োজন।

ভবতারণ ভাণ্ডারের মালিক সমস্ত শুনিয়া বলিলেন, আপনি বিপদে পড়েছেন বুঝতে পারছি, কিন্তু ও জিনিস তো আমার কাছে নেই। কারও কাছেই পাবেন না। আচ্ছা দাঁড়ান, গফুর, গফুর ও গফুর!"

পাশের ঘর হইতে পর্দা ঠেলিয়া লুঙ্গিপরা একটি শীর্ণ ব্যক্তি প্রবেশ করিল।

"এই বাবুর হাফ প্যাণ্ট আর হাফ শার্টের মাপ নিয়ে নাও তো! যান আপনি ওর সঙ্গে। চারটে নাগাদ সাঁতারের পোষাক পেয়ে যাবেন।"

"করিয়ে দেবেন বলছেন?"

"হাঁ হাঁ মশাই, ভার নিলুম যখন করিয়ে দেব। খুব ভাল কাপড়ের করিয়ে দেব। কলকাতায় এমনটি পাবেন না।"

"কী কাপড়ের?"

"সে দেখবেন তখন!"

ভদ্রলোকের চোখ-মুখের ভাব দেখিয়া আর বেশী ইতস্তত করিতে সাহস হইল না।

গফুর দর্জির ঘরে গিয়ে মাপ দিলাম। যাঁহার বাড়িতে উঠিয়াছিলাম তিনিও আশ্বাস দিলেন, "ভবতারণবাবু স্বয়ং যখন ভার নিয়েছেন, তখন ঠিক পেয়ে যাবেন।"

সাড়ে পাঁচটার সময় সাঁতার আরম্ভ। ভবতারণবাবু ঠিক চারটের সময় যাইতে বলিয়াছিলেন। গিয়া দেখিলাম দোকান বন্ধ, শুনিলাম ভবতারণবাবু এ-বেলা দোকান খুলিবেন না, সাঁতার দেখিতে যাইবেন। অনেক ডাকাডাকির পর গফুর-দর্জি পাশের একটি গলি হইতে বাহির হইয়া আসিল।

"ও, আপনি এসেছেন! টেঁকে রেখেছি, এইবার কলটা চালিয়ে দিচ্ছি। এক্ষুণি হয়ে যাব।"

বারান্দাতেই বসিয়া রহিলাম। সওয়া পাঁচটার সময় গফুর কোনক্রমে কাজ শেষ করিল। দেখিলাম কাপড়টা কালো এবং খুব খস্‌খসে গোছের।

গফুর বলিল, "ছাতার কাপড়। বাবু বলিলেন, জলে ভিজবে কিনা, ছাতার কাপড়েরই ভাল হবে।"

হাফ প্যাণ্টটা একটু আঁট এবং হাফ শার্টটা বেশ ঢিলা হইল। অদল-বদল করিবার আর সময় ছিল না। ওই কস্ট্যুম পরিয়াই প্রতিযোগিতায় নামিয়া গেলাম। প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থানই অধিকার করিয়াছিলাম, কিন্তু জল হইতে যখন উঠিলাম, তখন আমার সর্বাঙ্গ কালো হইয়া গিয়াছে। কাপড়ের রংটা কাঁচা ছিল।

একটা কথা কিন্তু না উল্লেখ করিলে অন্যায় হইবে। ভবতারণবাবু একটি পয়সাও দাম লন নাই। হাসিয়া বলিয়াছিলেন, "ওটা আপনাকে প্রেজেণ্ট করলাম। আপনি নামি লোক, গরিবের স্মৃতিচিহ্ন থাক আপনার কাছে।"

সাঁতারের পোষাক সম্পর্কে একটি বিলাতী দোকানের এবং একটি স্বদেশী দোকানের গল্প বলিলাম। তৃতীয় গল্পটি আরও স্বদেশী। এক অজ পাড়াগাঁয়ে ভাগ্নের বিবাহ উপলক্ষে গিয়াছিলাম। সেখানে সকলে ধরিয়া বসিল, সাঁতার দেখাইতে হইবে। কয়েকজন উৎসাহী প্রতিযোগীও জুটিয়া গেল এবং স্পর্ধা করিতে লাগিল আমাকে হারাইয়া দিবে।

বলিলাম, "সঙ্গে তো সুইমিং কস্ট্যুম আনিনি। সুইমিং কস্ট্যুম না হলে সাঁতার কাটতে পারি না।"

ছোকরারা দমিয়া গেল। কিছুক্ষণ অপ্রস্তুত মুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

হঠাৎ একজন বলিল, "বেংকট বাবার কাছে গেলে কেমন হয়। তিনি ছবির অসুখের সময় থার্মোমিটার বার করে দিয়েছিলেন, আমাদের অসময়ে কাঁটাল খাইয়েছিলেন, তিনি ইচ্ছে করলে সুইমিং কস্টুমও আনিয়ে দিতে পারবেন। চলুন না তাঁর কাছে। বেশী দূর নয়।"

"বেংকট বাবা কে?"

মস্ত বড় সিদ্ধপুরুষ একজন। ইচ্ছে করলে সব করতে পারেন। সুখেনদাকে দামী একটা ঘড়ি আনিয়ে দিয়েছিলেন একবার।"

"কী করে আনিয়ে দিয়েছিলেন?"

"মন্তরের চোটে। আপাদমস্তক কম্বল ঢাকা দিয়ে শুয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর উঠে ঘড়িটা হাতে দিলেন। মনে হল যেন তাঁর কাছেই ছিল।"

কৌতুহল হইল। গেলাম বেংকট বাবার কাছে। ক্ষুদ্র খর্বকার ব্যক্তি, চক্ষু দুইটি

লাল। সব শুনিয়া তিনি বলিলেন, "সাঁতার কাটবার জন্যে আবার পোষাকের দরকার কি! বাবা, সমস্ত ত্যাগ করে ভবসমুদ্রে ঝাঁপিয়ে না পড়লে পার মিলবে না। সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে সাঁতার কাটতে শেখ বাবা, সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে সাঁতার কাটতে শেখ। পোষাক নিয়ে কী হবে!"

বন্দেমাতরম্

শহরের গণ্যমান্য নাগরিক রায়বাহাদুর জগৎজ্যোতি সিংহরায়ের কন্যা সুশীলা সহসা নিরুদ্দেশ হওয়াতে আমার কাজ আরও বাড়িয়া গেল। চোর, ডাকাত, খুনী, জালিয়াত্ ইহাদের লইয়াই আমার নিঃশ্বাস ফেলিবার অবকাশ নাই, বিবিধ প্রকার পাপী ও শয়তানদের পিছু পিছু ঘুরিয়া দিনকে রাত এবং রাতকে দিন করিয়া ফেলিতেছি—রায়বাহাদুরকে সবিনয়ে সে কথা নিবেদন করিলাম! তিনি কিন্তু না-ছোড়। অত বড় মানী লোক আমার কাছে হাতজোড় করিয়া ফেলিলেন। বলিলেন,

"ওসব কোনও ওজর শুনব না ভাই। সি-আই-ডি হিসেবে তোমার যে সুনাম শুনেছি তার মর্যাদা তোমাকে রাখতেই হবে। আমার মন সম্ভ্রম কলঙ্কে কালো হয়ে যাবে, আর তুমি বাঙালীর ছেলে হয়ে দাঁড়িয়ে দেখবে সেটা!"

কি আর বলিব, কয়েক মুহূর্ত নীরব থাকিয়া শেষে কথা দিয়া আসিলাম।

সুশীলার যে এই পরিণাম হইবে, তাহা পূর্বেই বুঝিয়াছিলাম। মনোমত পাত্র পাওয়া যায় নাই বলিয়া রায়বাহাদুর তাহার বিবাহ দিতে পারেন নাই। যে ধরনের পাত্র সাধারণত আমাদের মনোমত হয় তাহা এদেশে দুর্লভ। অনেক টাকা খরচ করিয়াও মেলে না, এ যুক্তি কিন্তু বয়স বা যৌবনের উদ্দাম গতিকে রোধ করিতে পারে না। রায়বাহাদুর রোধ করিবার চেষ্টাও করেন নাই। বহুবিধ সৌখীন শাড়ি এবং অলঙ্কারে মেয়েকে সাজাইয়া ঐশ্বর্যের ময়ূরপঙ্খীটিতে তাহাকে তুলিয়া দিয়াছিলেন। সংসার সমুদ্রের ঘাটে ঘাটে সে নাচিয়া গাহিয়া বেড়াইতেছিল। কোনও সিনেমা, কোনও থিয়েটার, কোনও পার্টি সে বাদ দিত না। কলেজে কো-এডুকেশন তো ছিলই। ইহাই আজকালকার হাওয়া এবং ইহাই নাকি সভ্যতার মানদণ্ড। এ অবস্থায় যাহা ঘটিবার তাহাই ঘটিয়াছে, বিস্ময়ের কিছু নাই।

সুশীলার নাগাল কিন্তু সহজে পাইলাম না। দেখিতে দেখিতে প্রায় সাত আট মাস কাটিয়া গেল। রায়বাহাদুর পরিচিত মহলে প্রচার করিয়া দিলেন সুশীলা ব্যাঙ্গালোরে তাহার জ্যাঠামহাশয়ের কাছে গিয়াছে, সেখানে একজন খাঁটি মেমসাহেবের নিকট সে নাকি লেখাপড়ার সহিত বিলাতী সহবৎ শিক্ষা করিতেছে। তাহার পর বিলাত যাইবে। পরিচিত-মহল রায়বাহাদুরের সামনে দেঁতো হাসি হাসিয়া আনন্দ প্রকাশ করিল। কিন্তু আড়ালে তাহারা যে হাসি হাসিল তাহা অন্য প্রকার। যাই হোক, এইভাবেই চলিতে লাগিল। আমি পারতপক্ষে রায়বাহাদুরের সহিত দেখা করিতাম না। দেখা হইয়া গেলে সত্য কথাই বলিতাম, যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছি। লোক লাগাইয়া চেষ্টা করিবার উপায় ছিল না, কারণ রায়বাহাদুর ব্যাপারটা গোপন রাখিতে বলিয়াছিলেন।

এলাহাবাদে সিধু গুণ্ডার পিছু লইয়াছিলাম। সিধু গুণ্ডাই যে প্রকাশ্য দিবালোকে একটা মাড়োয়ারিকে খুন করিয়া তাহার টাকার থলিটা ছিনাইয়া লইয়াছিল সে বিষয়ে কারও সন্দেহ ছিল না। কিন্তু লোকটা এমনই ধূর্ত যে কিছুতেই তাহাকে ধরিতে পারিতেছিলাম না। সে যে এই শহরেই আছে তাহারও প্রমাণ পাইয়াছিলাম, কিন্তু কোথায় যে আছে তাহা নির্ণয় করা যাইতেছিল না। সমস্ত হোটেলে এবং খাবারের দোকানে আমার গুপ্তচর ছিল। একজন আসিয়া খবর দিল যে শহরের বাহিরে যে ডাস্টবিনটা আছে সেখানে নাকি গভীর রাত্রে সিধু খাবার লইবার জন্য আসে। একটা লোক সন্ধ্যার সময় সেই ডাস্টবিনের ভিতর তাহার জন্য খাবার রাখিয়া যায়। কাছেই একটা গাছ ছিল, সন্ধ্যার পর তাহার উপর চড়িয়া বসিয়া রহিলাম। একটু পরে সত্যই দেখিলাম একটা লোক তাহার ভিতর শালপাতা মুড়িয়া কি যেন রাখিয়া গেল। বুঝিলাম একটু পরে সিধু আসিবে। সিধু অনেক রাত্রে আসিল এবং আসিল সাইকেল চড়িয়া। এটা আমি প্রত্যাশা করি নাই। আমি গাছ হইতে নামিতে নামিতেই সে খাবার লইয়া অন্তর্ধান করিল। আমার কিংবা আমার সঙ্গের কনেস্টবল দুইজনের সাইকেল ছিল না। আমরা পদব্রজেই সিধু যে পথে গিয়াছিল সেই পথেই চলিতে লাগিলাম। সাইকেলটা কিছুক্ষণ পরেই আঁধারে মিলাইয়া গেল। তবু আমরা চলিতে লাগিলাম। দুইদিকে ফাঁকা মাঠ, জনমানবের চিহ্ন নাই, গভীর অন্ধকার। ফিরিয়া আসিব কি না ভাবিতেছি এমন সময় কিছুদূরে একটা পোড়ো বাড়ি চোখে পড়িল। কাছে গিয়া দেখিলাম, খোলার বাড়ি, দুই দিকে মাটির দেওয়াল কোনক্রমে দাঁড়াইয়া আছে। টর্চের আলো ফেলিয়া ফেলিয়া কাছে গেলাম এবং ভিতরে উঁকি দিয়া দেখিবার চেষ্টা করিলাম। একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করিয়া ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিল। সাধারণ দেশী কুকুর, লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম কুক্কুরী। তাহার প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করিয়া ভিতরে ঢুকিয়া পড়িলাম। সিধুকে দেখিতে পাইলাম না।

"কে আপনি ?"

টর্চের আলো ফেলিয়া অবাক হইয়া গেলাম। শত ছিন্ন মলিন বসন, মাথার চুল রুক্ষ, একটি সদ্যোজাত শিশুকে বুকে চাপিয়া উঠিয়া বসিয়াছে। ঠিক পাশেই দেখিলাম কতকগুলি কুকুর ছানাও রহিয়াছে। তাহাদের মা-ও পরমুহূর্তে আসিল এবং তারস্বরে চীৎকার করিতে করিতে বাচ্চাগুলিকে ঘিরিয়া বসিল। সুশীলার চোখে ভয়ার্ত দৃষ্টি ; দেখিলাম সে থরথর করিয়া কাঁপিতেছে।

আমি একটি কথাও বলিলাম না। বলিতে পারিলাম না। জগজ্জননী জগদ্ধাত্রীকে মনে মনে প্রণাম করিয়া বাহির হইয়া আসিলাম।

অঙ্কুর ও বৃক্ষ

ভদ্রলোক সত্যই বিপন্ন হ'য়ে পড়েছিলেন। আমিও বেশ বিপন্ন হ'য়ে পড়লাম। কম টাকা নয়, প্রায় দু'হাজার টাকা। আমার কথায় অত টাকা সে কি ছেড়ে দিতে রাজি হবে ? আমাকে অবশ্য সে খুবই খাতির করে। কিন্তু খাতির করে বলেই কি অসঙ্গত অনুরোধ করা যায়। ভদ্রলোক কিন্তু না-ছোড়। হাত জোড় করে বলতে

লাগলেন—"দয়া করুন ডাক্তারবাবু, বিশ্বাস করুন, তিন দিন না খেয়ে আছি।" চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে পড়ল তাঁর। নিরুপায় হয়ে শেষে প্রতিশ্রুতি দিলাম যে তাঁর উত্তমর্ণকে অনুরোধ করব যাতে তিনি সুদের টাকাটা ছেড়ে দেন। তাকে বুঝিয়ে বলব যে বসতবাটি বিক্রি করেও সব টাকা দিতে পারবেন না ভদ্রলোক। যতটা দিচ্ছেন ততটা নিয়ে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। সিভিল জেল দিয়ে আর লাভ কি? ক্ষতিই বরং। আমার প্রতিশ্রুতি পেয়ে ভদ্রলোক চোখ মুছতে মুছতে উঠে গেলেন। অনাহার ক্লিষ্ট চেহারা। পরনে ছিন্ন মলিন বসন। দেখে সত্যই দুঃখ হ'ল।

একটি গল্প মনে পড়ছে। গল্প নয়, সত্যি ঘটনা। অনেকদিন আগেকার ঘটনা, প্রায় বিশ বছরের। আমার এক বন্ধু হঠাৎ একদিন সকালে আমার বাসায় এসে উপস্থিত।

"অনেকদিন তোর সঙ্গে দেখা হয়নি, তাই ভাবলাম নেবে পড়ি এখানে। পাটনায় যাচ্ছি একটা বিয়েতে। কাল বিয়ে, আজ রাত্রের ট্রেনে এখান থেকে রওনা হলে ঠিক সময় পৌঁছানো যায়। তারপর কেমন আছিস?"

অনেকদিন পর রতনকে দেখে খুব খুশী হলাম। রতনকে সত্যই ভালবাসতাম, অন্য কোনও কারণে নয়, তার নিরহংকার সরলতার জন্য। লক্ষপতির একমাত্র ছেলে সে, লেখাপড়াতেও খুব ভাল, কিন্তু তার পোষাক-পরিচ্ছদে বা কথা-বার্তায় কখনও কোন রকম চালিয়াতি লক্ষ্য করিনি। সদা-হাস্যময় আত্মভোলা লোক। অনেকদিন পরে দেখা হ'ল, দেখলাম একটুও বদলায়নি। তখন আমি সবে প্র্যাকটিস আরম্ভ করেছি, রোগীর ঝামেলা বিশেষ ছিল না, সমস্ত দিন খুব আড্ডা দেওয়া গেল তার সঙ্গে।

হঠাৎ রতন বলে উঠল—"ওহো, একটা জিনিস ভুল হয়ে গেছে! ঊর্ধ্বশ্বাসে ট্যাক্সি করে এসে ট্রেন ধরেছি শাড়িখানা কিনে আনা হয়নি। এখানে ভালো কাপড়ের দোকান আছে?"

আমি ব্যাপারটা ধরতে পারিনি প্রথমে।

"কিসের শাড়ি?"

বাঃ বিয়ে বাড়িতে যাচ্ছি শুধু হাতে কি যাওয়া যায়? একটা ভালো বেনারসী শাড়ি নিয়ে যাব ভেবেছি। এখানে দোকান আছে?"

"আছে। বেশ বড় বাঙালী দোকান আছে একটা।"

"চল তাহলে সেখানে। একটা শাড়ি কিনে ফেলা যাক।"

আমার পরিচিত জগৎবাবুর জগজ্জ্যোতি ভাণ্ডারে রতনকে নিয়ে গেলাম। জগৎবাবুর নিজের মৃতা পত্নী জ্যোতির্ময়ী দেবীর নামের প্রথমার্ধের সঙ্গে নিজের নামের ব্যঞ্জন সন্ধি করে দোকানটির নামকরণ করেছিলেন। দোকানটির তখন খুব চলতি।

আমরা যখন দোকানে গেলাম তখন বেলা আড়াইটে হবে। জগৎবাবু নিজেই দোকানে ছিলেন, কর্মচারী কেউ ছিল না। তারা খেতে গিয়েছিল বোধ হয়। জগৎবাবু একটা তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে ঢুলছিলেন। আমরা দোকানে ঢুকতেই তাঁর কাঁচা ঘুমটা ভেঙে গেল, মনে হ'ল একটু যেন অপ্রসন্ন হলেন। তাঁর ঈষৎ কুঞ্চিত ভ্রূযুগল দেখে তাই-ই অনুমান করলাম। কিন্তু আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল, তাই মুখে একটা ভদ্রতার হাসি টেনে আনলেন।

"ডাক্তারবাবু যে, আসুন ! দুপুর রোদে বেরিয়েছেন যে !"

"আমার এই বন্ধুটির কাপড় কেনার দরকার। বিয়ে বাড়িতে যাচ্ছে, একটা বেনারসী শাড়ি নিয়ে যেতে চায়। দিন একখানা।"

জগৎবাবু কয়েক মুহূর্ত নীরব রইলেন। তারপর দোকানের শেল্‌ফগুলোর দিকে চেয়ে বললেন—"শাড়ি ? বেনারসী ? আছে বোধ হয় নাগালের মধ্যে। দেখি।"

তাকিয়া ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। উঠতে গিয়ে কাছাটা খুলে গেল। সেটা গুঁজে কসিটা ঠিক করে নিয়ে এগিয়ে গেলেন একটা শেল্‌ফের দিকে। সেখান থেকে একটা কাপড়ের বস্তা নামালেন ধপাস্‌ করে। তারপর তার পাশে উবু হ'য়ে বসে বস্তাটি খুলে বার করলেন একখানি শাড়ি।

"নিন দেখুন।"

রতনের কিন্তু পছন্দ হল না।

"আর একটা দেখান।"

আর একটা দেখালেন তিনি। সেটাও কিন্তু রতনের পছন্দ হল না। তৃতীয় শাড়িখানাও যখন রতনের পছন্দ হ'ল না তখন জগৎবাবুর চোখের দৃষ্টিতে আগুন ধরেছে। গুম হয়ে নির্নিমেষে তিনি চেয়ে আছেন রতনের দিকে।

প্রশ্ন করলেন—"কি রকম শাড়ি চাই আপনার ?"

মিতভাষী রতন বললে—"ভালো শাড়ি। আছে কি আপনার ?"

"আছে। আড়াই-শ' তিন-শ' টাকা দামের শাড়ি আছে।"

নির্বিকার কণ্ঠে রতন বললে—"বেশ, দেখান।"

"সত্যি সত্যি যদি নেন তাহলে দেখাই। তা না হলে শুধু শুধু সিঁড়িতে চড়ে ওই ওপরের তাক থেকে নাবানোর কোন মানে হয় না ! নেবেন কি ?"

"থাক আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না।"

মৃদু হেসে উঠে পড়ল রতন, দোকান থেকে বেরিয়ে এল। আমাকেও বেরিয়ে আসতে হ'ল।

"কিনবি না ?"

"অন্য দোকানে চল। এখানে কিনব না। অভদ্র লোক।"

মনে পড়ল মথুরাদাসের কথা। মথুরা দাস আমার রোগী। ছোট একটি কাপড়ের দোকান করেছে সম্প্রতি। তাঁর দোকানেই গেলাম। আমাদের দেখেই মথুরা দাস শশব্যস্তে উঠে দাঁড়াল এবং এমনভাবে আমাদের অভ্যর্থনা করল যেন আমাদের পথ চেয়েই তার দিন কাটছিল।

"একখানা ভাল বেনারসী শাড়ি চাই শেঠজী, আমার দোস্তের জন্য।"

"আইয়ে বৈঠিয়ে।"

সাগ্রহে আহ্বান করল আমাদের, তারপর শাড়ি বার করতে লাগল। এক, দুই, তিন, চার—আর ছিল না বেচারীর দোকানে। রতনের একটাও পছন্দ হ'ল না। শেঠজী কিন্তু দমলেন না তাতে।

হিন্দী ভাষায় বললেন, "আপনারা একটু অপেক্ষা করুন। আমি আরও শাড়ি এনে দেখাচ্ছি। অন্য দোকান থেকে আনছি।"

দুপুরের রোদ তুচ্ছ করে বেরিয়ে গেল তৎক্ষণাৎ। কিছুক্ষণ পরে ফিরল

একগাদা শাড়ি নিয়ে, নানা দামের, নানা রঙের। একখানা শাড়ির জমি রতনের পছন্দ হ'ল, কিন্তু রংটা হ'ল না।

শেঠজী একটু অপ্রতিভ হ'য়ে প্রশ্ন করলেন, "বাবুজির কোন রং পছন্দ তাহলে ?"

"ফিকে সবুজ।"

"হুজুরিমলের দোকানটা এখন বন্ধ আছে। সেখানে ফিকে সবুজ রঙের কাপড় আছে। কাল এনে রাখব বাবু, কিম্বা বলেন তো ডাক্তারবাবুর বাড়িতে পাঠিয়ে দেব।"

"বাবু তো কাল পর্যন্ত থাকবেন না। আজ সন্ধ্যার ট্রেনে পাটনা যাচ্ছেন।"

"ও, আচ্ছা দেখি।"

বেরিয়ে এলাম আমরা দোকান থেকে।

রতন বললে—"পাটনাতেই পেয়ে যাব বোধ হয় !"

সন্ধ্যার সময় রতনকে স্টেশনে তুলে দিতে যাবার জন্য বেরুতে যাচ্ছি এমন সময় মথুরাদাস মারোয়াড়ি এসে হাজির। হাতে ফিকে সবুজ রঙের তিনখানা শাড়ি। রতনের একখানা শাড়ি পছন্দ হ'ল। সাড়ে আট-শ' টাকা দিয়ে কিনলে শাড়িখানা।

পরে খবর নিয়ে জেনেছিলাম ওই শাড়িখানা বেচে একশ টাকা লাভ করেছিল মথুরাদাস।

বিপন্ন ভদ্রলোকটিকে দেখে এই যে ঘটনাটা মনে পড়ল এটাকে অবান্তর বা অপ্রাসঙ্গিক মনে করবেন না। রীতিমত প্রাসঙ্গিক। কারণ ঐ বিপন্ন ভদ্রলোকটিই একদা-ধনী জগৎ চৌধুরী। জগজ্জ্যোতি ভাণ্ডার ঋণের বন্যায় বহুকাল আগেই ভেসে গেছে। আর যার থেকে টাকা ধার করে তিনি এই বিপুল বন্যায় নিজের নাকটি কোনক্রমে বার করে রাখতে সক্ষম হয়েছেন তার নাম শেঠ মথুরাদাস,—যে একদিন রতনকে ফিকে সবুজ রঙের শাড়ি বেচেছিল বাড়িতে এসে। তাঁর এখন চারটে দোকান, দুটো মিল, ব্যাঙ্কে লক্ষ লক্ষ টাকা।

আর একটা কথাও এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন।

আমার অনুরোধে মথুরাদাস জগৎবাবুকে ঋণমুক্ত করে দিয়েছিল।

অন্তরালে

পুরাতন বন্ধু উমানাথ বাজপেয়ী কর্ম হইতে অবসর লইয়া কাশীবাস করিতে যাইতেছিল। দিল্লী এক্সপ্রেস ভাগলপুর পর্যন্ত আসিয়া গেল। সামনের স্টেশনে একটা গাড়ি লাইনচ্যুত হইয়া পথ আটকাইয়াছিল। উমানাথ জানিত আমি ভাগলপুরে আছি। গাড়ী ছাড়িবার প্রচুর দেরী আছে দেখিয়া সে পুরাতন বন্ধুত্বটা ঝালাইয়া লইবার মতলবে নিজের জিনিসপত্র নামাইয়া একটা ছ্যাকড়া গাড়িতে আরোহণ করিল এবং খুঁজিয়া খুঁজিয়া আমাকে বাহির করিয়া ফেলিল। পুরাতন বন্ধুকে দেখিয়া আনন্দিত হইলাম। বলিলাম,—

"আজ আর তোমার যাওয়া হচ্ছে না। এসেছ যখন থেকেই যাও দু'একদিন।"

"আজকের দিনটা তো থাকতেই হবে মনে হচ্ছে, কাল যদি গাড়ি চলে তখন দেখা যাবে।"

সন্ধ্যার পর ছাতের উপর ক্যাম্প-চেয়ার বিছাইয়া উভয়ে বিশ্রম্ভালাপে রত হইলাম। পূর্বজীবনের নানা কথার পর তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—

"তুমি তো এস. পি. হয়েই রিটায়ার করলে।"

"হ্যাঁ। ডি. আই. জি হওয়া আর হল না।"

"চাকরি জীবনটা কেমন লাগল ?"

"রটন্‌! নরক বাস !"

"পয়সা-কড়ি কেমন রোজগার হল ?"

"তা মন্দ হয়নি। গোটা দুই ছেলে আছে, তাদের উচ্ছন্ন যাবার পাথেয় রেখে যাব।"

"কেন লেখাপড়া শেখেনি তারা ?"

"ম্যাট্রিকের বেড়া পার হতে পারেনি।"

"আর ছেলে-পিলে নেই তোমার ?"

"তিনটি মেয়ে আছে। তিনটেই বিধবা, তার মধ্যে একটি পাগল।"

একটা অস্বস্তিকর নীরবতা ঘনাইয়া আসিল। বাজপেয়ী-ই হঠাৎ আবার বলিল।

"বাবা বিশ্বেশ্বরের চরণে যাচ্ছি। ভরসা আছে তিনি ঠেলে ফেলে দেবেন না, দু'চারটে ভাল কাজ করেছি জীবনে।" বলিলাম—

"তোমাদের জীবনে অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই খুব বিচিত্র। কোন সাহিত্যিক জানতে পারলে হয়তো আমাদের সাহিত্যেও শার্লক হোমস্, পইরো বা ফাদার ব্রাউন দেখা যেত।"

"ভবিষ্যতে কি হবে জানি না, কিন্তু আমার যে-ধরনের অভিজ্ঞতা তা অত্যন্ত সাদা-মাটা, চাঁছাছোলা, পরিষ্কার ব্যাপার। কোনও বুদ্ধিমান ডিটেক্‌টিভের দরকার হয় না তার জন্যে। ডিটেক্‌টিভ দরকার হতে পারে কে কি ভাবে ঘুস খাচ্ছে তাই ধরবার জন্যে, চোর ডাকাত খুনী ধরবার জন্যে নয়। আমাদের দেশের ডিটেক্‌টিভরা, ইংরেজ আমলে অন্তত, দেশের সচ্চরিত্র ভদ্রলোকেদেরই ফাঁসাবার চেষ্টা করত খালি। টেররিস্ট-মুভমেণ্টের কথা ভেবে দেখ। আমি নিজের স্বপক্ষে শুধু এইটুকু বলতে পারি যে, বিপ্লবী দু' একটি ছেলেকে আমি হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়েও ছেড়ে দিয়েছি। সেইজন্যেই হয় তো বিশ্বেশ্বর আমাকে দয়া করতে পারেন।"

"বল না শুনি দু'একটা ঘটনা !"

ঠিক এই সময়ে ভিতর হইতে গৃহিনীর আহ্বান আসিল।

"খাবার দেওয়া হয়েছে, তোমরা খাবে এস !"

গল্পটা চাপা পড়িয়া গেল। সকালেই আমার কাজের ভীড়। গল্প শুনিবার অবসর নাই। বলিলাম—

"তোমার গল্পটা আর শোনা হল না। আজ থেকে যাও।"

"না ভাই, জিনিসপত্র সব পেঁছে গেছে, স্টেশনেই পড়ে আছে হয়ত। গল্পটা লিখে পাঠিয়ে দেব. তবে যে ঘটনাটা বলতে যাচ্ছিলাম তাতে আমার কৃতিত্ব কিছুই নেই। তবে গল্পটা তোমার মন্দ লাগবে না বোধ হয়। বীভৎস গল্প, তবে তার অন্তরালে কিছু পাবে হয়তো।"

বাজপেয়ী সেইদিনই চলিয়া গেল। দিন দশ-বারো পরে সত্যই সে নিম্নলিখিত গল্পটি পাঠাইয়াছিল।

আমি যখন শেরপুরায় বদলি হইয়া আসিলাম তখন আমাকে প্রথম প্রথম একটু অসুবিধায় পড়িতে হইয়াছিল। একেবারে নূতন জায়গা, পরিচিত লোক তেমন কেহ নাই যে কাজকর্মের পর দুই দণ্ড গল্প করিয়া কাটাই। তখনও আমি বিবাহ করি নাই, মন্ত্রও লই নাই। অবসর পাইলে তাস খেলিতাম। কিন্তু শেরপুরায় তখন কোনও ক্লাব ছিল না। সাধারণত দারোগার সঙ্গীর অভাব হয় না, অনেকে বরং দারোগার সহিত ভাবই করিতে চায়। কিন্তু ইহারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে যে-জাতীয় লোক হয় তাহাদের সহিত অবসর-বিনোদন করিবার মতো প্রবৃত্তি আমার তখন ছিল না। আমি যথাসম্ভব ন্যায়-নিষ্ঠ ভাবেই কাজ করিবার চেষ্টা করিতাম এবং পারতপক্ষে এমন কোনও লোকের সহিত মিশিতাম না, যাহারা আমার নিষ্ঠাকে বিচলিত করিতে পারে। সুতরাং শেরপুরায় প্রথম কিছুদিন নিঃসঙ্গ জীবনই যাপন করিতে হইয়াছিল। হঠাৎ একদিন বিধাতা কৃপা করিলেন, বাল্যবন্ধু সুরনাথের সহিত বহুকাল পরে হঠাৎ পথে দেখা হইয়া গেল। সুরনাথ শুধু আমার বাল্যবন্ধুই নয়, আমার দূরসম্পর্কের ভগ্নীপতিও। বলা বাহুল্য, হাতে স্বর্গ পাইলাম। শুনিলাম সুরনাথ শেরপুরা হইতে ক্রোশ দুই দূরে সস্তায় কিছু জমি কিনিয়াছে এবং সেই জমিতেই বসবাস করিতেছে। আমাকে সেখানে যাইবার জন্য অনুরোধ করিল। প্রতিশ্রুতি দিলাম ঃ যাইব এবং সেইদিনই গেলাম। আমার ঘোড়া ছিল, বিশেষ কোন অসুবিধা হইল না। বৈকালে গিয়াছিলাম, তখনও দিনের আলো ছিল। দেখিলাম সুরনাথ যে-স্থানে বসবাস করিতেছে সে-স্থানটি লোকালয়ের একেবারে বাহিরে। একটু বিস্মিত হইলাম। বীরভুম জেলায় তাহার বাড়ি ছিল, কিছু জমিদারীও ছিল, সে এরকম নির্বান্ধব পুরীতে আসিয়া বসবাস করিতে গেল কেন? জিজ্ঞাসা করিলাম।—

"মীনুও এখানে আছে তো?"

মীনু আমার দূরসম্পর্কীয়া সেই ভগ্নীর নাম।

"না, সে ভাই অনেকদিন আগে মারা গেছে। সেই জন্যেই তো দেশে আর ভাল লাগল না। এখানে পালিয়ে এসেছি।"

"দেশের বিষয়-সম্পত্তি?"

"সব বিক্রী ক'রে দিয়ে এখানেই বিঘে পঞ্চাশেক জমি কিনেছি।"

"ছেলে-পিলে হয়নি?"

"না।"

"একেবারে একা থাক এখানে?"

"ঠিক একা নয়। ওই যে দূরে একটা বাড়ি দেখছ ওখানে আমার এক বন্ধু থাকে। সে-ও আমার সঙ্গেই জমি কিনেছিল। দু'জনে একসঙ্গে চাষবাস করি, বেশ আছি। ওরে ভজুয়া, চা নিয়ে আয়! চায়ের সঙ্গে কিছু খাবে না কি?"

"না।"

"আর বিয়ে করনি?"

"না। ওসবে আর রুচি নেই।"

ভজুয়া একটু পরে চা লইয়া আসিল। ভজুয়াকে দেখিয়া অস্বস্তি বোধ করিলাম। কুচকুচে কালো রং, খুব লম্বা, মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল। কিছু গোঁফ-দাড়িও আছে, কিন্তু সুবিন্যস্ত নয়, খাপ্‌চা-খাপ্‌চা। চক্ষু দুইটি ক্ষুদ্র, কিন্তু ভয়ংকর। মনে হয় শ্বাপদের চক্ষু। ভজুয়া চা দিয়া চলিয়া গেলে জিজ্ঞাসা করিলাম—

"এ চাকর কোথায় পেলে? এখানকারই লোক?"

"না, বাইরের। মাসখানেক হ'ল এসেছে। কেন?"

"অতি বদ চেহারা।"

"তা বটে। মাইনে নেয় না, পেট-ভাতাতেই কাজ করে, তাই রেখেছি। চেহারা খারাপ বটে কিন্তু খুব কাজের, জুতো-সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত সব কাজ করতে পারে। চেহারাটা অবশ্য খুবই খারাপ।"

ভজুয়া-প্রসঙ্গ চাপা পড়িয়া গেল। সুরনাথের বন্ধু কালিপ্রসাদ দ্বারপ্রান্তে দর্শন দিলেন। লোকটি একচক্ষু। আলাপ করিয়া মনে হইল বেশ আমোদপ্রিয়। প্রকাশ পাইল তিনিও অবিবাহিত। আমারও তখন বিবাহ হয় নাই। হাসিয়া বলিলাম—

"চতুর্থ আর একজন অবিবাহিত লোক জুটলে আমরা ব্যাচিলার্স কার্ড-ক্লাব করতে পারতাম।"

কালিপ্রসাদ বলিলেন—

"আছেন একজন। আমাদের সঙ্গে তেমন আলাপ হয় নি এখনও। মাস দুই আগে তিনিও জমি কিনবেন ব'লে এসেছেন। সুরনাথ, মিস্টার বক্‌শীকে খবর পাঠাও না একটা, দারোগাবাবুর নাম শুনলে হয়তো চ'লে আসবেন! আমাদের সঙ্গে ভালো ক'রে আলাপটাও হয়ে যাবে, কার্ড-ক্লাবটারও গোড়া-পত্তন হবে।"

"বেশ, ভজুয়াকে পাঠাচ্ছি।"

একটা চিঠি লইয়া ভজুয়া সাইকেল চড়িয়া চলিয়া গেল। আমরা গল্প করিতে লাগিলাম। গল্প কিন্তু জমিল না। কালিপ্রসাদবাবুর অদ্ভুত এক-চক্ষুটি গল্পের রসভঙ্গ করিতে লাগিল। শেষে না জিজ্ঞাসা করিয়া পারিলাম না।

"আপনার চোখটি গেল কি করে?"

"এক বাঘিনীর পাল্লায় পড়েছিলাম।"

"বাঘিনী? শিকার করার শখ আছে নাকি?"

"ছিল এককালে।"

কালিপ্রসাদবাবুর চোখে অদ্ভুত একটা ভাব ক্ষণিকের জন্য ফুটিয়া উঠিল। দেখিলাম সুরনাথও তাহার দিকে চাহিয়া একটা অদ্ভুত হাসি হাসিতেছে। আমি বলিলাম।

"তাহলে তো আপনি গুণী লোক মশায়। বলুন, বলুন শুনি আপনার শিকার-কাহিনী।"

কালিপ্রসাদবাবু হাসিয়া উত্তর দিলেন।

"সে অনেক লম্বা কাহিনী, আর একদিন শুনবেন। আজ আমার একটু কাজ আছে।"

কালিপ্রসাদবাবু উঠিয়া পড়িলেন। আমার মনে হইল গল্পের সুরটা যেন কাটিয়া গেল। কালিপ্রসাদবাবু চলিয়া যাইবার পর আর একটা ব্যাপারে একটু বিস্মিত

হইলাম। বাড়ির ভিতরের দিক হইতে নারীকণ্ঠের একটা কলহাস্য ভাসিয়া আসিল। সুরনাথ সঙ্গে সঙ্গে আমার দিকে চাহিল অর্থাৎ বুঝিবার চেষ্টা করিল হাসিটা আমি শুনিয়াছি কি না, শুনিয়া থাকিলে কিভাবে তাহা গ্রহণ করিয়াছি। জিজ্ঞাসা করিলাম—

"বাড়িতে কোনও মেয়েছেলে আছে না কি ?"

"তা আছে বই কি। চাকরানী আছে, চাকরদের বউ আছে। কেন তুমি অন্য কিছু ভাবছ না কি ?"

"না, না !"

সুরনাথের চোখে-মুখে কেমন একটা হিংস্রভাব যেন ক্ষণিকের জন্য মূর্ত হইয়া মিলাইয়া গেল। সুরনাথ আমার বাল্যবন্ধু, তাহার সহিত আত্মীয়তাও আছে, কিন্তু সহসা অনুভব করিলাম তাহাকে আমি চিনি না। যাহাকে আমি চিনিতাম, সে অন্য লোক।

ভজুয়া ফিরিয়া আসিয়া খবর দিল বক্‌শীবাবুর মাথা ধরিয়াছে বলিয়া আসিতে পারিলেন না।

আমিও উঠিয়া পড়িলাম। আমার ঘোড়া ছিল। ঘোড়ায় উঠিতে যাইতেছি এমন সময় ভজুয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আগাইয়া আসিয়া বলিল—

"হুজুর, আমি লণ্ঠন আর লাঠি নিয়ে আপনাকে মাঠটুকু পার ক'রে দিয়ে আসি।"

"কেন ?"

"এ মাঠে বড় বড় গোখরো সাপ আছে হুজুর। সেদিন একটা ঘোড়াকেই কামড়েছিল।"

সুরনাথও সে-কথার সমর্থন করিল। বলিলাম,—

"তবে চল।"

আমি অশ্ব-পৃষ্ঠে উঠিলাম। ভজুয়া লাঠি ও লণ্ঠন লইয়া আমার আগে আগে চলিতে লাগিল। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—

"তোমার দেশ কোথা ?"

"আজ্ঞে মানভুম হুজুর। পুরুলে থেকে কোশ পাঁচেক হবে।"

"দেশ ছেড়ে এখানে এলে কেন ?"

"কলেরায় সব মরে গেল যে হুজুর। তাই যেদিকে দু'চোখ যায় বেরিয়ে এলাম।"

ভজুয়াকে বেশী দূর যাইতে হইল না। কারণ আমার হাবিলদার সাহেব সাইকেলে চড়িয়া আমার খোঁজে আসিতেছিলেন। থানায় একটা দাঙ্গার সংবাদ আসিয়াছিল। হাবিলদার সাহেব দেখিলাম ভজুয়াকে চেনেন। বলিলেন,—

"কে ভজু না কি। আজ শহরে যাও নি ?"

"না।"

ভজুয়া চলিয়া গেলে হাবিলদার সাহেব বলিলেন, ভজু প্রত্যহ গাঁজা কিনিবার জন্য আবগারির দোকানে যায়। বলিয়া একটু হাসিলেন।

"তাই নাকি! আপনি জানলেন কি ক'রে ?"

"আমিও ভাং কিনতে যায় যে। রোজই দেখা হয়।"

"ও।"

হাবিলদার সাহেব আর একটা কথাও বলিলেন।

"ভজু খুব গুণী লোক হুজুর। অনেক রকম গাছ-গাছড়া চেনে, অনেক ভাল ওষুধও দিতে পারে। শুনলাম সুরনাথবাবু ওঁকে নিজের চিকিৎসার জন্যেই রেখেছেন।"

"সুরনাথবাবুর অসুখ আছে না কি কোনও ? দেখে তো কিছু মনে হল না।"

হাবিলদার সাহেব কয়েক সেকেন্ড চুপ করিয়া থাকিয়া একটু নিম্নকণ্ঠে বলিলেন—

"শুনেছি পুরোনো গণোরিয়া। এখানকার অনেক ডাক্তার কবিরাজ হাকিম ও'র চিকিৎসা করেছেন, কিছু হয়নি। এখন ভজু ওকে ওষুধ দিচ্ছে।"

আমি এ-সব খবর শুনিয়া শুধু বিস্মিত নয়, একটু বিচলিতও হইলাম।

"আপনি এত-সব খবর জানলেন কি ক'রে ?"

"আমি তো এখানে অনেকদিন আছি হুজুর। অনেকের অনেক খবর জানি। সুরনাথবাবুর সব্‌জিবাগানের মালীই আমাকে বলেছিল একদিন। সুরনাথবাবু আপনার কেউ হয় না কি।"

এ-সব খবর শোনার পর তাহার সহিত আত্মীয়তা আছে এ-কথা আর বলিতে পারিলাম না। বলিলাম—

"ছেলেবেলায় এক সঙ্গে এক স্কুলে পড়তাম, সেদিন রাস্তায় হঠাৎ দেখা হয়ে গেল, তাই এসেছিলাম।"

হাবিলদার বলিলেন—

"ও'র ভারী বদনাম এখানে। ও'র কানা দোস্তটিও ভাল নয়।"

উপরোক্ত ঘটনার পর আমি আর সুরনাথের কাছে যাই নাই, যাইবার উৎসাহ পাই নাই। একদিন কিন্তু যাইতে হইল। গভীর রাত্রে সুরনাথের একটি চাকর, ভজুয়া নয়, অন্য চাকর, আসিয়া আমাকে যে সংবাদটি দিল তাহা ভয়ানক। বলিল, সুরনাথকে এক প্রকাণ্ড গোক্ষুর দংশন করিয়াছে। সুরনাথ অবিলম্বে আমাকে একজন ডাক্তার লইয়া যাইতে অনুরোধ করিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলাম—

"সাপে কামড়েছে ? সাপটাকে দেখেছিস ?"

"সবাই দেখেছে হুজুর, প্রকাণ্ড গোখ্‌রো সাপ। বাবুর ঠোঁট মুখ সব নীল হয়ে গেছে। অতি কষ্টে কথা বলতে পারছেন, অতি কষ্টে আপনার কথা বললেন।"

ডাক্তার মৈত্রকে লইয়া যতশীঘ্র সম্ভব অকুস্থলে গিয়া উপস্থিত হইলাম। গিয়া দেখিলাম সুরনাথ মারা গিয়াছে। তাহার মুখটা নীল, মনে হইতেছে কেহ যেন কালি মাখাইয়া দিয়াছে। পায়ের গোছে দুই তিন স্থানে দড়ি বাঁধা রহিয়াছে, শুনিলাম পায়ের পাতায় সাপটি কামড়াইয়াছিল। ক্ষতস্থানের উপর ভজুয়া কি একটা জংলি-গাছের পাতা বাটিয়া লাগাইয়া দিয়াছে। ডাক্তার মৈত্র পাতা-বাটাটা জল দিয়া পরিষ্কার করিয়া ক্ষত-চিহ্নটি দেখিলেন। দুইটি কালো বিন্দু পাশাপাশি দেখা গেল। দুইটি বিন্দুর মধ্যে প্রায় আধ ইঞ্চি ব্যবধান! ডাক্তার মৈত্র ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া টর্চ ফেলিয়া বিন্দু দুইটিকে বারবার নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাহার পর বলিলেন—

"খুব বড় সাপ মনে হচ্ছে। সাপটা কত বড় ছিল ?"

"প্রকাণ্ড সাপ হুজুর। পাঁচ ছ'হাত হবে।"

ভজুয়া বলিল, "আরও বড়।"

আমি ডাক্তার মৈত্রকে প্রশ্ন করিলাম—

"বড় সাপ বুঝলেন কি ক'রে ?"

"দুটো দাঁতের মাঝখানে কত বড় ফাঁক দেখছেন না ? আমি এত বড় ফাঁক আগে দেখিনি।"

ভজুয়া বলিল, "অত বড় সাপও আজ্ঞা, আমরা দেখিনি কখনো। কি বল যদু ?"

যদু নামক মালীটি সে-কথা স্বীকার করিল। আরও অনেকে সাপটি দেখিয়াছিল। সকলেই সমস্বরে বলিল সাপটি সত্যই প্রকাণ্ড বড়। ঘরের মধ্যে এবং বারান্দায় প্রায় কুড়ি-পঁচিশ জন লোক সমবেত হইয়াছিল। জিজ্ঞাসা করিলাম—

"এতগুলো লোক সবই কি সুরনাথের চাকর ?"

কে একজন উত্তর দিল—

"কালিপ্রসাদবাবুর চাকরদেরও ভজুয়া ডেকে এনেছে !"

"কালিপ্রসাদবাবু কোথা ?"

"তিনি আসেন নি তো দেখছি ! ঘুমুচ্ছেন বোধ হয়।"

ব্যাপারটা একটু অস্বাভাবিক বোধ হইল।

"ভজুয়া কালিপ্রসাদবাবুকে খবর দেয়নি ? ভজুয়া কোথা গেল ?"

ভজুয়ার কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

ভীড়ের ভিতর হইতে একজন আগাইয়া আসিয়া বলিল—

"বাবুকে কি ডেকে আনব ?"

"তুমি কে ?"

"আমি তাঁর চাকর। তিনি ন'টার পর ওষুধ খেয়ে শুয়ে পড়েন। ঘুম এসে গেলে ভজুয়া তাঁহার ঘুম ভাঙাতে মানা ক'রে দিয়েছে, তাই তাঁকে আমরা কেউ ওঠাই নি।"

"ভজুয়া মানা করেছে !"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। এঁরা দু'জনই তো ভজুয়ার তৈরি কি ওষুধ রোজ খান। আমি ডেকে আনছি তাঁকে।"

লোকটি চলিয়া গেল। আমি যদু নামক মালীটির নিকট হইতে সন্ধ্যা হইতে কি কি ঘটিয়াছিল, কে কে আসিয়াছিল খবর লইতেছিলাম এমন সময় সেই লোকটি, যে, কালিপ্রসাদবাবুকে ডাকিতে গিয়াছিল উর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়া খবর দিল যে কালিপ্রসাদবাবুকে কে খুন করিয়া গিয়াছে।

আমরা ঘটনাস্থলে পেঁাছিয়া যাহা দেখিলাম তাহা ভয়াবহ। দেখিলাম—কালিপ্রসাদবাবুর দ্বিতীয় চক্ষুটি কে উপড়াইয়া লইয়া গিয়াছে। সমস্ত বালিশ রক্তে ভাসিয়া যাইতেছে। আর একটা চমকপ্রদ ঘটনাও প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘটিল। কালিপ্রসাদবাবুর ঘরের পাশেই আর একটা ছোট ঘর ছিল। সেই ঘরের ভিতর হইতে একটা খড় খড় শব্দ শোনা গেল। দুই ঘরের ভিতর ছোট একটা বন্ধ কপাট ছিল। কপাটটা খুলিতে তাহার ভিতর হইতে প্রকাণ্ড একটা নেউল বাহির হইয়া আসিল এবং নিমেষের মধ্যে অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেল। সকলেই দেখিতে পাইল নেউলটার পায়ে এবং মুখে রক্ত মাখা। সে যেদিক দিয়া চলিয়া গেল লণ্ঠন লইয়া দেখিলাম রক্তাক্ত পদচিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে। কিছুক্ষণের জন্য আমরা সকলেই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলাম। বলিলাম—

"ভজুয়াকে ডাক !"

ভজুয়ার কিন্তু কোন সাড়া পাওয়া গেল না। সে অন্তর্ধান করিয়াছিল। অনেক খোঁজাখুঁজি করিয়াও তাহাকে আর পাওয়া গেল না। একজন বলিল—

"সে হয়তো বক্‌শীবাবুকে খবর দিতে গেছে।"

"দেখ তো !"

আমি এবং ডাক্তারবাবু বাড়িটির চারিদিক লণ্ঠন এবং টর্চ লইয়া যতটা পারিলাম দেখিলাম। অন্ধকারে বিশেষ কিছুই দেখা গেল না। যে লোকটি বকশীবাবুর বাড়ি গিয়াছিল সে ফিরিয়া আসিয়া বলিল বক্‌শীবাবুর বাড়ীতে ভজুয়া তো নাই-ই, বক্‌শীবাবুও নাই।

তখন ডাক্তারবাবুকে বলিলাম—

"ব্যাপার ক্রমশ ঘোরতর হয়ে আসছে ডাক্তার মৈত্র। আমি তো সঙ্গে কোনও পুলিশ আনি নি। আপনি বাইক ক'রে থানায় চলে যান, হাবিলদার সাহেবকে জনকয়েক কনেস্টবল নিয়ে এখুনি চলে আসতে বলুন ! তারা যেন বন্দুকও আনে।"

ডাক্তার মৈত্র বলিলেন—

"আমি যাচ্ছি, লাস দু'টোকে পোস্টমর্টেম করতে হবে। আমার বিশ্বাস এর ভিতর অনেক রহস্য আছে।"

...পুলিশ এবং বন্দুকের নাম শুনিয়া অনেকেই সরিয়া পড়িল। আমি, সুরনাথের মালী যদু এবং আরও গোটা দুই লোক হাবিলদার সাহেবের অপেক্ষায় বসিয়া রহিলাম। এ-রকম অভিজ্ঞতা আমার আর কখনও হয় নাই। ফাঁকা মাঠের মাঝে অসংখ্য ঝিল্লী ডাকিতেছে, আকাশে নক্ষত্রের ঝাঁক, কাছে দূরে বড় বড় গাছ। বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছিলাম কে ইহাদের খুন করিল এবং কেন করিল। সুরনাথের মৃত্যু যে সর্পাঘাতে হয় নাই এবং কালিপ্রসাদের চক্ষুও যে নেউলে উপড়াইয়া লয় নাই এ বিষয়ে আমার সন্দেহ ছিল না। কিন্তু সাপটাকে অনেকে দেখিয়াছে, নেউলটাকেও আমরা দেখিলাম, নেউলটার মুখে এবং পায়ে রক্তও ছিল। ডাক্তার মৈত্র বলিতেছেন সুরনাথের পায়ের ক্ষত-চিহ্নটি সন্দেহজনক, ক্ষত-বিন্দু দুইটির মধ্যে ফাঁক অনেক বেশী, কিন্তু সাপ যদি একান্ত হয় তাহা হইলে ...আমার চিন্তা-ধারা সহসা ব্যাহত হইল। একটা নারীকণ্ঠের কলহাস্যে চমকাইয়া উঠিলাম। মনে পড়িল প্রথম দিনও ওই হাসি শুনিয়াছিলাম। যদুকে জিজ্ঞাসা করিলাম—

"হাসছে কে ?"

"ছুক্‌রি বোধ হয়।"

"ছুক্‌রি কে ?"

যদু একটু চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর উত্তর দিল—

"ওকে বাবু কিছুদিন আগে রেখেছিল।"

"কোথা সে ?"

"ভিতরে আছে বোধ হয়।"

"ডেকে নিয়ে এস তো !"

যদু ভিতরে চলিয়া গেল, একটু পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল—

"কই ভিতরে দেখছি না, বাইরে কোথাও আছে বোধ হয় !"

"ডাক তাকে।"

"বাইরে বড় অন্ধকার বাবু! আমার ভয় করছে বেরুতে!"

যদুর দোষ ছিল না, আমার নিজেরই গা ছমছম করিতেছিল। যে লণ্ঠনটা জ্বলিতেছিল সেটারও শিখা ক্রমশ ম্লান হইয়া আসিতেছিল। নাড়িয়া দেখিলাম তেল নাই। শঙ্কিত হইয়া পড়িলাম।

"আর তেল আছে?"

"তেল আর নেই। তবে পেট্রোম্যাক্স আছে একটা। তাতে তেল থাকতে পারে। পিছন দিকের ঘরে আছে পেট্রোম্যাক্সটা।"

"পেট্রোম্যাক্সটাই জ্বাল। স্পিরিট আছে তো?"

"দেখি।"

যদু লণ্ঠনটা লইয়া ভিতরে গেল এবং একটু পরেই আর্তকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল—'সাপ সাপ।'

ছুটিয়া গেলাম, দেখিলাম পিছনের ঘরে সত্যই একটা বিরাট গোক্ষুর ফণা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। যদু বলিল—

"সাপটা ওই ঝুড়ির মধ্যে ছিল। এ-রকম ঝুড়ি এখানে আগে দেখি নি। তাই মনে হল এটা কোথা থেকে এল। যেই তুলে দেখতে গেছি—আর অমনি বাপরে বাপ! উঃ খুব বেঁচে গেছি।"

যদু ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিল। আমি দেখিলাম ঝুড়িটা সাপুড়েদের ঝুড়ি। সাপটা ফণা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। আমার কাছে লোডেড্ রিভলভারটা ছিল, সাপটা পলাইতে পারিল না। এক গুলিতেই ভুশায়ী হইল। গুলিটা মাথায় লাগে নাই, ঘাড়ের কাছে লাগিয়াছিল। আবার সেই হাসিটা শুনিতে পাইলাম। এবার অনেক দূরে। কি যে করিব মাথায় আসিল না। হাবিলদার সাহেব ও কনেস্টবলরা না আসা পর্যন্ত কিছুই করিবার উপায় ছিল না। প্রায় ঘণ্টা দুই পরে তাহারা আসিল। তাহারা আসিবার পর চারিদিকটা তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিলাম। কিন্তু ভজুয়া বা ছুকুরির সন্ধান পাইলাম না। বকশীবাবুও অন্তর্ধান করিয়াছিলেন।

পাঁচ ছয়জন পুলিশকে পাহারায় রাখিয়া আমি অবশেষে ফিরিয়া গেলাম। পরদিন বোঝা গেল পুলিশরা অবশ্য জাগিয়া পাহারা দেয় নাই, কারণ সকালে পোস্টমর্টেম (শব-ব্যবচ্ছেদ) করিবার জন্য ডোমেরা যখন লাস লইতে আসিল, তখন দেখা গেল, সুরনাথেরও চক্ষু দুইটি নাই, কেবল দুইটি রক্তাক্ত গহ্বর রহিয়াছে। শব-ব্যবচ্ছেদ করিয়া উভয়েরই পেট হইতে প্রচুর আফিং পাওয়া গেল। সিভিল সার্জন বলিলেন আফিংই উভয়ের মৃত্যুর কারণ। সাপটার শবও ব্যবচ্ছেদিত হইয়াছিল, এটা অবশ্য ডাক্তার মৈত্র আলাদা করিয়াছিলেন। দেখা গেল সাপটার বিষ দাঁত নাই, দুই একদিন পূর্বেই তাহা তুলিয়া ফেলা হইয়াছে।

এ বিষয়ে সন্দেহ রহিল না যে বকশীবাবু, ভজুয়া এবং ছুকুরিই এই রহস্যময় হত্যাকাণ্ডের সহিত সংশ্লিষ্ট। কয়েকটা পায়ের এবং হাতের ছাপ সংগ্রহ করিয়া আমরা 'হুলিয়া' করিয়া দিলাম, পুরস্কারও ঘোষণা করিলাম, কিন্তু তাহাদের আর নাগাল পাইলাম না। কেন যে তাহারা উভয়কে এমন নৃশংসভাবে হত্যা করিয়াছিল তাহাও বুঝিতে পারি নাই কারণ সুরনাথ এবং কালিপ্রসাদের একটি জিনিসও চুরি যায় নাই।

বুঝিতে পারিলাম মাসখানেক পরে। একটি পত্র আসিয়া রহস্যোদ্ঘাটন করিল। পত্রটি এই—

দারোগাবাবু,

ইতিপূর্বে বহুবার আপনাদের ফাঁকি দিয়াছি এবারও দিলাম। এ পত্র আপনাদের লিখিতাম না, কিন্তু পাছে আপনারা কতকগুলি নির্দোষ লোককে ধরিয়া সাজা দেন, তাই সত্য ঘটনাটা প্রকাশ করিতেছি। যাহাদের আমরা খুন করিয়াছি তাহারা উভয়েই চরিত্রহীন দুর্বৃত্ত ছিল। অকথ্য অসংযমের ফলে উভয়েরই সিফিলিস, গণোরিয়া তো হইয়াছিলই, উভয়ে অসমর্থও হইয়া পড়িয়াছিল। দৈহিক অপটুতা কিন্তু তাহাদের মানসিক কামনাকে নিবৃত্ত করিতে পারে নাই। এ নষ্ট ক্ষমতা ফিরিয়া পাইবার জন্য বহুপ্রকার চিকিৎসকের শরণাপন্ন হইয়াছিল, কিন্তু কোনও ফল হয় নাই। অবশেষে তাহারা এক ভয়াবহ কাণ্ড করিয়া বসিল। জানি না কাহার নিকট হইতে তাহারা শুনিয়াছিল যে, কোনও জীবন্ত কুমারীর চক্ষু উপড়াইয়া যদি তাহা কাঁচা গিলিয়া খাওয়া যায় তাহা হইলে তাহাদের যৌবন ফিরিয়া আসিবে। এই বিশ্বাসে একদিন রাস্তা হইতে একটি ছোট মেয়েকে তাহারা ভুলাইয়া লইয়া যায়। মেয়েটি পথ হারাইয়া ফেলিয়াছিল। কিন্তু বিধাতার এমনই চক্র যখন তাহারা একটি নির্জন পড়ো বাড়ীতে মেয়েটির চক্ষু উৎপাটন করিতেছিল তখন মেয়েটির মাসী সেখানে আসিয়া পড়ে। মেয়েটির মাসী চুড়ি ফেরি করিত। চুড়ি ফেরি করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িলে ওই পোড়ো বাড়ীতে ভিতরের দিকের বারান্দায় একটু হাত পা ছড়াইয়া বিশ্রাম করিবার জন্য সে মাঝে মাঝে সেখানে আসিত। সেদিন আসিয়া সে দেখিল ভিতরের দিকে একটা ঘরে বসিয়া দুইটা লোক মদ খাইতেছে, তাহাদের হাতে, কাপড়ে রক্তের দাগ। তখনও সে বুঝিতে পারে নাই যে তাহার বোনের মেয়েকেই তাহারা নৃশংসভাবে হত্যা করিয়াছে। সে নিঃশব্দে ঢুকিয়াছিল এবং উঠানে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া তাহাদের ক্রিয়াকলাপ প্রত্যক্ষ করিতেছিল। হঠাৎ লোক দুইটা তাহাকে দেখিতে পাইল এবং জানলা টপকাইয়া পলায়ন করিল। তখন মেয়েটি কৌতুহলী হইয়া ঘরে ঢুকিয়া যাহা দেখিল তাহা মর্মান্তিক। তাহার বোনঝি মুনিয়ার রক্তাক্ত চক্ষুহীন মৃতদেহটা পাশের ঘরেই পড়িয়াছিল। সে চীৎকার করিল না। মেয়েটি বুদ্ধিমতী, সে ভাবিল চীৎকার করিয়া লোক জড়ো করিলে সে নিজেই হয়তো খুনের দায়ে জড়াইয়া পড়িবে। সে পুলিশেও গেল না। আমার সহিত তাহার এবং তাহার বোনের যোগাযোগ আছে পুলিশের এ সন্দেহ ছিল, তাই তাহারা পুলিশকে এড়াইয়া চলিত। সে সোজা আমার নিকটে আসিয়া সমস্ত ঘটনা বলিল। আমার সহিত তাহাদের সম্পর্কের কথাটা খুলিয়া না বলিলে আপনার মনে হয়তো নানারূপ সন্দেহ হইতে পারে, তাই কথাটা খুলিয়াই বলিতেছি। আমি অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত বিপ্লবী দলের একজন। যে সব পুলিশ অফিসার আমাদের জ্বালাতন করিত, কিম্বা আমাদের দলের যেসব লোক অ্যাপ্রুভার হইয়া আমাদের ধরাইয়া দিত তাহাদের হত্যা করাই ছিল আমার প্রধান কাজ। প্রফুল্ল চাকীকে যে সাবইনস্পেক্টার নন্দলাল ব্যানার্জি পুলিশে ধরাইয়া দেয় সেই নন্দলাল ব্যানার্জিকে আমিই হত্যা করি। এ সব কাজ করিবার জন্য আমাদের অনেক রকম লোকের সহিত যোগাযোগ রাখিতে হইত। এই চুড়িওয়ালী ভগ্নী দুইটি আমাকে অনেক খবর আনিয়া দিত। তাহারা আমাকে গুরুর মতো ভক্তি করিত,

আমিও তাহাদের স্নেহ করিতাম। আমি গিয়া সেই হতভাগিনী বালিকার মৃতদেহটি স্বচক্ষে দেখিয়া আসিলাম, তাহার মা-ও আমার সঙ্গে গিয়াছিল। আমরাও অনেক খুন করিয়াছি, কিন্তু এরূপ বীভৎস ব্যাপার আমাদেরও জীবনে ঘটে নাই। কন্যার এই শোচনীয় মৃত্যুতে তাহার মা কিন্তু এক বিন্দু চোখের জল ফেলে নাই। তাহার দৃষ্টি হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইয়াছিল। এই দুই ভগ্নি 'জিপ্সি' জাতের মেয়ে, ইহাদের নীতিজ্ঞান খুব বিশুদ্ধ নয়, তাছাড়া ইহারা ভয়ানক প্রতিহিংসাপরায়ণ। তাহারা আমাকে বলিল ইহার প্রতিশোধ লইতে হইবে, আমি যেন তাহাদের সাহায্য করি।

সেইদিন হইতে ঐ দুইটি নর-রূপী পিশাচের আমি পিছু লইয়াছি। উহাদের সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি। উহাদের একদিনও চোখের আড়াল করি নাই। উহারা যখন শেরপুরে জমি কিনিয়া বসবাস আরম্ভ করিল, তখন আমিও উহাদের সঙ্গে সঙ্গে গেলাম এবং প্রচার করিলাম যে আমিও জমি কিনিয়া তাহাদের প্রতিবেশী হইব। কিছুদিন আলাপ করিয়া বুঝিলাম উহাদের কাম-প্রবৃত্তি এখনও প্রশমিত হয় নাই। যুবতী নারী দেখিলে এখনও উহারা লোলুপ হইয়া ওঠে এবং ছলে বলে কৌশলে তাহাকে নিজেদের আয়ত্তে আনিবার চেষ্টা করে। আমি উহাদের এই কামপ্রবৃত্তির সুযোগ লইলাম। যাহার কন্যাকে উহারা নৃশংসভাবে হত্যা করিয়াছিল সে গিয়া উহাদের সহিত বসবাস করিতে রাজি হইল। জিপ্সি মেয়েদের মোহিনী শক্তি উহার ছিল, সুতরাং বেশী বেগ পাইতে হইল না। একদিন চুড়ি বিক্রয় করিবার ছলে সে কালিপ্রসাদবাবুর বাসায় গেল এবং আর ফিরিল না। সেখানেই রক্ষিতারূপে থাকিয়া গেল। ইহার দিন দশেক পরে একদিন দেখিলাম কালিপ্রসাদবাবু বাম চোখে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। কি হইয়াছে জিজ্ঞাসা করাতে বলিলেন তিনি একটা জঙ্গলে শিকার করিতে গিয়াছিলেন হঠাৎ একটা বাঘিনীর দেখা পান, বাঘিনীটা চোখে একটা থাবা মারিয়াছে। আমি মনে মনে হাসিলাম, বুঝিলাম বাঘিনীটি কে। আলিঙ্গনাবদ্ধ ছুকুরিরই নখরাঘাতে তাহার চক্ষুটি নষ্ট হইয়াছিল। আমি ছুকুরিকে সাবধান করিয়া দিলাম, প্রকাশ্যভাবে সে যেন আর কিছু না করে। কিন্তু ওই লোক দুইটা এমন কামান্ধ ছিল যে ওই ঘটনার পরও তাহারা ছুকুরিকে বাড়ি হইতে বিদায় করিয়া দেয় নাই। ছুকুরির মুখ হইতেই আমি খবর পাই যে, উহারা উভয়েই পুরুষত্বহীন। তখনও আমি ঠিক করিতে পারি নাই, কি উপায়ে উহাদের হত্যা করিব। এমন সময় হঠাৎ এক পুরাতন বন্ধুর সহিত দেখা হইয়া গেল। কিছুদিন আমি সাপুড়ের ছদ্মবেশে সাপুড়েদের সহিত ঘুরিয়া বেড়াইতে বাধ্য হইয়াছিলাম। ভজুয়া নামক যে লোকটিকে আপনারা দেখিয়াছিলেন সে আমার পূর্বপরিচিত একজন সাপুড়ে। তাহাকে পূর্বে আমি কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করিয়াছিলাম। আমাকে অপ্রত্যাশিতভাবে দেখিয়া সে পুলকিত হইল, আমার বাসাতেই আসিয়া আড্ডা গাড়িল এবং নিজের নানা দুঃখের বর্ণনা করিয়া অবশেষে কিছু অর্থ ভিক্ষা করিল। দেখিলাম তাহার নিকটে একটি প্রকাণ্ড গোক্ষুর এবং একটি প্রকাণ্ড নেউল রহিয়াছে। নেউল ও সাপের খেলা দেখাইয়া সে অর্থোপার্জন করে। সাপটা দেখিয়া আমি ভয় পাইয়াছিলাম, কিন্তু সে বলিল সাপের বিষদাঁত নাই, কয়েকদিন অন্তর অন্তর সে বিষদাঁত ভাঙিয়া দেয়। ভজুয়াকে কাজে লাগাইব স্থির করিলাম। সাপ ও নেউলে দুইটি ঝুড়িতে

আমার পিছন দিকের একটি ঘরে বন্দী রহিল। ভজুয়াকে তখন সমস্ত কাহিনী খুলিয়া বলিলাম। কেবল অর্থের লোভে নহে, এই বীভৎস কাহিনী শুনিয়া ওই পিশাচ দুইটিকে শাস্তি দিবার আগ্রহেও সে আমাকে সাহায্য করিতে সম্মত হইল। আমি তখন প্ল্যান ঠিক করিলাম। তাহাকে বলিলাম 'প্রথমে উহাদের কাছে গিয়া বলিতে হইবে যে তুমি অনেক দুরারোগ্য ব্যাধির দেশী ঔষধ জান। ধাতু-দৌর্বল্য, প্রমেহ প্রভৃতি ব্যাধির অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ তোমার নিকট আছে। ইহাও তোমাকে বলিতে হইবে যে অর্থাভাবে তুমি কষ্ট পাইতেছ, যে কোনও কাজ পাইলে পেটভাতাতেও তুমি করিতে প্রস্তুত আছ। খুব সম্ভব ইহা শুনিয়া উহারা তোমাকে বহাল করিবে। তাহার পর তোমাকে চিকিৎসা শুরু করিতে হইবে। প্রথম প্রথম কিছুদিন উহাদের মদনানন্দ মোদক খাওয়াও। কিন্তু শেষ দিন একটু বেশী পরিমাণে আফিং খাওয়াইতে হইবে। সেই দিন তোমার সাপটাও একজনের ঘরে ছাড়িয়া দিয়া লোকের মনে বিশ্বাস জন্মাইতে হইবে যে সর্পাঘাতে উহার মৃত্যু হইয়াছে। একটা ছুঁচ লইয়া উহার পায়ের পাতায় দুইটা ক্ষতচিহ্ন করিয়া দিলে কাহারও কোন সন্দেহ হইবে না। মেয়েটির মায়ের একান্ত ইচ্ছা উহাদের চোখও উপড়াইয়া লইতে হইবে, না লইলে প্রতিশোধ পুরা হইবে না। সুরনাথের ঘরে যখন সাপ লইয়া সকলে ব্যস্ত থাকিবে তখন অহিফেন-বিষে অজ্ঞান কিম্বা মৃত কালিপ্রসাদের চোখটা ছুকুরি অনায়াসে উপড়াইয়া ফেলিতে পারিবে। চোখ ওপড়ানো হইয়া গেলে তোমার নেউলটার মুখে এবং সামনের পায়ে রক্ত লাগাইয়া পাশের ঘরে সেটাকে বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। ইহাতে অনেক বোকা লোকের হয়তো ধারণা হইবে যে, নেউলটাই কালিপ্রসাদের চক্ষুটি নষ্ট করিয়াছে। ছুকুরির ইচ্ছা সুরনাথের চোখ দুইটাও সে উপড়াইবে। যদি পারা যায় তাহার সে ইচ্ছা পূর্ণ করিবার চেষ্টাও আমরা করিব।'

আশা করি ব্যাপারটা এইবার আপনার নিকট পরিষ্কার হইয়াছে। আর একটা কথা বলিয়া পত্র শেষ করি। এ-পত্রের হস্তাক্ষর আমার নয়। ছুকুরি, ভজুয়া এবং বক্‌শী এ নাম তিনটিও ছদ্মনাম। ন্যায়ের মর্যাদা রক্ষা করিবার জন্যই আমরা নৃশংস ব্যাপারে লিপ্ত হইয়াছিলাম। আপনাদের আইনের চক্ষে আমরা অপরাধী। একটা সান্ত্বনা শুধু আছে উপর-ওয়ালার আইনে হয়তো আমারা ছাড়া পাইব। ইতি—

বক্‌শীবাবু

এই চিঠি পাইবার মাসখানেক পরে আমি ট্রেণে করিয়া একটা এন্‌কোয়ারি করিতে যাইতেছিলাম। মাঠের মাঝখানে ট্রেণটা থামিয়া গেল। শুনিলাম একটা লোক কাটা পড়িয়াছে। ট্রেণ হইতে সকলে নামিয়া পড়িলাম। নামিয়া শুনিলাম লাইনের মাঝখানে একটা কুকুরছানা আসিয়া পড়িয়াছিল ; সেই কুকুর ছানাটাকে বাঁচাইবার জন্য একটা লোক ছুটিয়া আসে এবং কুকুর ছানাটাকে দূরে ফেলিয়া দেয়, কিন্তু নিজে সে পড়িয়া যায়। ড্রাইভার সময় মতো গাড়ি থামাইয়া ফেলিয়াছিল তাহা না হইলে কাটা পড়িত। ভীড় ঠেলিয়া আগাইয়া দেখিলাম ভজুয়া এবং একটি জিপ্‌সি মেয়ে একটি বলিষ্ঠ যুবককে কাঁধে করিয়া লইয়া যাইতেছে। যুবকটির মাথা হইতে রক্ত পড়িতেছে, জ্ঞান নাই। রেলের ধারে মাঝখানে একটি জিপসিদের তাঁবু দেখিলাম। তাঁবুর সম্মুখে একটি কুকুরী তাহার নধর শাবকটিকে স্তন্যপান করাইতেছে।

সেদিন আমি ভজুয়া, ছুকুরী এবং বক্‌শীবাবুকে ধরিতে পারিতাম। কারণ ওই

বলিষ্ঠ যুবকটিই যে বকশীবাবু তাহাতে আমার সন্দেহ ছিল না। কিন্তু আমি কিছুই করিলাম না। ভীড়ের মধ্যে আত্মগোপন করিয়া মুগ্ধ নেত্রে কেবল চাহিয়া রহিলাম। জীবনে যে দুই চারিটি সৎকার্য করিয়াছি এইটি মনে হয় তাহার মধ্যে অন্যতম।

হীরের টুকরো

অশীতিপর বৃদ্ধ বিমল ডাক্তারের কাছে সেদিন যে রোগীটি আসিয়া হাজির হইলেন তিনিও খুব বৃদ্ধ। যে যুবকটি রোগীর সঙ্গে আসিয়াছিলেন তিনিই প্রথমে ডাক্তারবাবুর সহিত আলাপ করিলেন।

বলিলেন, "আমার ঠাকুরদাকে একবার দেখতে হবে ডাক্তারবাবু। আমরা অনেক দূরে থেকে এসেছি—"

"কি হয়েছে তাঁর ?"

"মাথাটা কেমন গোলমাল হয়ে গেছে। অনেকদিন থেকেই ওঁর মাথা খারাপ। সম্প্রতি কিছু বাড়াবাড়ি হয়েছে, তাই আপনার কাছে এনেছি।"

"কোথা থেকে আসছেন আপনারা ?"

"কোলকাতা থেকে।"

"কোলকাতা থেকে ? সেখানে কত বড় বড় ডাক্তার আছেন, তাঁদের ছেড়ে আপনি পাড়াগাঁয়ে আমার কাছে এসেছেন, আশ্চর্য তো !"

যুবক একটু অপ্রস্তুতমুখে চুপ করিয়া রহিলেন। আসল কারণটা ব্যক্ত করিতে তাঁহার কেমন যেন সঙ্কোচ হইতে লাগিল। ডাক্তারের গুণের জন্য নয় 'বিমল' এই নামটার জন্যই যে তিনি ঠাকুরদাকে তাঁহার কাছে লইয়া আসিয়াছেন এ কথা তিনি বলিতে পারিলেন না। অথচ যে ডাক্তারের নাম 'বিমল' নয় তাহার কাছে ঠাকুরদা কিছুতেই যাইতে চান না। প্রথমেই গিয়া জিজ্ঞাসা করেন 'আপনার নামটি কি'। নাম বিমল না হইলে তৎক্ষণাৎ উঠিয়া আসেন। মানসিক ব্যাধিতে যশস্বী দুই একজন ডাক্তারের সহিত তিনি ষড়যন্ত্রও করিয়াছিলেন, তাঁহারা মিথ্যা করিয়া বলিয়াছিলেন যে তাঁহাদের নাম 'বিমল', রোগীর হিতার্থে তাঁহারা মিথ্যা-ভাষণ করিতে আপত্তি করেন নাই, কিন্তু কোন ফল হইল না। ঠাকুরদা তাঁহাদের সহিত আলাপ করিয়াই উঠিয়া আসিলেন, তাঁহাদের ঔষধ স্পর্শ পর্যন্ত করিলেন না। একজন জোর করিয়া একটা ইনজেকসন দিয়াছিলেন, তাহাতে খানিকক্ষণ ঘুম হইয়াছিল, আর কিছু হয় নাই। মুখ দিয়া কোনও ঔষধ ঠাকুরদাকে খাওয়ানো যায় না। তিনি বলেন, 'আমার কোনো অসুখ নেই, ওষুধ খাব কেন ? আসল বিমলের সঙ্গে দেখা হলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।' অথচ তিনি সমস্ত রাত ঘুমান না। খাওয়া-দাওয়ারও ঠিক নাই, অনেক সাধ্যসাধনা করিলে সামান্য কিছু খান। নিজের মনেই কাঁদেন, হাসেন। সময়ের জ্ঞানও লোপ পাইয়াছে। সকালকে বলেন সন্ধ্যা, সন্ধ্যাকে বলেন সকাল। তারিখ, বার কিছুই মনে থাকে না। একজন ডাক্তার বলিয়াছিলেন কোনও বিমল ডাক্তারের সহিতই ইঁহার রোগের নিগূঢ় সম্পর্ক আছে, তাহার সহিত দেখা হইয়া গেলেই অসুখ সারিয়া যাইবার

সম্ভাবনা। তাই কোনও বিমল ডাক্তারের খবর পাইলেই সেখানে ঠাকুরদাকে লইয়া যান। বিমল নাম শুনিলে ঠাকুরদাও আগ্রহ দেখান।

বিস্মিত বিমলবাবু প্রশ্ন করিলেন, "কোথায় আপনার ঠাকুরদা ?"

"বাইরে গাড়িতে বসে আছেন।"

"নিয়ে আসুন তাঁকে। আচ্ছা, দাঁড়ান একটু। আপনার কাছ থেকে ওঁর হিস্ট্রিটা জেনে নি একটু, উনি হয়তো কিছু বলবেন না। আপনি চেয়ারটায় ভাল করে বসুন—"

যুবকটি উপবেশন করিয়া বলিলেন, "আমিও বিশেষ কিছু জানি না। ঠাকুরদা বরাবরই বিদেশে বিদেশে ঘুরতেন, আমি বোর্ডিং-এ হোস্টেলে থেকে পড়াশোনা করতাম।"

"আপনার বাবা কোথায় ?"

"আমি শিশুবয়সেই পিতৃমাতৃহীন। নিকট-আত্মীয় বিশেষ কেউ নেই। ঠাকুরদার কাছেই আমি সাত বছর পর্যন্ত ছিলাম। তারপর উনি আমাকে বোর্ডিং-এ দিয়ে দেন।"

"বোর্ডিং-এর খরচ আপনার ঠাকুরদাদাই দিতেন ?"

"হ্যাঁ। উনি ছাড়া আর তো কেউ নেই আমার।"

"কি করতেন উনি, চাকরি ?"

"না, উনি চিত্রকর। ছবিবিক্রির টাকা থেকেই আমাদের সংসার চলত। বছরখানেক থেকে ওঁর মাথা খারাপ হয়ে গেছে, ছবি আঁকেন না আর।"

"এখন কি করে সংসার চলে ?"

"আমি রোজগার করি কিছু।"

"কি করেন ?"

"প্রফেসারি।"

যুবকটির কুণ্ঠিতমুখের দিকে চাহিয়া বিমল ডাক্তারের হৃদয়ে শ্রদ্ধা সঞ্চারিত হইল। ছেলেটি বিদ্বান, অথচ বাহিরে তাহার কোনও প্রকাশ নাই।

"আপনার ঠাকুরদার পাগলামিটা কি ধরনের বলুন তো, কি করেন—"

"নাওয়া-খাওয়ার ঠিক নেই। রাত্রে ঘুমোন না। আপনমনে বিড়বিড় করে কি বলেন সর্বদা—"

"কি বলেন, শুনেছেন কিছু কখনও ?"

"একটি কথাই বার বার বলেন। 'এ ভার আমি আর বইতে পারছি না—এ ভার আমি আর বইতে পারছি না'। বলতে বলতে কখনও কাঁদেন, কখনও হাসেন।"

ডাক্তারবাবু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কিছুক্ষণ বসিয়া রহিলেন।

"ওঁর পাগলামিতে আর কোনও বিশেষত্ব লক্ষ্য করেছেন কি ?"

যুবকটি এইবার একটু মুশকিলে পড়িলেন। সত্যকথাটা বলিলে ডাক্তারবাবু মনে আঘাত পাইবেন কি ? অথচ না বলিলে রোগের সূত্রটা হয়তো তিনি ধরিতে পারিবেন না, অবশ্য উহাই যদি রোগের সূত্র হয়। একটু ইতস্ততঃ করিয়া অবশেষে সব কথা খুলিয়া বলাটাই তিনি সঙ্গত মনে করিলেন।

"করেছি। মনে হয় উনি কোন বিমল ডাক্তারকে খুঁজছেন। ডাক্তারের নাম বিমল না হলে সেখানে যেতেই চান না। আপনার কাছে বিশেষ করে এসেছি সেইজন্যেই—"

"ও। আপনার ঠাকুরদার নামটি কি ?"

"নিরঞ্জন সেন।"

"আপনার নামটি ?"

"বিকাশ।"

"আচ্ছা, আপনার ঠাকুরদাকে নিয়ে আসুন এবার।"

বিকাশবাবু বাহির হইয়া গেলেন এবং একটু পরে বৃদ্ধ শিল্পী নিরঞ্জন সেনকে লইয়া ফিরিয়া আসিলেন। বিমলবাবু দেখিলেন নিরঞ্জন সেনের অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। একমুখ পাকা গোঁফদাড়ি, মস্তক কেশবিরল। যে কয়গাছি চুল আছে তাহাও পাকা, অবিন্যস্ত এবং তৈলহীন। মুখে জরার চিহ্ন। কপালে, চোখের কোণে বলি-রেখা, গালের মাংস ঝুলিয়া পড়িয়াছে। চোখের দৃষ্টিই কেবল এখনও বেশ তীক্ষ্ণ আছে। অতীতের সাক্ষী কেবল ওই দৃষ্টিটুকু। বিমলবাবু নির্বাক হইয়া চাহিয়া রহিলেন। ভিড়ের মধ্যে দেখিলে যৌবনের বন্ধু নিরঞ্জনকে তিনি চিনিতে পারিতেন না। নিরঞ্জনকে দেখিয়া মনে মনে তিনি একটু অপ্রতিভও হইয়া পড়িলেন। তাঁহার ধারণা ছিল নিরঞ্জন মারা গিয়াছে। বাঁচিয়া থাকিবার কোনও প্রমাণ সে এতদিন দেয় নাই। দিবার সুযোগও অবশ্য ছিল না। লখনৌ হইতে চলিয়া আসিবার সময় বিমল ডাক্তার কোনও ঠিকানা কাহারও কাছে রাখিয়া আসেন নাই। সেই অপ্রীতিকর ঘটনাটা ঘটিবার পর কাহাকেও কিছু না বলিয়া তিনি লখনৌ হইতে সরিয়া পড়িয়াছিলেন, তাহার পর অনেক ঘাটের জল খাইয়া অবশেষে এই পল্লীগ্রামে আসিয়া বাস করিতেছেন। পঞ্চাশটি বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। এতদিন পরে নিরঞ্জন আসিয়া হাজির হইয়াছে কি মনে করিয়া! চেহারার অদ্ভুত পরিবর্তন হইয়াছে।

বিমল ডাক্তার নির্বাক হইয়া চাহিয়া রহিলেন। নিরঞ্জনও নির্ণিমেষে বিমলকে দেখিতেছিলেন। হঠাৎ তিনি ঘাড় ফিরাইয়া বিকাশকে বলিলেন— "তুমি বাইরে গিয়ে বোসো। এঁর সঙ্গে আমার গোপনীয় কিছু কথা আছে—।"

বিকাশ ইহা প্রত্যাশাই করিতেছিলেন, প্রতিবারই ঠাকুরদা এ কথা বলেন। তিনি বাহিরে চলিয়া গেলেন।

॥ দুই ॥

আরও কিছুক্ষণ দুইজনে মুখোমুখি বসিয়া রহিলেন। নিরঞ্জনই কথা কহিলেন প্রথমে।

"বিমল আমাকে চিনতে পারছ ?"

"পারবার কথা নয়, কিন্তু পেরেছি। ছিলে কোথায় এতদিন ?"

"ছিলাম না কোথায় তাই বরং জিগ্যেস কর। আমি সারাজীবন তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। লক্ষ্মী বেঁচে আছে ?"

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বিমল ডাক্তার বলিলেন, "আছে।"

"তার যে ছবিটা এঁকেছিলাম সেটা কি আছে তোমার কাছে ?"

"আছে।"

"একবার দেখাও তো—"

"সেটা ভিতরে টাঙানো আছে। ছবিটা দেখতে চাইছ কেন, আমার কথায় বিশ্বাস হচ্ছে না ?"

"না। তোমার চেহারা এত বদলে গেছে যে তোমাকে ঠিক চিনতে পারছি না। ছবিটাই একমাত্র প্রমাণ যে তুমি সেই বিমল। বহু বিমল ডাক্তারের সঙ্গে দেখা হয়েছে। আমি নিঃসন্দেহ হতে চাই যে তুমি সেই বিমল।"

"বেশ, একটু বোসো তাহলে।"

বিমল ডাক্তার উঠিয়া ভিতরের দিকে চলিয়া গেলেন।

ফিরিলেন প্রায় আধ ঘণ্টা পরে। সঙ্গে একটি বালক ভৃত্য প্রকাণ্ড একখানা ছবি বহন করিয়া আনিল। একটি নর্তকী নাচিতেছে। অপূর্ব ছবি। নিরঞ্জন সেন বিস্ফারিত-নেত্রে তাঁহার অতীত কীর্তির দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "আমার আর সন্দেহ নেই। ছবিটা নিয়ে যেতে পার।"

বালক ভৃত্য ছবিটা লইয়া চলিয়া গেল।

নিরঞ্জন প্রশ্ন করিলেন—"লছমী কি আমার সঙ্গে দেখা করবে ? তাকে শুধু একটা কথা বলতে চাই। কথাটা খুবই মর্মান্তিক, তবু তার জানা উচিত।"

"কি কথা ?"

"তার ছেলে আর বেঁচে নেই। তাকে আমি বড় করে তুলেছিলাম, লেখাপড়া শিখিয়েছিলাম, বিয়ে দিয়েছিলাম, তার একটি ছেলেও হয়েছিল, কিন্তু বিধাতার এমনি অভিশাপ, প্লেগে ছেলে বউ দুজনেই মারা গেল, বেঁচে রইল শুধু শিশুটা। তাকেও আমি মানুষ করে তুলেছি। কিন্তু আমি আর বেশীদিন বাঁচব না, তার জিনিস তার হাতে সঁপে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হতে চাই। আমার আর একটা আতঙ্কও হয়েছে, আমার বদ্ধমূল ধারণা হয়ে গেছে যে আমি অভিশপ্ত। লছমীকে পাই নি, লছমী নিজেই আমার কাছে থাকতে চায় নি। সে তোমাকে বিয়ে করেছিল, তাই বোধ হয় এখনও বেঁচে আছে। আমার কাছে থাকলে মরে যেত। ছেলেটাকেও তোমরা যদি নিয়ে নিতে হয়ত সে বেঁচে থাকত—"

নিরঞ্জন সেন রুদ্ধবাক হয়ে ক্ষণকালের জন্য নীরব হইয়া গেলেন। তাঁহার চোখ হইতে দুই ফোটা জল গড়াইয়া পড়িল। তাহার পর তিনি বিমল ডাক্তারের হাতদুটি চাপিয়া ধরিলেন। বলিলেন, "বিকাশ তোমাদের কাছেই থাকুক। লছমীকে বল তুমি, তুমি বললেই সে রাজী হবে—"

"সেই বিকাশই কি তোমার সঙ্গে এসেছে ?"

"হ্যাঁ। খুব ভাল ছেলে, হীরের টুকরো—"

"ও কি সব কথা জানে ?"

"না। কিন্তু ওকে আমি বলব সব। তার আগে লছমীর মত চাই, তোমারও মত চাই।"

বিমল ডাক্তার মাথায় হাত বুলাইয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "যেমন চলছে চলুক না। ও সব ঘাঁটিয়ে আর লাভ কি—"

"না, আমি আর পারছি না। যার জিনিস তার কাছে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হতে

চাই। ওর ঠাকুরমার কাছেই ও বেঁচে থাকবে, আমার কাছে থাকলে বাঁচবে না। আমি অভিশপ্ত, অভিশপ্ত, অভিশপ্ত—"

নিরঞ্জন সেন চিৎকার করিয়া উঠিলেন। তাঁহার চোখদুইটা যেন ঠিকরাইয়া বাহির হইয়া আসিতে চাহিল। বিমল ডাক্তার ভয় পাইয়া গেলেন।

"বেশ, তাই হবে। বিকাশ আমাদের কাছেই থাকবে। কিন্তু লছমীকে এত বড় মর্মান্তিক খবরটা তো চট করে দেওয়া যাবে না, সইয়ে সইয়ে বলতে হবে। সে আমি বলব এখন। যদিও ছেলের সঙ্গে ওর বহুকাল ছাড়াছাড়ি হয়েছে, তবু ছেলে তো, তার মৃত্যুসংবাদটা হঠাৎ এভাবে দেওয়া ঠিক হবে না। আমাদের আর কোনও সন্তান হয় নি, ও হয়তো আশা করে আছে যে ওর ছেলে একদিন ফিরে আসবে—"

"তুমি বলবে তাকে? প্রতিশ্রুতি দিচ্ছ?"

"দিচ্ছি।"

"কতদিনের মধ্যে বলবে?"

"এই ধর মাসখানেক।"

"মাসখানেক পরে তা হলে আমি বিকাশকে বলতে পারি?"

"বেশ, বোলো।"

নিরঞ্জন সেন সোৎসুক দৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্ত বিমল ডাক্তারের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

"লছমীর সঙ্গে একবার দেখা হয় না? সে দেখা করবে কি, একবার বলে দেখ না।"

"বললে হয়তো দেখা করবে। কিন্তু এখন দেখা করাটা উচিত নয়। দেখা হলেই ছেলের কথা উঠবে—"

"তাকে একবার দেখতে খুবই ইচ্ছে করছে ভাই—"

"দূর থেকে দেখতে পার। এই জানলাটা খুলে দিচ্ছি, ভিতরের দিকে বারান্দায় বসে আছে সে। ভালোভাবেই দেখতে পাবে এখান থেকে—"

বিমল ডাক্তার পিছনের দিকের একটি জানলা খুলিয়া দিলেন। নিরঞ্জন দেখিলেন বারান্দায় একটি বৃদ্ধা বসিয়া বই পড়িতেছে। মাথার চুল সাদা, মুখে জরার চিহ্ন, চোখে চশমা।

"ওই লছমী!"

"হ্যাঁ।"

"আশ্চর্য বদলে গেছে।"

"তুমিও বদলেছ, আমিও বদলেছি।"

নিরঞ্জন সেন নির্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

॥ তিন ॥

ঠিক একমাস পরে বিকাশ একদিন কলেজ হইতে ফিরিয়া দেখিলেন নিরঞ্জন সেন গলায় দড়ি দিয়া আত্মহত্যা করিয়াছেন। টেবিলের উপর নিম্নলিখিত পত্রটি রহিয়াছে।

ভাই বিকাশ,

আমি চললাম। আমার কাজ শেষ হয়েছে, এই ব্যর্থ জীবন বহন করবার আর কোনো সার্থকতা দেখতে পাচ্ছি না। যাবার আগে একটি কথা তোমাকে বলে যেতে চাই। তুমি বিদ্বান, বুদ্ধিমান, অনেক কবিতা, অনেক উপন্যাস পড়েছ, তাই আশা করছি আমার প্রথম যৌবনের উন্মাদনাকে তুমি ক্ষমা করতে পারবে। ঘটনাটা সত্যিই গল্পের মতো। প্রথম যৌবনে লখ্নৌ শহরে আমি লছমী নামে একটি নর্তকীকে ভালোবেসেছিলাম। তার সঙ্গে একঘরে বাস করেছিলাম, তার গর্ভে আমার একটি ছেলেও হয়েছিল। লছমীর সুন্দর ছবিও এঁকেছিলাম একটি। ভেবেছিলাম তাকে বিয়ে করে সুখের সংসার গড়ে তুলব। কিন্তু তা আর হয়ে উঠল না। তার এক ডাক্তার প্রণয়ী জুটল। প্রণয় শেষে এমন গাঢ় হল যে লছমী অবশেষে আমাকে বলল—আমি তোমার সঙ্গে আর থাকতে চাই না। আমি ঠিক করেছি বিমলবাবুকে বিয়ে করব। বললাম—সে কি, তোমার ছেলে হয়েছে—! লছমী হেসে উত্তর দিলে, তোমার ছেলে তুমি রাখতে পার, আমি কিন্তু বিমলবাবুকেই বিয়ে করব। জিজ্ঞাসা করলাম, বিমলবাবু বিয়ে করতে রাজী হয়েছেন? তারপর একটু হেসে বললে, পরশুদিন রেজিস্ট্রি করে আমাদের বিয়ে হয়েও গেছে। আমি অবাক হয়ে গেলাম, সত্যিই আমার মুখ দিয়ে কোনও কথা সরল না। তার পরদিনই লছমী কাউকে কিছু না বলে নিজের ছেলেকে ফেলে রেখে আমাকে ছেড়ে চলে গেল বিমলের সঙ্গে। বিমল ডাক্তার ছোট একটি চিঠি লিখে গিয়েছিল—'স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ তোমার আঁকা লছমীর ছবিটি নিয়ে যাচ্ছি। রাগ কোরো না, বন্ধু'। সত্যিই বিমল ডাক্তার আমার বন্ধুই ছিল। তার কাছে এ ব্যবহার প্রত্যাশা করি নি। লছমীর উপর আমার কিন্তু রাগ হল না। মনে হল ওরা উর্বশীর জাত, কোথাও কোনো কারণেই বাঁধা পড়ে না কখনও। নিজের দুর্ভাগ্যকে মেনে নিয়ে ছেলেটিকেই মানুষ করে তুলতে লাগলাম। সে বড় হল, লেখাপড়া শিখল, তার বিয়ে দিলাম, ছেলেও হল একটি। আবার পড়ল অভিশাপের বজ্র। প্লেগ এপিডেমিকে আমার ছেলে, বউ মারা গেল, বেঁচে রইল কেবল তাদের শিশুসন্তানটি, মানে তুমি। তোমাকেও আবার মানুষ করে তুলেছি, কি করে তা সম্ভব হয়েছে, কি ভাবে টাকা রোজগার করে তোমার পড়ার খরচ যুগিয়েছি তা তুমি জান না, তা তোমার জানবার দরকারও নেই। এইটুকু শুধু জেনে রাখ, শুধু ছবি এঁকে তা হয় নি। এদেশে তা হয় না। এখন আমার ভয় পাছে আমার ছোঁয়াচ লেগে তোমার আবার কিছু হয়। আমার জীবন অভিশপ্ত, আমার কাছে কেউ থাকবে না ; তাই ঠিক করলাম লছমীকে খুঁজে বার করব। যদি বার করতে পারি তাকে সব কথা বলে তার হাতে তোমাকে সমর্পণ করে সরে পড়ব। এতদিন সব দায়িত্ব আমি একাই বহন করেছি, এবার সেও করুক খানিকটা। এ দাবি করবার অধিকার আমার আছে। তাই বিমল ডাক্তারকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম। সেদিন তার দেখা পেয়েছি। তাকে সব খুলে বলেছি। সে রাজী হয়েছে। এইবার তুমি তোমার ঠাকুরমার কাছে ফিরে যাও। বাস, আমার কাজ শেষ হয়ে গেল। আমি চললাম! আশীর্বাদ করি জীবনে সুখী হও, যে আদর্শে তোমাকে মানুষ করবার চেষ্টা করেছি তা যেন তোমার জীবনকে মহিমান্বিত করে। ইতি

তোমার দাদু।

॥ চার ॥

দশ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে।

হিমালয়ের পথে একটি বৃদ্ধাকে স্কন্ধে লইয়া একটি বলিষ্ঠ ব্যক্তি পাহাড়ে উঠিতেছেন। সম্মুখে চড়াই, তাহার পরই একটি চটি। সময়মতো চটিতে পৌঁছিতে না পারিলে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা। যদিও ঈষৎ শ্বাসকষ্ট হইতেছিল তবু সেই বলিষ্ঠ ব্যক্তিটি ক্ষণকালের নিমিত্তও শ্লথগতি হন নাই।

নাতি ঠাকুরমাকে কেদার-বদরী দর্শন করাইতে লইয়া চলিয়াছে। ডানডিতে লইয়া যাইবার মতো সঙ্গতি নাই, ঠাকুরমারও হাঁটিবার শক্তি নাই, অগত্যা তাই কাঁধে করিয়া লইতে হইয়াছে। যথাসময়ে তাহারা চটিতে পৌঁছিয়া গেল। পরদিন ভোরে উঠিয়া আবার যাত্রা শুরু হইবে। সামনে আর একটা নাকি চড়াই আছে। আহারাদির পর যে যেখানে স্থান পাইল শুইয়া পড়িল। বৃদ্ধা ও তাঁহার নাতিও একবার শয়ন করিলেন।

·· গভীর রাত্রি। বাহিরে শনশন করিয়া হাওয়া বহিতেছে, চটির সকলেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, ঘুমান নাই কেবল বৃদ্ধা। তিনি ধীরে ধীরে তাঁহার নাতিকে ডাকিলেন।

"বিকাশ, ঘুমুচ্ছ না কি ?"

"কি হয়েছে ?"

বিকাশ ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল।

"কিছু হয় নি। তোমাকে শুধু একটা কথা বলতে চাই আজ। অনেকদিন থেকেই বলব ভাবছি উনি বলতে মানা করেছিলেন বলেই এতদিন বলি নি। আজ উনি নেই, তোমার ঠাকুরদাও নেই, আমি কেদার-বদরী দর্শন করতে যাচ্ছি তোমার কাঁধে চড়ে, আমার মন কিন্তু বলছে কথাটা তোমাকে না বললে আমার তীর্থদর্শনের পুণ্য হবে না—"

"কি কথা ?"

"আমি তোমার ঠাকুরমা বলেই তো তুমি এত কষ্ট সহ্য করে আমাকে কেদার-বদরী নিয়ে যাচ্ছ—"

"নিশ্চয়ই। এটা আমার কর্তব্য।"

"কিন্তু আমি তোমার ঠাকুরমা নই।"

"তার মানে ?"

"আমি লছমী নই, আমার নাম দুর্গা। লছমী ওঁর কাছেও বেশীদিন থাকে নি, ছ-মাস পরেই পালিয়েছিল। তারপর উনি আমাকে বিয়ে করেন। তোমার ঠাকুরদা যখন ওঁর কাছে এসেছিলেন তখন সত্যিকথাটা উনি তাঁকে বলেন নি। ভেবেছিলেন মিথ্যাকথা বললে হয়তো উনি সান্ত্বনা পাবেন। হয়তো ওঁর পাগলামি সেরে যাবে। তারপর ঠাকুরমা বলে তুমি যখন আমার কাছে এসে দাঁড়ালে তখন আমার অন্ধকার ঘরে যেন আলো জ্বলে উঠল। তখন প্রাণ ধরে আমি বলতে পারলাম না তুমি আমার কেউ নও। তারপর দেখতে দেখতে দশটা বছর কেটে গেল। উনিও চলে গেলেন, আমার ছেলে-মেয়ে হয় নি, তুমিই আমার আশ্রয়, নির্ভর, সব। আমাকে কাঁধে করে তুমিই কেদার-বদরী নিয়ে যাচ্ছ। কিন্তু কেবলই আমার মনে হচ্ছে সত্যিকথাটা তোমাকে

বলা উচিত। সত্যিকথা শুনে তুমি আমাকে যদি এখানে ফেলে রেখেও চলে যাও তা-ও বরং আমি সহ্য করতে পারব, কিন্তু মিথ্যার বোঝা বুকে লুকিয়ে রেখে আমি কেদার-বদরী যেতে পারব না, গেলে পাপ হবে, পুণ্য হবে না।"

বিকাশ কি বলিবেন ভাবিয়া পাইলেন না। তাঁহার গোড়ার কথা মনে পড়িল। ঠাকুরমার অতীত জীবনকে ঘিরিয়া যে রূপকথা-লোক তিনি মনে মনে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন তাহাও চুরমার হয়ে গেল। কিন্তু তিনি একটি কথা বলিলেন না।

"এ কথা শোনার পর আমাকে কাল নিয়ে যাবি তো ?"– বৃদ্ধা প্রশ্ন করিলেন।

"নিশ্চয়, তুমিই আমার ঠাকুরমা। ঘুমিয়ে পড়, খুব ভোরে উঠতে হবে কাল। সামনেই চড়াই আছে—"

॥ পাঁচ ॥

বিকাশের সমস্ত রাত্রি ঘুম হইল না। আলোর আভাস দেখা যাইতেই তিনি বিছানা ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ঊষার অরুণরাগে পূর্বাকাশ রঞ্জিত। মেঘে মেঘে হিমালয়ের শৃঙ্গে শৃঙ্গে স্বপ্নলোক মূর্ত হইয়াছে। সহসা বিকাশের মনে হইল ওই তো আমার ঠাকুরমা। তিনিও তো ঊষার মতো চঞ্চলা, অবগুণ্ঠনা ছিলেন · ।

তিনি স্বপ্নাচ্ছন্নবৎ দাঁড়াইয়া রহিলেন।

"দাদু, দাদু, বিকাশ, কোথা গেলি দাদু—"

বৃদ্ধা ঘরের ভিতর হইতে আতঙ্কিতকণ্ঠে চিৎকার করিয়া উঠিলেন। তাঁহার ভয় হইয়াছিল বিকাশ বুঝি তাঁহাকে ফেলিয়া চলিয়া গেল।

"এই যে ঠাকুরমা, যাচ্ছি, এবার ওঠ। বেরুতে হবে এক্ষুনি।"

একটু পরেই দেখা গেল বিকাশ বৃদ্ধাকে স্কন্ধে তুলিয়া লইয়া চড়াই ভাঙিতেছেন। আকাশে ঊষা নাই, চতুর্দিকে কেবল পাহাড় · ।

সবিলা

জনৈক খবরের কাগজের রিপোর্টার তাসের আড্ডা থেকে বাড়ি ফিরবার পথে যে মেয়েটিকে কুড়িয়ে বাড়ি নিয়ে গিয়েছিল, সে-মেয়ে যে রাজকন্যা, তা বেচারা বুঝতে পারে নি। সুতরাং তার সঙ্গে প্রেম করতেও ইতস্ততঃ করে নি। প্রেম যখন জমে উঠল, তখন হঠাৎ জানা গেল ওই কুড়িয়ে পাওয়া মেয়েটির আসল পরিচয়। এতে উক্ত সাংবাদিক যুবকটির মনের অবস্থা যা হল তা বর্ণনীয় নয়, অনুমেয়। বিখ্যাত একটি বিদেশী চলচ্চিত্রে এর শিল্পায়িত অভিব্যক্তি অনেকেই আপনারা দেখেছেন।

সবিলার জীবনেও এইরকম একটি কাণ্ড ঘটেছিল। সবিলা সাংবাদিক নয়, সহিস। সিকিমের একপ্রান্তে তার বাড়ি। সিকিমের রাজার অশ্বশালায় সে একজন পরিচারক-মাত্র। কিন্তু তবু সে অসামান্য ব্যক্তি, ধর্মের জ্যোতিতে তার মনপ্রাণ পরিপূর্ণ। সে মুসলমান, তার আকাঙ্ক্ষা, বাড়ির পাশে একটি মসজিদ নির্মাণ করাবে। আর অল্প,

কিন্তু তার থেকেই সে একটু একটু করে টাকা জমিয়েছে অনেকদিন ধরে। জমিও সংগ্রহ হয়েছে একটু একটু, চাঁদাও সংগ্রহ করেছে কিছু-কিছু। কিন্তু তার আকাঙ্ক্ষার অনুরূপ মসজিদ-নির্মাণ অল্প টাকায় হবে না, অনেক টাকা চাই। প্রায় দশ বৎসর ধরে চেষ্টা করে মসজিদের ভিত্তিপত্তন করতে পেরেছে সে। তারজন্যেই মালমশলা, ইঁট, সিমেন্ট সংগ্রহ করতে জিব বেরিয়ে পড়েছে তার। ঋণ হয়ে গেছে কিছু। তবু সে হাল ছাড়ে নি। আবার একটু একটু করে টাকা জমাচ্ছিল, এমন সময় এই অভাবনীয় ঘটনাটি ঘটল। কোট-প্যাণ্ট-পরা একটি সাহেব এসে হাজির হলেন তার কাছে। খাঁটি সাহেব নয়, দেশী সাহেব। চমৎকার লোক কিন্তু। খাসা উর্দুতে বললেন, "আমি পায়ে হেঁটে এই অঞ্চলটা বেড়িয়ে দেখতে চাই, দশ-বারো দিনের মত থাকবার জায়গা কি পাওয়া যাবে কোথাও?"

"এখানে তো হোটেল বা সরাই নেই সাহেব। এ-অঞ্চলে আমরা দশ-বারো ঘর সহিস আছি কেবল। সবাই মুসলমান। আমার গরীবখানায় থাকতে হুজুরের যদি আপত্তি না থাকে, তা হলে আপনার খিদমত করে আমি নিজেকে ধন্য মনে করব।"

সাহেব বললেন, "ও, তুমি মুসলমান বুঝি? যাক নিশ্চিন্ত হলাম। তোমার গরিবখানাই যে আমার মত মুশাফিরের পক্ষে দৌলতখানা ভাই। তুমি মুসলমান, কত বড় সংস্কৃতির বাহক তুমি—"

পর পর দু-তিনটে উর্দু বয়েত আওড়ালেন, কোরানের কথা বললেন। মুগ্ধ হয়ে গেল সবিলা।

সারাদিন ঘুরে বেড়াতেন সাহেব। সন্ধ্যাবেলা ফিরে আসতেন, একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করতেন। সবিলার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খুব ভাব হয়ে গেল তাঁর। চাচা-সাহেব বলে ডাকতে লাগল তাঁকে তারা।

একদিন পাশের জমিতে মসজিদের অর্ধ-সমাপ্ত ভিত্তিটা চোখে পড়ল তাঁর।

"ওটা কী সবিলা? নূতন বাড়ি করছ?"

একটু কুণ্ঠিত হয়ে পড়ল সবিলা।

"ওটা আমার পাগলামি হুজুর। বামন হয়ে চাঁদ ধরবার চেষ্টা—"

"কী ব্যাপার বল তো খুলে।"

কুণ্ঠিতমুখে চুপ করে রইল সবিলা খানিকক্ষণ। তারপর বলল, "হুজুর, আমার জীবনের আকাঙ্ক্ষা, একটি মসজিদ তৈরি করব। অনেকে আমার কথা শুনে হাসে, ঠাট্টা করে, কিন্তু তবু আমি চেষ্টা করছি—"

সাহেব বললেন, "দেখ সবিলা, এতদিন তোমাকে আমি আমার মতই সাধারণ মানুষ মনে করতাম। এখন দেখছি তুমি আমার চেয়ে অনেক বড়। তোমার মাথা আকাশে গিয়ে ঠেকেছে। এতদিন বুঝতে পারি নি, দেখতে পাই নি। তোমাকে আমি শ্রদ্ধাভরে সেলাম করছি। একটা কথা তুমিও বুঝতে পার নি সবিলা, তোমার মসজিদও তৈরি হয়ে গেছে, তার মিনারও আকাশ স্পর্শ করেছে। স্থান পেয়েছে সূর্যতারার সভায়—"

সবিলা অভিভূত হয়ে শুনছিল। সাহেব থামতেই সে জিজ্ঞাসা করল, "আমার মসজিদ তৈরি হয়ে গেছে? এ কী বলছেন আপনি, হুজুর—! কিছুই হয় নি, দেখতেই তো পাচ্ছেন—"

সাহেব দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, "হয়ে গেছে। যে-মুহূর্তে তুমি সঙ্কল্প করেছ সেই মুহূর্তেই তা হয়ে গেছে। তোমার মতো পুণ্যাত্মার সঙ্কল্প পূর্ণ হতে দেরি হয় না। ইঁট, সিমেণ্ট, চুন-সুরকি যোগাড় করতে হয়তো দেরি হচ্ছে, কিন্তু তা-ও হয়ে যাবে। টাকা কী করে যোগাড় করছ তুমি?"

"নিজে কিছু কিছু জমাচ্ছি। চাঁদাও পেয়েছি কারো কারো কাছ থেকে। কিন্তু এখানে তো লোকজন বেশী নেই, যারা আছে তারাও গরিব—"

"বেশ, আমি তোমাকে কিছু চাঁদা দিচ্ছি।"

সাহেব নগদ দশ টাকা দিলেন তাকে। আর একটি ইংরেজীতে ঠিকানা-লেখা কার্ড দিয়ে বললেন, "তুমি যদি কখনও কলকাতায় যাও, এই ঠিকানায় আমার খোঁজ কোরো। আমি তোমাকে আরও চাঁদা যোগাড় করে দেব!"

তার পরদিনই নেমে এলেন সাহেব পাহাড় থেকে।

॥ দুই ॥

তারপর তিন বৎসর কেটে গেছে।

কলকাতা শহরে প্রকাণ্ড একটি বাড়ির বাইরের ঘরে বহু রোগীর ভিড়ে সংকুচিত হয়ে বসে আছে সবিলা। প্রায় ঘণ্টা দুই বসে থাকতে হল। সব রোগী দেখা শেষ করে বেরিয়ে এলেন ডাক্তারসাহেব। সবিলা তখনও এককোণে বসে ছিল। চোখাচোখি হল দুজনে। হাসিমুখে এগিয়ে এলেন ডাক্তারসাহেব। হাত বাড়িয়ে উর্দুতে বললেন, "আরে সবিলা সাহেব যে! কী খবর!…"

সবিলা কুণ্ঠিতভাবে বললে, "আপনি ওয়াদা করেছিলেন যে, আমার মসজিদের জন্যে কিছু চাঁদা যোগাড় করে দেবেন।"

"নিশ্চয় দেব। ভিতরে এস!"

সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন ভিতরে।

"একটু চা খাও, নাস্তা কর। তারপর আমি তোমাকে একটা চিঠি দিচ্ছি, সেই চিঠি নিয়ে তুমি চলে যাও। যাঁর নামে চিঠি দেব তিনি তোমার সব ব্যবস্থা করে দেবেন।"

॥ তিন ॥

তার পরদিন আবার এল সবিলা।

ডাক্তারসাহেব জিগ্যেস করলেন, "কী হল?"

"টাকা পেয়েছি।"

"কত টাকা?"

"প্রায় তিন হাজার টাকা।"

"ওতে তোমার মসজিদ হয়ে যাবে তো?"

"হয়ে যাবে। আদাব।"

এত টাকা পেয়েও সবিলা কিন্তু ততটা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে পারল না যতটা উচ্ছ্বসিত হওয়া উচিত ছিল।

সে আবিষ্কার করেছিল যে, ডাক্তারসাহেব মুসলমান নন, হিন্দু।

অপ্রতিভমুখে আদাব করে চলে গেল সে।

অতিদূর ভবিষ্যতে

যে গল্পটি লিখিতেছি, তাহার পরিবেশ বর্তমান নহে, ভবিষ্যৎ। অনতিদূর ভবিষ্যৎ নহে, অতিদূর ভবিষ্যৎ। সে যুগে মানুষের প্রতিপত্তি নাই, জন্তু-জানোয়ারদেরই বাড়বাড়ন্ত। বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি হইয়াছে। মানুষই একদা বিজ্ঞানের সাহায্য লইয়া জানোয়ারদের সভ্য করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, তাহাদের সে চেষ্টা মর্মান্তিকরূপে সফল হইয়াছে। অর্থাৎ শিক্ষিত, সভ্য জানোয়ারদের কবলে পড়িয়া বহু নরনারী প্রাণ হারাইয়াছেন। হস্তীরা যখন রাজা হইয়াছিল তখন তাহারা আইন করিয়াছিল যে মানুষ দেখিলেই তাহাকে শুঁড়ে জাপটাইয়া তুলিয়া আছাড় দিতে হইবে। সিংহ-ব্যাঘ্রদের আমলে যাহা ঘটিয়াছিল তাহা অবর্ণনীয়! বোলতা-ভীমরুলগণ সম্মিলিতভাবে কিছুকাল রাজত্ব করিয়াছিল। সে সময় প্রতিটি মানুষের চেহারা এত বীভৎস হইয়াছিল যে চেনা যাইত না। যে যন্ত্রণা তাহারা ভোগ করিয়াছিল তাহা জনৈক মানব-কবি একটি কাব্যে বর্ণনা করিয়াছিলেন। কিন্তু সে কাব্য রাজদ্রোহসূচক বলিয়া ভস্মীভূত করা হয়, কবিকেও লক্ষ লক্ষ বোলতা এবং ভীমরুলের হুলাঘাতে প্রাণত্যাগ করিতে হয়। এই-ভাবে বারম্বার আক্রান্ত হইয়া মানুষেরা ক্রমশঃ সংখ্যায় অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে। যাহারা আছে তাহারা জানোয়ারদের অধীনে থাকিয়া জানোয়ারদের নির্দেশ মানিয়া কোনক্রমে জীবনযাপন করিতেছে।

যখনকার কথা লিখিতেছি তখন গর্দভ-সম্প্রদায়ের রাজত্ব। ঘোড়ারা তাহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী। নির্বাচন-যুদ্ধ আসন্ন। কী হয় বলা যায় না।

সে যুগের জনৈক মানব-লেখক একটি ই-যন্ত্রের সম্মুখে বসিয়াছিলেন। ই-যন্ত্রের অর্থ ইচ্ছাশক্তি-যন্ত্র। আণবিক যুগ অতীতের পর্যায়ে পড়িয়া গিয়াছে। মনোময় যুগ চলিতেছে। প্রবল ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন যে কোনও মানুষের ইচ্ছা ই-যন্ত্রযোগে অপরের মনে সঞ্চালিত হইয়া অঘটন ঘটাইতেছে। এমন কি যাহারা কুরূপ, তাহারা স্বরূপ হইতেছে, বামনগণ দৈত্যে পরিণত হইয়াছে। জন্তুজানোয়ারদের চেহারাও মনুষ্যাকৃতিলাভ করিয়াছে। ই-যন্ত্রের সম্মুখে বসিয়া প্রবল ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করিলেই ইচ্ছানুরূপ ফল ফলিতেছে। প্রবল ইচ্ছাশক্তিশালী মানব ব্যতীত অন্য কাহারও দ্বারা কিন্তু এই যন্ত্রে সুফল ফলে না। তাই ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন মানবদের এখনও কিছু আধিপত্য আছে!

যে লেখকটি ই-যন্ত্রের সম্মুখে বসিয়াছিলেন তাঁহার ইচ্ছাশক্তি খুব প্রবল। তিনি যন্ত্রের সম্মুখে বসিয়া দূরবাসিনী কোনও তরুণীর অনমনীয়তাকে নমনীয় করিবার প্রয়াস পাইতেছিলেন।

এমন সময় গর্দভ-রাজ্যের প্রচার-সচিব আসিয়া প্রবেশ করিলেন।

'ও মশাই, একটা মুশকিল হয়েছে। জানেন তো, ঘোড়াদের প্রজাবৃদ্ধি হলেই আমরা ভোটে হেরে যাব। তাই আমরা সমস্ত পুরুষ-ঘোড়াগুলিকে বন্দী করে রেখেছিলাম। খবর পেলাম, কয়েকটি পুরুষ-ঘোড়া বন্দীশালা থেকে পালিয়েছে। চর এসে খবর দিলে যে তারা কতকগুলি তরুণী-ঘোটকীর সঙ্গে মিলিতও হয়েছে। শুনছি, শ' দুই ঘোটকী গর্ভবতী। আপনি ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করুন, যেন একটি ঘোটকীও সন্তানপ্রসব করতে না পারে।'

'যে আজ্ঞে।'

তটস্থ লেখক উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

এক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। যাহা সুদূর কল্পনারও অতীত ছিল, তাহাই ঘটিয়াছে। গর্দভ-রাজ্যে উক্ত লেখকটি প্রধানমন্ত্রীরূপে নির্বাচিত হইয়াছেন। তাঁহার ইচ্ছাশক্তিবলে সমস্ত ঘোটকীগুলি নাকি ডিম্বপ্রসব করিয়াছিল, একটিও বাচ্চা হয় নাই।

উচিত-অনুচিত

যাহা চিরকাল ঘটে, তাহাই ঘটিতেছিল।

মিত্তিরদের বাড়ির শফরী বসুদের বাড়ির ক্যাবলার সহিত এমন মাখামাখি আরম্ভ করিয়াছিল যে শহরসুদ্ধ সকলের নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটিতে লাগিল। সেকাল হইলে শফরীর পিতা কুঞ্জনাথকে একঘরে করিয়া ইহার প্রতিকার করা চলিত। কিন্তু কালের চাকা ঘুরিয়াছে, এখন ফুসফুস, গুজগুজ করা ছাড়া অন্য কিছু করিবার উপায় নাই।

সকালে দেখা যায়, শফরী ও অশোক (ক্যাবলার ভালো নাম) শহরের বাহিরে যে মাঠটা আছে, সেখানে গিয়া সাইকেল চড়া প্র্যাকটিশ করে। অশোক শেখায়, শফরী শেখে।

দুপুরে আহারাদির পর অশোক শফরীদের বাড়িতে যায়। সেখানে প্রায় বেলা পাঁচটা পর্যন্ত তাসখেলা চলে। শফরীর মা এবং বিধবা পিসীমাও খেলায় যোগদান করেন। পান ও দোক্তার শ্রাদ্ধ হয়। অশোক মাঝে মাঝে ম্যাজিক দেখায়, তাসের ম্যাজিক। দুপুরটা বেশ আনন্দে কাটে। শফরীর পিতা কুঞ্জনাথ মিত্র ক্যাবলার পিতা হরগোবিন্দ বসুর বাল্যবন্ধু। সুতরাং এ মেলামেশায় কেহই দোষের কিছু দেখেন না। শফরী ঘরের মেয়ে, ক্যাবলাও ঘরের ছেলে। উভয়েরই পিতামাতার ধারণা, তাঁহাদের পুত্রকন্যা কুসুমের মতো নির্দোষ।

তাসখেলা শেষ করিয়া অশোক শফরীকে লইয়া সিনেমায় যায়। সন্ধ্যাবেলা প্রায় সিনেমাতেই কাটে। রাত্রে তাহারা কোথায় থাকে, কী করে, তাহা কেহ জানে না। নেপথ্যে ফুসফুস, গুজগুজ হইতে থাকে।

আমি তখন সেখানকার ম্যাজিস্ট্রেট ছিলাম। আমাদের মহলেও অর্থাৎ উচ্চপদস্থ হাকিমমহলেও ইহা লইয়া সরস আলোচনা চলিত। কুঞ্জবাবু আমার আপিসে কাজ করিতেন আর হরগোবিন্দবাবু করিতেন আবগারি বিভাগে। একজন বিহারী অফিসার

একদিন কটাক্ষ করিয়া বলিলেন, আজকালকার মেয়েরা যেরূপ দ্রুতবেগে প্রগতির পথে ধাবিত হইতেছেন, তাহাতে ভবিষ্যতে প্রাদেশিকতা জিনিসটা আপনিই উঠিয়া যাইবে। বলিয়া আমার দিকে চাহিয়া হাসিলেন।

আমার খুব খারাপ লাগিল। কয়েকদিন পরে আমি আমার একজন সাব-ডেপুটিকে কথা-প্রসঙ্গে বলিলাম, "অশোকের সঙ্গে শফরীর বিয়ে তো অনায়াসে হতে পারে। ওরা পালটি ঘর। আপনি একটু ঘটকালি করুন না।"

"আচ্ছা, সার।"

দিনদশেক পরে নিত্যানন্দবাবু (সেই সাব-ডেপুটি) আসিয়া আমাকে খবর দিলেন।

বলিলেন, "বিয়ে হওয়া শক্ত। হরগোবিন্দবাবুকে আমি বলেছিলাম, তিনি বললেন, তাঁর ছেলের বিয়ে দেবার মালিক তিনি নন, তাঁর স্ত্রী। তাঁর স্ত্রী যদি মত করেন, তিনি আপত্তি করবেন না। ওঁদের বাড়িতে আমাদের যাতায়াত আছে। আমার স্ত্রীকে বললুম, হরগোবিন্দবাবুর স্ত্রীর কাছে কথাটা পাড়তে। আমার স্ত্রী কথাটা পেড়েছিল কাল। হরগোবিন্দবাবুর স্ত্রী কথাটা শুনে যেন আঁৎকে উঠলেন। বললেন, 'ওই বেহায়া মেয়ের সঙ্গে আমি আমার অমন ছেলের বিয়ে দেব, বলছেন কী আপনি! কত ভালো বংশের সুন্দরী মেয়ে সাধাসাধি করছে! ওই কী ক্যাবলার যোগ্য মেয়ে'।"

কুঞ্জবাবুর অভিমতটা কী তাহাও আমি জানিয়াছিলাম। কুঞ্জবাবুর ধারণা তাঁহার মেয়ের যেরকম রূপ, গুণ তাহাতে অনেক বড় ঘরে তাহার বিবাহ হইবে। সে নাচিতে জানে, গাহিতে জানে, লেখাপড়া জানে, অনেক কিছু জানে। তা ছাড়া উহারা দুইজনে ভাই-বোনের মতো মানুষ হইয়াছে, উহাদের বিবাহটা বড়ই অশোভন হইবে।

কিছুদিন পরে যাহা অনিবার্য, তাহাই ঘটিল। শফরীকে লইয়া অশোক একদিন সরিয়া পড়িল। তাহার পর কী হইয়াছিল জানি না, কারণ আমিও বদলি হইয়া গেলাম।

॥ দুই ॥

তাহার পর পাঁচ বছর কাটিয়া গিয়াছে।

একদিন সন্ধ্যায় কলিকাতার একটি নামজাদা প্রেক্ষাগৃহে বসিয়া সিনেমা দেখিতেছি। হঠাৎ চমকাইয়া উঠিলাম। এ কী! এ যে সেই শফরী আর ক্যাবলা! তাহারাই নায়ক-নায়িকা। পরস্পর পরস্পরকে জড়াইয়া চুম্বন করিতেছে। কী আর করিব, বসিয়া বসিয়া দেখিতে লাগিলাম। তাহারা বেশ ভালো অভিনয়ই করিতেছে। বলা বাহুল্য, এখন তাহাদের শফরী আর অশোক নাম নাই। চিত্র-জগতে নতুন নামে তাহাদের পরিচয়। সত্যই বেশ ভালো অভিনয় করিতেছে! আমার পিছনে যাঁহারা বসিয়াছিলেন তাঁহারাও দেখিলাম উচ্ছ্বসিত।

"উঃ, কী চমৎকার অ্যাক্‌টিং করছে।"

"গুণ আছে, তা না হলে অত টাকা দিয়েছে। দশ হাজার করে। আরও কনট্রাক্ট পেয়েছে…"

পিছনের সিটে এই জাতীয় আলোচনা চলিতেছিল। শফরী আর ক্যাবলা যে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছে ইহাতে আনন্দিত হইলাম। মনে হইল, এই হওয়াই তো উচিত।

ইন্‌টারভাল হইল।

দেখিলাম, পিছনের সিটে বসিয়া আছেন কুঞ্জনাথ, হরগোবিন্দ এবং আরও দুইটি প্রৌঢ়া মহিলা। সম্ভবতঃ কুঞ্জনাথ এবং হরগোবিন্দের স্ত্রী। সকলেরই মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত। কুঞ্জনাথ আমাকে চিনিতে পারিয়াছিলেন, নমস্কার করিলেন। আমিও প্রতি-নমস্কার করিয়া বাহিরে চলিয়া গেলাম।

॥ তিন ॥

ইহার পর আরও পনেরো বৎসর কাটিয়াছে।

আমার কলিকাতায় বাসায় একদিন সকালে শফরী আর ক্যাবলা আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদের সঙ্গে একটি মেয়ে। চমৎকার মেয়েটি। যেমন রঙ, তেমনি মুখ-চোখ।

শফরী প্রণাম করিয়া বলিল, "জ্যাঠামশাই, চিনতে পারেন আমাদের ?"

ক্যাবলাও প্রণাম করিল। মেয়েটিও করিল।

"শুনলাম আপনি কোলকাতাতেই আছেন। চিনতে পেরেছেন আমাদের ?"

"তোমরা তো বিখ্যাত লোক, না চেনবার কি আছে ?"

"এ মেয়েটি কে ?"

"আমাদেরই মেয়ে। রুমা।"

"বাঃ, খাসা মেয়েটি। পড়াশোনা করছে তো ?"

"এ বছর ম্যাট্রিক দেবে।"

"বাঃ…"

শফরী তাহার পর আসল কথাটি পাড়িল।

"আমরা বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এসেছি। ছোটবয়সেই মেয়েটি বিয়ে দিতে চাই, যা দিনকাল পড়েছে। আপনার ছেলেটি তো এবার ডাক্তারি পাশ করেছে। আপনি আমাদের পালটি ঘরও। নিন না রুমাকে—"

বললাম, "আমার ছেলে এই সবে পাশ করেছে। আগে কিছু রোজগার করুক, সেট্‌ল্‌ড্‌ না হলে—"

শফরী বলিল, "যদি কিছু না মনে করেন তাহলে একটা কথা বলতে চাই। বলব ?"

"বল—"

"আমাদের ওই একটিমাত্র মেয়ে। ওকে এক লক্ষ টাকা দেব আমরা। আমাদের যে জামাই হবে, তার যাতে কোনও আর্থিক অসুবিধা না হয়, সে ব্যবস্থা আমরা করব।"

"আচ্ছা, ভেবে দেখি—"

প্রণাম করিয়া তাহারা চলিয়া গেল।

খবর লইয়া জানিলাম, শফরী এবং ক্যাবলার তিন আইন অনুসারে বিবাহ হইয়াছিল। রুমা জারজ নয়। তবু কিন্তু এ বিবাহে সম্মতি দিতে পারি নাই। কোথায় যেন একটু বাধিল।

দন্ত-কৌমুদী

যাহারা পতিতা, যাহারা নিজেদের দেহ বিক্রয় করিয়া অন্নবস্ত্রের সংস্থান করে, তাহাদের ঘৃণা করা উচিত—সুনীতিপরায়ণ, সাধু ব্যক্তিদের ইহাই নির্দেশ। তাঁহারা আরও বলেন, তাহাদের সংস্রবও পরিহার্য। প্রথম উপদেশটি এতদিন পালন করিয়াছি, কিন্তু দ্বিতীয়টি পারি নাই। কারণ, আমি ডাক্তার, রোগিণী আসিয়া উপস্থিত হইলে সে পতিতা কি সতী, এ বিচার করা চলে না, তাহার চিকিৎসায় মন দিতে হয়, সুতরাং সংস্রব অপরিহার্য হইয়া পড়ে। তাই দ্বিতীয় উপদেশটি পালন করা সম্ভব হয় নাই। আজ দেখিতেছি, প্রথম উপদেশটির মর্যাদাও রক্ষা করিতে পারিলাম না। চাহনির উদ্দেশে মনে মনে প্রণাম নিবেদন করিতে হইল। সবাই তাহাকে চাউনি বলিয়া ডাকিত। বিহারীরা বলিত, নজরিয়া। আমি নামটাকে একটু শুদ্ধ করিয়া লইয়াছিলাম। চাহনি নামজাদা পতিতা ছিল না, চিত্র-তারকা হইবার সুযোগ সে পায় নাই। তাহার ফী ছিল মাত্র এক টাকা। পথচারিণী ছিল সে।

সে আমার নিকট প্রথম যখন আসিয়াছিল তখন সে সিফিলিসে জর্জরিত। অনেকগুলি ইনজেকশন দিয়া তাহাকে ভালো করিলাম। আমার ফী দিতে কোনদিন সে কার্পণ্য করিত না, কেবল শেষের ফীটা সে দিতে পারে নাই, হাতজোড় করিয়া বলিয়াছিল, এখন হাতে পয়সা নেই ডাক্তারবাবু, পরে দিয়ে যাব। বিশ্বাস করুন আমাকে, নিশ্চয় দিয়ে যাব।

বছরখানেক পরে আবার আসিয়াছিল সে। আমার ফী আনে নাই, নতুন একটা সমস্যা সমাধান করিবার জন্য পরামর্শ চাহিতে আসিয়াছিল।

বলিল, আমার দাঁতগুলো দেখুন তো ডাক্তারবাবু। দেখিলাম, দাঁতগুলি মজবুত আছে, কিন্তু প্রত্যেকটিই কুচকুচে কালো। মিশি, গুল এবং পান-দোক্তাই কারণ। বলিলাম, দাঁত তো ভালোই আছে। রঙ অবশ্য কালো হয়ে গেছে। কিন্তু তাতে ক্ষতি কি?

চাহনি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল।

এ কালো রঙ উঠিয়ে দেওয়া যায়?

যায়, কিন্তু অনেক হাঙ্গামা। এখানে হবে না। কোলকাতা যেতে হবে। থাক না কালো রঙ, ক্ষতি কি?

চাহনি বলিল, আজকাল ঝকঝকে, সাদা দাঁত সবাই চায়। আমার খদ্দের অনেক কমে গেছে।

বলিয়া মাথা হেঁট করিল। তাহার পর বলিল, কোলকাতাই চলে যাই তাহলে। রেশমীও এই কথা বলছিল। আপনিও যখন বলছেন, তখন সেই ব্যবস্থাই করি।

যাইবার পূর্বে বলিয়া গেল, আপনার ফীয়ের কথা ভুলি নি, পাঠিয়ে দেব পরে। বড় টানাটানি চলছে আজকাল।

চলিয়া গেল।

তাহার পর আরও পাঁচ বছর কাটিয়াছে। চাহনির কোনও খবর আর পাই নাই। আজ সকালে একটি ঘাড়-ছাঁটা ছোকরা একটি চিঠি এবং একটি সীল-করা কৌটা আমার হাতে দিয়া গেল। বলিল, চাউনি এটা কোলকাতা থেকে আপনাকে পাঠিয়েছে।

কী আছে কৌটাতে?

তা তো জানি না।

ছোকরা চলিয়া গেল।

চিঠিটা খুলিয়া পড়িলাম। আঁকা-বাঁকা লেখা, অজস্র বানান ভুল। ভাষাতেও গুরু-চণ্ডালী দোষ। সংশোধন করিয়া লিখিলে এইরূপ দাঁড়ায়—

শ্রীচরণেষু,

শতসহস্র প্রণামান্তে নিবেদন,

ডাক্তারবাবু, ভগবানের কৃপায়, আশা করি, আপনি ভালো আছেন। আশা করি, এ অভাগীর কথা আপনার মনে আছে। আপনার পরামর্শ অনুসারে আমি কলিকাতায় আসিয়া একজন বড় দাঁতের ডাক্তারকে আমার দাঁতগুলি দেখাইয়াছিলাম। তিনি বলিলেন, সব দাঁতগুলি সোনা দিয়া বাঁধাইয়া লও। সবগুলি না পার অন্ততঃ সামনের কয়টি বাঁধাইয়া লও। দেখিতেও ভালো হইবে, দাঁতগুলি অনেকদিন টিকিবেও। আমার যে কয়খানা গহনা ছিল তাহা বেচিয়া সোনা দিয়া দাঁত বাঁধাইয়া লইলাম। ইহাতে ফলও হইয়াছিল। এখানেই নূতন করিয়া আবার ব্যবসা ফাঁদিয়াছিলাম। লোক মন্দ জুটিত না। কিন্তু ডাক্তারবাবু, আমার অদৃষ্টই মন্দ। আবার ব্যায়রামে পড়িলাম। এবার যক্ষ্মা। ডাক্তার বলিয়া গিয়াছেন, বাঁচিবার আশা কম। অনেক টাকা খরচ করিলে, কিছুদিন বাঁচিতে পারি। সম্পূর্ণ আরোগ্য হইব না। আমার টাকা আর নাই, চিকিৎসায় এবং বাড়িভাড়ায় সর্বস্বান্ত হইয়াছি। আর বাঁচিব না। আপনার সহিত আর আমার দেখাও হইবে না। আপনার কিছু ফী বাকি ছিল, সে কথা আমি ভুলি নাই। আপনার ঋণ শোধ করিবার নয়, তবু ফী বাবদ কিছু পাঠাইতেছি। আমার কাছে নগদ টাকা নাই। আমার সোনা-বাঁধানো দাঁতগুলিই আপনাকে একটি কৌটায় পুরিয়া পাঠাইয়া দিতেছি। পাড়ায় একটি ছোকরা দাঁতের ডাক্তার আছে, সে-ই কোনো পয়সা না লইয়া দাঁতগুলি উপড়াইয়া দিয়াছে। ছেলেটি বড় ভাল। রেশমীর ছেলে খোনতা এখানে আসিয়াছিল, তাহার হাতেই পাঠাইলাম। আপনি গ্রহণ করিলে কৃতার্থ হইব। আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানিবেন। ইতি

সেবিকা
চাহনি

আলোবাবু

সবাই তাঁকে আলুবাবু বলত, কিন্তু তাঁর আসল নাম আলো। চেহারা অবশ্য নামের উপযুক্ত নয়। গায়ের রং কুচকুচে কালো, মুখটি বেগুনপোড়ার মতো, তার উপর কালো গোঁফ-দাড়ি, যুগ্ম-ভ্রূ, মাথায় ঘাড় পর্যন্ত লম্বা বাবরি চুল। গলায় তুলসীর মালা, সেটিও কালো হয়ে গেছে। পরনের থানখানি অবশ্য ধপধপে সাদা। গায়ের চাদরখানিও সাদা। আলোবাবু জামা গায়ে দিতেন না। জুতোও পরতেন না।

একদিন সকালে আমার বৈঠকখানায় ঢুকে নমস্কার করে কাঁচুমাচু হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। সেইদিনই প্রথম দেখলাম তাঁকে।

"কি চাই আপনার ?"

"অনুগ্রহ করে একটু সাহায্য করবেন আমাকে ?"

সাহায্যপ্রার্থী অনেক আসে, অধিকাংশ লোকই টাকা চায়, ভাবলাম, ইনিও বোধ হয় সেই দলের। মনে মনে একটু বিরক্ত হলাম, কিন্তু মুখ ফুটে বিরক্তিপ্রকাশ করতে পারলাম না। বরং বললাম, "অসম্ভব না হলে নিশ্চয়ই করব। বলুন, কি করতে হবে—"

তাঁর বাঁ হাতে একটি ছোট থলি ছিল। তার ভিতর হাত ঢুকিয়ে তিনি একটি ছোট পাখির ছানা বার করলেন।

"একটা ছোঁড়া এই পাখির ছানাটার পায়ে দড়ি বেঁধে টেনে টেনে নিয়ে বেড়াচ্ছিল। আমি দু আনা পয়সা দিয়ে বাচ্চাটা নিয়ে নিয়েছি তার কাছ থেকে। মনে হচ্ছে, এর পায়ে লেগেছে, পায়ে দড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে বেড়াচ্ছিল কিনা, একটু দেখবেন দয়া করে ? শুনেছি আপনি বড় ডাক্তার।"

দেখলাম পাখির ছানাটিকে। পায়ে সত্যিই লেগেছিল। টিঞ্চার আয়োডিন লাগিয়ে বেঁধে দিলাম।

"কি করবেন এটাকে নিয়ে, পুষবেন ?"

"না। ভালো হলে ছেড়ে দেব। জীবন্ত কোনো জিনিস পোষবার সামর্থ্য নেই আমার। ইচ্ছে করে খুব, কিন্তু পয়সা নেই। সেইজন্যে বিয়েও করি নি।"

কুণ্ঠিতদৃষ্টি তুলে একটু হেসে চাইলেন আমার দিকে।

"ও। এর আগে তো দেখি নি আপনাকে, কোথা থাকেন ?"

"অবিনাশবাবুর বাড়িতে। দিনসাতেক হল এসেছি।"

আর একবার কুণ্ঠিতদৃষ্টি তুলে চাইলেন। অবিনাশবাবু এখানকার নামজাদা উকিল একজন।

"অবিনাশবাবুদের সঙ্গে আত্মীয়তা আছে বুঝি ?"

"না, তেমন কিছু নয়। আমার এক দূর-সম্পর্কের ভাগ্নির বন্ধুর শ্বশুর উনি। আসলে লোক খুব ভালো। তাই দয়া করে থাকতে দিয়েছেন।"

আলোবাবু পাখির ছানাটিকে নিয়ে চলে গেলেন।

দিনকয়েক পরে অবিনাশবাবুর বাড়ি যেতে হয়েছিল। সেখানে আলোবাবুর সঙ্গে আবার দেখা হয়ে গেল। দেখলাম, তিনি একটি দিশি কুকুরের বাচ্চার পরিচর্যায় নিযুক্ত

হয়ে আছেন। আমাকে দেখেই একমুখ হেসে বললেন, "বিনুবাবুর কুকুর এটি। কুকুর পোষার শখ আছে, কিন্তু সেবা করতে জানে না। দুটো চোখে এতক্ষণ পিঁচুটি ভরতি ছিল, তুলো ভিজিয়ে পরিষ্কার করলুম। আর কুকুরকে সারাক্ষণ বেঁধে রাখলে কি চলে ? ওদের সঙ্গে খেলা করতে হয়—"

কুকুরটার দিকে চেয়ে তার মুখের সামনে টুসকি দিতে লাগলেন। ল্যাজ নেড়ে নেড়ে খেলা করতে লাগল কুকুরটা। বিনু অবিনাশের ছেলে, বয়স দশ বছর।

অবিনাশবাবুর সঙ্গে দেখা হল একটু পরে।

বললাম, "আপনার এই আলোবাবু লোকটি তো অদ্ভুত ধরনের মনে হচ্ছে।"

"হ্যাঁ, অদ্ভুতই। স্নেহের কাঙাল বেচারা। গরীবও খুব। আপনার সঙ্গে আলাপ হয়েছে নাকি ?"

"হ্যাঁ, এক পাখি পেশেণ্ট নিয়ে গিয়েছিলেন আমার কাছে।"

"দেখবেন তো, যদি ওর চাকরি-বাকরি জুটিয়ে দিতে পারেন কোথাও। সেবা করতে বড় ভালোবাসে, বিশেষতঃ সেবার পাত্র বা পাত্রী যদি অসহায় হয়—"

দিনকতক পরে সিভিল সার্জনের সঙ্গে দেখা হল। একসঙ্গে কলেজে পড়েছিলুম। কথায় কথায় আলোবাবুর কথা উঠে পড়ল। সিভিল সার্জন বললে, "এখানকার হাসপাতালে ওকে প্রবেশনার ড্রেসার করে ঢুকিয়ে নিতে পারি। তবে দশ টাকার বেশি এখন পাবে না। পরীক্ষায় পাশ করলে তখন মাইনে বাড়বে—"

আলোবাবু হাসপাতালের আউট-ডোরে রোগীদের ঘা ধোয়াতে লাগলেন। মাসখানেক পরেই কিন্তু চাকরিটি গেল তাঁর। একদিন দেখি, আমার ল্যাবরেটরিতে এসে শুষ্কমুখে বসে আছেন।

"কি খবর—"

"আমাকে দূর করে দিলে।"

"কেন ?"

"একটা লোকের পায়ের ঘা কিছুতেই সারছিল না। সে-ই আমাকে একটা ওষুধ দেখিয়ে দিয়ে বললে, ওই ওষুধটা দাও, তাহলে সেরে যাবে। ওটা লাগিয়ে অনেকের নাকি সেরে গেছে। দিলুম ওষুধটা লাগিয়ে, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে লোকটা চিৎকার শুরু করে দিলে, সে এক হৈ-হৈ ব্যাপার। ডাক্তারবাবু এলেন, তিনি তো চটেই লাল, বললেন, কার হুকুমে তুমি ঘায়ে কার্বলিক এসিড ঢেলে দিয়েছ ? আমি আর কি বলব, চুপ করে রইলাম। ডাক্তারবাবু আমাকে দূর করে দিলেন। আমি ওর ভালোর জন্যেই ওষুধটা দিয়েছিলাম, আর ওর কথাতেই দিয়েছিলাম—"

আমিও চুপ করে রইলাম, কি আর বলব। সত্যিই অন্যায় কাজ করেছেন।

কিছুক্ষণ বসে থেকে আলোবাবু চলে গেলেন।

কষ্ট হতে লাগল ভদ্রলোকের জন্য, কিন্তু কি করব ভেবে পেলাম না।

দিনকয়েক পরে অবিনাশবাবুর বাড়ি থেকেও বিদায় নিতে হল আলোবাবুকে। শুনলাম, অবিনাশবাবুর স্ত্রী দূর করে দিয়েছেন তাঁকে। আলোবাবু যা করেছিলেন তা কোনও মা সহ্য করতে পারেন না। তিনি এক বগলে কুকুর-বাচ্চাটা এবং আর এক বগলে অবিনাশবাবুর শিশু-পুত্র তিনুকে নিয়ে একবার কুকুরটার মুখে আর সঙ্গে সঙ্গে তিনুর মুখে চুমু খাচ্ছিলেন।

অবশেষে আমিই আশ্রয় দিলাম আলোবাবুকে।

একদিন সন্ধ্যের পর এসে দেখলাম, তিনি একটা সোলার হ্যাট বাজিয়ে গুনগুন করে গান গাইছেন।

"আপনি গানবাজনা জানেন নাকি—"

কুণ্ঠিতমুখে উঠে দাঁড়ালেন তিনি।

"এককালে ডুগি-তবলা বাজাতে পারতাম। দেনোর দায়ে সব বেচে দিতে হয়েছে। এখন হ্যাট বাজাই—"

বলা বাহুল্য, খুব কৌতুক অনুভব করলাম।

"হ্যাট পেলেন কোত্থেকে—"

"অনেক আগে স্যুটও পরতাম। সব গেছে, ওই হ্যাটটি আছে কেবল।"

আলোবাবুর আরও পরিচয় পেলাম দিনকয়েক পরে। একদিন দেখি, তিনি ছুটতে ছুটতে আসছেন।

"কি হল, ছুটছেন কেন—"

"দশটা বেজে গেছে, আমার ঘড়িতে দম দেওয়া হয় নি এখনও। রামবাবুর গাইটার বাচ্ছা হয়েছে শুনে দেখতে গিয়েছিলাম, হঠাৎ শুনতে পেলাম, তাঁর বৈঠকখানার ঘড়িতে টং টং করে দশটা বেজে গেল। তখুনি ছুটলাম, আমার ঘড়িতে ঠিক দশটার সময় দম দি। আমাদের যেমন খাবার, ঘড়ির তেমনি দম, বেচারীর খেতে দেরি হয়ে গেল আজকে—"

তাড়াতাড়ি ঢুকে পড়লেন নিজের ঘরে। আমি একটু অবাক হয়ে গেলাম। আলোবাবুর যে ঘড়ি আছে, তা জানতাম না। তাঁর পিছু পিছু এসে একটু আড়াল থেকে দেখতে লাগলাম। দেখলাম, ঘরে ঢুকেই তিনি নিজের ভাঙা তোরঙ্গটা খুললেন। তার ভিতর থেকে বার করলেন একটি ছোট টিনের বাক্স। বাক্সের ভিতর থেকে একটা ন্যাকড়ার ছোট পুঁটুলি-মতন কি বার করলেন। ন্যাকড়াটি খুলতেই লালরঙের শালুর পুঁটুলি বেরিয়ে পড়ল। সেটি খুললেন। বেরুল রেশমী ন্যাকড়ার পুঁটুলি, সেটি খুলতেই বের হল খানিকটা তুলো, তারপর ছোট্ট ঘড়িটি। তিন পুরু কাপড়-ঢাকা ঘড়িটিকে আঙুরের মতো রাখতেন তিনি সযত্নে। ঘড়িটি বার করে চাপটালি খেয়ে বসলেন, তারপর চোখ বুজে ধীরে ধীরে দম দিতে লাগলেন। মনে হল, যেন পুজো করছেন।

অবিনাশবাবুর কথাটা মনে পড়ল। স্নেহের কাঙাল বেচারা! জীবনে কিন্তু ভালবাসার সুযোগ পাচ্ছে না কোথাও। সব স্নেহ তাই উজাড় করে দিয়েছে বোধ হয় ঘড়িটির উপর।

একদিন ল্যাবরেটরি থেকে ফিরে দেখি, আলোবাবু হ্যাট বাজিয়ে তারস্বরে গান গাইছেন। দুটো লাইনই বার বার গাইছেন—

আমায় ওরা সইলো না কেউ
আমার কাছে রইলো না কেউ—

আমি খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম অবাক হয়ে। এমন গলা ছেড়ে গান গাইতে শুনি নি কখনও তাঁকে। আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে থেমে গেলেন তিনি।

"আজ এত জোরে জোরে গান গাইছেন যে।"

"এমনি।"

তারপর আমার দিকে চেয়ে একটু কুণ্ঠিত হাসি হেসে বললেন, "আমার ঘড়িটা চুরি হয়ে গেছে। ঠিকসময়ে হয়তো ভালো করে দম দিতে পারবে না—"

টপ-টপ করে তাঁর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল কয়েক ফোঁটা।

আলোবাবু এখন পাগলাগারদে আছেন।

সমাজের সঙ্গে নিজেকে তিনি খাপ খাওয়াতে পারলেন না কিছুতে।

ধনী-দরিদ্র

"নমস্কার মহেশবাবু, ভালো তো সব?"

দন্তপংক্তি বিকশিত করে ধীরেনবাবু নমস্কার করলেন।

সদ্য পাশকরা কলেজের ছোকরা জীবন কেরানীর ছেলে মহেশ দাসকে নমস্কার করা দূরে থাক, গ্রাহ্যের মধ্যেই আনতেন না আগে ধীরেনবাবু। ইদানীং কিন্তু আনছেন। মানে, আনতে হচ্ছে। ধীরেনবাবুর মনিব রায়বাহাদুর নির্মলশংকরের একমাত্র কন্যা জয়শ্রীর সঙ্গে বিয়ে হয়েছে মহেশ দাসের। বিয়ে যাতে না হয়, ধীরেনবাবু গোপনে গোপনে সে চেষ্টার ত্রুটি করেন নি। ধীরেনবাবুর ইচ্ছে ছিল, অবনী সেনের সঙ্গে জয়শ্রীর বিয়ে হোক। অবনীও জমিদারের ছেলে, সুপুরুষ, জয়শ্রীর সঙ্গে ভাবও আছে। কিন্তু হল না। হলে ধীরেন ভাদুড়ীর সুবিধা হত, অবনীকে তিনি প্রাইভেট পড়িয়েছিলেন কিছুদিন। তাঁর পশার-প্রতিপত্তি বাড়ত। এখন মহেশ দাসকে নমস্কার করতে হচ্ছে। ধীরেনবাবু আর একবার দন্তপংক্তি বিকশিত করলেন।

"মৃণালপুরে যাচ্ছেন না কি? জয়া মা তো সিমলা থেকে নেবে গেছেন, শুনলাম অবনীর কাছ থেকে।"

মহেশ দাসের ভ্রূ ঈষৎ কুঞ্চিত হল। জয়শ্রী সিমলা থেকে নেবে মৃণালপুরে গেছে, এ কথা শোনামাত্রই মহেশ সেখানে ছুটবে কেন বিনা আহ্বানে? ধীরেনবাবুর এই উক্তি তার আত্মসম্মানকে আঘাত করলে যেন। এ কথা ভাববার মানে!

"না, আমার এখন যাবার কোনো ঠিক নেই।"

"ও, আচ্ছা যদি যান, আমাকে জানাবেন একটু আগে থাকতে, কিছু ডিম দিয়ে দেব সঙ্গে। আজ অবনীর সঙ্গে দিলাম কিছু, আপনার সঙ্গে আরও কিছু দিয়ে দেব। মৃণালপুরে ডিম পাওয়া যায় না কিনা!"

"অবনীবাবু গেছেন নাকি সেখানে?" প্রশ্নটা বেরিয়ে পড়ল মহেশ দাসের মুখ থেকে।

"হ্যাঁ, বললে, জয়া মা-র চিঠি পেয়েছে কাল। তাকে স্টেশনে তুলে দিয়েই তো আসছি।"

ঘাড়টি কাৎ করে আর একবার হলদে দাঁতগুলি বার করলেন ধীরেনবাবু, তারপর মরাল-গতিতে মোড়ের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। লাম্বেগো হওয়ার পর থেকে ধীরেনবাবুর মরাল-গতি হয়েছে।

ঘাড় কাৎ করে সাপ বিষ ঢালে, ধীরেনবাবুও বিষ ঢেলে গেলেন।

অবনী সেন জয়শ্রীর চিঠি পেয়েছে, কিন্তু সে কোনও খবরই জানে না। তার চিঠি পেয়ে অবনী মৃণালপুরে চলে গেল!

নিষ্ঠুর বিষটা মহেশ দাসের শিরা-উপশিরায় সঞ্চারিত হতে লাগল ক্রমশঃ। খানিকক্ষণ ভ্রূ কুঞ্চিত করে দাঁড়িয়ে থেকে চলে গেল সে অবশেষে কলেজের দিকে।

॥ দুই ॥

বিধবা মায়ের একমাত্র ছেলে মহেশ দাস। কিন্তু চমৎকার ছেলে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। মহেশের বাবা ছিলেন কলেজের কেরানী, অকালে হঠাৎ মারা গেছেন। মহেশ অধ্যাপক হয়েছে সেই কলেজে। মহেশের সুখ্যাতিতে সকলেই পঞ্চমুখ। যেমন বিদ্বান, তেমনি স্বভাব-চরিত্র, তেমনি স্বাস্থ্য। যদিও গরীব, কিন্তু বংশ বনিয়াদী। রায়বাহাদুর নির্মলশঙ্কর অপ্রত্যাশিতভাবে একদিন হাজির হলেন মহেশের মায়ের কাছে। অতি দূর-সম্পর্কের আত্মীয়তা ছিল কিছু। অত বড় একজন ধনীর আগমনে মহেশের মা একটু ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। রায়বাহাদুর যা বললেন, তা আরও বিস্ময়কর।

"একটি ভিক্ষা আছে আপনার কাছে।"

মহেশের মা মাথার কাপড়টা আর একটু টেনে নীরব হয়ে রইলেন।

"আপনার মহেশের সঙ্গে জয়ার বিয়ে দিতে চাই। যদি অনুমতি করেন, ব্যবস্থা করি। জয়া এবার আই-এ পাশ করল, এইবার বিয়ে দিতে হবে।"

রায়বাহাদুর নির্মলশঙ্কর তাঁর সুন্দরী শিক্ষিতা মেয়ের জন্য তাঁর দ্বারস্থ হবেন, এ মহেশের মায়ের কল্পনাতীত ছিল। প্রস্তাব শুনে তিনি খানিকক্ষণ নীরব হয়ে রইলেন, তারপর বললেন, "আপনার মেয়ের পাত্রের অভাব কি? আমরা গরীব—"

বাধা দিয়ে রায়বাহাদুর বললেন, "অমন ছেলের মা আপনি, আপনি গরীব হতে যাবেন কোন দুঃখে—"

মহেশের মা আবার চুপ করে রইলেন খানিকক্ষণ, তারপর বললেন, "আচ্ছা, ছেলেকে জিগ্যেস করে দেখি।"

মহেশও প্রথমটা রাজি হয় নি।

সে-ও বলেছিল, "মা, ওরা বড়লোক, আমরা গরীব।"

মহেশের মা হেসে উত্তর দিয়েছিলেন, "বড়লোক হওয়া তো অপরাধ নয়, বাবা। হলই বা বড়লোক। নির্মলবাবু লোক খুব ভালো। তা ছাড়া, অত বড় একটা মানী লোক নিজে বাড়িতে এসে অনুরোধ করলেন, মেয়েও শুনেছি খুব ভালো—"

মহেশ চুপ করে রইল। তখন চুপ করে রইল, কিন্তু রাজি হয়ে গেল শেষ পর্যন্ত। নির্মলশঙ্করবাবু নিজে আরও দুবার এলেন, লোক পাঠালেন কয়েকবার! দরিদ্র মহেশের ক্ষুধিত অহংকারটা তৃপ্ত হল বোধ হয়, কিংবা হয়তো আরও কিছু…। রাজি হয়ে গেল সে শেষ পর্যন্ত।

সকলেই আশা করেছিল, নির্মলশঙ্করের বন্ধু এবং প্রতিবেশী জমিদার প্রবীর সেনের একমাত্র ছেলে অবনী সেনের সঙ্গেই জয়শ্রীর বিয়ে হবে। অবনীর সঙ্গে জয়শ্রীর খুব মেশামেশি দেখেই লোকে এ কথা ভেবেছিল, কিন্তু ভুল ভেবেছিল।

তারা রায়বাহাদুর নির্মলশঙ্করকে চিনত না। তিনি জহুরী লোক। জমিদারের বিলাসী ছেলে অবনী সেনের তুলনায় বিদ্বান, শুভ্রচরিত মহেশ যে কত ভালো, তা বুঝতে তাঁর দেরি হয় নি।

…বিয়ের এই ইতিহাস।

মাত্র মাসছয়েক আগে বিয়ে হয়েছে।

॥ তিন ॥

সমস্তদিন নানাকাজে ব্যাপৃত হয়ে রইল মহেশ। তিনটে পর্যন্ত কলেজের ক্লাশ ছিল, তারপর ইচ্ছে করেই সে গিয়ে যোগ দিলে ছেলেদের ডিবেটিং ক্লাবে, সেদিন 'ডিবেট' ছিল একটা, ছেলেদের সঙ্গে টেনিসও খেললে সন্ধ্যা পর্যন্ত। তারপর বাড়ি ফিরে এল। বাড়ি ফিরে এসে পড়াশোনায় মগ্ন রাখবার চেষ্টা করলে নিজেকে, কিন্তু কিছুতেই মন বসল না। ধীরেনবাবুর কথাগুলো বার বার মনে পড়তে লাগল।

অবনী সেনের সঙ্গে জয়শ্রীর মাখামাখি সে-ও যে লক্ষ্য করে নি, তা নয়। কিন্তু গ্রাহ্য করে নি। সে ভেবেছিল, বড়লোকের মেয়ে বিশেষতঃ আজকালকার লেখাপড়া-জানা মেয়ে—তা ছাড়া, তার নিজেরও এ বিষয়ে যে খুব একটা আপত্তি ছিল, তা-ও নয়। মিশলেই বা, ক্ষতি কি তাতে। হারেমের দিন এখন আর নেই। কিন্তু তার প্রতি জয়শ্রীর ব্যবহারটা একটু আড়ষ্টগোছের হওয়াতে তার কেমন একটু খটকা লাগছিল। একদিনও সে প্রাণ খুলে কথা কয় নি তার সঙ্গে, ভালো করে হাসে নি। সে নাকি ভালো গান গাইতে পারে। কিন্তু একদিনও গান গায় নি তার কাছে। সম্মানিত অতিথির প্রতি লোকে যেমন মুখোশ-পরা ভদ্র ব্যবহার করে, জয়শ্রীও তার সঙ্গে তেমনি ব্যবহার করে চলেছে। সর্বদাই কেমন যেন আড়ষ্টভাব। শ্বশুরবাড়ির সম্পর্কে তার নিজের আচরণও তেমন স্বচ্ছন্দ নয়। সমস্ত ব্যাপারটাই কেমন যেন লেফাফাদুরস্ত কাণ্ড! মার্বেলপাথরের মেজে, দামী কার্পেট পাতা রয়েছে, পা দিতে সঙ্কোচ হয়। বহুমূল্য সোফা-সেটি। বসতে সাহস হয় না। সব ঝকঝক, তকতক করছে। যেদিকে দৃষ্টি ফেরাও, কেবল ঐশ্বর্যের চাকচিক্য। মহেশ একদিনও স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করতে পারে নি। বাড়ির ছেলে-মেয়ে, চাকর-চাকরানী, সোফার-সহিস সব ফিট-ফাট; মিনার্ভা কার, ওয়েলার ঘোড়া, মুলতানী গাই, অ্যালশেশিয়ান কুকুর—মহেশের কেমন যেন ভয়-ভয় করত সর্বদা। বিয়ের পর জামাই হিসেবে যখন সে গেল, তখন তাকে কেন্দ্র করে বিশেষ কোনো হৈ-হৈ উঠল না। নতুন কেনা একটা দামী আসবাবের মতোই সে যেন বড়লোকের প্রাসাদে ঢুকল। দামী আসবাবের প্রতি যতটুকু মনোযোগ দেখানো সঙ্গত, তার বেশী মনোযোগ যেন কেউ তার প্রতি দিলে না। সে-ও দাবি করতে পারলে না। যত্নের কোনও ত্রুটি হল না অবশ্য। কিন্তু আয়োজনের আধিক্যটাই যেন আঘাত করতে লাগল তাকে। তার মনে হতে লাগল, কারও অন্তরে সে যেন প্রবেশ করতে পারছে না। অনাবশ্যক ঐশ্বর্যের আড়ম্বর দেওয়ালের মতো আড়াল করে ফেলেছে সব কিছুকে।

…রাত্রে ঘুম এল না। কিছুতেই এল না। ক্রমাগত এপাশ-ওপাশ করতে লাগল

সে। অবনী সেন? কী এমন আছে লোকটার মধ্যে! চেহারা ভালো, ভালো বাঁশীও বাজাতে পারে। তাতে কী! জয়শ্রী অবনীকে খবর দিয়েছে মৃণালপুরে যাবার জন্যে, অথচ তাকে কিছু লেখেনি, এর মানে কী? সে যে সিমলা থেকে চলে এসেছে, এ খবরই তো জানে না সে! আশ্চর্য!

জয়শ্রীর চেহারাটা মনের উপর ফুটে উঠল। তার শেষ যে চেহারাটা সে দেখেছিল সেই চেহারাটা। অদ্ভুত রূপসী! ধবধবে ফরসা রঙ, টকটকে লাল একখানা শাড়ি পরেছিল। কুচকুচে কালো চোখে অদ্ভুত একটা শাণিতদৃষ্টি। লোভনীয়, ভয়ংকর লোভনীয়।

মহেশ দাস শুয়ে শুয়ে এ-পাশ ও-পাশ করতে লাগল। তারপর হঠাৎ ঠিক করলে—যাবে। বিনা নিমন্ত্রণেই যাবে। কাউকে কিছু না বলে, লুকিয়ে যাবে। হঠাৎ রাত্রিবেলা কোনও খবর না দিয়ে, হঠাৎ গিয়ে হাজির হবে। দেখতে হবে, অবনী সেনের সঙ্গে জয়শ্রীর প্রকৃত সম্পর্কটা কী। যেতেই হবে। ইতিপূর্বে সে মৃণালপুরে যায় নি কখনও। কিন্তু রায়বাহাদুর নির্মলশংকরের বাড়ি খুঁজে বার করতে বিশেষ বেগ পেতে হবে না। সে যাবে, যেতেই হবে।

॥ চার ॥

রায়বাহাদুর নির্মলশংকরের বিরাট বাড়ির সামনে মহেশ এসে যখন দাঁড়াল, তখন রাত্রি দ্বিপ্রহর। চতুর্দিক জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে। একটানা ডেকে চলেছে পাপিয়াটা – চোখ গেল—চোখ গেল—চোখ গেল। প্রকাণ্ড বাড়ি, প্রকাণ্ড হাতা। উঁচু দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। দেওয়ালের ধারে উৎকীর্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল মহেশ। বাঁশী বাজছে। বাঁশীর সঙ্গে সুর মিলিয়ে গানও গাইছে কে যেন। জয়শ্রী কি? মহেশের একবার ইচ্ছে হল, ডাকে। কিন্তু না- সে ডাকবে না। গেটের সামনে এগিয়ে এল আস্তে আস্তে। বিরাট লোহার গেট। নিষ্ঠুর নিষেধের মতো দাঁড়িয়ে আছে। আস্তে আস্তে ঠেলে দেখলো একটু। ভিতর থেকে বন্ধ। না, সে ডাকবে না। বাঁশী বেজে চলেছে। সমস্ত অন্তর যেন গলে পড়ছে গানের সুরে সুরে।·· মহেশ ভুলে গেল যে সে একজন অধ্যাপক, ভুলে গেল যে সে এ বাড়ির জামাই। সে ঠিক করলে যে সে গেট টপকে লোহার পাইপ বেয়ে ছাতে উঠবে লুকিয়ে। আসল ব্যাপারটা কি দেখতেই হবে তাকে। গেটের লোহার গরাদেতে পা রেখে সে উঠতে লাগল।

॥ পাঁচ ॥

সকালে চায়ের আসরে সবাই জমে বসেছে। রেডিওতে বেহালায় ভৈরবী আলাপ করছে কে যেন। হঠাৎ মালীটা এসে বললে, "হুজুর, বাগানে একটা লাস পড়ে আছে। কোনো চোর-টোর হবে বোধ হয়। রাত্রে গেট টপকে ঢুকেছিল, কুকুরে মেরে ফেলেছে—"

জয়শ্রীর দূর-সম্পর্কের একজন মামা বসে ছিলেন। তিনি বলে উঠলেন—"ইস, তাই নাকি? দু-দুটো অ্যালশেশিয়ান এমনভাবে খুলে রাখিস তোরা। কুকুর তো নয়, যেন বাঘ—"

অবনী সেন বললে—"পাহারা দেবার জন্যেই তো কুকুর। চলুন, দেখে আসা যাক। এখানকার দারোগা কে আজকাল? পুলিসে একটা খবর দিতে হবে—মহাফ্যাসাদে পড়া গেল দেখছি। চল জয়শ্রী, যাবে নাকি—"

"যাচ্ছি দাঁড়ান, ভৈরবীটা শেষ হোক—"

চম্পা

শ্রীমান কার্তিক শ্রীমতী চম্পার প্রেমে পড়িয়াছিল। চম্পা কিছুমাত্র আপত্তি করে নাই, বরং খুশীই হইয়াছিল। কারণ, কার্তিক ধনবান তো বটেই, রূপবানও। মিলনের পথে সাধারণতঃ যে সব সামাজিক, আর্থিক বা আধ্যাত্মিক বাধা থাকে, এক্ষেত্রে তাহা ছিল না। চম্পা রূপোপজীবিনী। সরকারের খাতায় নাম লিখাইয়া আইনসংগত উপায়ে সে ব্যবসা ফাঁদিয়াছিল। এ রকম ঘটনা বিরল নহে। কিন্তু ইহাদের কেন্দ্র করিয়া একদিন একটি বিস্ময়কর ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাই এ প্রসঙ্গের অবতারণা।

কার্তিকের প্রতিবেশী অমরবাবুর কলিকাতাস্থ বাসায় একদা প্রভাতে তাঁহার বাল্যবন্ধু যোগেনবাবু আসিয়া হাজির হইলেন। আসিয়া বলিলেন, "ভাই অমর, এসে তো পড়লুম, এবার তুমি সব ব্যবস্থা কর। তোমার পাঁচু স্যাকরাকে এখনই খবর দাও। আমাকে কালই সন্ধ্যের ট্রেনে ফিরতে হবে। একদিন ছুটি পেয়েছি। বিয়েরও তো দেরি নেই আর। মাঝে মাত্র পনেরোটি দিন।"

অমরবাবু দক্ষিণ হস্তটি উত্তোলন করিয়া বলিলেন, "সব হবে। ব্যস্ত হচ্ছ কেন? আগে হাতমুখ ধোও, কিছু খাও, জিরোও, তারপর সব ঠিক করে দেব। আগে গিন্নিকে খবরটা দিয়ে আসি।" অমরবাবু অন্দরের দিকে চলিয়া গেলেন। যোগেনবাবু কোটটি খুলিয়া জানালার ধারে যে পেরেকটি ছিল, তাহাতে ঝুলাইয়া দিলেন। তাহার পর গেঞ্জি খুলিতে লাগিলেন।

অমরবাবু ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "তুমি একেবারে ভিতরেই এস। বাথরুমটা খালি আছে এখন, স্নানটা সেরে নাও। স্নান করবে তো?"

"স্নান করবো বইকি।"

"তা হলে চলে এস।"

"আমি সন্ধ্যাহ্নিকও করব।"

"সব ব্যবস্থা আছে, চলে এস।"

উভয়ে ভিতরে চলিয়া গেলেন।

যোগেনবাবু অনেকক্ষণ ধরিয়া স্নান করিলেন। রাত্রে ট্রেনে একেবারে ঘুম হয় নাই। স্নানান্তে পূজা করিলেন। তিনি ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি, প্রতিদিন অনেকক্ষণ ধরিয়া

পূজা করেন। পূজার পর চা-জলখাবারের পালা। তাহাতেও খানিকটা সময় গেল। বাল্যবন্ধু যোগেনের জন্য অমরবাবু নানাবিধ আয়োজন করিয়াছিলেন। আহারাদির পর বিবাহের কথা উঠিল এবং কিছুক্ষণ পরে অনিবার্যভাবে আর্থিক প্রসঙ্গ লইয়া দুই বন্ধুতে আলোচনা করিতে লাগিলেন।

যোগেনবাবু বলিলেন, "ভাই, ভদ্রাসনটুকু বাঁধা দিয়ে হাজার তিনেক টাকা যোগাড় করেছি। ওইতেই কুলিয়ে নিতে হবে সব—"

"কুলিয়ে যাবে। তবে জিনিসপত্তরগুলো ভালো হবে না। নগদ দিতে হবে না কি কিছু?"

"নগদ দেড় হাজার চেয়েছেন। সেটা বউমার গয়না বিক্রি করে পাব।"

"বউমা তোমার কাছেই আছেন?"

"এখন আছেন। কিন্তু বিয়ের পর ভেবেছি বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দেব। আমার বাড়িতে দেখা-শোনা করবার কেউ নেই, দিনকালও ভালো নয়। গবুর মা যদি বেঁচে থাকত, তা হলে ভাবনা ছিল না—"

হঠাৎ একটা অস্বস্তিকর নীরবতা ঘনাইয়া উঠিল। বছরতিনেক আগে যোগেনবাবু তাঁহার একমাত্র পুত্র গোবর্ধনের বিবাহ দিয়াছিলেন। মাসছয়েক পরেই গোবর্ধন মারা যায়। তাহার মাসছয়েক পরেই গোবর্ধনের মা-ও। পুত্রশোক তিনি সহ্য করিতে পারেন নাই।

অমরবাবু জানালা দিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিলেন। যোগেনবাবু কোঁচার খুঁট দিয়া উদ্গত অশ্রু মুছিয়া ফেলিলেন।

"গবুর বিয়েতে তুমি তো নগদ পাঁচ হাজার টাকা নিয়েছিলে। সব টাকাটা খরচ করে ফেলেছ?"

"বাড়িটা দোতলা করলাম যে। গবুর জন্যেই দোতলা করাতে হয়েছিল। এখন সব শূন্য পড়ে আছে। যাক, ভাগ্যে বাড়িটা ছিল, তাই সেটা বাঁধা দিয়ে বিয়ের টাকাটা যোগাড় হল—"

"বাড়ি বাঁধা দিয়ে মোটে তিন হাজার টাকা পেলে?"

"তাই দিতে চায় না হে। গরজ যে আমার। এদিকে মেয়ের বয়স আঠারো পেরিয়ে গেছে, সুপাত্র যখন পেয়েছি, তখন আর দ্বিমত করলাম না। কিছুদিন পরে প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডটা পাব, তাই দিয়ে উদ্ধার করব বাড়িটা। আর কার জন্যেই বা বাড়ি, মেয়েটার বিয়ে হয়ে গেলে বাড়িতে কে থাকবে বল—"

"তা বটে—। পাত্রটি কি করে?"

"এবার বি. এ. পাশ করেছে। আগে বার দুই ফেল করেছিল। তবে বংশ ভালো। ঘরে খাওয়া-পরার সংস্থান আছে, দেশে বাড়ি আছে—"

"এই পাত্র নগদ পণ দেড় হাজার চাইছে?"

"আর, বল কেন ভাই। আমি আর দরদস্তুর করি নি, বুঝলে! মেয়ে পছন্দ হতেই ওরা যা বললে তাতেই রাজি হয়ে গেলাম। গত দু-বৎসর থেকে ক্রমাগত মেয়ে দেখাচ্ছি, কারও পছন্দই হয় না—ওর সামনের দাঁতগুলো উঁচু কি না—"

বলিয়াই যোগেনবাবু একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িলেন। তিনিও গবুর জন্য অনেক মেয়ে দেখিয়াছিলেন, অনেককে প্রত্যাখ্যানও করিয়াছিলেন। একটি মেয়েকে

তাঁহার খুব পছন্দ হইয়াছিল, কিন্তু তাহার বাবা নগদ পাঁচ হাজার টাকা দিতে স্বীকৃত হন নাই। আর একটি মেয়ে……

"পাঁচু স্যাকরাকে ডাকতে পাঠাই তা হলে। ডাকবার দরকার কী, নিজেরাই যাই চল। ট্রামে পাঁচ মিনিট লাগবে।"

দুইজনেই বৈঠকখানায় বাহির হইয়া আসিলেন।

"এ কী, আমার কোটটা কোথা গেল ? এইখানে টাঙিয়ে রেখেছিলাম যে—"

"কোনখানে—"

"এই পেরেকে—"

"তা হলে ঠিক কেউ জানালা দিয়ে নিয়ে গেছে। ওখানে কোট রাখতে গেলে কেন—"

"ওই কোটের পকেটেই যে তিন হাজার টাকা আছে আমার।"

"অ্যাঁ, বল কী !—"

যোগেনবাবু মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন।

ব্যাপারটা পাড়ায় চাউর হইয়া গেল।

অমরবাবু নিজের এবং পাশের বাড়ির চাকরদের ডাকিয়া জেরা করিতে লাগিলেন, পুলিশের ভয় দেখাইলেন। যদি খুঁজিয়া দিতে পারে, বকশিশ দিবেন, এ কথাও বলিলেন। কিন্তু ফল হইল না।

অবশেষে একটা চাকর বলিল, "কার্তিকবাবুকে বলুন, তাঁর হাতে অনেক গুণ্ডা আছে, তিনি যদি চেষ্টা করেন, হয়তো কোনও পাত্তা লাগাতে পারেন।"

কার্তিকের পিতা বিশ্বেশ্বরবাবুর সহিত অমরবাবুর হৃদ্যতা ছিল। কিন্তু তিনি মারা গিয়াছেন। কার্তিকও তাঁহাকে চেনে, খাতিরও করে, কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে যে সব কানাঘুষা বাজারে শোনা যাইতেছে তাহাতে তাহার নিকট যাইতে অমরবাবুর প্রবৃত্তি হয় না। বন্ধুর খাতিরে তবু গেলেন। সমস্ত শুনিয়া কার্তিক খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর বলিল, "আমি চেষ্টা করে দেখছি, যদি কিছু করতে পারি। যদি কিছু করা সম্ভব হয়, আমি ঘণ্টাদুয়েকের মধ্যেই আপনার কাছে যাব। আর যদি না যাই, তা হলে জানবেন, কিছু করতে পারি নি।"

অমরবাবু চলিয়া আসিলেন।

কার্তিকও মোটরটি বাহির করিল এবং মিনিটদশেকের মধ্যেই চম্পার বাড়িতে পৌঁছিয়া গেল।

চম্পা বিস্মিত হইল একটু। এ সময়ে কার্তিক সাধারণতঃ আসে না।

"আজ এমন অসময়ে যে ?"

"একটু দরকার আছে। একটা কথা শুনেছিলাম, কিন্তু সে কথা তোমাকে জিগ্যেস করতে ভুলেই গিয়েছিলাম। এবার গুণ্ডারা তোমাকে নাকি 'রানী' করেছে ?"

মুচকি হাসিয়া চম্পা বলিল, "হ্যাঁ, করেছে—। আমি ত্রিশ ভোটে জিতেছি। ফুলী আমার সঙ্গে কনটেস্ট করেছিল. পারে নি।"

"ভোট নিয়ে ঠিক হয় নাকি এ সব ?"

"নিশ্চয়।"

"রানীর ক্ষমতা কী ?"

"ঠিক রানীর মতোই ক্ষমতা। ওদের আমি যা করতে বলব তা ওরা তৎক্ষণাৎ নির্বিচারে করবে। কেন, দরকার আছে নাকি কিছু ?"

"আছে —"

কার্তিক সমস্ত ব্যাপারটা খুলিয়া বলিল।

"চোর, পকেটমার এদের উপরও তোমার কর্তৃত্ব আছে না কি ?"

"আছে বই কী। এ বছরকার মতো কলকাতার আণ্ডার-ওয়ার্লডের রানী আমি। বাংলা ভাষায় পাতালের রানী বলতে পার—"

"দেখ, যদি ভদ্রলোককে সাহায্য করতে পার। বড় বিপন্ন হয়েছেন। ধার করে মেয়ের বিয়ের বাজার করবার জন্যে যে টাকা এনেছিলেন তা সব ছিল ওই কোটের পকেটে—"

"দেখি—"

ইলেকট্রিক বেল টিপিতেই দৈত্যের মতো বিরাটকায় একটি লোক অভিবাদন করিয়া দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইল।

"দেখ, মুনিম, কৈলাস বসু স্ট্রীট থেকে একটি কোট চুরি হয়েছে কিছুক্ষণ আগে। কে সেখানে ডিউটিতে ছিল ?"

"সুখন।"

"তাকে ডাক।"

আধঘণ্টা পরে সুখন আসিয়া হাজির হইল। অতিশয় নিরীহ, ভদ্র চেহারা। কে বলিবে, লোকটা চোর।

"সুখন, আজ সকালে কৈলাস বসু স্ট্রীট থেকে কোট পেয়েছ কি একটা ?"

"হাঁ, মাইজি। জানালার ধারে ঝুলছিল, গলি থেকে হাত বাড়িয়ে টেনে নিয়েছি।"

"কোটটা ফেরৎ দিতে হবে।"

"সেটা তো গুদামে জমা হয়ে গেছে মা।"

"চম্পা কার্তিকের দিকে ফিরিয়া বলিল, "তুমি কোটটা চেন কি ?"

"না—"

"সেই ভদ্রলোককে নিয়ে এস এখানে, আমি কোটটা এখানে আনিয়ে রাখছি।"

প্রায় ঘণ্টাদুই পরে।

কার্তিক ও যোগেনবাবু চম্পার বাহিরের ঘরে বসিয়া আছেন। সুসজ্জিত ঘর। মেঝেতে দামী কার্পেট পাতা। চলিতে গেলে পা ডুবিয়া যায়। প্রত্যেকটি আসবাবই দামী। পরদা ঠেলিয়া চম্পা প্রবেশ করিল।

"এই কোটটা কি আপনার ?"

চম্পাকে দেখিয়া যোগেনবাবু একটু চমকাইয়া গেলেন। তাহার পর বলিলেন, "হ্যাঁ, এইটেই—"

"দেখুন, এতে যা যা ছিল তা ঠিক আছে কি না।"

যোগেনবাবু দেখিলেন, সবই ঠিক আছে। ইনার পকেটে নোটের তাড়াটা যেমন পিন করা ছিল, তেমনি রহিয়াছে। একটা পকেটে বিড়ি, দেশলাই ছিল, তাহাও আছে।

যোগেনবাবুর মনে হইল এ মেয়েটিকে কোথায় যেন দেখিয়াছি। তাহার পর হঠাৎ মনে পড়িল।

"তোমাকে কোথায় যেন দেখেছি এর আগে?"

"না, কোথাও দেখেন নি।"

"আচ্ছা, তোমার নামটি কি সাবিত্রী?"

"না, আমার নাম চম্পা।"

চম্পা আর দাঁড়াইল না, ভিতরে চলিয়া গেল।

যোগেনবাবুর কিন্তু ভুল হয় নাই। গবুর বিবাহের জন্য যখন তিনি একের পর এক পাত্রী দেখিতেছিলেন, তখন তাহাদের মধ্যে এ মেয়েটিকেও দেখিয়াছিলেন। মেয়েটির রূপ দেখিয়া এবং তাহার 'সাবিত্রী' নাম শুনিয়া ইহাকে তাঁহার পছন্দও হইয়াছিল। কিন্তু ইহার বাবা নিতান্ত গরীব ছিল, পাঁচ হাজার টাকা পণ শুনিয়া পিছাইয়া যায়।

যোগেনবাবু হতভম্ব হইয়া বসিয়া রহিলেন।

"চলুন, কোট তো পেয়ে গেলেন—"

আসিবার সময় আবার নরম কার্পেটে তাঁহার পা ডুবিয়া যাইতে লাগিল।

রঘুবীর রাউত

জমিদারি-প্রথা তখনও অবলুপ্ত হয় নি। মহামহিম মহিমার্ণব শ্রীল শ্রীযুক্ত রঘুবীর রাউতের দোর্দণ্ডপ্রতাপে তখনও বাঘে, গোরুতে একঘাটে জল খাচ্ছে। মহারানী ভিক্টোরিয়ার আমল তখন, ইংরেজের কড়া আইন দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কিন্তু রঘুবীর রাউত নিজের আইনে চলেন। সে আইনের সংগে ইংরেজের আইনের গরমিল হলেও চিন্তিত হন না তিনি। টাকার জোরে সব ঠিক হয়ে যায়। তা বলে তিনি অত্যাচারী ছিলেন না। বরং সুবিচার করবার জন্যেই তিনি প্রচলিত আইন অমান্য করতেন। তিনি ব্যাপারটার মর্মস্থলে একেবারে তীরের মত সোজা সবেগে পেঁছে যেতেন। একটা উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটা স্পষ্ট হবে।

এক ছোকরা দারোগা এসে তাঁর জমিদারিতে উৎপাত করতে লাগল একবার। লোকের খাসিটা-পাঁটাটা নিয়ে যায়, দাম দেয় না। ঘুস খেয়ে আসল অপরাধীকে ছেড়ে দেয়, নিরপরাধ গরিবকে নিয়ে টানাটানি করে। রাউত মশায়ের গুপ্তচর (লোকে গোপনে তাকে মাহুত বলত) মুলুক দাস এসে খবরটি রাউত মশায়ের কর্ণগোচর করল। রাউত মশায় ভ্রূকুঞ্চিত করে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর বললেন, "সাবধান করে দাও ওকে। পুলিসের লোক, হট করে ঘাঁটাতে চাই না; কিন্তু বেশি যদি বাড়াবাড়ি করে, শিক্ষা দিয়ে দেব।"

সপ্তাহ-খানেক পরে মুলুক দাস এসে বলল, "সাংঘাতিক লোক ব্যাটা। আমাদের হীরু গোয়ালার মেয়েটাকে নিয়ে টানাটানি করেছে রাত্রে। সবাই হৈ-হৈ করে উঠতেই বাইকে চড়ে পালাল। আড়ালে ডেকে বললাম আপনার কথা। জবাবে কী বললে জানেন, বললে, "আমি স্বয়ং কুইনের প্রতিনিধি, আর উনি একটা সামান্য জমিদার।

যদি ইচ্ছে করি, ছারপোকার মত পিষে মেরে ফেলতে পারি, ওঁকে মানা করে দেবেন, উনি যেন আমার ব্যাপারে হাত না দেন। আমি ওঁর প্রজাও নই, খাতকও নই।”

রাউত মশায় কিছু বললেন না। বাঁ হাতের আঙুলগুলি দিয়ে বাঁ দিকের গোঁফটায় তা দিতে লাগলেন খালি। বাঁ দিকের গোঁফটার উপর তাঁর কিঞ্চিৎ পক্ষপাতিত্ব ছিল।

সাতদিন পরে রাউত মশায় বৈঠকখানায় বসে আছেন, দেখতে পেলেন দারোগাটা তাঁর গেটের সামনে দিয়ে বাইকে করে যাচ্ছে।

“রাবণ মিশির—”

“জী হুজুর!”

বলিষ্ঠ সিপাহী রাবণ মিশ্র সেলাম করে দাঁড়াল।

“দারোগাসাহেব বাইকে করে যাচ্ছে, তাকে ডেকে নিয়ে এসো। যদি আসতে না চায়, ধরে নিয়ে এসো।”

“যো হুকুম।”

মিনিটদশেক পরে ক্রুদ্ধ দারোগাকে টানতে টানতে নিয়ে এল রাবণ মিশির।

“থামের সঙ্গে বেশ কস্‌কসিয়ে বাঁধো ওকে। আগে প্যাণ্ট, কোট, গেঞ্জি সব খুলে নাও, যদি চেঁচায়, মুখটাও বেঁধে ফেলো।”

রাবণ মিশির তাকে টানতে টানতে নির্জন পশ্চিম বারান্দায় নিয়ে গেল। একটু পরে এসে খবর দিল, দারোগাকে থামে বাঁধা হয়েছে। রাউত মশায় উঠে গিয়ে দেখলেন, উলঙ্গ, আবদ্ধ দারোগা নির্বাক হয়ে রয়েছে বটে, কিন্তু তার চোখ দুটো দিয়ে আগুনের হল্কা ফুটে বেরুচ্ছে।

রাউত বললেন, “আপনি মহারানীর প্রতিনিধি, আমি আমার প্রজাদের প্রতিনিধি। আপনি যে সব অন্যায় করেছেন তার শাস্তি দিচ্ছি। আজ আপনাকে চাবকে ছেড়ে দিচ্ছি। কিন্তু ফের যদি এ সব করেন, তা হলে বাঘ কিংবা কুমির দিয়ে আপনাকে খাওয়াব। ও দুটো জানোয়ারই আমি পুষি, আশা করি জানা আছে সেটা আপনার। এই, বেত লাগাও—”

রাবণ মিশির একটা হাণ্টার বের করে এনে চাবকাতে লাগল দারোগাকে। রঘুবীর রাউত একটা মোড়ায় বসে বাঁ দিকের গোঁফটি চোমরাতে লাগলেন। একটু পরে দারোগা অজ্ঞান হয়ে গেল। তখন রাউত মশায় হুকুম দিলেন, “ওকে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে হীরু গোয়ালার বাড়ির পিছনদিকের জঙ্গলে ফেলে দিয়ে আয়। তারপর এই টেলিগ্রামটা ডাকঘরে নিয়ে যা। আমি টেলিগ্রাম লিখছি, ওটাকে ফেলে দিয়ে আয় আগে।”

টেলিগ্রাম করলেন পুলিস সুপারিনটেণ্ডেণ্টকে। লিখলেন, “এখানকার দারোগা একটি গোয়ালার মেয়েকে বলাৎকার করছিল বলে গুরুতররূপে প্রহৃত হয়েছে। অবিলম্বে কিছু একটা ব্যবস্থা করুন।”

অনেক হাঙ্গামা, হুজ্জত হল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত চাকরি গেল দারোগাটার। রঘুবীর রাউত ডাইরেক্‌ট অ্যাকশনের পক্ষপাতী ছিলেন। যা করতেন, নিজেই করতেন। আবেদন-নিবেদন বা আইনের ঘোরপ্যাঁচের ভিতর যেতে চাইতেন না।

বলতেন, "আইন ? ও আইন অনুসারে চললে দোষীকে সাজা দেওয়া যায় কখনও ? হাতে-নাতে চোর ধরলেও মিথ্যে সাক্ষী তৈরি করতে হবে, তা না করলে চোর ছাড়া পেয়ে যাবে !" আদালতে তাঁর মামলা-মকদ্দমা হরদম লেগে থাকত। কিন্তু তিনি একবার ছাড়া কখনও ফরিয়াদী হন নি। বরাবর আসামী হয়েছেন। তিনি নিজের জমিদারিতে দণ্ডমুণ্ডের কর্তা ছিলেন, সুতরাং আইনভঙ্গের অপরাধে আসামী হতে হত তাঁকে।

যে-মকদ্দমায় তিনি ফরিয়াদী হয়েছিলেন, তারই গল্প এবার বলব।

॥ দুই ॥

রঘুবীররা দুই ভাই ছিলেন, রঘুবীর আর সুমিত্রানন্দন। সুমিত্রানন্দন এবং তাঁর পত্নী বহুকাল আগেই মারা গেছেন। তাঁদের একমাত্র সন্তান অযোধ্যাপ্রসাদ রঘুবীরের কাছে মানুষ হচ্ছিল। রঘুবীর অপুত্রক এবং বিপত্নীক। সুতরাং অযোধ্যাপ্রসাদ রাউতই বিশাল জমিদারির একমাত্র উত্তরাধিকারী। রঘুবীর অযোধ্যাপ্রসাদকে লেখাপড়া শেখান নি বিশেষ। স্কুল-কলেজের শিক্ষার উপর তেমন আস্থা ছিল না তাঁর। তিনি তাকে মোটামুটি বাংলা, ইংরেজী এবং অঙ্ক শিখিয়েছিলেন। পালোয়ান রেখে কুস্তি করতে শিখিয়েছিলেন। গান-বাজনা শেখাবার জন্যে ওস্তাদ রেখেছিলেন একজন। অযোধ্যাপ্রসাদ যখন সাবালক হল, তখন তাকে আলাদা বাড়িও করিয়ে দিলেন একটি। জমিদারির একটা মহালের ভারও দিয়ে দিলেন যাতে সে স্বাধীনভাবে থেকে জমিদারি পরিচালনা করবার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পারে। প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে পুত্রং মিত্রবদাচরেৎ – চাণক্যের এই উপদেশ রঘুবীর মানতেন। প্রাপ্তবয়স্ক অযোধ্যাপ্রসাদের কোনও কাজে বাধা দিলেন না তিনি।

ফল নিম্নলিখিতপ্রকার হল।

যে পালোয়ানেরা তাকে কুস্তি শেখাতে এসেছিল তারা অযোধ্যাপ্রসাদকে পরামর্শ দিলে যে, পুষ্টিকর খাবার প্রচুর পরিমাণে না খেলে কুস্তিতে সাফল্য অর্জন করা সম্ভব নয়। বাতাম, পেস্তা, কিসমিস, আখরোট, খুবানি, খোয়া প্রচুর পরিমাণে খেতে হবে। এর সঙ্গে মাছ, মাংস, ডিম থাকলে আরও ভাল হয়। গামা, গোবর, কিক্কর প্রভৃতি বড় বড় ব্যায়ামবীরদের খাদ্য-তালিকা আউড়ে তারা অযোধ্যাপ্রসাদকে পরিষ্কার বুঝিয়ে দিলে যে, কুস্তি করতে হলে ভাল খাওয়া চাই।

অযোধ্যাপ্রসাদের অর্থাভাব ছিল না। বাদাম, পেস্তা প্রভৃতি প্রচুর আনিয়ে ফেললে। মুশকিল হল মাছ-মাংস নিয়ে। পাঁড়াগাঁয়ে প্রত্যহ ভালো মাছ-মাংস পাওয়া যায় না। অযোধ্যাপ্রসাদ প্রত্যহ কালীপুজোর ব্যবস্থা করে ফেললে। রোজ পাঁঠাকাটা হতে লাগল। তার মহালে বড় দিঘি ছিল একটা। সেখানে সে আর তার পালোয়ানরা রোজ ছিপ ফেলে বসতে শুরু করল। জেলেরা জাল নিয়ে নিয়ে ঘুরতে লাগল। অন্ততঃ সেরপাঁচেক মাছ রোজ চাই। কারণ, সে একা তো নয়, গোটাপাঁচেক পালোয়ান আছে। মাছও জুটতে লাগল। পয়সা খরচ করলে সবই হয়।

গান-বাজনার ওস্তাদ নূর মহম্মদও একটি পরামর্শ দিলেন তাকে। বললেন,

সেতার যখন বাজে, তখন একটি অদৃশ্য নর্তকী সেতারের ছন্দে ছন্দে নৃত্য করে। তার নূপুরের নিক্কণ হুজুর নিশ্চয়ই শুনেছেন। তার সঙ্গে সঙ্গে বাইরে সতরঞ্চের উপর যদি আর একটি নর্তকী নাচে, তা হলেই জুড়ি ঠিক মেলে আর তা হলেই সেতারের মজাটা পুরো পাওয়া যায়। নূর মহম্মদ অযোধ্যাপ্রসাদের বাড়ির পাশেই একটি আলাদা বাড়িতে থাকতেন। বললেন, লখ্নৌ থেকে তার বিবির এক বোন এসেছে। সাবিত্রী দেবী নাম নিয়ে সে সিনেমায় নামতে চায়। কিন্তু হুজুর যদি মত দেন—।

বাঁ দিকের গোঁফ চোমরাতে চোমরাতে মুলুক দাসের কাছে খবর শুনছিলেন রাউত মশায়।

মুলুক দাস বলছিল, "বেলা নটা-দশটার সময় ওঠে অযোধ্যা আজকাল। উঠে মুখ ধোয় ঘণ্টাখানেক পরে। তারপর চা খায়, তারপর বাদাম, পেস্তার হালুয়া। যা চেহারা হয়েছে, চিনতে পারবেন না আপনি। এই টেবো-টেবো গাল, থলথলে ভুঁড়ি, গর্দানের উপর চাপ-চাপ চর্বি। প্রকাণ্ড একটা গড়গড়া কিনেছে দেখলাম, ঘণ্টাখানেক ধরে তামাকই খায়। তারপর তেল মাখতে বসে। ওই পালোয়ানগুলো তেল মাখায় ওকে। বলে না কি, মাসাজ করলে শরীরের উপকার হবে। প্রথমে সর্ষের তেল, পরে অলিভ অয়েল, তারপর মাথায় ফুলেল তেল। খেতে বসে দুটো আড়াইটের সময়। মাছ, মাংস, রাবড়ি রোজ খায়। নানারকম তরিতরকারি খাবার জন্যে বাড়ির পিছনে বিঘে দুই জমিতে শাকসবজি লাগিয়েছে। হাঁস পুষেছে। রোজ ডিম খায়। খেয়ে-দেয়ে শোয় একটু। তারপর বিকেলে গিয়ে দিঘিতে মাছ ধরতে বসে। পালোয়ানগুলোও বসে। সন্ধ্যের পর থেকে আরম্ভ হয় গানের মজলিস। সাবিত্রী দেবী নাচেন। রাত একটা দেড়টা পর্যন্ত গান-বাজনা চলে। আজকাল মদও চলছে শুনছি।"

"চুপ কর, বুঝেছি।"

থেমে গেল মুলুক দাস। তারপর আড়চোখে তাঁর দিকে একবার চেয়ে উঠে গেল। রাউত মশায় আরও খানিকক্ষণ গোঁফ চোমরালেন, তারপর তিনিও উঠে গেলেন।

॥ তিন ॥

এর পরই শুরু হল মকদ্দমা।

রঘুবীর রাউত এক জাল দলিল বার করে দাবি করলেন যে, মৃত্যুর পূর্বে সুমিত্রানন্দন তাঁর অংশের সম্পত্তি তাঁকে (অর্থাৎ রঘুবীরকে) বিক্রি করে গিয়েছিলেন। জমিদারিতে আইনতঃ অযোধ্যাপ্রসাদের কিছুমাত্র অধিকার নেই। কিন্তু সে জোর করে একটা মহাল দখল করে বসে আছে এবং অপব্যয় করে সম্পত্তি নষ্ট করছে। আদালত থেকে তাঁকে তাঁর ন্যায্য অধিকার সাব্যস্ত করবার অনুমতি দেওয়া হক।

দ্বিতীয় মকদ্দমা করল নর্তকী সাবিত্রী দেবী। তাকে টাকা দিয়ে হাত করলেন রাউত মশাই এবং তাকে দিয়েই এক মকদ্দমা রুজু করা গেল। সাবিত্রী দেবী আদালতে হলফ করে বলে এল যে, অযোধ্যাপ্রসাদ তার উপর বলাৎকার করবার চেষ্টা করেছিল। ডাক্তার, উকিল এবং আরও জনকয়েক প্রত্যক্ষদর্শী সমর্থন করলেন সাবিত্রী দেবীকে।

তৃতীয় মকদ্দমা করলে কয়েকটি প্রজা। তাদের নালিশ অযোধ্যাপ্রসাদ নাকি জোর করে তাদের কাছে খাজনা আদায় করেছে। মারধোরও করেছে।

চতুর্থ মকদ্দমা করলে পিয়ারিলাল ঢনঢনিয়া। অযোধ্যাপ্রসাদ নাকি তাঁর মানহানি করেছে। এইভাবে নানা ছুতোয় দশটা মকদ্দমা লাগিয়ে দিলেন রাউত মশাই অযোধ্যাপ্রসাদের বিরুদ্ধে।

ঘুমন্ত লোকের মাথায় যদি বাড়ির ছাত ভেঙে পড়ে, তা হলে তার যা অবস্থা হয়, অযোধ্যাপ্রসাদের তাই হল।

সে প্রথমটা ভাবলে যে, জ্যেঠামশাইয়ের মাথা খারাপ হয়ে গেছে। কিন্তু এ-ভুল ভাঙতে দেরি হল না। মুলুক দাসই এ-ভুল ভাঙিয়ে দিলে। সে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাইলে, রঘুবীর বলে পাঠালেন, তিনি তার মুখদর্শন করতে অনিচ্ছুক।

অযোধ্যাপ্রসাদের শ্বশুর শাঁসালো ব্যক্তি ছিলেন। অবশেষে তাঁরই শরণাপন্ন হতে হল তাকে। সে মকদ্দমা লড়তে লাগল।

বছর দুই কেটে গেছে।

কয়েকটা মকদ্দমা জিতেছে অযোধ্যাপ্রসাদ। কিন্তু আসল মকদ্দমাটা অর্থাৎ বিষয়ের মালিকানা-স্বত্ব নিয়ে যে মকদ্দমাটা হচ্ছিল, সেটা শেষ হয় নি। লোয়ার কোর্টে হেরে গেছে অযোধ্যাপ্রসাদ। হাইকোর্টে আপিল করেছে।

মুলুক দাস রঘুবীর রাউতকে একটি খবর দিলে।

"অযোধ্যাপ্রসাদ দেখলাম খুব রোগা হয়ে গেছে। দেহের চর্বি বিলকুল ঝরে গেছে। মুখ শুকনো, চুল উসকো-খুসকো—"

রাউত গোঁফ চোমরাতে লাগলেন, কিছু বললেন না।

হাইকোর্টে রাউত হারলেন। কিন্তু তিনি ছাড়বার লোক নন, বিলেতে আপিল করলেন আবার। বিলেতের আপিলে জিতে গেলেন তিনি।

তারপর ডেকে পাঠালেন তিনি অযোধ্যাপ্রসাদকে। অযোধ্যাপ্রসাদ নতমস্তকে এসে দাঁড়াল।

"এই নাও—"

একটা খাম এগিয়ে দিলেন তার দিকে।

"কী এটা ?"

"ডীড অব গিফট। আমার সমস্ত সম্পত্তি তোমায় দান করলাম।"

অযোধ্যাপ্রসাদ বিস্মিত হয়ে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ। একটু ইতস্ততঃ করে মাথা চুলকে তারপর বলল, "তা হলে মকদ্দমা করবার দরকার কী ছিল ?"

তোমার বড্ড চর্বি হয়েছিল, সেটা একটু ঝরিয়ে দিলাম। বিষয়সম্পত্তি কী করে রক্ষা করতে হয় তারও একটু ট্রেনিং হয়ে গেল তোমার। বিপদে না পড়লে তো শিক্ষা হয় না। তুমি যে-রাস্তায় চলেছিলে তাতে আমাদের পিতৃপুরুষের বিষয়সম্পত্তি ডুবে যেত। আমি কাল কাশী যাব, আর ফিরব না। কাল থেকে তোমাকেই স্টেটের ভার নিতে হবে। যাও—"

অযোধ্যাপ্রসাদ প্রণাম করে চলে গেল।

কলার বিবর্তন

তখন সাহেবেরা এদেশে সভ্যতাবিস্তার করিয়াছেন। সাধারণ লোক সাহেবদেরই দেবতা বলিয়া মনে করিতেছে। যাহা কিছু ভালো, তাহাই বিলাতী বিশেষণে ভূষিত হইতেছে। বিলাতী সভ্যতাই যে আমাদের দেশকে ত্রাণ করিবে, এ বিশ্বাস শিক্ষিত সমাজেরও মনে শিকড় গাড়িয়াছে, অশিক্ষিত চাষাদের তো কথাই নাই। রেলগাড়ি দেখিয়াই তাহারা বুঝিয়াছে যে, বিলাতী দেবতারা অসাধ্যসাধন করিবে।

হারাধন সুদূর পল্লীগ্রামে থাকিত। রেলগাড়ি চড়িবার জন্যই সে একদিন গ্রাম হইতে পদব্রজে বাহির হইয়া পড়িল। বলা বাহুল্য, সঙ্গে কিছু পয়সা-কড়িও লইল। সে জানিত, বিনা পয়সায় কিছু হয় না। এ গোরুর গাড়ি নয় যে, গাড়োয়ানকে অনুরোধ করিলে, কিছুদূর চড়াইয়া লইয়া যাইবে। বিলাতী কলের গাড়ি, টিকিট কাটিয়া চড়িতে হয়। তা ছাড়া শহরে যাইতেছে, কিছু ভালো বিলাতী জিনিস পাইলে কিনিয়া আনিবে। সুতরাং কিছু টাকা-পয়সাও সে সঙ্গে লইল।

অনেক দূর হাঁটিয়া বর্ধমান স্টেশনে সে আসিয়া প্রথম ট্রেনে চাপিল। দেখিতে দেখিতে কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিয়া গেল। অবাক কাণ্ড, মাত্র কয়েকঘণ্টায় কলিকাতা। গোরুর গাড়িতে আসিলে কয়দিন লাগিত ঠিক কি!

কলিকাতার জনারণ্যে কিছুক্ষণ দিশাহারা হইয়া ঘুরিবার পর তাহার হুঁস হইল যে, পথ হারাইয়া গিয়াছে। বাড়ি ফেরা যাইবে না। ব্যাকুল হইয়া আরও কিছুক্ষণ ঘুরিল, কিন্তু তাহাতেও সুবিধা হইল না। অবশেষে হাপুসনয়নে কাঁদিতে লাগিল বেচারা।

"কি রে কাঁদছিস কেন, কে তুই—"

"আমি হারাধন। পথ হারিয়ে ফেলেছি—"

"কোথা যাবি—"

"হাওড়া।"

"চল, আমিও হাওড়া যাব। গাছ কটা বেচে ফেলি। আয় আমার সঙ্গে।"

একটি গলির ভিতর দিয়া হারাধন একটা তরকারির বাজারে আসিয়া হাজির হইল। যে লোকটি তাহাকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিল, সত্যই তাহার কয়েকটি গাছ ছিল একটা ঝুড়িতে। হারাধন যদিও চাষা, তবু ওগুলো কি গাছ, তাহা চিনিতে পারিল না।

জিজ্ঞাসা করিল, "কলাগাছের মতো পাতা, ওগুলো কি গাছ?"

হারাধন যে কি জাতীয় খাজা, তাহা কলিকাতাবাসী শ্যামচাঁদের বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই। সে মুচকি হাসিয়া উত্তর দিল, "কলাগাছই। বিলিতি কলা—"

"বিলিতি কলা! আমিই তা হলে কিনে নিই। কত দাম—"

"পাঁচটি আছে, পাঁচ টাকা পড়বে—"

"কিছু কম হবে না?"

হারাধন গোটাদশেক টাকা লইয়া বাড়ি হইতে বাহির হইয়াছিল। ওই টাকা কয়টা জমাইতে তাহার এক বৎসর লাগিয়াছিল। তখন পাঁচটা টাকায় একটা ছোট-খাটো গোরু পাওয়া যাইত। পাঁচটা কলার চারা পাঁচ টাকা দিয়া কিনিবে কি না হারাধন একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিল।

"নিবি তো, নিয়ে নে। আমিও ঝাড়া-হাত-পা হয়ে যাই, তোকে হাওড়ায় পেঁছে দি। এ রকম জিনিস সহজে কোথাও পাবি না। আদত বিলিতি কলা—"

হারাধন চারাগুলি কিনিয়া ফেলিল।

"খুব ভালো গোবরের সার দিতে হবে।"

"তা আমি খুব পারব।"

বাড়ি ফিরিয়া খুব যত্ন করিয়াই সে বিলাতী কলার চারাগুলি পুঁতিল।

॥ দুই ॥

মাস ছয় কাটিয়াছে। গাছগুলি বড় হইয়াছে। কিন্তু কলা একটিও হয় নাই। মোচার মতো হয়, কিন্তু তাহা হইতে কলার কাঁদি বাহির হয় না, ফুল হইয়া যায়। কোনোটা লাল ফুল, কোনোটা হলদে। হারাধন আবার ভাল করিয়া গোবর দিল, কিন্তু কোনো ফল হইল না। ক্রমাগত ফুল হইতে লাগিল। কলা কই ?

চটিয়া-মটিয়া আবার একদিন সে কলিকাতার উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া পড়িল। এবার আর তাহার রাস্তা ভুল হইল না। সোজা সে সেই তরকারির বাজারে হাজির হইল আবার। সন্দেহ ছিল, শ্যামচাঁদের দেখা পাইবে কি না। কিন্তু ভাগ্যক্রমে শ্যামচাঁদ ছিল। অন্য ফুলের চারা বেচিতেছিল সে।

"এই যে ! আচ্ছা, সেবার তুমি যে আমাকে পাঁচ টাকায় পাঁচটা বিলিতি কলার গাছ বেচলে, কিন্তু এক কাঁদি কলাও তো নামল না !"

শ্যামচাঁদ খানিকক্ষণ ভুরু কুঁচকাইয়া রহিল, তাহার পর মনে পড়িল তাহার।

"কিছুই হয় নি ?"

"খালি ফুল হচ্ছে। নানা রঙের ফুল—"

"তাই তো হবে। বিলিতি কলা যে—"

"কি রকম—"

"ওতে খাবার কলা হয় না। দেখবার কলা হয়।"

"কিন্তু, দিব্যি করে বলছি, একটি কলাও দেখি নি।"

"কিন্তু, এখনি নিজের মুখে বললে, ফুল হচ্ছে।"

"তা হচ্ছে তো—"

"ওই ফুলই কলা। সাহেবরা বলে আর্ট, বাংলায় ওকেও কলা বলে।"

"কি রকম ?"

"ওই রকম। যাও, মেলা বক্‌বক্‌ করে আমার সময় নষ্ট কোরো না। বিলিতি কলাগাছে মর্তমান কলা ফলবে কি করে ? কি আপদ।"

হারাধন খানিকক্ষণ হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর বাড়ি ফিরিয়া আসিল। বহুকাল পরে সাহেব-বাড়ির এক মালী তাহাকে আর একটু জ্ঞানদান করিয়াছিল। বলিয়াছিল, "ওর বিলিতি নাম ক্যানা—"

॥ তিন ॥

বিখ্যাত পুষ্পবিক্রেতা নগেন্দ্রনাথ এণ্ড কোং-এর নাম আপনারা নিশ্চয় শুনিয়াছেন। ক্যানা ফুল বিক্রয় করিয়াই তিনি মাসে হাজার টাকা রোজগার করেন। তাঁহার ক্যানা না কি ভারতবর্ষের বাহিরেও যায়। হারাধন ছিলেন নগেন্দ্রনাথের পূর্বপুরুষ। নগেন্দ্রনাথ আর একটি জিনিসও করিয়াছেন। একরকম এসেন্স বাহির করিয়াছেন, যাহার গন্ধ ঠিক কলার মতো। জিনিসটা ঘোলের শরবতে খুব চলে।

॥ চার ॥

নগেন্দ্রনাথের পুত্র স্মরজিৎ নূতন পথ ধরিয়াছে।
সে একজন অতি আধুনিক কবি। বাজারে বেশ নাম হইয়াছে।

শ্রীনাথ সেনের 'তুমি'

শ্রীনাথ সেন কবি ছিলেন বললেই যথেষ্ট বলা হয় না, তিনি একজন উঁচুদরের কবি ছিলেন। কিন্তু তাঁর কথা কেউ জানে না, জানবেও না, কারণ তিনি তাঁর একটি লেখাও ছাপান নি। তাঁর কয়েকটি অন্তরঙ্গ বন্ধু ছাড়া তাঁর পরিচয়ও কেউ জানে না। তিনি নির্জন বনে ফুটে নির্জনেই ঝরে গেলেন। নির্জন বনেও দু চারটি পুষ্পরসিক অলি আসে, সেইভাবেই তাঁরও দুচারজন সমঝদার বন্ধু জুটেছিল। যাঁরা ইংরেজি ভাষা জানেন না, তাঁদের পক্ষে তাঁর কবিতার রস-গ্রহণ করা সম্ভব হবে না। কারণ, অধিকাংশ কবিতাই তিনি লিখেছিলেন ইংরেজীতে। সংস্কৃতেও দু চারটে লিখেছিলেন, কিন্তু তার সংখ্যা খুব অল্প।

তাঁর ইংরেজি কবিতার দু চারটে অনুবাদ নীচে দিচ্ছি, মূলের সঙ্গে অবশ্য অনুবাদের আকাশ-পাতাল তফাৎ, তবু দিচ্ছি, কারণ তা হলে লোকটাকে বোঝা সহজ হবে। একটা কবিতায় লিখেছেন—"তুমি এসেছ, কারণ তোমাকে আসতে হয়েছে। আমার শাখা শোভিত হয়েছে তোমার আগমনে, স্বীকার করছি, কিন্তু এ-ও আমি বলব, তুমি এসেছ, কারণ তোমাকে আসতে হয়েছে। রাত্রির পর দিন যেমন আসে, অমাবস্যার পর দেখা দেয় যেমন শিশুচাঁদ পূর্ণিমার সম্ভাবনা নিয়ে, তেমনি তুমি এসেছ। তোমাকে আসতে হয়েছে। আমার জীবনে তোমার আগমন অবশ্যম্ভাবী ছিল, তাই এসেছ। তোমাকে অভ্যর্থনা করি তবু"। আর একটা কবিতায় বলছেন—"আমি তোমাকে বাজাই নি, তুমি নিজেই বেজেছ। আমার স্থূল অঙ্গুলিস্পর্শে ও-সুর বাজত না। আমার স্থূল অঙ্গুলি তবু বার বার তোমাকে বাজাতে চেষ্টা করেছে, বাধা দিয়েছে তোমার স্বতোৎসারিত সুর-লীলায়, কিন্তু তা সত্ত্বেও তুমি প্রতিষ্ঠিত করেছ নিজের মহিমা। তোমার স্বর্গীয় সুরসাধনা উপভোগ করেছে অসংখ্য নক্ষত্র নিশীথসভায় বসে, আমিও করেছি। কিন্তু, আমি দিনেও তোমার গান শুনেছি।

ভিড়েও শুনেছি, একাও শুনেছি। তাই বার বার অনুভব করেছি, আমি তোমাকে বাজাই নি, তুমি নিজেই বেজেছ…"

আর একটি কবিতায় বলেছেন, "রক্তের সমুদ্র থেকে প্রতি প্রভাতে তোমার জন্ম হয়; উর্বশীর মতো নয়, মৃত্যুর মতো। জীবনের ছদ্ম-বেশে আলোকের ছলনায় সমস্ত দিন ভোলাও তুমি আমাকে, আমিও ভুলি, কারণ আমি ভুলতে চাই। তারপর সন্ধ্যার অন্ধকার যখন ঘনিয়ে আসে, আবার রক্তের সমুদ্র থইথই করে পশ্চিম দিগন্তে, আকাশের নীলের সঙ্গে, রাত্রির কালোর সঙ্গে মেশে রক্ত-সমুদ্রের তরঙ্গ-নর্তন। তাতে ঝাঁপ দাও তুমি। তোমার মেখলার মুক্তারা ছড়িয়ে পড়ে নক্ষত্রের মতো…"

চতুর্থ যে কবিতাটির অনুবাদ দিচ্ছি, সেটি আমিও ভালো বুঝি নি। কিন্তু আমার মনে হয়, এরই মধ্যে তাঁর মৃত্যু-রহস্যটা লুকিয়ে আছে।

"অন্ত সরে সরে যাচ্ছে আদির কাছ থেকে। কে যেন তাকে সরিয়ে দিচ্ছে জোর করে, হয়তো সময়ের স্রোত-বেগে অসহায়ের মতো ভেসে চলেছে। কিন্তু চিরকাল যাবে না, স্রোতের বিরুদ্ধে শুরু হবে তার অভিযান। আদির কাছে ফিরে আসবে অন্ত, রক্তাক্ত কলেবরে, স্রোতের বিরুদ্ধে, সময়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে করতে। তখন অন্ত হবে অনন্ত, আদি হবে অনাদি। প্রলয়ের কালরাত্রে অন্তিম আলিঙ্গনে আবদ্ধ হবে তারা। তুমি তখন হাসবে…"

এই তুমির উল্লেখ তাঁর প্রতিটি কবিতায় আছে। রবীন্দ্রনাথের 'মানসী'র মতো ইনি কল্প-লোক-বাসিনী না। ইনি যে সশরীরে মর্ত্যে ছিলেন, তার প্রমাণ অন্ততঃ একবার পাওয়া গিয়েছিল। একদিন আবির্ভূত হয়েছিলেন তিনি। কিন্তু সে কথা বলবার আগে শ্রীনাথ সেনের পারিবারিক পটভূমিকাটি আঁকা প্রয়োজন।

॥ দুই ॥

শ্রীনাথ সেন ছিলেন জমিদারের একমাত্র ছেলে। জমিদার হরিনাথ সেনের পরিচয় তাঁর জমিদারির লোকেরা সকলেই জানত। তাঁর সম্বন্ধে এই কথাটি বললেই যথেষ্ট হবে যে, তাঁর বাড়িতে প্রতিদিন চার-পাঁচ শো লোকের পাতা পড়ত। গরীব-দুঃখী, আত্মীয় স্বজন, চাকর-বাকর, চাকরদেরও আত্মীয়, গরীব প্রতিবেশী সবাই খেত সেখানে। তা ছাড়া অতিথিশালা তো ছিলই। তাঁর বাড়ির হাতাতেই পাঠশালা ছিল একটা, বিনা বেতনে বহু ছাত্র সেখানে পড়ত। এই সবই হরিনাথ সেনের বিলাস ছিল। মদে বা মেয়েমানুষে একটি পয়সা নষ্ট করেন নি তিনি। আশ্চর্যের বিষয়, এইজন্য তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে নাকি তাঁর বিরোধ বেধেছিল। তাঁর স্ত্রী সর্বাঙ্গসুন্দরীর বাপের বাড়ির চাল-চলন ছিল অন্যরকম। বাল্যকাল থেকেই মাইফেল দেখে অভ্যস্ত তিনি, ওস্তাদ-বাইজীর আড্ডা ছিল সে বাড়িতে। ঘরকুণো সাধু স্বামী পছন্দ হয় নি তাঁর। তিনি অধিকাংশ সময়েই বাপের বাড়িতে থাকতেন। শ্রীনাথ সেনের জন্ম মামার বাড়িতেই হয়েছিল, বাল্যকালটাও কেটেছিল সেখানে। সম্ভবতঃ মায়ের জেদেই তাঁকে বিলেত পাঠানো হয়েছিল। সেকালে বড়লোকদের ওই এক কায়দা ছিল। শ্রীঅরবিন্দ, জওহরলাল, রবীন্দ্রনাথ সকলেই বিলেতে লেখাপড়া শিখতে গিয়েছিলেন। শ্রীনাথ

সেনও গিয়েছিলেন। তিনি বিখ্যাত হন নি, কারণ তিনি বিখ্যাত হতে চান নি। চাইলে, হতেন। তিনি যখন বিষয়ের উত্তরাধিকারী হলেন, তখন এক অদ্ভুত কাণ্ড করলেন তিনি। সমস্ত জমিদারিটি বিক্রি করে দিয়ে কোলকাতায় এসে ভাড়া-বাড়িতে বাস করতে লাগলেন। জমিদারি-প্রথার যে উচ্ছেদ হবে এ তিনি অনেক আগেই বুঝতে পেরেছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে সর্বাঙ্গসুন্দরীর মৃত্যু স্বামীর আগেই হয়েছিল।

শ্রীনাথ সেন তাঁর স্ত্রী ললিতা ও একমাত্র পুত্র আদিনাথকে নিয়ে আহিরিটোলায় ছোট একটি বাড়িতে থাকতেন। সেইসময়ে তাঁর সঙ্গে আমাদের আলাপ হয়, যদিও তিনি মিশুক প্রকৃতির লোক ছিলেন না। একটা ঘরে একা একা চুপচাপ থাকতে ভালবাসতেন। পরে জেনেছি, সেখানে বসে কবিতা লিখতেন। দিনরাত ঘরে খিল দিয়ে বসে থাকতেন, অনেক সময় বোঝাও যেত না যে, তিনি বাড়িতে আছেন কি নেই। তাঁর স্ত্রীও বুঝতে পারতেন না। তিনি যে ঘরে থাকতেন, সে ঘরে আর একটি দরজা ছিল বাইরের দিকে। সেই দরজা দিয়ে আমরা মাঝে মাঝে যেতাম তাঁর কাছে। তিনিও মাঝে মাঝে ওই দরজা দিয়েই বেরিয়ে যেতেন। কোথায় যেতেন কেউ জানে না।

আমাদের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল তাঁর খাসবেয়ারা হরলালের মাধ্যমে। হরলালকে তিনি ফরমাশ করেছিলেন একজন ভাল লিখিয়ে যোগাড় করবার জন্যে। তাঁর ফরমাশ—হাতের লেখা শুধু মুক্তোর মতো হলেই হবে না, তা শিল্প হওয়া চাই। অর্থাৎ তিনি একজন উঁচুদরের ক্যালিওগ্রাফার খুঁজছিলেন। আমার জানা-শোনা একটি লোক ছিল—সুরেন পাল। তাকে নিয়ে গেলাম একদিন। তিনি বললেন, আমার এই কবিতাগুলি খুব দামী কাগজে ভালো করে লিখতে হবে। সুরেন পালের কাজ দেখে পছন্দ হল তাঁর। কবিতা পিছু একশ টাকা করে দিতেন। আট-দশ লাইনের একটি কবিতা লিখতে প্রায় মাসখানেক লাগত। কী রঙে লেখা হবে তাই ঠিক করতেই কেটে যেত কয়েকদিন। নানারকম রং এনে নিজেই মিশিয়ে মিশিয়ে দেখতেন, তারপর সুরেনকে বলে দিতেন সেটা। এইসূত্রেই তাঁর কবিতা পড়বার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার। ছাপবার কথা বলেছিলাম তাঁকে একবার। তিনি বলেছিলেন—ছাপাব ? বলেন কি ! প্রিয়াকে বাজারে বার করে না কি কেউ ! কবিতা আমার অসূর্যম্পশ্যা প্রেয়সী।

নিজের বউকে কিন্তু তিনি খুন করেছিলেন। কেন করেছিলেন, তা নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে, অনেক মতভেদ আছে। কিন্তু সুরেন যা বলে তাই সত্যি বলে মনে হয়। সুরেনকে দিয়ে তিনি প্রায় একশটি কবিতা লেখান। লিখে সেটিকে ভালো মখমল দিয়ে বাঁধান। তাঁর স্ত্রী ললিতা দেবী নাকি তাতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলেন একদিন। দশ বারোটা কবিতা ছাড়া, বাকি কবিতাগুলো সব পুড়ে যায়। দু-একটা আধ-পোড়া কবিতা আমি নিজেও দেখেছি। উপরে যেগুলির অনুবাদ দিলাম, সেগুলির মধ্যে দুটি আধ-পোড়া কাগজ থেকেই উদ্ধার করেছি। তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুর কারণ পুলিসও ঠিক করতে পারে নি। তাদের মতে, ললিতা দেবী আত্মহত্যা করেই মারা গিয়েছিলেন, কারণ তাঁকে অর্ধদগ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায়। সমস্ত কাপড়ে, জামায় স্পিরিট লাগিয়ে আগুন ধরানো হয়েছিল। স্পিরিট তিনি স্বহস্তে দিয়েছিলেন, না, শ্রীনাথ সেন ঢেলে দিয়েছিলেন তা সঠিক জানা যায় নি।

স্ত্রীর মৃত্যুর পর ছেলেকে তিনি বিলেত পাঠিয়ে দেন। আহিরীটোলার বাসায়

তিনি একাই থাকতেন। আমরা মাঝে মাঝে যেতাম অবশ্য। কিন্তু গিয়ে স্বস্তি পেতাম না। তিনি খুব কম কথা বলতেন। প্রায়ই প্রস্তরমূর্তিবৎ বসে থাকতেন। হঠাৎ একদিন বলতেন, কবিতা শুনবেন ? লিখেছি একটা। কবিতা শোনবার জন্যেই যেতাম আমরা। আগ্রহপ্রকাশ করলে কোনো কোনো দিন শোনাতেন, কোনো দিন বা বলতেন, আজ থাক, মেজাজটা ভালো নেই।

একটা গুজব কিন্তু চাউর হচ্ছিল ক্রমশঃ তাঁর সম্বন্ধে। তিনি নাকি গভীর রাত্রে কোথা যান। পায়ে হেঁটে যান। পাড়ার গাঙ্গুলীখুড়ো বললেন, "মেয়েমানুষ রেখেছে—।" মিত্তিরমশাই নাকের দুটি ছ্যাঁদাই নস্যিতে বোঝাই করে বললেন, "রেখেছিস, বেশ করেছিস। পয়সা আছে, গুড় খাচ্ছিস, তবে অত ঢাক-ঢাক কেন। মরদকা বাচ্চা, যা করবি চুটিয়ে কর—"

এই ধরনের নানা আলোচনা হতে লাগল তাঁর সম্বন্ধে। কিন্তু তিনি কোথায় যান, তা কেউ আবিষ্কার করতে পারে নি। দু-একজন তাঁর পিছু নিয়েছিল, কিন্তু সুবিধে করতে পারে নি। তারা বলে, তিনি হয় গড়ের মাঠে, না হয় গঙ্গার ধারে গিয়ে বসে থাকেন, ঘন্টার পর ঘণ্টা। মেয়েমানুষ দেখে নি তারা।

বছরকয়েক পরে তাঁর ছেলে ফিরে এল ব্যারিস্টার হয়ে। তার ফিরে আসার দিন-সাতেক পরেই শ্রীনাথ সেনের মৃত্যু হয়। শোচনীয় মৃত্যু। গড়ের মাঠেই একদল গোরার সঙ্গে লড়তে লড়তে মারা যান তিনি। তাঁর মৃত্যুর পর দেখা গেল, তাঁর ব্যাংকে একটি কপর্দকও আর নেই। তিনি গোরাদের সঙ্গে কেন লড়েছিলেন, কি করে তাঁর ব্যাংকের অত টাকা নিঃশেষ হয়ে গেল, এ সবেরও কোনও সঠিক কারণ নির্ণয় করতে পারি নি আমরা।

মিত্তিরমশাই বললেন, "মেম রেখেছিল বোধ হয়, তাই গোরাদের আক্রোশ হয়েছিল। আর টাকাকড়ি সব ওই মাগীর গর্ভেই গেছে—এ তো সোজা হিসেব।"

লোহার সিন্দুকে একটি চিঠি ছিল, ছেলে আদিনাথের নামে। ছোট্ট চিঠি।

বাবা আদিনাথ,

ইচ্ছে করেই তোমার জন্যে ব্যাংকে কিছু রেখে গেলাম না। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছি, পিতৃপুরুষের জমানো টাকা নিয়ে যারা জীবন শুরু করে, তারা প্রায়ই অমানুষ হয়। জীবনপথে বেশি টাকা থাকাটা নিরাপদ নয়। আশা করি, নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে। সে শিক্ষা তোমাকে দেবার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। আশীর্বাদ জেন। ইতি তোমার বাবা।

টাকা-কড়ির অভাব, সুতরাং শ্রাদ্ধের আয়োজন খুব সামান্যভাবেই করা হয়েছিল। আদিনাথ শ্রাদ্ধের কাজ আরম্ভ করতে যাবে, এমন সময় প্রকাণ্ড একটা মোটরগাড়ি এসে দাঁড়াল, আর তার পিছু পিছু একখানা ট্যাক্সি।

মোটর থেকে কালো-বোরখা-পরা একটি মহিলা নেবে এলেন। ধপধপে সাদা পা দুখানি ছাড়া তাঁর অঙ্গের আর কিছু দেখা যাচ্ছিল না। তিনি এসেই জিজ্ঞাসা করলেন, "আদিনাথ কোথা—"

আদিনাথ এগিয়ে গেল।

মহিলা তখন বোরখার ভিতর থেকে একটি দলিল বার করলেন। "এ দলিলটি নাও তুমি—"

"কিসের দলিল—?"

"দানপত্র। তোমার বাবা আমাকে দুটি বাড়ি করিয়ে দিয়েছিলেন, একটি গড়ের-মাঠের কাছে, আর একটি গঙ্গার ধারে। সে দুটি তোমাকেই আমি দিয়ে যাচ্ছি। আর এটাও রাখ—"

মোটর-ড্রাইভার একটি বাক্স নিয়ে পিছনে দাঁড়িয়েছিল।

"তোমার বাবা আমাকে যে গয়না আর নগদ টাকা দিয়েছিলেন, তা এই বাক্সে আছে। এগুলোও তুমি নাও। আমার মোটরখানাও তুমি ব্যবহার কোরো।"

বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে গিয়েছিলাম সবাই।

আদিনাথ বললে, "আপনি কে, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।"

"আমি ওঁর কবিতার তুমি। এই আমার শ্রেষ্ঠ পরিচয়।" এই বলেই উনি চলে যেতে উদ্যত হলেন।

আদিনাথ একটু এগিয়ে গিয়ে বলল, "আপনি যাচ্ছেন কোথা—"

"তীর্থে।"

যে ট্যাক্সিটা মোটরের পিছু পিছু এসেছিল, সেইটেতে চড়ে চলে গেলেন তিনি।

ভগবানের দয়া

দীননাথ মল্লিক দীনের নাথ হইতে পারেন নাই, সারাজীবন নিজেই তিনি অত্যন্ত দীন ছিলেন। প্রায় পঁয়তাল্লিশ বৎসর পূর্বে তিনি নাথ হইয়াছিলেন ভূতিবালার, কিন্তু তাহাতে তাঁহার দৈন্য ঘোচে নাই, স্বয়ং লক্ষ্মীর আর এক নাম ভূতি হওয়া সত্ত্বেও ঘোচে নাই। আপিসের চাকরিতে যে গ্রেডে বাহাল হইয়াছিলেন, তদনুসারেই মাহিনা বাড়িয়াছিল, কিছুমাত্র ইতরবিশেষ হয় নাই। এক হিসাবে অবশ্য ভূতিবালা তাঁহার অনেক আর্থিক সুবিধা করিয়াছিলেন, তাঁহার একটিও সন্তান হয় নাই। দশ-বারোটি ছেলেমেয়ে হইলে দীননাথ অকূলপাথারে পড়িতেন। তথাপি এই ব্যপদেশে তাঁহাকে কিছু অর্থব্যয় করিতে হইয়াছিল। সামর্থ্যহীন দরিদ্রেরও সন্তান-আকাঙ্ক্ষা থাকে, দীননাথ এবং ভূতিবালারও ছিল। তাই ডাক্তারদের দ্বারে দ্বারে কিছুদিন তাঁহারা ঘুরিয়াছিলেন। প্রায় শতখানেক টাকা খরচ হইয়া যাইবার পর তাঁহারা হৃদয়ঙ্গম করিলেন যে, সন্তান হইবার আশা নাই। একটি মেনি বিড়াল পুষিয়া ভূতিবালা দুধের সাধ ঘোলে মিটাইলেন। মেনিটি মরিয়া গেলে একটি টিয়া পুষিলেন। টিয়া মরিয়া গেলে ময়না। তাহার পর খরগোস। এইভাবেই তাঁহাদের সুদীর্ঘ দাম্পত্যজীবন কাটিয়াছে। বাকি জীবনটাও হয়তো কাটিয়া যাইত, কিন্তু মুশকিল হইল যখন ভূতিবালার দক্ষিণ অঙ্গটি পড়িয়া গেল। ষাট বৎসর বয়সে পক্ষাঘাত হইলে তাহা আর সারে না। মৃত্যুই তখন একমাত্র ত্রাণকর্তা। মৃত্যু কিন্তু ভূতিবালাকে ত্রাণ করিল না। ভূতিবালা তো বিপদে পড়িলেনই, কিন্তু তাঁহার অপেক্ষা শতগুণ বিপদে পড়িলেন দীননাথ। দীননাথের বয়স সত্তরের কাছাকাছি। (সঠিক হিসাব আটষট্টি বৎসর, দুই মাস, ছয় দিন), আপনার জন বলিতে কেহ নাই। ওই ভূতিবালাই তাঁহার প্রিয়া, শিষ্যা, সচিব সব, উপরন্তু রাঁধুনী, চাকরানী, ধোপানিও। ভূতিবালার পক্ষাঘাত

হওয়াতে দীননাথই পঙ্গু হইয়া পড়িলেন বেশী। কিন্তু ভগবান আছেন, তিনি দয়া করিলেন। কিছুদিন পূর্বে সুধাংশু বোসের সহিত আলাপ হইয়াছিল। সেই ছোকরাই এই বিপদে তাঁহাকে সাহায্য করিল। সুধাংশু বোস সদ্য-বিলাত-প্রত্যাগত ডাক্তার। চমৎকার ছেলে। এম. আর. সি. পি. এবং এফ. আর. সি. এস. দুইটা ডিগ্রিই অর্জন করিয়াছে। লোকহিসাবেও মহানুভব। কোনো ফি না লইয়া সে ভুতিবালার চিকিৎসার ভার লইল, কিছু কিছু ঔষধপত্রও নিজের পকেট হইতে কিনিয়া দিল। ইহাতে দীননাথ কৃতার্থ তো হইলেনই, একটু লজ্জিত এবং অপ্রতিভ হইয়াও পড়িলেন। লজ্জিত হইলেন দারিদ্র্যের জন্য এবং অপ্রতিভ হইলেন আজকালকার ছোকরাদের নিন্দায় পঞ্চমুখ ছিলেন বলিয়া। চিকিৎসারূপী ঝামেলা অনেকটা মিটিল বটে, কিন্তু ঝামেলা জিনিসটা সহজে মিটিবার নহে, অন্যান্য নানা রূপ ধারণ করিয়া তাহা দীননাথকে বিব্রত করিতে লাগিল। ভুতিবালার সেবা করে কে, পথ্য প্রস্তুত করে কে, তাঁহার নিজের জন্যই বা রান্না করে কে। এইসব জটিল সমস্যার সমাধান সহজ হইত, যদি দীননাথ অর্থবান হইতেন। দীননাথ পেন্সন পান মাত্র পঁচানব্বুই টাকা। বাড়িভাড়া দিতে হয় পঁচিশ টাকা। বাকি সত্তর টাকায় কোনক্রমে দুজনের গ্রাসাচ্ছাদন চলে। ভুতিবালা অসুস্থ হইয়া পড়াতে তাঁহার জন্য খরচ কিছু বাড়িয়াছে। সুধাংশু ডাক্তার নানারকম ফুড এবং ভিটামিনের ব্যবস্থা করিয়াছে। গরম জলের সেঁক দিবার জন্য হটওয়াটার ব্যাগ কিনিতে হইয়াছে, বেডপ্যান, ইউরিনালও কিনিতে হইয়াছে। সবই ওই সত্তর টাকার মধ্যে। ইহার উপর চাকর বা রাঁধুনি রাখা সম্ভব নয়।

আবার ভগবান দয়া করিলেন। ওই সুধাংশু ডাক্তারই আবার একদিন দীননাথের দীনতার অন্ধকারে সত্যসত্যই সুধাংশুর মতো উদিত হইল।

"এই লোকটাকে নিয়ে এলাম। এ আপনার এখানে পেটভাতায় থাকবে। রাঁধতেও জানে। রাত্রে আপনার বারান্দায় শুয়েও থাকবে। রাখুন একে।"

একটি কুচকুচে কালো যুবক দীননাথকে নমস্কার করিল। দীননাথ ডাক্তারবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "একে পেলেন কোথা ?"

"আমার চেম্বারে ভিক্ষে চাইতে এসেছিল। বলছে পশ্চিমে ওর বাড়িঘর ছিল, দেনার দায়ে বিকিয়ে গেছে। লেখাপড়াও শেখে নি বিশেষ, আত্মীয়স্বজনও কেউ নেই। কোলকাতায় রোজগার করবার জন্যে এসেছে, কিন্তু কাজ পাচ্ছে না, তাই ভিক্ষে করে দিন চালাচ্ছে। আমি আপনার কথা বলাতে রাজি হল। আপনারও তো লোক দরকার একজন—"

"হ্যাঁ, খুব দরকার।"

"একেই রাখুন তা হলে আপাততঃ।"

কিছু খরচ বৃদ্ধি হইল, কিন্তু উপায় কি।

রাধিকারমণ দীননাথের বাড়িতে রহিয়া গেল।

॥ দুই ॥

কিছুদিন পরেই দীননাথ অনুভব করিলেন (মানে, আন্দাজ করিলেন) যে, পূর্বজন্মে তিনি নিশ্চয়ই যৎসামান্য কিছু পুণ্য অর্জন করিয়াছিলেন, তাই রাধিকা-

রমণের মতো সর্বগুণান্বিত ভৃত্যটি তাঁহার ভাগ্যে জুটিয়াছে। রান্না করে, বাসন মাজে, কাপড় কাচে, ঘরদুয়ার পরিষ্কার করে, বাজার করে। ইহার উপর ভূতিবালার সেবা করিতেও তাহার আপত্তি নাই। কিন্তু ভূতিবালা তাহা করিতে দেন না। পরপুরুষ তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করিবে, ইহা তিনি চান না। দীননাথকেই সব করিতে হয়। কিন্তু এই কর্মটি দীননাথের পক্ষে ক্রমেই কঠিন হইয়া উঠিতেছিল। ভূতিবালা স্থূলাঙ্গিনী, দীননাথ শীর্ণকায়। পক্ষাঘাতগ্রস্ত ভূতিবালাকে নাড়াচাড়া করিবার শক্তি দীননাথের ছিল না। প্রত্যহ বিছানা বদলানো, গা মুছাইয়া দেওয়া, পিঠে স্পিরিট-পাউডার দেওয়া, বেডপ্যান দেওয়া-নেওয়া, এসব কর্ম দুই একদিন করা যায়, রোজ করা সম্ভবপর নহে। দীননাথের খুবই কষ্ট হইতেছিল, ভূতিবালাও তাহা অনুভব করিতেছিলেন, কিন্তু উপায় কি। অসহায়ভাবে তিনি ভাবিতে লাগিলেন, পূর্বজন্মে কত পাপই যে করিয়াছি তাই এ জন্মে স্বামীকে দিয়া নরক ঘাঁটাইতেছি। ভগবান আমাকে শাস্তি তো অনেক দিলে, এবার চরণে স্থান দাও। ভগবান কিন্তু এ অনুরোধটি রক্ষা করিলেন না। ভূতিবালার মৃত্যু হইল না। দীননাথ নরকভোগ করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে অবশ্য ভগবান দয়া করিলেন। কিন্তু একটু অন্যভাবে। ভূতিবালার মৃত্যু হইল না, বিস্মৃতি অপনোদিত হইল। অনেকদিন পরে চামেলীকে তাঁহার মনে পড়িল।

চামেলী তাঁহার দূর-সম্পর্কীয়া ভগ্নী। বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ। তাহারও তিনকুলে কেহ নাই। থাকে তাহার পিশামশায়ের কাছে জব্বলপুরে। তাহাকে লিখিলে সে হয়তো আসিতে পারে। টানিয়া টানিয়া কথাগুলি তিনি দীননাথকে বলিলেন। প্রস্তাবটি ভালো, তবু দীননাথকে মাথা চুলকাইতে হইল, সংসারে আর একটি লোক-বৃদ্ধি হওয়ার মানেই খরচবৃদ্ধি। এখনই তো রাধিকারমণ থাকাতে খরচ বেশ বাড়িয়াছে। চামেলী আসিলে সত্তর টাকায় কুলাইবে কি ? ইহার উত্তরে ভূতিবালা যাহা বলিলেন, তাহা কিন্তু খুবই আশ্বাসজনক। খবরটা দীননাথ জানিতেন না, চামেলীর কথাই জানিতেন না তিনি। চামেলীর পিতা নাকি পুলিসের সি. আই. ডি. ছিলেন। অগ্নিযুগে বোমারুদের ধরাইয়া দিতেন। অবশেষে একজন বোমারুর গুলিতেই তিনি নিহত হন। সদাশয় ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট সেজন্য চামেলীর মা এবং চামেলীর জন্য মাসিক দেড়শত টাকা করিয়া ভাতা দিতেন। চামেলীর মা মারা যাইবার পর ভাতা কমিয়া গিয়াছে, কিন্তু এখনও চামেলী প্রতি মাসে কিছু করিয়া পায়। কত পায়, তাহা ভূতিবালা সঠিক জানেন না, কিন্তু তাহাতে তাহার গ্রাসাচ্ছাদন যে চলিয়া যায়, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহার এখনও বিবাহ হয় নাই, বিবাহ হইলে, বিবাহের খরচস্বরূপ কিছু টাকাও নাকি গভর্ণমেণ্ট দিবে। চামেলীর মা মারা যাওয়ার পর, বাধ্য হইয়া চামেলীকে পিসামশায়ের নিকট যাইতে হইয়াছে, কারণ দেশে তাহার অভিভাবকত্ব করিবার মতো নিকট-আত্মীয় কেহ ছিল না। ভূতিবালার বিশ্বাস, চামেলীকে খবর দিলে সে আসিবে। তাহার ঠিকানা তিনি জানিতেন। সম্পর্কটা খুবই দূর, তাই দীননাথ প্রথমটা ইতস্ততঃ করিতেছিলেন, কিন্তু শেষে মনস্থির করিয়া ফেলিলেন। বেশ গুছাইয়া একটি পত্র চামেলীকে, আর একটি তাহার পিসামশায়কে লিখিয়া দিলেন। ভগবান দয়া করিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই পিসামশায়ের উত্তর পাওয়া গেল। সংক্ষিপ্ত উত্তর। লিখিয়াছেন, চামেলীকে লইয়া শীঘ্রই যাইতেছি,

সাক্ষাতে সমস্ত কথা হইবে। দিনসাতেকের মধ্যে তিনি চামেলীসহ আসিয়া পেঁৗছিয়া গেলেন। সাক্ষাতে যাহা বলিবেন লিখিয়াছিলেন, তাহা গোপনে দীননাথকেই বলিলেন।

"মহাবিপদে পড়েছিলাম মেয়েটাকে নিয়ে মশাই। পাড়ার চার পাঁচটা ষণ্ডা ছোঁড়া দিনরাত আমার বাড়ির চারদিকে চক্কোর মারে। সিটি দেয়, রাত্রে টর্চ ফেলে, চিঠি লেখে। আর মেয়েটাও একটু ফরওয়ার্ডগোছের, বুঝলেন। কি করব, দুশ্চিন্তায় ছিলাম। এমন সময় আপনার চিঠিটি পেয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। এক ঢিলে দুই পাখি মল। আপনার উপকারও হল, ওকে ওখান থেকে সরানোও হল।"

পিসামশায়ের মুখেই তিনি শুনিলেন, চামেলী গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে প্রতিমাসে পঁচাত্তর টাকা করিয়া ভাতা পায়। বিবাহ হইলে এক হাজার টাকা দিতেও গভর্ণমেণ্ট প্রতিশ্রুত আছেন, তবে এখন স্বদেশী গভর্ণমেণ্ট হইয়াছে, দিবে কিনা কে জানে। পিসামশায়ের মতে ও-মেয়ের বিবাহ হইবে না, ষাঁড়াইয়া গিয়াছে, অর্থাৎ ষাঁড়ের মতো মোটা ও বলিষ্ঠ হইয়াছে।

পিসামশায় পরদিনই চলিয়া গেলেন।

দীননাথ এবং ভূতিবালা লক্ষ্য করিলেন, চামেলী মেয়েটি হাস্যমুখী, একটু সাজগোজ করিতে ভালবাসে, আর খুব নেটিপেটি। খাটিতেও পারে খুব। গায়ে জোরও আছে। অবলীলাক্রমে সে ভূতিবালার সেবার সমস্ত ভার লইল। দীননাথের মনে হইল, সবই ভগবানের দয়া। সব শুনিয়া সুধাংশু ডাক্তারও খুশী হইল।

কিন্তু আর একটি সমস্যা দেখা দিল দুই মাস পরে।

॥ তিন ॥

ভূতিবালার মনেই দেখা দিল প্রথমে। পক্ষাঘাত হওয়াতে তাঁহার দেহটাই অসমর্থ হইয়া শয্যায় পড়িয়াছিল, মন মোটেই নিষ্ক্রিয় হয় নাই। মাস দুই পরে স্বামী দীননাথের জন্য তাঁহার একটু চিন্তা হইল। চামেলী সম্পর্কে দীননাথের কোনও অশোভন আচরণ অবশ্য তিনি দেখেন নাই—দেখিবেনই বা কিরূপে, তিনি তো শয্যাগত—কিন্তু ভূতিবালা অনুভব করিতে লাগিলেন যে, চামেলীর সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা যেন উত্তরোত্তর বাড়িতেছে। ঘনিষ্ঠতা তো হইবেই, দুটিমাত্র ঘর, দুটি ঘরের মধ্যে যে দরজা আছে তাহাতে কপাট নাই, তা ছাড়া শালী সম্পর্ক, ঘি ও আগুন… ভূতিবালার আশঙ্কা ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। কিন্তু মুখ ফুটিয়া কিছু বলিবারও উপায় নাই। ভূতিবালা শুইয়া শুইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, কি করা যায়। চামেলী তাঁহার পক্ষে অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছে, দীননাথ তো অপরিহার্যই। ভূতিবালা চিন্তা করিয়া কোনো কূলকিনারা পাইতেছিলেন না হঠাৎ কিন্তু একদিন তিনি মনস্থির করিয়া ফেলিলেন। দীননাথ তাঁহার ঘরেই মেঝেতে বিছানা পাতিয়া শুইতেন। হঠাৎ একদিন মধ্যরাত্রে ঘুম ভাঙিয়া গেল. লক্ষ্য করিলেন, দীননাথ বিছানায় নাই। দুই একবার ডাকিয়াও উত্তর পাইলেন না। চামেলী পাশের ঘরে থাকে, তাহারও সাড়া পাইলেন না। একটু পরে দীননাথ চামেলীর ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন।

"এত রাত্রে কোথায় গিয়েছিলে গো ?"

"পায়খানায়। তোমার ঘুম ভেঙে যাবে বলে এ দরজাটা আর খুলি নি, চামেলীর ঘর দিয়েই গিয়েছিলাম।"

"চামেলী কোথা ?"

"ঘুমুচ্ছে।"

"একটু ডেকে দাও তো। মাথার বালিশটা সরে গেছে।"

"আমিই ঠিক করে দিচ্ছি। ও বেচারী সমস্ত দিন খাটে তো, মড়ার মতো ঘুমুচ্ছে।"

চামেলীর প্রতি এই দরদটুকু ভূতিবালার একেবারে ভালো লাগিল না। ঈর্ষার জ্বালা যদি পক্ষাঘাতের অব্যর্থ ঔষধ হইত, তাহা হইলে ভূতিবালা তৎক্ষণাৎ উঠিয়া বসিতেন। তিনি সেদিন আর কিছু বলিলেন না। পরদিন চামেলী যখন রাস্তার কল হইতে জল আনিতে গেল, তখন তিনি প্রস্তাবটি করিলেন।

"দেখ, আমি একটা কথা ভাবছি। চামেলী সোমত্ত মেয়ে, ওর সঙ্গে তোমার এমনভাবে মেলা-মেশা করাটা লোকতঃ ধর্মতঃ খুবই খারাপ দেখাচ্ছে। অথচ অন্য উপায়ও তো নেই। তাই আমি বলছি, ওকে তুমি বিয়েই করে ফেল—"

দীননাথ আকাশ হইতে পড়িলেন।

"বলছ কি তুমি !"

"ঠিকই বলছি। ভগবানের দয়ায় বলতে নেই তোমার শরীরটি এখনও সুস্থ আছে। কিন্তু আমি তো তোমার সঙ্গে তাল রাখতে পারলুম না, আমি এখন তোমার গলগ্রহ। আর আমাকে সেবা করবার জন্যেই চামেলীকে এনেছি, ওকে ছাড়া আমাদের চলবেও না, তাই বলছি বিয়ে কর ওকে, পালটি ঘরও আছে, তোমার দিক থেকেও ভালো হবে, আমার দিক থেকেও হবে। এ রকম বিয়ে তো কত হয়। ভেবে দেখো কথাটা—"

দীননাথ ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিতে গিয়া কিন্তু তিনি অনুভব করিলেন যে, ব্যাপারটাকে প্রণিধান বা পর্যালোচনা করিতে হইলে সুধাংশু ডাক্তারের প্রাজ্ঞতার সাহায্য লইতে হইবে। ছোকরার বয়স কম, কিন্তু বুদ্ধি প্রখর। তা ছাড়া হিতৈষীও। তাহার সহিত পরামর্শ না করিয়া কিছু করা চলিবে না।

সব শুনিয়া সুধাংশু বলিল, "আপনার স্ত্রী ঠিকই বলেছেন। এ অবস্থায় বিয়ে করাই উচিত, আর করলে ক্ষতিই বা কি। আর কিছু না হোক, কেলেঙ্কারির ভয় থাকবে না। সত্যি, আপনার নামে, আপনার পাড়ার লোকেরা ফুসফুস, গুজগুজ আরম্ভ করেছে, কানে এসেছে আমার। বিয়েই করে ফেলুন। জড়ই মেরে দিন ব্যাপারটার।"

"কিন্তু এই বয়সে বিয়ে করে যদি আবার ছেলেপিলে হয়ে যায়, তা হলেই তো মুশকিল ! যদিও অবশ্য আগে জনকয়েক ডাক্তার আমাকে পরীক্ষা করে বলেছিলেন যে, আমার ছেলেপিলে হবে না। কিন্তু যদি হয়ে যায়—"

"তা হলে এক কাজ করুন। আসুন, আপনার ভাসেকটমি করে দি।"

"সে আবার কি ?"

"সামান্য একটা অপারেশন। ওটা করে দিলে ছেলেপিলে হওয়ার ভয় আর একদম থাকবে না। আর ব্যাপারটা কাউকে বলবেন না, চামেলীর কানে যেন না যায়। শুনলে হয়তো সে-ই আপনাকে বিয়ে করতে চাইবে না।"

"না, না, আমি কাউকেই বলব না। বেশী সিরিয়াস অপারেশন নয় তো ?"

"আরে, না, না, সে কিছুই নয় ; চামেলী কি আপনাকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছে ?"

"না, তাকে জিগ্যেস করা হয়নি এখনও।"

"জিগ্যেস করুন। যদি রাজি হয়, খুব ভালো হবে আপনার পক্ষে। আপনার স্ত্রী যে এত বুদ্ধিমতী তা জানতাম না।"

"ওর দেহটাই মোটা, বুদ্ধি খুব সূক্ষ্ম। এতদিন দেখছি তো—"

ভুতিবালাই কথাটা চামেলীর কাছে পাড়িলেন। সে হ্যাঁ বা না কিছুই বলিল না, ঘাড় হেঁট করিয়া মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিল কেবল। ভুতিবালা এবং দীননাথ উভয়েই বুঝিলেন, সম্মতি আছে। দিনকয়েক পরে সুধাংশু তাহার অপারেশনটুকুও করিয়া দিল। দীননাথ বাড়িতে রটাইলেন যে, কুঁচকির কাছে একটা ফোড়া হইয়াছিল, সুধাংশু ডাক্তার সেটা অপারেশন করিয়া দিয়াছে। দিনসাতেক শুইয়া রহিলেন, তাহার পর সব ঠিক হইয়া গেল। তাহার পর পাঁজি দেখা হইল, মাসখানেক পরে বিবাহের শুভদিনও একটা পাওয়া গেল। কিন্তু গোল বাধিয়া গেল হঠাৎ একটা। হিন্দু কোড বিল পাশ হইয়া গেল। আইন হইল, এক স্ত্রী জীবিত থাকিতে দ্বিতীয়বার বিবাহ করা চলিবে না। করিতে হইলে, আদালতের সহায়তা লইয়া প্রথম বিবাহ-বন্ধনটি বিচ্ছিন্ন করিতে হইবে। দীননাথ ইহাতে রাজি হইলেন না। বিবাহ-বিচ্ছেদ করিবার সংগত কারণ অবশ্য দীননাথের ছিল, আদালত হয়তো তাঁহার আবেদন মঞ্জুর করিতেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই রাজী হইলেন না। বরং এমন একটা ভাব দেখাইতে লাগিলেন যে, ভুতিবালা ও সুধাংশু জোর করিয়া তাঁহার স্কন্ধে চামেলীকে চাপাইবার চেষ্টায় ছিল, আইনটা পাশ হওয়াতে তিনি রক্ষা পাইলেন। বলিলেন, সবই ভগবানের দয়া।

॥ চার ॥

মাসছয়েক পরে ভুতিবালা স্বর্গারোহণ করিলেন।

বিবাহের বাধা অপসারিত হইল, তবু কিন্তু দীননাথ ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। মাস দুই কাটিল। তারপর হঠাৎ চামেলী একদিন তাঁহাকে বলিল, "এবার বিয়েটা হয়ে যাক, আর দেরি করা উচিত নয়।"

"কেন"—বিস্মিত দীননাথ প্রশ্ন করিলেন।

উত্তরে যাহা শুনিলেন, তাহাতে তাঁহার বিস্ময় সীমা ছাড়াইয়া গেল। চামেলী সন্তান-সম্ভবা !

ছুটিয়া চলিয়া গেলেন তিনি সুধাংশু ডাক্তারের কাছে। সমস্ত শুনিয়া ডাক্তার খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর মুচকি হাসিয়া বলিল, "তা হলে সম্ভবতঃ আমি অপারেশনটা ঠিক করে করতে পারি নি।"

"কিন্তু আপনি বিশ্বাস করুন, আমি হলপ করে বলছি—"

"চুপ করুন। ভাবতে দিন আমাকে।"

দীননাথ থামিয়া গেলেন। সুধাংশু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া গুম হইয়া রহিল। কয়েক সেকেন্ড পরে দীননাথ আমতা আমতা করিয়া বলিলেন, "আর একটা বিপদও হয়েছে।"

"আবার কি ?"

"রাধিকারমণও কাল থেকে সরেছে।"

সুধাংশুর ভ্রূ আরও কুঞ্চিত হইয়া গেল।

"এখন কি করি বলুন ?"

"বিয়েই করে ফেলুন চামেলীকে। ও ছাড়া গত্যন্তর নেই।"

বিবাহ হইয়া গেল। যথাসময়ে চামেলী একটি কুচকুচে কালো পুত্রসন্তান প্রসব করিল। সুধাংশু তাহার নাম রাখিয়া দিল—কোকিলকুমার।

॥ পাঁচ ॥

আরো পঁচিশ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে।

চামেলীরও মৃত্যু হইয়াছে। সুধাংশু ডাক্তারও একটা বড় চাকরি পাইয়া অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে। দীননাথের বয়স প্রায় পঁচানব্বই। কোমর ভাঙিয়া গিয়াছে, চোখে দেখিতে পান না, কিন্তু তাঁহার মৃত্যু হয় নাই। কোকিলকুমার এখন পঁচিশ বৎসরের যুবক। সে লেখাপড়ায় বরাবরই ভালো ছিল, এখন ভালো চাকরি করিতেছে। সে-ই এখন স্থবির দীননাথের একমাত্র অবলম্বন। দীননাথ ভাবেন, সবই ভগবানের দয়া।

পৌরাণিক-আধুনিক

শুনে আমি বললাম, "ওকে হাসপাতালেই নিয়ে যান—"

"কেন, আপনি পারবেন না ?"

পাঠকমশাই সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করলেন।

"পারব। কিন্তু হাসপাতালেই এ-সব করা ভাল। আজকাল যিনি লেডি ডাক্তার এসেছেন, তাঁর খুব হাত-যশ।"

চুপ করে রইলেন পাঠকমশায় কয়েক মুহূর্ত।

তারপর মুচকি হেসে বললেন, "একটি গল্প শুনবেন ?"

"কী গল্প—"

"পৌরাণিক গল্প। যদি শোনেন তো বলি—"

যদিও খুব বিরক্ত লাগছিল, তবু প্রবীণ পাঠকমহাশয়কে বলতে পারলাম না যে, শুনব না।

"বলুন।"

"পুরাকালে একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন। বিবাহ করবার কিছুদিন পরে তিনি অনুভব

করলেন যে, তিনি পথ-ভ্রষ্ট হয়েছেন, ব্রহ্ম থেকে ক্রমশঃ সরে যাচ্ছেন, মায়াতে জড়িয়ে পড়ছেন, অবিলম্বে সাবধান না হলে অকূলপাথারে ডুবতে হবে। অবিলম্বেই সাবধান হলেন তিনি। বাড়ি থেকে অন্তর্ধান করলেন একদিন। হিমালয়ে গিয়ে শুরু করলেন কঠোর তপস্যা। বহুদিন তপস্যা করবার পর ভগবান তাঁর সামনে আবির্ভূত হয়ে বললেন, 'বৎস তোমার তপস্যায় আমি তুষ্ট হয়েছি—বর দিচ্ছি। যে-কোনো লোককে তুমি অমর করে দিতে পারবে। এবার বাড়ি যাও।' ব্রাহ্মণ বাড়ি ফিরে এলেন। এসে দেখলেন, তাঁর পত্নী বৃদ্ধা হয়েছেন এবং একটি সুদর্শন যুবক তাঁর পরিচর্যা করছে। পত্নী বললেন, 'এটি আমাদের পুত্র। তুমি চলে যাওয়ার কিছুদিন পরেই এ ভূমিষ্ঠ হয়েছিল। একে অবলম্বন করেই আমি এতকাল তোমার পথ চেয়ে বসে আছি। পুত্রটি কর্তব্যপরায়ণ এবং বিদ্বান হয়েছে, ওর চরিত্রও নির্মল। কিন্তু সেদিন ভৃগুমুনি ওর হস্তরেখা বিচার করে বললেন যে, আর একবছর মাত্র ওর পরমায়ু আছে। শুনে থেকে আমি বড় বিমর্ষ হয়ে আছি। এর কি কোনও উপায় নেই ?'

"তপস্বী উত্তর দিলেন, 'তুমি চিন্তা কোরো না, ওকে আমি অমর করে দিতে পারি। সে-শক্তি আমি অর্জন করেছি।'

"বৃদ্ধা এতটা প্রত্যাশা করেনি।

"ও, তাই না কি। তা হলে ওকে অমরই করে দাও।

"তপস্বী ক্ষণকাল চিন্তা করলেন। তারপর বললেন, 'আমি এখনই করে দিতে পারি, কিন্তু আমি করলে সেটা ভাল দেখাবে না, কারণ ও আমার ছেলে। আমি বিষ্ণুকে স্মরণ করছি। তিনিই এসে করে দিন।'

"স্মরণ করবামাত্র বিষ্ণু এলেন।

"সব শুনে বললেন, 'তা, এর জন্যে আমাকে ডাকলে কেন ? তুমি তো নিজেই ওকে অমর করে দিতে পার।'

"তপস্বী বললেন, 'তা পারি। কিন্তু আপনি করে দিলে আরও ভাল হয়। আপনি স্বয়ং বিষ্ণু—'

"বিষ্ণু বললেন, 'আরও ভালর কথা যদি তুললে, তা হলে ব্রহ্মার কাছে চল। পিতামহ যদি একে অমর করে দেন, তা হলে আর কারও কিছু বলবার থাকবে না।'

"বেশ, চলুন।'

"তপস্বী, বিষ্ণু এবং সেই যুবক তখন ব্রহ্মার কাছে গিয়ে হাজির হলেন। ব্রহ্মা সব শুনে বললেন, 'এর জন্যে আমার কাছে আসা কেন ? তোমাদের মধ্যে যে-কোনও একজনই তো একে অমর করে দিতে পারতে।'

"কিন্তু আপনি করে দিলে দেখতে শুনতে সব দিক দিয়েই ভাল হয়।'

"দেখতে শুনতে ভাল হয়, যদি মহেশ্বর করে দেন। চল, তাঁর কাছেই যাই।'

"ব্রহ্মা, বিষ্ণু, তপস্বী আর সেই যুবক মহেশ্বরের কাছে গেলেন।

"সব শুনে মহেশ্বর বললেন, 'এর জন্যে এতদূর এলে ? তোমাদের তিনজনের মধ্যে যে-কেউ একজন তো করে দিতে পারতে।'

"ব্রহ্মা বললেন, 'কিন্তু আপনি করে দিলে কাজটা একেবারে পাকা হয়।'

"‘পাকা হয়, ভাগ্যবিধাতা যদি নিজের খতিয়ানে ওকে অমর বলে লিখে নেন। বেশ, চল, ভাগ্যবিধাতার কাছেই চল, পাকাই করে ফেলা যাক ব্যাপারটাকে—’

"পাঁচজনে ভাগ্যবিধাতার দপ্তরের দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন। একটি প্রকাণ্ড পাথরে-তৈরি সিংহদ্বারের ভিতর দিয়ে সে-দপ্তরে ঢুকতে হয়। সিংহদ্বারে ঢুকছেন, এমন সময় একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল। সিংহদ্বারের উপর থেকে প্রকাণ্ড একটা পাথর খসে পড়ল যুবকটির মাথায়। সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু হল তার। হাহাকার করে উঠলেন তপস্বী।

"ভাগ্যবিধাতা তাঁকে সম্বোধন করে বললেন, ‘মুনিবর, এখন হাহাকার করে কী হবে। ওর মৃত্যুর জন্যে আপনিই দায়ী।’

"‘আমি ?’

"‘হ্যাঁ, আপনি। আপনি ওকে অনায়াসেই অমর করে দিতে পারতেন, কিন্তু তা না করে আপনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরকে নিয়ে আমার কাছে এলেন। এই দেখুন, আমার খাতায় লেখা রয়েছে, ওই যুবক যখন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর আর তার বাবাকে নিয়ে আমার সিংহদ্বারের ভিতর ঢুকবে, তখনি সিংহদ্বারের একটি পাথর ওর মাথায় পড়ে ওর মৃত্যু হবে। এই অসম্ভব যোগাযোগ আপনিই করেছেন—।’

গল্পটি বলে পাঠকমশায় বললেন, "উষার প্রথম যখন ব্যথা ধরল, তখন গেলাম নার্স আভার কাছে। সে বললে, আমি পারি, কিন্তু আমার চেয়ে ভাল হবে শশীবাবু ডাক্তার যদি ভার নেন। শশীবাবুর কাছে গেলাম, তিনি আপনার কাছে আসতে বললেন। আপনি এখন বলছেন, হাসপাতালের লেডি ডাক্তারের কাছে যেতে—"

আমি হেসে বললাম, "উষার ভালর জন্যেই বলছি। পরীক্ষা করে দেখলাম, ছেলেটা ঠিক সোজাভাবে নেই, ট্রান্সভার্স প্রেজেনটেশন। এ সব হাসপাতালেই ভাল হয়। তা ছাড়া উষার শরীরে রক্তও কম, পা দুটো ফোলা। হয়ত ব্লাড দেওয়ার দরকার হবে, হাসপাতালেই নিয়ে যান ওকে—"

পাঠকমশায় হাসপাতালেই নিয়ে গেলেন ওকে।

হাসপাতালে উষা মারা গেল।

মাসদুই পরে ঠিক এইরকম একটা কেস আমার হাতে এল।

মফঃস্বলের এক জমিদারের পুত্রবধূ। আমাকে ডেকে নিয়ে গেল।

আমি বললাম, "প্রসব করিয়ে দেব, কিন্তু হাজার টাকা চাই।"

রাজি হলেন তাঁরা।

নির্বিঘ্নে প্রসব হয়ে গেল। প্রসূতি, সন্তান উভয়কেই সুস্থ অবস্থায় রেখে, ফী নিয়ে চলে এলাম। কিছুদূর এসেছি এমন সময় গাড়ির টায়ার গেল ফেটে। ড্রাইভার টায়ার মেরামত করতে লাগল, আমি নেমে পায়চারি করতে লাগলাম মাঠে। চারিদিকে গাঢ় অন্ধকার। কিছু দেখতে পাচ্ছি না। হঠাৎ চমকে উঠলাম। আমার কানের কাছে কে যেন বলে-উঠল, "আমাকে তা হলে হাসপাতালে পাঠিয়ে ছিলেন কেন কাকাবাবু, আমার বাবা আপনাকে অত ফিস্ দিতে পারবেন না বলে—"

দ্রুতপদে ফিরে এলাম মোটরের কাছে। ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করলাম, "কোথায় আমরা রয়েছি বল তো ? অন্ধকারে বোঝা যাচ্ছে না কিছু।"

"আজ্ঞে, এটা শ্মশান।"

ভাবতে লাগলাম, কথাগুলি কে বললে, ঊষা, না আমার বিবেক ?

নবজীবন-স্রোত

শ্রীযুক্ত রামবৃছ সিং শ্রীযুক্ত কমলকুমার মিত্রের প্রতিবেশী, পাশাপাশি বাড়িতে বাস করেন। পরিচয় বেশীদিনের নয়, কারণ উভয়েই অল্প কিছুদিন পূর্বে চাকুরিব্যপদেশে এই শহরে আসিয়াছেন এবং দৈবাৎ পাশাপাশি দুইটি বাড়িতে ভাড়াটে-রূপে আশ্রয় লইয়াছেন। প্রথম প্রথম কিছুদিন উভয়ে উভয়ের পরিচয় লওয়াও প্রয়োজন মনে করেন নাই। সুযোগও ছিল না। দুইজন দুই বিভিন্ন আপিসে চাকরি করেন। একজন পোস্ট-অফিসে, একজন রেলে। নিজের নিজের আপিস আর সংসার লইয়াই দুইজনকে ব্যস্ত থাকিতে হয়, প্রতিবেশীর সংবাদ লইবার মত অবসর মেলে না। ছুটির দিনেও না। ছেলেদের মধ্যে কিন্তু এতটা ঔদাসীন্য দেখা গেল না। কমলকুমারের দশ বছরের ছেলে অমলকুমার রামবৃছের বারো বছরের ছেলে ছবিলালের সহিত আলাপ করিয়া ফেলিল। তাহাদের আলাপ করিবার সুযোগও ছিল। একই স্কুলে, একই ক্লাসে ভরতি হইয়াছিল তাহারা।

অমলকুমার একদিন তাহার মাকে বলিল, "মা, জান ছবিলাল আমাদের সঙ্গে পড়ে, সে সেভ্ন্ বলতে পারে না, বলে—সেভুন।"

কমলকুমার আয়নার সম্মুখে নানা মুখভঙ্গি করিয়া দাড়ি কামাইতেছিলেন, তিনি প্রশ্ন করিলেন, "ছবিলাল কে ?"

"পাশের বাড়িতে থাকে। ওর বাবার নামটাও অদ্ভুত। রামবৃছ—"

অমল হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

কমলকুমার বলিলেন, "ও, বুঝেছি। রামবৃছ সিং আমাদের পাশের বাড়িতে আছে না কি ?"

"হ্যাঁ—"

গৃহিণীর দিকে তাকাইয়া কমলকুমার বলিলেন, "ওঁর জায়গায় আমাদের বিশেশ্বরবাবুর আসবার কথা ছিল। তিনি ওর চেয়ে সিনিয়র লোক, কিন্তু তিনি তো বিহারী নন, কোনো মিনিস্টারের সঙ্গে তাঁর কোনো আত্মীয়তাও নেই—"

কমলকুমার বাঁকা হাসি হাসিয়া গাল চাঁচিতে লাগিলেন।

একটি নাতি-সুচরিত্রা ঠিকা দাই বারান্দা ঝাড়ু দিতেছিল। সে বাংলা বোঝে, রামবৃছবাবুর বাড়িতেও কাজ করে। সে যথাসময়ে উক্ত কথোপকথনটি রামবৃছবাবুর পরিবারে নিবেদন করিল। রামবৃছবাবু সংবাদটি শুনিলেন। বলা বাহুল্য, তাঁহার চিত্ত অমৃতনিষিক্ত হইল না। তিনি গোঁফে চাড়া দিয়া একটি উদ্গার তুলিলেন এবং মনে মনে বলিলেন, শালা বাঙালিয়া—!

কমলকুমারের বাড়িতে সরবরাহ করিবার মতো একটি সংবাদও একদিন উক্ত ঠিকা দাই সংগ্রহ করিয়া আনিল।

কমলকুমারের গৃহিণী সহসা একদিন সকালে হাতে আকাশের চাঁদ পাইয়াছিলেন। একজন ফেরিওয়ালা অপ্রত্যাশিতভাবে আসিয়া কিছু চিংড়িমাছ এবং নোনা ইলিশ তাঁহাকে বিক্রয় করিয়া গিয়াছিল। তিনি মহা-সমারোহে সেগুলি রন্ধন করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু রন্ধনকালে সম্ভবতঃ রান্নাঘরের জানালাটি খোলা ছিল, চিংড়িমাছ এবং নোনা ইলিশের গন্ধ বায়ু-বাহিত হইয়া রামবৃছ সিংয়ের অন্তঃপুরকে আমোদিত করিয়া তুলিল। রামবৃছ তখন রহরকা দাল ও নিমকিসহযোগে মোটা আটার রোটি-চর্বণে ব্যাপৃত ছিলেন। গন্ধ পাইয়া তাঁহার ভ্রূ কুঞ্চিত হইল।

দাইকে সম্বোধন করিয়া প্রশ্ন করিলেন, "ঘর মে কোই জানবর মরল বা ?"

দাই মুচকি হাসিয়া আড়ঘোমটা টানিয়া নিবেদন করিল যে, না, কোনও জানোয়ার মরে নাই, পাশের বাড়ির বাঙালিন বহু মৎস্য রন্ধন করিতেছেন।

রামবৃছ নাকে কাপড় দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "আরে, ছি, ছি, ছি ! ই বাংগালি লোগ আদমি নেই থে, গিধ্ বা।" অর্থাৎ বাঙালীরা মানুষ নয়, শকুনি, মরা জানোয়ার খায়।

ঠিকা দাইটি কমলকুমারের পত্নীর নিকট এই খবরটিও যথাসময়ে মুচকি হাসিয়া নিবেদন করিল।

আপিস হইতে ফিরিয়া কমলকুমারও সংবাদ শুনিলেন। একটু উচ্চাঙ্গের হাস্য করিয়া তিনি মন্তব্য করিলেন, "ও বেটা ছাতুখোর, মাছের মর্ম কি বুঝিবে !"

এ খবরটিও রামবৃছের অবিদিত রহিল না। উভয়পক্ষেই উত্তাপ বাড়িতে লাগিল। তাহা হু-হু করিয়া বাড়িয়া গেল, যখন রামবৃছ একদিন শুনিলেন যে, একজন সিনিয়র বাঙালীকে ডিঙাইয়া তাঁহাকে প্রমোশন দেওয়া হইয়াছে—এ খবরটি বঙ্গদেশ হইতে প্রকাশিত কোনও ইংরেজী পত্রিকায় কে. কে. নামক কোন পত্রলেখক প্রমাণসহ বাহির করিয়া দিয়াছেন। রামবৃছ আগুন হইয়া উঠিলেন। তাঁহার বদ্ধমূল ধারণা হইল, কে. কে. কমলকুমার ছাড়া আর কেহ নন। তিনি নিজের ইয়ারমহলে বাঙালীদের শ্রাদ্ধ করিতে লাগিলেন।

শ্রাদ্ধের আয়োজন কমলকুমারও করিলেন। তাঁহার পুত্র অমলকুমার অতিশয় কম নম্বর পাইয়া কোনোক্রমে ক্লাস-প্রমোশন পাইয়াছিল এবং বাড়িতে আসিয়া বলিয়াছিল যে, শিক্ষকেরা সব হিন্দী ভাষায় পড়ান, সে কিছুই বুঝিতে পারে না। তাহা ছাড়া, তাঁহারা পার্শিয়ালিটি করিয়া বেহারী ছেলেদের বেশী নম্বর দেন। কমলকুমার ইহা শুনিয়া যে সব ভাষা ব্যবহার করিলেন, তাহা রীতিমত সাহিত্যিক ভাষা। গানই বাঁধিয়া ফেলিলেন একটা। 'বঙ্গ আমার, জননী আমার' গানের প্যারডি।

বেহার আমার, মাসীমা আমার,
    ধাইমা আমার, আমার দেশ,
কাহেঁ গে মাইয়া, এইসা হালৎ
    কাহে গে তোরা এইসা বেশ !
একদা যাহার ভোজপুরিয়া
    হেলায় দাঙ্গা করিল মাৎ
আজিও যাহার রাজমিস্ত্রি
    জেনানি লইয়া পিটিছে ছাৎ

ময়লা ঘাড়ে পানি-পাঁড়ে
খাকি কোর্তা মুরেঠা সাজ
তাদেরই বংশে এ কি প্রহ্লাদ
কলম পিষিছে আপিসে আজ !

—এইভাবে সমস্ত গানটারই প্যারডি লিখিয়া ফেলিলেন।

রামবৃছ সিংয়ের বাড়ির সামনের নর্দমায় একদিন জল আটকাইয়া গেল। দেখা গেল, মাছের আঁশ ও নাড়িভুঁড়ি আসিয়া জলনিকাশের পথ রুদ্ধ করিয়াছে।

রামবৃছ দন্ত কড়মড় করিয়া বলিলেন, "শালা মছলিখোর !"

দোলের দিনে রামবৃছের পরিবারবর্গ কাদায়, রঙে কিম্ভূতকিমাকার হইয়া অশ্রাব্য ভাষায় 'হোলি' গাহিতে লাগিল।

কমলকুমার কানে আঙ্গুল দিয়া বলিতে লাগিলেন, "ব্যাটা বেহারী ভূত !"

এইভাবেই কিছুদিন চলিল। হয়তো বরাবরই চলিত ; কিন্তু একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনায় সব ওলটপালট হইয়া গেল।

রামবৃছ সিং একদিন লক্ষ্য করিলেন যে, কমলকুমারের বাড়ির সম্মুখস্থ ময়দানে একটি সামিয়ানা খাটানো হইয়াছে। সামিয়ানার নীচে টেবিল-চেয়ারও অনেক আনা হইল। ফুলের মালাও অনেক আসিল। সন্ধ্যার সময় শহরের অনেক বাঙালী যুবক আসিয়া সমবেত হইলেন। কৌতূহলী রামবৃছ একজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ সব কেন ?"

সে উত্তর দিল, "বাংলা ভাষার বিখ্যাত সাহিতিক 'নবজীবন'-এর নাম শুনেছেন ?"

"খুব—"

"তাঁর আজ জন্মদিন। তাঁকে আমরা সম্বর্ধনা জানাব বলে এই আয়োজন করেছি।"

'নবজীবন কি এখানে এসেছেন ?"

"আরে, তিনি তো আপনার বাড়ির পাশেই থাকেন। তাঁর আসল নাম কমলকুমার ঘোষ। এখানকার এ. এস এম।"

রামবৃছের আর বাক্যস্ফূর্তি হইল না, মুখটা একটু ফাঁক হইয়া গেল কেবল।

সম্বর্ধনা-সভা শেষ হইয়া গিয়াছে। শেষ যুবকটির সহিত কথাবার্তা কহিয়া কমলকুমার যখন বাড়ির ভিতর প্রবেশ করিতে যাইতেছেন, তখন রামবৃছ আসিয়া প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "শুনিয়ে—"

কমলকুমার ঘাড় ফিরাইতেই রামবৃছ করজোড়ে বলিলেন, "পহলেই ময় মাফি মাংতা হুঁ। মুঝে মালুম নহি থা যে আপহি 'নবজীবন' হ্যঁয়। ম্যয় আপকা ভকত হুঁ।"

কমলকুমার হাতজোড় করিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। রামবৃছ বলিলেন যে তিনি যদিও বাংলা বলিতে পারেন না, কিন্তু বাংলা বুঝিতে পারেন। প্রকাশও করিয়াছেন। কমলকুমার বলিলেন, "তাই নাকি ? 'স্রোত' নাম দিয়ে আর একজন লেখকও আমার গল্পের চমৎকার অনুবাদ করেছেন দেখেছি।"

রামবৃছ হাতজোড় করিয়া স্মিতমুখে কিছুক্ষণ নীরব রহিলেন, তাহার পর বলিলেন, "ম্যয় স্রোত হুঁ।"

উভয়ে গাঢ়-আলিঙ্গনে বদ্ধ হইলেন।

ঊর্মির পছন্দ

চার বছরের ঊর্মি তার দাদুর সঙ্গে গিয়েছিল গঙ্গার ধারে বেড়াতে। শীতকালের গঙ্গা, বালুর চর বেরিয়ে পড়েছে চারদিকে, আর সেই চারের মাঝে মাঝে ঝিরঝির করে বইছে জলের ধারা। স্বচ্ছ জলের ভিতর দিয়ে তলা পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। চিকমিক করছে বালি।

"ওগুলো কি দাদু ?"

"বক—"

"চারটেই বক ? অত সাদা কেন ?"

"ফরসা জামা-কাপড় পরেছে।"

"অমন গলা বাড়িয়ে এগিয়ে আসছে কেন আস্তে আস্তে ?"

"তোমার সঙ্গে ভাব করতে চাইছে বোধ হয়।"

"কেন ?"

"তোমাকে বিয়ে করতে চায়।"

ঊর্মি ভুরু কুঁচকে খানিকক্ষণ চেয়ে রইল বকগুলোর দিকে।

"চারটেকেই আমি বিয়ে করব ?"

"করলে ক্ষতি কি। দ্রৌপদী তো পাঁচজনকে বিয়ে করেছিল—"

"দৌপদী কে ?"

র-ফলা বেরোয় না ঊর্মির মুখে।

"সে গল্প আর একদিন বলব তোমাকে।"

"এখনি বল না।"

"আগে ঠিক কর, বকদের বিয়ে করবে কি না।"

ঊর্মি ঘাড় বেঁকিয়ে ভাবলে খানিকক্ষণ। তারপর বললে—"করব না। বড্ড লম্বা গলা ওদের, ঠুকরে দেবে না ?"

"ঠিক বলেছ, কথাটা ভাবি নি তো।"

খঞ্জনও চরছিল কয়েকটা জলের ধারে। দুতিন রকম খঞ্জন, কারও হলদে বুক, কারও সাদা মুখ, কালো পিঠ, কারও ছাই রং, ল্যাজ দুলিয়ে দুলিয়ে মনের আনন্দে চরে বেড়াচ্ছিল সবাই। একটা খঞ্জন লাফ দিয়ে উঠতেই ঊর্মি দেখতে পেলে সেটাকে।

"দেখ দেখ দাদু, আর একটা পাখি। একটা নয়, অনেকগুলো। কি রকম লাফালাফি করছে। ল্যাজও দেখাচ্ছে। দেখতে পেয়েছ ?"

"আমি অনেকক্ষণ আগেই দেখেছি। ওরা এদেশের পাখি নয়, বিদেশ থেকে এসেছে। অনেক দূর থেকে মাঠ, বন, পাহাড়, নদী পার হয়ে।"

"অনে—ক দূর থেকে ?"

"হ্যাঁ।"

"কেন এসেছে।"

"তোমাকে বিয়ে করবে বলে।"

"আমাকে ?"

"তাই তো মনে হচ্ছে। কেমন সেজে এসেছে, দেখছ না ?"

"ওরা তো পাখি। পাখিকে বিয়ে করলে মা-বাবা বকবে না ?"

"বকবে কেন ?"

"তা হলে পাখির খাঁচায় হাত দিলে মা বকে কেন ?"

"টিয়াপাখি যে কামড়ে দেয়।"

"ও। খঞ্জন কামড়ায় না বুঝি ?"

"না। কি সুন্দর দেখছ না ? কেমন খুর-খুর করে বেড়াচ্ছে—"

"খঞ্জন তা হলে তোমার পছন্দ নয়।"

"নাঃ।"

"ওই দুটোকে পছন্দ হয় ?"

"কোন দুটোকে ? ওই যে খঞ্জনদের ওপাশে চরে বেড়াচ্ছে ? কি পাখি ওরা ?"

"বাটান। ছোট বাটান, গলায় কেমন সুন্দর কালো কণ্ঠি দেখেছ—"

"কোথায় থাকে ওরা ?"

"ওরাও বিদেশে থাকে। এখানে বেড়াতে এসেছে।"

"কেন ?"

"তোমাকে বিয়ে করবে বলে।"

"সব্বাই আমাকে বিয়ে করবে বলে এসেছে ?"

"তুমি পছন্দ করলেই করবে।"

"আমার কাউকে পছন্দ নয়।"

"তা হলেই তো মুশকিল। মানুষ বর পাওয়া যাচ্ছে না বাজারে। পাখিই একটা পছন্দ করতে হবে।"

"কি পাখি ?"

"চারদিকে চেয়ে চেয়ে দেখ, যেটা তোমার পছন্দ হয়।"

ঊর্মি চারদিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল।

"ওগুলো কি দাদু ?"

এক ঝাঁক সোয়ালো উড়ছিল জলের উপর। সূর্যের আলো পড়ে চকচক করছিল তাদের কৃষ্ণ-নীল পিঠের রং। থামছিল না এক মুহূর্ত। জল ছুঁয়ে ছুঁয়ে উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছিল ক্রমাগত।

"ওগুলো সোয়ালো। বাংলা নাম আবাবিল।"

"ওরাও কি বিয়ে করবে বলে এসেছে ?"

"তাই তো মনে হচ্ছে।"

"ওদের আমি বিয়ে করব না। বিচ্ছিরি নাম। তা ছাড়া একটুও বসছে না, খালি উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে, গল্প করব কখন ? আচ্ছা দাদু, ওরা আমাদের মতো কথা বলতে পারে তো—!"

"শেখালে পারবে। টিয়াটা কেমন কথা বলে শুনেছ তো।"

"চমৎকার কথা বলে টিয়াটা। কিন্তু বড্ড কামড়ায় যে। বাঃ, ওই পাখিটা তো চমৎকার, কি ওটা—"

গাছের ডালে একটা শালিক বসেছিল, ঘাড় নেড়ে নেড়ে ডাকছিল যেন ঊর্মিকে।

"ওটা শালিক—! ঘাড় নেড়ে নেড়ে তোমাকে ডাকছে—চল, ওর কাছেই যাওয়া যাক—"

গাছটার দিকে এগিয়ে যেতেই 'পিড়িং' শব্দ করে উড়ে গেল শালিকটা।

তারপর দাদুর সঙ্গে অনেকক্ষণ ঘুরল উর্মি। দাদু তাকে আরও পাখি, গাছপালা, আকাশের মেঘ, সবুজ গমের ক্ষেত দেখালেন। উর্মি কিন্তু বেশ একটু অন্যমনস্ক। যে গাছটায় শালিকপাখিটা বসেছিল, সেই গাছটার দিকে ফিরে ফিরে চাইছে কেবল।

দাদু ডাকলেন —"উর্মি—"

উর্মি মুচকি হেসে বললে "পিড়িং—"

"ও কি—"

"আমি শালিকপাখি হয়েছি। শালিককেই বিয়ে করব। ওর ঠোঁটটা বেশ সুন্দর হলদে, নয়? ঠিক আমার ফ্রকের মতো।"

দুদিন আগে উর্মিকে হলদে রঙের ফ্রক কিনে দেওয়া হয়েছিল।

"বেশ, তা হলে শালিকের কাছেই লোক পাঠাই গে চল—! রাজি হয়, তবে তো?"

উর্মিকে নিয়ে গম্ভীরমুখে বাড়ি ফিরে এলেন দাদু।

ছবি

আমি হিরণ সেনের কাছে প্রথমে চিকিৎসক হিসাবেই গিয়েছিলাম। আমাকে যিনি ডাকতে গিয়েছিলেন তিনি তাঁর প্রতিবেশী, আত্মীয় নন। পরে জেনেছিলাম, তাঁর আত্মীয় কেউ নেই, থাকলেও খবর নেন না। প্রতিবেশী সমরবাবুই তাঁর দেখাশোনা করেন। চাকর-বাকর অবশ্য আছে।

সমরবাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম—"উনি বিয়ে-থা করেন নি?"

"না। যে ধরনের লোক সাধারণতঃ বিয়ে-থা করে সংসার পাতে, উনি সে ধরনের লোক নন।"

"ও—।"

সমরবাবু গোড়াতেই আমাকে বলেছিলেন, ওঁর কি হয়েছে। কোমরের নীচে থেকে সমস্ত অঙ্গ পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়েছে, আমাদের ডাক্তারিভাষায় যাকে বলে ট্রান্সভার্স মায়েলাইটিস্‌। সাধারণতঃ, সিফিলিস এর কারণ। সমরবাবু যা বললেন, তা শুনে ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে গেল আমার কাছে।

সমরবাবু রোগীর কাছে আমাকে নিয়ে গিয়ে বললেন, "ইনিই হিরণবাবু, এঁরই চিকিৎসা করতে হবে আপনাকে।"

আমি তাঁকে পরীক্ষা করে দেখলাম।

সিফিলিস বলেই সন্দেহ হল।

বললাম, "রক্তটা একবার পরীক্ষা করানো দরকার।"

হিরণবাবু বলে উঠলেন, "একবার কেন, দশবার পরীক্ষা করা হয়েছে। সমর, ওই ড্রয়ার থেকে রিপোর্টগুলো বার করে দাও তো ভাই—"

দেখলাম। প্রত্যেকটি রিপোর্টেই এক বার্তা, রক্তে কোনো দোষ নেই। একটু আশ্চর্য হলাম।

হিরণবাবু বললেন, "আপনিও যদি রক্ত পরীক্ষা করতে চান, করুন। আমার আপত্তি নেই। কিন্তু আমার বিশ্বাস, আপনারা যে পদ্ধতিতে চলছেন, তাতে আমার অসুখ সারবে না। কোলকাতার সব বড় ডাক্তারকেই দেখিয়েছি আমি, ওষুধ, ইনজেক্‌শন, ইলেকট্রিক চিকিৎসা সবরকম হয়েছে, কিন্তু দেখতেই পাচ্ছেন, কিছু হয় নি—"

সমরবাবু বললেন, "আচ্ছা, আপনারা তা হলে গল্প করুন, আমি ঘুরে আসছি একটু পরে। একটু কাজ আছে আমার। আপনার ট্রেনের এখন ঘণ্টা দুই দেরি। আমি ঠিক-সময়ে এসে আপনাকে স্টেশনে পৌঁছে দেব।

সমরবাবু চলে গেলেন।

হিরণবাবু আমার দিকে চেয়ে বললেন, "কি বুঝছেন আপনি—"

যা বুঝেছিলাম, তা অপকটভাবে প্রকাশ করতে কুণ্ঠা হচ্ছিল। চুপ করে রইলাম।

"চুপ করে রইলেন যে—"

"আপনার এ অসুখ সারবে না—"

দুজনেই চুপ করে গেলাম এর পর।

মিনিটখানেক পরে হিরণবাবু বললেন, "আমি কিন্তু আশা ছাড়িনি এখনও।"

কোনও রোগীই আশা ছাড়ে না। শঙ্করাচার্যের মোহ-মুদ্গর মনে পড়ল—স্তদপি ন মুঞ্চত্যাশাভাণ্ডং। চুপ করে রইলাম।

হিরণবাবু আবার বললেন, "না, আশা ছাড়ি নি আমি। আপনি যদি ডাক্তারি না করে অন্য একটা উপায় অবলম্বন করেন, তা হলে হয় তো সেরে যেতে পারি আমি। শুনেছি, আপনি স্বামী বিবেকানন্দের একজন ভক্ত।"

"তাঁর অসংখ্য ভক্তের মধ্যে আমিও একজন। কে বললে আপনাকে এ কথা—?"

"আপনারই একজন রোগী। শরৎবাবুকে মনে পড়ে আপনার ? শরৎ মিত্তির ? আপনি তাঁর হাঁপানির চিকিৎসা করেছিলেন, তাঁর মুখেই শুনেছি আপনার কথা। মনে পড়েছে ?"

মনে পড়ল, স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা হয়েছিল তাঁর সঙ্গে। প্রায়ই হত মাঝে মাঝে।

"কিন্তু, তার সঙ্গে আপনার অসুখের সম্পর্ক কি ?"

"আপনি আমার হয়ে স্বামীজীর কাছে প্রার্থনা করুন, তা হলেই আমার বিশ্বাস, অসুখ সেরে যাবে।"

"আপনিই করুন না।"

"আমি সর্বদাই করছি। কিন্তু, আমার প্রার্থনায় কাজ হচ্ছে না, হবেও না।"

"প্রার্থনায় ফল হবে, এই যদি আপনার বিশ্বাস, তা হলে কোনও ভালো সাধুকে দিয়েই প্রার্থনা করান। আমি অতি সামান্য লোক—"

"আমি সে চেষ্টাও করেছিলাম, কিন্তু কেউ রাজি হন নি। তারপর শরৎবাবুর মুখে আপনার কথা শুনলাম। তাই আপনাকে ডাকতে পাঠিয়েছিলাম। চিকিৎসার জন্যে ডাকাই নি আপনাকে। তবে, আপনি যদি ইচ্ছে করেন, চিকিৎসাও করতে পারেন। কিন্তু আমার অনুরোধ, একান্ত অনুরোধ, প্রার্থনা করুন আমার জন্যে, যদি ভালো হই, ওতেই হব। দয়া করুন আমার উপর—"

ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন হিরণবাবু। বলা বাহুল্য, খুবই বিব্রতবোধ করতে লাগলাম।

সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, "ভগবান যা করেন, মঙ্গলের জন্যেই করেন, এ বিশ্বাস যদি আপনার সত্যিই থাকে, তা হলে যা হয়েছে, সেটাকে হাসিমুখে মেনে নিন।"

চোখের জল মুছে হিরণবাবু বললেন, "সেটা আমি মেনে নিয়েছি। কিন্তু আমার সবচেয়ে বড় দুঃখ, স্বামীজী আমাকে ছেড়ে চলে গেছেন। আমি ডাকলে তিনি আর ফিরবেন না, আপনাদের মতো সচ্চরিত্র, সত্যবাদী লোক যদি অনুরোধ করেন, তা হলে হয়তো ফিরতে পারেন। আপনি চেষ্টা করুন আমার জন্যে- "

কথাগুলো কেমন যেন এলোমেলো মনে হচ্ছিল।

"কোন্ স্বামীজীর কথা বলছেন ?"

"স্বামী বিবেকানন্দ।"

"তিনি ফিরবেন কি করে ? তিনি তো অনেকদিন আগে মারা গেছেন—"

হিরণ সেন ঘাড় হেঁট করে বসে রইলেন কয়েক মিনিট। তারপর হঠাৎ মুখ তুলে বললেন—"সমস্ত ঘটনা খুলে বলি তাহলে আপনাকে। শুধু একটা অনুরোধ, আমাকে পাগল মনে করবেন না। বিশ্বাস করা না করা আপনার ইচ্ছে অবশ্য, কিন্তু যা বলছি তার একবারে মিথ্যা নয়—"

হিরণবাবু আবার চুপ করে গেলেন। আবার মাথা হেঁট করলেন।

আমি সপ্রশ্নদৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম।

"বলুন, কি বলবেন—"

মাথা তুলে হিরণবাবু বললেন, "হ্যাঁ, বলছি। দেখুন, ছাত্রজীবন থেকেই স্বামী বিবেকানন্দের খুব ভক্ত ছিলাম। বিয়ে-থা করি নি। যথাসাধ্য ব্রহ্মচর্যপালন করেই চলতাম। না, কথাটা একটু ভুল হল। হয়তো আপনার একটা ভুল ধারণা হয়ে যাবে যে, স্বামীজীকে ভক্তি করতাম খুবই, কিন্তু বিয়ে করি নি অন্য কারণে। যে মেয়েটিকে আমার ভালো লেগেছিল, তাকে আমি পাই নি। সহজ সামাজিক উপায়ে পাওয়ার উপায়ও ছিল না। সে ছিল ব্রাহ্মণের মেয়ে, আমি কায়স্থ। শেফালীরও অনেকদিন বিয়ে হয় নি, কারণ তার মায়ের সঙ্গতি ছিল না বিয়ে দেবার। নিতান্ত গরীব বিধবা ছিলেন তিনি। আমি অনেকবার বিয়ের প্রস্তাব করেছিলাম, কিন্তু তিনি কিছুতেই রাজি হন নি। এইভাবেই চলছিল, আমি দূরে থেকে তাকে দেখেই সন্তুষ্ট ছিলাম। একদিন হঠাৎ শুনলাম, শেফালীর বিয়ে হচ্ছে এক ষাট বছরের বুড়োর সঙ্গে। শুনেই আমার মাথায় রক্ত চড়ে গেল। শেফালীর সঙ্গে বিয়ে হবে ওই বুড়োর ! ঠিক করলাম, প্রাণ থাকতে তা হতে দেব না। টাকার অভাব ছিল না আমার। কোলকাতা থেকে গুণ্ডা আনালাম। বিয়ের রাত্রে ঠিক বিয়ে হবার আগেই লুট করে নিয়ে এলাম শেফালীকে। নিয়ে এসে এই ঘরেই আটক করলাম তাকে। জিজ্ঞাসা করলাম, 'আমাকে বিয়ে করবে তুমি ?"

"শেফালী দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দিল, 'কিছুতেই না। কায়স্থের সঙ্গে ব্রাহ্মণের বিয়ে হয় না। আমাকে এক্ষুনি ছেড়ে দিন।'

"আমার তখন রোখ চড়ে গেছে, সংযমের প্রাচীরেও ফাটল দেখা দিয়েছে। বললাম, 'কিছুতেই ছাড়ব না। তুমি হয়তো জানো না, আসুরিক বিবাহও আমাদের

শাস্ত্র-অনুসারে সিদ্ধ। আসুরিকমতেই তোমাকে বিবাহ করব আমি। পৃথিবীতে কোনও শক্তি নেই যে আমাকে বাধা দিতে পারে'—এই বলে জাপটে ধরলাম তাকে।"

"সে প্রাণপণে চিৎকার করতে লাগল। তাকে বাঁচাতে পারে, ত্রিসীমানায় এমন লোক সত্যিই সেদিন কেউ ছিল না। যারা ছিল, তারা আমারই বেতনভোগী গুণ্ডা। এরপর কি হল জানেন? ঝনঝন করে একটা শব্দ হল। ঘরের দেওয়ালে স্বামী বিবেকানন্দের যে ছবিটা টাঙানো ছিল, দেখি তার কাঁচটা ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে, আর স্বয়ং স্বামীজী আমার সামনে দাঁড়িয়ে। রাগে থরথর করে কাঁপছেন।"

"বজ্রনির্ঘোষে বললেন, 'পাষণ্ড, এখুনি ছেড়ে দাও ওকে।'

"আমার কোমরে একটা লাথি মারলেন. আমি পড়ে গেলাম। সেইথেকেই কোমর ভেঙে পড়ে আছি—"

হিরণ সেন থামলেন।

"তারপর?"

"তারপর শেফালীর দিকে ফিরে স্বামীজী বললেন, 'এসো মা, তুমি আমার সঙ্গে এস।'

"শেফালীকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন তিনি। আর ফেরেন নি। ওই দেখুন, ফ্রেম খালি—"

এতক্ষণ লক্ষ্য করি নি। এইবার দেখলাম, দেওয়ালে প্রকাণ্ড একটা ফ্রেমে-বাঁধানো কার্ড-বোর্ড ঝুলছে। ভিতরে ছবি নেই।

নির্বাক হয়ে চেয়ে রইলাম ফ্রেমটার দিকে।

"শেফালীর কি হল?"

"সে-ও আর ফেরে নি। অনেকে বলে, সে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। কিন্তু আমি জানি, স্বামীজী তাকে নিয়ে গেছেন।"

হিরণবাবু হু হু করে কাঁদতে লাগলেন।

আমি নির্বাক হয়ে বসে রইলাম।

হিরণবাবুর ডাক্তারি-চিকিৎসা আমি করি নি। তবে, তাঁর জন্য রোজ প্রার্থনা করতাম। সেদিন খবর পেলাম, তিনি মারা গেছেন।

চম্পা মিশির

"জিৎ গিয়া হুজুর।"

সোৎসাহে রামজানের ছেলে সলিম এসে খবরটা দিল। তারপর সেলাম করে চলে গেল।

মনে পড়ল চম্পা মিশিরকে। এখনও আমি যেন তাঁকে দেখতে পাচ্ছি, সোজা হয়ে বসে আছেন টমটমের উপর ঘোড়ার রাশ ধরে, আর যার টমটম, সে পিছনের দিকে বসে আছে স-সঙ্কোচে। বেশ লম্বা লোক ছিলেন, কিন্তু চওড়া নয়, সরু, লিকলিকে চেহারা। অসুস্থ নয়, ওইরকমই গড়ন। গোঁফ ছিল, দাড়ি ছিল না। গোঁফ সরু,

ভাল করে লক্ষ্য না করলে বোঝাই যেত না। গায়ের রঙের সঙ্গে প্রায় বেমালুম মিশে থাকত। গায়ের রঙ কালো ছিল না। গোধূমবর্ণ। গোঁফও তাই। ছোট ছোট চোখের তারাও কটা ছিল। মেরজাই পরতেন, মাথায় থাকত মৈথিলী পাগড়ি, কাপড় আঁট-সাঁট করে পরা, পায়ে দেশী নাগরা জুতো সবর্ণ মুচির তৈরী, অন্য মুচির জুতো পছন্দ হত না তাঁর। তাঁর এ সব বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করবার অনেক আগেই তাঁকে দেখেছিলাম আমি। রোজই দেখতাম। বস্তুতঃ, না দেখে উপায় ছিল না। আমার ল্যাবরেটরির সামনে দিয়ে যে রাজপথ চলে গেছে, তার উপর টমটম হাঁকিয়ে রোজ যেতেন তিনি। এতেও তাঁর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। সাধারণতঃ, যার টমটম, সে-ই হাঁকায়, আরোহী পাশে বা পিছনে বসে থাকে। আরোহী চম্পা মিশির কিন্তু নিজেই টমটম হাঁকাতেন, যার টমটম, সে পাশে বা পিছনে বসে থাকত। এ খবরটাও আমি পরে জেনেছি।

যেদিন উনি আমার দোকানের সামনে টমটম থেকে পড়ে গিয়ে একটু আঘাত পেলেন, সেইদিনই ডাক্তার হিসেবে ওঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হল। আঘাত সামান্যই, পায়ের গোছটা একটু ছড়ে গিয়েছিল। পায়ে একটু টিঞ্চার আইয়োডিন লাগিয়ে দিলাম। এর পর চম্পা মিশির যা করলেন, তাতে আমি নিঃসন্দেহ হলুম, ওর পায়ের হাড়ে কিছু লাগে নি। উনি লাফিয়ে নেবে গেলেন আমার ল্যাবরেটরির বারান্দা থেকে, সঙ্গের লোকটাকে হুকুম করলেন, ঘোড়াটাকে ধর ভাল করে, মুখটা শক্ত করে ধরে থাক। সে ধরতেই আগা-পাশ-তলা চাবকালেন ঘোড়াটাকে। ঘোড়াটা চলতে চলতে হঠাৎ থেমে গিয়ে পিছু হটছিল বলেই পড়ে গিয়েছিলেন তিনি। সেজন্যে শাস্তি দিলেন তাকে। তখনও আমি বুঝতে পারি নি যে, মিশিরজি টমটমের মালিক নন, আরোহীমাত্র। ঘোড়াটাকে পিটিয়ে মিশিরজি আবার আমার ল্যাবরেটরিতে এসে বসলেন এবং ভাঙলেন কথাটা। মৈথিলীমিশ্রিত হিন্দীতেই কথা বলতেন তিনি। আমি ভাবার্থটা অনুবাদ করে দিচ্ছি। বললেন, এমন বোকা এ দেশের লোক ডাক্তারবাবু, পয়সা দিয়ে ওই ঘোড়া কিনেছে। ও যতটা এগোয়, তার চেয়ে পিছোয় বেশী। এ টমটমে কোন্ সোয়ারি চড়বে বলুন? আমাকেই এখন ঠিক করতে হবে, ক'দিন লাগবে কে জানে?

পরে আরও অনেক ঘটনা থেকে জেনেছি, বাজে ঘোড়াকে ঠিক করাতেই ওঁর আনন্দ। ইংরেজীতে যাকে বলে রঙ হর্স (wrong horse) তাকে ব্যাক করেও উনি আনন্দ পেয়েছেন জীবনে। ওঁর বাড়ি গঙ্গার ওপারে মফঃস্বলে, অনেক জমি-জায়গা আছে, খাওয়া-পরার ভাবনা ছিল না। কিন্তু শহরে উনি প্রত্যহ আসতেন স্টীমারে পেরিয়ে। বাড়ি থেকে স্টীমারঘাটে আসতেও প্রায় মাইলখানেক হাঁটতে হত ওঁকে। কিন্তু তাতে আনন্দই পেতেন উনি, বলতেন, এইভাবে হাঁটার ফলে শরীর বেশ ভাল থাকে। স্টীমারঘাটে নেবেই একটা টমটম ভাড়া করতেন সমস্ত দিনের জন্য। যে টমটমের ঘোড়া খারাপ, সেইটেই পছন্দ করতেন তিনি। তা বলে তাকে যে কম ভাড়া দিতেন তা নয়, বরং বেশীই দিতেন। আর টমটমটা নিজেই হাঁকাতেন। সেই খারাপ ঘোড়া যতদিন না ঠিক হত, ততদিন সেই টমটমকেই বাহাল করে রাখতেন। এই সব কারণে মিশিরজিকে আরোহীরূপে পাবার জন্য সব টমটমওলাই ব্যগ্র হত। দু-একজন ঠকাতও। অর্থাৎ টমটমের ঘোড়া খারাপ না হলেও তাকে আরোহীরূপে পাবার জন্য

মিথ্যে করে বলত যে, তার ঘোড়া খারাপ। কিন্তু মিশিরজির কাছে এ সব চালাকি চলত না, ঘোড়ার রাশ থাকত তাঁর হাতে। একদিন আমার ল্যাবরেটরির সামনে টমটম থামিয়ে নেমে এসে বললেন, ডাক্তারবাবু, একটা রুগী নিয়ে এসেছি, দেখুন তো, শালার যদি কোনও ব্যবস্থা করতে পারেন, আরে, ইধার আ—

টমটমওলা ছোঁড়াটা মুচকি হেসে নেমে এল।

জিজ্ঞাসা করলাম, কি হয়েছে এর ?

মিশিরজি তার মুখের দিকে চিন্তিতমুখে চেয়ে রইলেন ক্ষণকাল। তারপর বললেন, শালা ঝুঠ্ঠা ছে। অর্থাৎ শালা মিথ্যাবাদী। টমটমের ঘোড়া ভাল, কিন্তু খারাপ বলে চালিয়েছে তাঁর কাছে। হেসে বললাম, এর তো কোনও দাবাই নেই আমার কাছে—

চম্পা মিশির তখন ছোঁড়ার একটা কান টেনে বললেন, তা হলে পুরানা দাবাই দিয়ে দি একটু। অমন তেজী ভাল ঘোড়া, বলে কি না খারাপ—

তারপর তাকে একটা সিকি দিয়ে বললেন, দু আনার ছাতু তুই খা, আর দু আনার ঘোড়াটাকে খাওয়া। পেট ভরা থাকলে মুখ দিয়ে মিথ্যেকথা বেরুবে না।

সিকিটা নিয়ে সানন্দে বেরিয়ে গেল ছোঁড়া, মিশিরজি আমার দিকে চেয়ে বাঁ চোখটা একটু কুঁচকে গেলেন তার পিছু পিছু।

মিশিরজি শহরে এসে ব্যস্ত থাকতেন সমস্ত দিন। আদালতেই বেশীর ভাগ সময় কাটত তাঁর। রোজই তাঁর একটা না একটা মকদ্দমা থাকত। তাঁর নিজের মকদ্দমা নয়, পরের মকদ্দমা। যে পক্ষ দুর্বল, সেই পক্ষের মকদ্দমার তদ্বির করতেন উনি। তার জন্য উকিল ব্যবস্থা করতেন, সাক্ষী যোগাড় করতেন, নিজেও পরামর্শ দিতেন। শহরে তাঁর একটা ছোট বাসা ছিল, সেই বাসায় আশ্রয় দিতেন তাদের। একজন ভাল উকিলের মুখে শুনেছি, মিশিরজি মকদ্দমা বুঝতেনও ভাল। মোটামুটি আইনের জ্ঞান ছিল, তা ছাড়া বিপক্ষকে জেরা করবার এমন সব ঘাঁৎ ঘোঁৎ বলে দিতে পারতেন যে, অনেক বুদ্ধিমান উকিলেরও তাক লেগে যেত। সুতরাং মকদ্দমাতেও মিশিরজিকে স্বপক্ষে টানবার জন্য চেষ্টা করত অনেকে। এ বিষয়ে খুব সুনাম ছিল তাঁর। একবার তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, এ সব করে তাঁর কি লাভ হয় ? তিনি উত্তর দিয়েছিলেম, সময় কাটে। কিন্তু তিনি কখনও সবলের পক্ষ অবলম্বন করেন নি। যার কেস কমজোর, যার অর্থাভাব, যে পুলিশের বিষ-দৃষ্টিতে পড়ে নাজেহাল হচ্ছে, চম্পা মিশির সর্বদা তার পক্ষে। উকিলরাও, বিশেষ করে নূতন উকিলরা, খুব সমীহ করত তাঁকে। সাধারণতঃ যে সব উকিলের মক্কেল জুটত না, তাঁদেরই নিযুক্ত করতেন তিনি। দরকার হলে কোনও নামজাদা উকিলের পরামর্শ যে না নিতেন, তা নয়, কিন্তু মকদ্দমার সম্পূর্ণ ভার থাকত নূতন উকিলটির উপর। পরে যাঁরা নামজাদা উকিল হয়েছিলেন তাঁরাও প্রথম জীবনে মিশিরজির সাহায্য পেয়েছিলেন, সুতরাং সে মহলেও মিশিরজির খুব খাতির ছিল। একবার এক উকিল কমিশন দিতে চেয়েছিলেন তাঁকে। মিশিরজি জিব কেটে উত্তর দিয়েছিলেন, আরে রাম রাম ওকিল সাহেব, আমি ব্রাহ্মণ, বেনিয়া নই। এ আমার পেশা নয়, খেলা।

আমার সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর থেকে আমাকেও অনেক রোগী পাঠিয়েছেন তিনি মফঃস্বল থেকে। মফঃস্বলের নিরীহ রোগীদের কাছে আমার সম্বন্ধে এমন সব

অত্যুক্তি করতেন, যা শুনে আমি লজ্জিত হতাম। আমি নাকি খুন পরীক্ষা করে তড়াক্‌সে (চট করে) সমস্ত রোগ নির্ণয় করে ফেলতে পারি। মাঝে মাঝে অপ্রস্তুতও হতে হত। একবার তাঁর প্রেরিত এক রোগী এসে বলল যে, তার রক্ত পরীক্ষা করে বলে দিতে হবে, তার শ্বশুরের রক্তে কোনো দোষ আছে কি না! বললাম, আমি তা পারব না। কিন্তু লোকটা না-ছোড়। বলল, মিশিরজি যখন বলে দিয়েছেন, তখন নিশ্চয়ই আপনি পারবেন। ফী যা লাগে আমি দেব, কাজটা করে দিন। বললাম, তোমার শ্বশুরকেই পাঠিয়ে দাও। সে বলল, তিনি থাকলে তো নিয়েই আসতাম। কিন্তু তাঁর নামে সম্প্রতি হুলিয়া বেরিয়েছে বলে তিনি কোথায় যে আত্মগোপন করে আছেন, তা কেউ জানে না। বললাম, তা হলে আমি পারব না।

পরদিন চম্পা মিশিরকে সঙ্গে নিয়ে হাজির হল সে।

চম্পা মিশির এসেই আমাকে আদেশের ভঙ্গিতে বললেন, খুন লে লিজিয়ে ডাক্‌টার সাহেব।

আমি পুনরায় অক্ষমতা জ্ঞাপন করতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু চম্পা মিশির হাত তুলে ঈষৎ অধীরভাবে যা বললেন, তার ভাবার্থ—আমি এ বিষয়ে পরে আপনার সঙ্গে কথা বলছি, আপনি রক্তটা তো আগে নিয়ে নিন। অনিচ্ছাসত্ত্বেও ভাসারম্যান টেস্টের জন্য নিলাম খানিকটা রক্ত।

মিশিরজি লোকটার দিকে ফিরে বললেন, ফিস্‌ রাখখো। লোকটি একটি একশো টাকার নোট আমার সামনে রাখল। আমি আবার বলতে যাচ্ছিলাম যে, একশো টাকা এর ফী নয়। মিশিরজি আবার হাত তুলে বারণ করলেন আমাকে। আদেশের ভঙ্গিতে আবার বললেন, উঠা লিয়া যায়। তুলে নিলাম নোটটা।

মিশিরজি তখন সেই লোকটার দিকে ফিরে বললেন, অব তুম্‌ যাও।

চলে গেল সে।

তখন আমি মিশিরজিকে বললাম, আপনি যা বলছেন তা তো করা অসম্ভব। ওর রক্ত দেখে ওর শ্বশুরের—

মিশিরজি বললেন, আপনি ওরই রক্তে দোষ আছে কি না দেখুন। কিন্তু রিপোর্ট
সিং।
দেবেন পি. সিং—এই নামে। ওর নাম প্রয়াগ সিং, ওর শ্বশুরের নাম প্রাণেশ্বর

আমি বললাম, এ রকম চাতুরীর অর্থ কি!

মিশিরজি তখন যা বললেন তার ভাবার্থ হচ্ছে, এ লোকটির ছেলে হয়ে হয়ে মরে যাচ্ছে। সিভিল সার্জন বলেছেন—হয় এর রক্তে, না হয় এর স্ত্রীর রক্তে, কিংবা উভয়েরই রক্তে সিফিলিসের বিষ আছে। কিন্তু এরা দুজনেই হলফ করে ঘোষণা করেছে যে এদের চরিত্র স্ফটিকের মতো নির্মল। ওর স্ত্রী তো রক্ত পরীক্ষাই করাতে চায় না। যদি কিছু বেরিয়ে পড়ে, ভয়ানক কলঙ্ক রটে যাবে একটা। মানী বংশ ওদের। সব দিক বাঁচাতে হবে। তখন আমার মাথায় এই বুদ্ধিটা খেলে গেল। পলাতক খুনী শ্বশুরের ঘাড়ে দোষটা চাপালে সবদিক রক্ষে হয়। এ ছোকরার রক্তে দোষ পাবেন আপনি। কারণ, ও বাইরে সাধু সেজে থাকে, কিন্তু আমি জানি, ও ডুবকি মেরে জল খায়। আপনি রিপোর্ট দেবেন পি. সিং—এই নামে।

বললাম, কিন্তু একশো টাকা তো আমার ফী নয়!

তা-ও জানি আমি। এটা ওর জরমানা, ঝুট বলেছে বলে।

রক্তে দোষ ছিল। চিকিৎসার পর ছেলেও হয়েছিল ওদের। ছেলের অন্নপ্রাশনে আমি নিমন্ত্রণ খেয়েছিলাম। গরদের জোড় দিয়ে প্রণাম করেছিল আমাকে প্রয়াগ সিং।

মিশিরজি সম্বন্ধে নানা ঘটনা মনে পড়ছে।

আর একটা ঘটনা বলি। একবার বাড়িতে এসেছিলেন। চা দিতে গেলাম, বললেন চা খান না।

শরবৎ আনিয়ে দেব?

তা দিতে পারেন।

শরবৎ যখন এল, তখন বললেন, আপনি খাবেন না?

আমার তো চিনি খাওয়ার উপায় নেই। ডায়াবিটিস আছে—

শরবৎটি শেষ করে মুখ মুছে বললেন, ইয়ে বাৎ? চিনিসে আপকো ঝগড়া হ্যয়, আচ্ছা, বিনা চিনিসেই আপকো শরবৎ পিলাউংগা—

তার পরদিন এক ঝুড়ি বড় বড় লেবু নিয়ে এসে হাজির হলেন। বললেন, এর নাম হচ্ছে শরবতিয়া লেবু। দুটো লেবুর রস গেলে এক গ্লাস জলে দিয়ে দিন, এক গ্লাস শরবৎ হয়ে যাবে, চিনি দিতে হবে না। দেখলাম, সত্যিই তাই। অবশ্য এত মিষ্টি লেবুও ডায়াবিটিস-রোগীর পক্ষে অচল, কিন্তু সে কথা তাঁকে বলি নি। পরে তিনি শরবতিয়া লেবুর গাছও একটা দিয়েছিলেন আমাকে। আমার হাতার একধারে এখনও আছে বোধ হয় সেটা।

মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে আমাকে ডেকেছিলেন একবার।

আমাকে দেখেই হেসে বললেন, চিকিৎসার জন্যে নয়, শেষদেখা করার জন্যে ডেকেছি। এবার আর মকদ্দমায় জেতবার আশা নেই। মহাকালের শমন এসেছে, যেতেই হবে। ডাক্তারের সার্টিফিকেটে কাজ হবে না—

তারপর একটু থেমে বললেন, যাওয়ার আগে আপনাকে একটা অনুরোধ করে যাচ্ছি, যদি পারেন, কিছু ব্যবস্থা করে দেবেন। এখানে রমজান বলে একটা গরিব লোক আছে। ভেড়া আছে তার একটা। ভেড়াটা আগে খুব ভাল লড়ত। রমজান ওকে লড়িয়ে রোজগার করত কিছু। কিন্তু গত দু বাজিতে হেরে গেছে ভেড়াটা। রমজান বলছে, ও দানা হজম করতে পাচ্ছে না, তাই কম-জোর হয়ে গেছে। এখানে কাছেপিঠে তো ভাল পশুচিকিৎসক নেই। আপনি কি ব্যবস্থা করতে পারবেন কিছু? লোকটা গরিব, ওই ভেড়া-লড়িয়েই রোজগার করত—

বললাম, আচ্ছা, দেখব চেষ্টা করে।

দু দিন পরে খবর পেলাম মিশিরজি মারা গেছেন।

মানুষেরই ওষুধ দিয়েছিলাম ভেড়াটাকে। বাজি জিতেছে যখন, উপকার হয়েছে নিশ্চয়ই।

মনে হচ্ছে, চম্পা মিশিরের মতো লোকেরা কোথায় গেল, যারা কেবব দুর্বল মানুষদেরই সাহায্য করত, বাঙালী, বিহারী, হিন্দু, মুসলমান—এ সব ভেদ ছিল না যাদের কাছে…?

বাড়ি ফিরে দেখলাম, শবরতিয়া লেবুর গাছটা শুকিয়ে যাচ্ছে। তার চারদিক খুঁড়িয়ে, সার দিয়ে, জল দেওয়ালাম ভাল করে। গাছটাকে বাঁচাতেই হবে।

ত্রি-ফলা

সুরেন্দ্রনাথ একটি খাতা খুলিয়া পড়িতেছিলেন ঃ—

শুকরির সঙ্গে দেখা হল মাছের বাজারে। কোলে একটি ফুটফুটে মেয়ে, ওরই মেয়ে। আমাকে দেখে একটু সলজ্জ হাসি হেসে একপাশে সরে দাঁড়াল। আমি ওর মেয়েটির গাল টিপে আদর করলুম একটু। শুকরি যেন কৃতার্থ হয়ে গেল। আমার মনে হল, যাক শুকরির মুখে আবার হাসি ফুটেছে তা হলে।

শুকরি মেথরের মেয়ে। আমি যখন প্রথম এসে ল্যাবরেটারি খুলি তখন ওর ঠাকুরদা মুননিকে আমি বাহাল করেছিলাম। তখন শুকরির বাপ সিতাবীই ছেলেমানুষ। সতেরো-আঠারো বছর বয়স, বিয়ে হয়নি তখনও। মুননি মদ খেত খুব, গাঁজাও। ছোট ছোট চোখদুটি জবাফুলের মতো লাল হয়ে থাকত সর্বদা। কিন্তু কখনও বেচাল হয়নি, কখনও বেয়াদপি করেনি। মদ, গাঁজা খেত বটে, কিন্তু খাওয়াটা যে অন্যায়, এ বোধটা তার ছিল। সর্বদাই যেন একটু অপ্রস্তুত হয়ে থাকত। একদিন মুননির বউ রঙীন-কাপড়-পরা ঘোমটা-দেওয়া একটি মেয়েকে নিয়ে এল আমার বাড়িতে। বললে, সিতাবীর বিয়ে দিয়েছি হুজুর, দেখুন, কনিয়া কেমন হয়েছে। গোড় লাগ—। নববধূ আমাকে, আমার স্ত্রীকে প্রণাম করে বখশিশ নিয়ে চলে গেল। বেশ বউটি। সত্যিই রূপসী। অমন রূপ ভদ্রঘরেও সচরাচর দেখা যায়। কতদিন আগেকার কথা, অথচ মনে হচ্ছে, যেন সেদিন। সিতাবীর বিয়ে হওয়ার কিছুদিন পরেই মুননি মারা গেল। তার কিছুদিন পরে মুননির বউও। সিতাবী তখন বাহাল হল তার বাপের জায়গায়। আমার চোখের সামনেই ওই শুকরির জন্ম হয়েছে। আমার ল্যাবরেটারির বারান্দাতে ও হামাগুড়ি দিয়েছে, তারপর বড় হয়ে উঠেছে ক্রমশঃ। তারপর বিয়ে হল ওর একদিন। কোলকাতার এক মেথর এসে বিয়ে করে নিয়ে গেল ওকে। মাঝে মাঝে খবর পেতাম, ও সুখে আছে। কলকাতার মেথররা ধর্মঘট করে মাইনে বাড়িয়ে নিয়েছে, ওদের পাকা ঘর-বাড়ি। এর কিছুদিন পরে সিতাবীর বউ মারা গেল যক্ষ্মায়, সিতাবী আবার বিয়ে করল। বেশী মাইনের লোভে আমার চাকরি ছেড়ে মিউনিসিপ্যালিটিতে ঢুকল। ওদের কথা ভুলেই গিয়েছিলাম প্রায়।

প্রায় বছরতিনেক পরে একদিন সকালে দেখি, শুকরি আমার বাড়ির উঠোনের একধারে বসে আছে। মুখে হাসি নেই, চুল উসকো-খুসকো। পরনের কাপড়টা রঙীন বটে, কিন্তু ছেঁড়া।

"কি রে, কবে এলি ?"

শুকরি মাথা নীচু করল।

"কবে এলি তুই, তোর ছেলে হয়েছে শুনেছি, ছেলে কই—"

শুকরির মাথাটা আরও নীচু করলে। দেখলাম, কাঁদছে।

“কি হল তোর? বল না, কি হয়েছে—”

অনেক জেরার পর জানা গেল, শ্বশুরবাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছে সে।

স্বামী পাগল। ছেলেটাকে কেড়ে রেখে দিয়েছে ওরা।

আমার গিন্নী কিছু খেতে দিলেন ওকে। বাড়িতে কিছু বাসি মাংস আর রুটি ছিল। শুকরি বসে বসে সেগুলি খেলে। খাবার পরও বসে রইল।

“কি রে, আরও খাবি?”

শুকরি মাথা নেড়ে জানালে, খাবে। পারত-পক্ষে কথা বলতে চায় না, কারণ, তোৎলা।

আরও দুখানা রুটি খেলে। তবু নড়ে না। খানিকক্ষণ পরে আসল মনোভাবটি ব্যক্ত করলে।

“কা-কা-পড়া দে একটো—”

একটা শাড়ি দিলেন গিন্নী, পুরোনো রঙীন শাড়ি। তবু উঠতে চায় না। আরও আট আনা পয়সা নিয়ে তবে উঠল।

…দিনদশেক পরে দেখলাম, শুকরি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে। একেবারে অন্যরকম চেহারা। রঙীন শাড়িটি বেশ কায়দা করে পরেছে, যৌবনশ্রী ফুটে উঠেছে শাড়িটির ভাঁজে ভাঁজে। মাথায় তেল দিয়ে পরিষ্কার করে চুল আঁচড়েছে, সিঁদুর পরেছে, হাতে পরেছে কাঁচের বাহারে চুড়ি একগোছা। চোখে, মুখে হাসি ঝলমল করছে।

তারপর ভুলেই গিয়েছিলাম ওর কথা।

মাসদুই পরে খবর পেলাম—(আমার মেথরটাই খবর দিলে)—শুকরি ডোমনের সংগে ফেঁসে গেছে, তার বাড়িতে গিয়েই আছে নাকি।

ডোমন আর একটি মেথর, বিবাহিত।

এরও মাসখানেক পরে, আবার একদিন দেখি, শুকরি মাথা নীচু করে বসে আছে এসে আমাদের উঠানে, গিন্নী যৎপরোনাস্তি ভর্ৎসনা করছেন তাকে। কাঁদছে সে। শুনলুম, ডোমনের প্রথম বউ শুকরিকে মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে। শুকরি তার বাবার কাছে ফিরে এসেছিল, কিন্তু তার বাবাও দূর করে দিয়েছে তাকে, কারণ সে অন্তঃসত্ত্বা। তাকে ঘরে স্থান দিলে সমাজে একঘরে হতে হবে। সুতরাং, অকুল পাথারে পড়েছে শুকরি।

গিন্নী আমার দিকে চেয়ে বললেন, তুমি এর ব্যবস্থা কর একটা। তা না হলে ও মুখপুড়ি আমাদের বাড়িতেই আড্ডা গাড়বে এসে।

মেথরদের উপর কিঞ্চিৎ প্রভাব ছিল আমার, কারণ মিউনিসিপ্যালিটির হেলথ অফিসার ডাক্তার সেন আমার বিশেষ বন্ধু ছিলেন। তাঁর সহায়তায় সিতাবী, ডোমন এবং আরও জনকয়েক প্রবীণ মেথরকে ডেকে পাঠালাম। ছোটখাটো একটা সভা হল আমার বৈঠকখানায়। সেই সভায় স্থির হল যে, শুকরির বেচালের জন্যে সিতাবীকে পঁচিশ টাকা জরিমানা দিতে হবে। এ টাকায় ভোজ হবে একটা। শুকরি সকলের সামনে কান মলে, নাক মলে বলবে যে, এমন কাজ সে আর কখনও করবে না। এক স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও ডোমন শুকরিকে বিয়ে করবে। ডোমনের প্রথম স্ত্রীর সংগে শুকরি যদি মানিয়ে না চলতে পারে, তা হলে ওর ভরণপোষণের দায়িত্ব নিতে হবে

সিতাবীকে। ডাক্তার সেন বললেন, শুকরিকে মিউনিসিপ্যালিটিতে চাকরি করে দেবেন একটা। সুতরাং তাই হল। শুকরি পঞ্চায়েতের সামনে নাক-কান মলে প্রতিজ্ঞা করল যে, সে আর বিপথে যাবে না।

আজ আবার মাছের বাজারে দেখলুম, শুকরির মুখে আবার হাসি ফুটেছে।

কোলের মেয়েটা বোধ হয় ডোমনের মেয়ে। হঠাৎ আর একটা ঘাড়-ছাঁটা মেথর ছোঁড়া শুকরির পাশে এসে দাঁড়াল। তার হাতে একটা ইলিশ মাছ। ডোমন নয়, আর একজন। আমাকে সেলাম করে গেল তারা। বুঝলাম, হারামজাদি আবার একটা জুটিয়েছে কাকে, আবার ফ্যাসাদ বাধাবে।

মনে হল এদের নীতি-কথা বলে সংশোধন করা শক্ত। তার চেয়ে জন্ম-শাসন সম্বন্ধে কিছু উপদেশ দিলে হয়তো সমাজের উপকার হয়—

এই পর্যন্ত পড়িয়া সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার ঠাকুরদার ডায়েরিটা সশব্দে বন্ধ করিয়া দিলেন।

বন্ধু বিকাশের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "শুকরি কিন্তু ঠাকুরদার উপদেশ শোনে নি। চোদ্দটা ছেলেমেয়ে হয়েছিল তার। তুমি যে কিষুণের কাছে ইলেকশনে হেরে গেছ, সে ওই শুকরিরই ছেলে—"

"তাই নাকি ?"

"হ্যাঁ আমরা ভদ্রলোকেরা জন্মশাসন করে সংখ্যায় কমে যাচ্ছি, আর ওরা কিছু না করে সংখ্যায় হু হু করে বেড়ে যাচ্ছে। সংখ্যাধিক্যই যখন যোগ্যতার মাপকাঠি আজকাল, তখন আমাদের পরাজয় অনিবার্য।"

জগদীশ হাসিয়া বলিলেন—"কিন্তু যাই বল ভাই, এ যুগে জন্মশাসন না করলে চলা অসম্ভব। আমি অন্ততঃ মরে যেতুম।"

সুরেন্দ্রনাথের বড় ছেলে বিনয় বাড়ির ভিতর হইতে ছুটিয়া আসিল।

"বাবা, শিগগির এস, পিসিমা ডাকছে।"

সুরেন্দ্রনাথ ভিতরে চলিয়া গেলেন।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে প্রবেশ করিলেন জগদীশ-পত্নী শ্রীমতী সবলা দেবী।

সাজে-পোশাকে, ভাব-ভঙ্গিতে অতি-আধুনিক।

স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কি আশ্চর্য, তুমি এখানে বসে আড্ডা দিচ্ছ ! তুমি বাড়িতে না থাকলে আমি মিটিংয়ে যাব কি করে—"

"ওহো, একেবারে ভুলে গেছি। চল।"

নমস্কারাদি বিনিময়ের পর স্বামীকে লইয়া শ্রীমতী সবলা চলিয়া গেলেন।

বিকাশের দিকে চাহিয়া অবনী বলিলেন—"জন্মশাসন করলে কি হয়, তার দু রকম নমুনা পাওয়া গেল আজ ! বিকাশ ইলেক্‌শনে হারল, জগদীশ সুখে আছে—"

"কেন, তৃতীয় নমুনাও তো দেখলে, ওই সবলা দেবী। বছর বছর ছেলে হলে, ও মিটিং করে বেড়াতে পারত কি ?"

"জন্মশাসন তা হলে ত্রি-ফলা, তিন রকম ফলের সম্ভাবনা আছে ওতে—"

বিকাশ বলিলেন, "শংকরির মেয়েটিকে কিন্তু ভারি ভাল লাগল। সুরেনের ঠাকুরদা বেড়ে লিখতে পারতেন তো—"

সুরেন্দ্রনাথ হন্তদন্ত হইয়া অন্দরমহল হইতে ফিরিলেন ;

"অবনী গোটা পঞ্চাশেক টাকা ধার দিতে পারবে—"

"তা পারব। হঠাৎ টাকার কি দরকার পড়ল—"

"আমার বউয়ের কাল থেকে ব্যথা ধরেছে। ডাক্তার ডাকতে হবে—"

"ও—"

অবনী বড়লোকের ছেলে। অবিবাহিত। পকেটে সর্বদা টাকা থাকে।

অবিলম্বে পঞ্চাশটি টাকা বাহির করিয়া দিলেন !

"আমি ডাক্তারের কাছে চললুম—। তোমরা বস। চা করতে বলেছি"—সুরেন্দ্রনাথ চলিয়া গেলেন।

অবনী একটি সিগারেট ধরাইয়া রিং করিতে করিতে বলিলেন, "দেখ, জন্মশাসন না করলে যা হয়, তাও দেখছি ত্রিফলা। ধর্ম, অর্থ, কাম। আমাদের সুরেনের কথাই ধর। খাঁটি ধার্মিকলোক, নিষ্কলঙ্ক-চরিত্র। বারোটি সন্তান যখন, কাম ওর চরিতার্থ হয়েছে। অর্থটা যদিও এখন মাইনাসের দিকে চলছে, কিন্তু ওর আটটা ছেলে যদি মানুষ হয়, চারটেও যদি হয়, তা হলে অর্থও হবে—"

চাকর চা লইয়া প্রবেশ করাতে আলোচনা আর বেশীদূর গড়াইল না।

অতি-ছোট গল্প

দীপ-শিখা নিষ্কম্পভাবে জ্বলছিল। মনে হচ্ছিল, যেন অধীরভাবে কার প্রতীক্ষা করছে। আর আকুল আগ্রহই যেন অচঞ্চল করেছিল তাকে। একটু পরেই ধীরে ধীরে সে কাঁপতে লাগল। এসেছে, হাওয়া এসেছে। কাঁপুনি বেড়ে গেল তার। মনে হতে লাগল, হাওয়ার বাহুপাশে আত্মহারা হয়ে পড়েছে সে বুঝি।

দীপ-শিখা। ছেড়ে দাও, ও কি করছ ?

হাওয়া। আমাকে ছেড়ে কি থাকতে পারবে তুমি ? বিজ্ঞানীরা কি বলেছেন জানো ?

দীপ-শিখা। কি ?

হাওয়া। আমার মধ্যে না কি অক্সিজেন-নামে একরকম গ্যাস আছে। সেই গ্যাসই নাকি মূর্ত করেছে তোমাকে শিখা-রূপে। আমি না থাকলে, তুমিও থাকতে না।

দীপ-শিখা। ইস্—। কি করছ তুমি—

হাওয়ার বেগ বাড়ল। দীপ-শিখা কাঁপতে লাগল অসহায়ভাবে।

ঘরের আর এক কোণে।

"ছিঃ, কি করছ—"

"কি ভণ্ড তুমি ! এইজন্যেই তো জেগে আছ !"

"ছাড়, ছাড়। ঘরে আলো রয়েছে, বড্ড লজ্জা করছে আমার—"

"আলোটা নিবিয়ে দাও তা হলে।"

একটি নিটোল সুন্দর মুখ এগিয়ে এল দীপ-শিখার কাছে।

একটি ফুৎকারে নিবে গেল দীপ-শিখা।

"বড্ড জোর হাওয়া আসছে। জানলাটা বন্ধ করে দি ?"

"দাও—"

দড়াম্‌ করে বন্ধ হয়ে গেল জানলাটা।

নাক

কথিত আছে, নাকের জোরেই ক্লিওপেট্রা নাকি বড় বড় বীরদের ঘায়েল করিয়াছিলেন। স্বক্ষেত্রে স্বনামধন্য বীর পাঁচুগোপাল আইচ মহাশয়ও নাকের জন্যই ঘায়েল হইলেন।

শ্রীপাঁচুগোপাল আইচ একটি আপিসের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। "রাখিলে রাখিতে পার, মারিলে কে করে মানা"—এ কথা তাঁহার সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। তাঁহার আপিসে সকলেই তাঁহার ভয়ে তটস্থ। কেবল এক গণেশপ্রসাদ আইচ ছাড়া। আইচ পদবী দেখিয়াই ছোকরাকে পাঁচুগোপালবাবু বাহাল করেন। আইচদের সম্বন্ধে তাঁহার কিছু দুর্বলতা আছে। ইণ্টারভিউ করিবার সময়ও ছোকরাকে তাঁহার ভালো লাগিয়াছিল। বাটারফ্লাই ছাঁটের গোঁফটা যদিও তেমন পছন্দ হয় নাই, কিন্তু তাহার কথাবার্তা, চটপটে চাল-চলন, চমৎকার হাতের লেখা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। নামটিও ভালো, গণেশপ্রসাদ আইচ। কিন্তু ক্রমশঃ তাঁহার মুগ্ধভাবটা কাটিয়া যাইতেছে। ছোকরার ডাক-নাম নাকি পিংপং! একদিন লক্ষ্য করিলেন, আপিসে ঢিলা পায়জামা, চুড়িদার পাঞ্জাবি এবং লখনৌ-শহর-জাত শুঁড়-ওলা নাগরা পরিধান করিয়া আসিয়াছে। তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ বাপু, এটা আপিস। তোমার বৈঠকখানাও নয়, শ্বশুরবাড়িও নয়। হয়, সাহেবী পোশাক পরে এসো, তা না পার, ভদ্র বাঙালী হলেও চলবে। তার মানে, কাপড়ের ওপর গলাবন্ধ কোট বা ভদ্র কামিজ বা পাঞ্জাবি। ফুটানি করবার জায়গা এটা নয়।"

পিংপং বলিল, "এ সম্বন্ধে কি কোনও আইন আছে ?"

শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন পাঁচুগোপালবাবু। তাঁহাকে আইন দেখাইতে আসিয়াছে!

বলিলেন, "এ আপিসে আমার কথাই আইন। যা বললাম, তাই কোরো। নইলে চাকরি থাকবে না।"

"এ তো আশ্চর্য কাণ্ড দেখছি।"

ছোকরা গজগজ করিতে করিতে চলিয়া গেল।

ইহার দিনসাতেক পরে পাঁচুবাবু একদিন সিনেমা দেখিতে গিয়াছেন, হঠাৎ নজরে পড়িল, তাঁহার ঠিক সামনের সিটেই পিংপং বসিয়া আছে। সিগারেট খাইতেছে। তাঁহাকে দেখিয়া জ্বলন্ত-সিগারেট-সুদ্ধ হাতটা তুলিয়া অভিবাদন করিল, কিন্তু

সিগারেটটা ফেলিয়া দিল না। তাহার নাকের উপর ধোঁয়া ছাড়িয়া একটার পর একটা সিগারেট ফুঁকিতে লাগিল। পাঁচুগোপাল গুম হইয়া বসিয়া রহিলেন। তাঁহার সন্দেহ রহিল না যে, ছোকরা যথার্থই আইচ-কুল-কুলাঙ্গার।

পরদিন আপিসে গিয়াই তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

"দেখ, তোমাকে টেম্পোরারি হ্যাণ্ড হিসেবে নিয়েছিলাম। কিন্তু তোমার কাজ-কর্ম, চাল-চলন কিছুই আমার পছন্দ নয়, তুমি অন্যত্র কাজের চেষ্টা দেখো, আমরা তোমাকে পার্মানেন্ট করব না।"

পিংপং স্থিরদৃষ্টিতে কয়েকমুহূর্ত তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পর পকেট হইতে একটি সুবাসিত রঙীন রুমাল বাহির করিয়া কপাল ও মুখটা মুছিয়া ফেলিল। তাহার পর মৃদু হাসিয়া বলিল, "অনেক ধন্যবাদ—"

নমস্কার করিয়া চলিয়া গেল। পাঁচুগোপাল গুম হইয়া বসিয়া রহিলেন। ইহার দিন-তিনেক পরে পিংপং যাহা করিল, তাহা আরও বিস্ময়জনক। আপিসে আসিয়া বলিল, "আমি আর একটি চাকরির যোগাড় করেছি। সেটা এ চাকরির চেয়ে ভালো। মাইনে প্রায় দেড়গুণ, কাজ অর্ধেক। সাহেবী ফার্ম। তবে আপনি রেকমেণ্ড না করলে সে চাকরি হবে না। আমি দরখাস্তটা লিখে এনেছি, আপনি রেকমেণ্ড করে দিন—"

ছোকরার স্পর্ধা দেখিয়া অবাক হইয়া গেলেন পাঁচুগোপাল।

"সরি, আমি রেকমেণ্ড করতে পারব না।"

ভ্রূযুগল কপালে উৎক্ষিপ্ত করিয়া পিংপং বলিল, "সে কি!—"

"না, আমি মিছেকথা লিখতে পারব না।"

পিংপং গটগট করিয়া বাহির হইয়া গেল। তাহার পরদিন আপিসেও আসিল না। পাঁচুগোপাল স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন। কিন্তু দিনতিনেক পরেই আবার তাঁহাকে নিঃশ্বাসটি টানিয়া লইতে হইল। তিনদিন পরে লম্বা খামে তাঁহার নামে একটি পত্র আসিল। খামটি খুলিয়া দেখিলেন, পিংপং সেদিন যে দরখাস্তটি রেকমেণ্ড করাইবার জন্য আনিয়াছিল, সেইটি রহিয়াছে, আর রহিয়াছে মেয়েলী-হাতের লেখা একখানি চিঠি।

ভাই পাঁচু,

আমাকে আশা করি, এতদিনে সম্পূর্ণ ভুলে গেছ। ভোলাটাই স্বাভাবিক, যদি ভুলে থাক, তোমাকে দোষ দেব না। আমাকে অনেকেই ভুলেছে। তোমার হাত ধরেই আমি সর্বপ্রথম অকূলে ভেসেছিলাম, তুমি হাত ছাড়িয়ে নিয়ে চলে গেছ, কিন্তু আমি আর কূলে উঠতে পারি নি। অনেকে আবার এসে আমার হাত ধরেছে, আবার ছেড়ে দিয়ে চলেও গেছে। এমনিই হয়। পুরুষমানুষরা পদ্মপত্রের মতো, তাদের গায়ে বা মনে জল দাঁড়ায় না, এমন কি চোখের জলও নয়। তুমি এখন মানী, পদস্থ ব্যক্তি হয়েছ, আমার সঙ্গে তোমার যে কি সম্পর্ক ছিল, তা সবাই ভুলে গেছে, এমন কি তুমিও ভুলে গেছ। কি সব বাজে কথা লিখলুম, আসল যে কথাটা বলবার জন্যে এই চিঠি লিখছি, সেইটেই আগে বলি। পিংপং আমার ছেলে। ওর বাবা কে, তা আমি হলফ করে বলতে পারব না, কিন্তু আমার ধারণা, তুমিই ওর বাবা, তাই ওর আইচ পদবী দিয়েছি। তাই তোমার আপিসে ও কাজ পেয়েছে শুনে খুব খুশী হয়েছিলাম। এখন শুনছি, ওকে নাকি তোমার তেমন ভালো লাগে নি, তাই ওকে নোটিশ

দিয়েছ। আর একটা আপিসে ও চাকরি যোগাড় করেছে, কিন্তু তুমি সুপারিশ না করলে সে চাকরি ওর হবে না। দরখাস্তটি এই সঙ্গে পাঠালুম, দয়া করে একটু সুপারিশ করে দিও। ওই আমার একমাত্র সন্তান, একমাত্র ভরসা। ও যদি রোজগার করতে না পারে, আমাকে উপবাস করতে হবে। কারণ, আমি এখন অসমর্থ, আর রোজগার করতে পারি না। আমার আন্তরিক ভালবাসা নিও। আর, দয়া করে একটু সুপারিশ করে দিও লক্ষ্মীটি।

ইতি—তোমারই সুশী।

নীচে ঠিকানা দেওয়া ছিল। হাড়কাটা গলির ঠিকানা।

পত্রটি পাঠ করিয়া পাঁচুগোপাল নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। তাঁহার চোখের সামনে হইতে ত্রিশ বৎসরের যবনিকা সরিয়া গেল। তিনি স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন—দ্বিতলের একটি জানালায় ষোড়শী সুশীলা দাঁড়াইয়া আছে। পানের মতো মুখখানি, তাহার উপর বাঁশীর মতো নাকটি। প্রথমে নাকটাই তাঁহার চোখে পড়িয়াছিল, নাক দেখিয়াই তিনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন। মনে পড়িল—ওই-নাক, সই-নাক, মৈনাক, কই-নাক, প্রভৃতি মিল মিলাইয়া দীর্ঘ একটি কবিতাও তিনি লিখিয়াছিলেন। সব মনে পড়িল। দরখাস্তটির দিকে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া চাহিয়া রহিলেন খানিকক্ষণ। তাহার পর জোর কলমে সুপারিশ করিয়া দিলেন।

দিনদুই পরে সন্ধ্যার পর পাঁচুগোপাল হাড়কাটা গলিতে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং খুঁজিয়া সুশীলার বাড়িটা বাহির করিলেন। একটি স্থবিরা চাকরাণী বাহির হইয়া আসিল।

"সুশীলা কি এইখানে থাকে—"

"হ্যাঁ।"

"পিংপং বাড়িতে আছে—"

"না, তিনি বেরিয়ে গেছেন। রাত বারোটার আগে ফিরবেন না।"

"সুশীলাকে বল, পাঁচুগোপালবাবু এসেছেন—"

চাকরাণী একটু পরেই আসিয়া তাঁহাকে ভিতরে ডাকিয়া লইয়া গেল। পাঁচুগোপালবাবু দেখিলেন, একটি অবগুণ্ঠনবতী প্রৌঢ়া আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতেছে।

"এ কি সুশীলা, ঘোমটা কেন—! ঘোমটা খোল।"

সুশীলা ক্ষণকাল নতমস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর ঘোমটা সরাইয়া দিল। পাঁচুগোপালবাবু আঁৎকাইয়া উঠিলেন। সে নাক নাই, নাকের জায়গায় প্রকাণ্ড একটা গর্ত।

বিশ্বাস মশাই

আমরা আগ্রার তাজমহল দেখব বলেই বেরিয়েছিলাম। কিন্তু আগ্রার বাঙালী বন্ধুবান্ধবেরা বলেন, "এতদূর যখন এসেছেন, তখন হরিদ্বারটাও দেখে যান।"

আমাদের তত ইচ্ছে ছিল না। কারণ, প্রথমতঃ টাকা কমে গিয়েছিল; দ্বিতীয়তঃ, অত বড় পরিবার এবং লটবহর নিয়ে ঘোরা-ফেরা করবার আর উৎসাহ পাচ্ছিলাম না। আমাদের দলে যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, বালক-বালিকা সবই ছিল, আর প্রত্যেকের বিবিধরকম বায়নাক্কা। কেউ ঝাল পছন্দ করে, কেউ করে না; কারও বাথরুম না হলে স্নানের সুবিধা হয় না; বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা ম্লেচ্ছ চার পছন্দ করেন না; ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে গেলে মেজাজ বিগড়ে যায় তাঁদের; দু-তিনটে ছেলে অসুখে পড়ে গেল। আর টাকা তো জলের মতো খরচ হচ্ছিল। তাই ভাবছিলাম, এখন ঘরের ছেলে ভালয় ভালয় ঘরে ফিরতে পারলেই বাঁচি। কিন্তু আগ্রার বন্ধুরা একেবারে না-ছোড়। টাকা কমে গিয়েছে শুনে তাঁরা কিছু টাকা ধার দিতেও উদ্যত হলেন। তাঁদের বললাম, "হরিদ্বারে কাউকে তো চিনি না। এখানে আপনারা ছিলেন—কোনো অসুবিধা হয়নি।"

একজন বন্ধু বললেন, "হরিদ্বারেও হবে না, সেখানে বিশ্বাস মশাই আছেন—"

"বিশ্বাস মশাই কে?"

"গেলেই বুঝতে পারবেন।"

যদিও প্রত্যেকটি লোক অসুবিধা ভোগ করছিল, তবু হরিদ্বারের নামে উৎসাহিত হয়ে উঠল সবাই। বিশেষ করে, বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা। শেষটা, বন্ধুদের কাছ থেকে টাকা ধার করে যাওয়াই স্থির করলাম। হুজুকে-বাঙালী আর কাকে বলে!

॥ দুই ॥

হরিদ্বারে পেঁছিলাম ভোরে। তখনও অন্ধকার ভাল করে কাটে নি। জানলা দিয়ে খুব আশাভরে মুখ বাড়ালাম, ভাবলাম, কোনও অপরূপ দৃশ্য বুঝি চোখে পড়বে। কিন্তু সংগে সংগে মুণ্ড টেনে নিতে হল। বৃষ্টি পড়ছে, কনকনে শীত। প্যাসেঞ্জার-কুলি ভিজে-ভিজেই ছুটোছুটি করছে প্যাচপেচে প্ল্যাটফর্মে। দমে গেলাম বেশ। মালপত্র আর সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে আমাকেও নামতে হবে এর মধ্যে। বিদেশে কুলিরাই বন্ধু। তাদেরই সাহায্যে নেমে পড়লাম অবশেষে। নেমে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজতে লাগলাম। কোথায় আশ্রয় মিলবে, কিছু জানা ছিল না। অবিলম্বে কয়েকটা পাণ্ডা এসে ঘিরে ধরল এবং কোথায় বাড়ি, পিতার নাম কী, পিতামহের নাম কী, কোনও পাণ্ডা ঠিক করা আছে কি না, প্রভৃতি প্রশ্ন করে অস্থির করে তুলল সকলকে। কী করব, দিশাহারা হয়ে ভাবছিলাম, এমন সময়ে বিশ্বাস মশাইয়ের কথা মনে পড়ল। একটা কুলিকেই জিজ্ঞেস করলাম, "আচ্ছা, বিশ্বাস মশাই কোথা থাকেন জান?"

"ওই তো বিশ্বাসবাবু। এ বিশ্বাসবাবু, এ বিশ্বাসবাবু, ইধর আইয়ে—"

কুলির ডাকে যিনি এসে দাঁড়ালেন, তাঁর চেহারা দেখে তো চক্ষুঃস্থির হয়ে গেল। এরই ভরসায় আমরা এসেছি! এ যে ভিখারী একটা! পরনে আধময়লা জামাকাপড়, পায়ে শতছিন্ন ময়লা কেডস। মাথার চুলগুলো লম্বা লম্বা এবং অবিন্যস্ত, গোঁফ-দাড়িও আছে, তাও কেমন যেন খাপছাড়াগোছের, বেশ ঘনসন্নিবদ্ধ নয়, এখানে চারটি, ওখানে চারটি, ছড়ান-ছড়ান। রংটি কুচকুচে কালো। হাতদুটি জোড় করে সামনে এসে দাঁড়ালেন। চোখদুটি ছোট ছোট, কিন্তু অপরূপ। যে বিনয়, ভদ্রতা এবং স্নিগ্ধতা

ঝরে পড়ছিল সে-চোখের দৃষ্টি থেকে, তা আজকাল দুর্লভ। অথচ ভদ্রলোকের বেশবাস এমন কুৎসিত কেন। অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম তাঁর দিকে।

"আমাকে ডাকছিলেন ?"

নমস্কার করে বললাম, "আগ্রার মতিবাবু আপনার খোঁজ করতে বলে দিয়েছিলেন। আমরা এখানে নতুন এলাম তো, কিছুই জানি না, কাউকে চিনিও না—"

"তা বেশ, চলুন, আমি যথাসাধ্য সাহায্য করব—"

তারপর কুলির দিকে ফিরে বললেন, "কুম্ভকর্ণ পাণ্ডার ওখানে নিয়ে চল—"

বিশ্বাস মশাইয়ের পিছু পিছু আমরা সার বেঁধে চলতে লাগলাম।

বিশ্বাস মশাই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আমার ছোট ছেলেটাকে কোলে তুলে নিলেন। না নিলে ওর জন্যে আর একটা কুলি করতে হত। কুম্ভকর্ণ পাণ্ডার আস্তানায় যখন পেঁছিলাম, তখন কুলিরা পয়সা চাইতে লাগল। সাধারণতঃ কুলিরা যা করে বিদেশী দেখে, খুব বেশী চাইতে লাগল। আমার কাছে দশ টাকার নোট ছিল, খুচরো পয়সা ছিল না, তাই বেশ একটু বিব্রতবোধ করতে লাগলাম।

বিশ্বাস মশাই বললেন, "নোটটা আমাকে দিন—"

অচেনা লোককে নোটটা দিতে একটু দ্বিধা হচ্ছিল প্রথমে, কিন্তু গত্যন্তর ছিল না বলে দিলাম। বিশ্বাস মশাই কুলিদের দিয়ে জিনিসগুলি যথাস্থানে রাখিয়ে বিছানাপত্র পাতিয়ে আমাদের খালি কুঁজো দুটি নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। কুলিরাও তাঁর পিছু পিছু গেল। তারপর যা ঘটল, তাতে অবাক হয়ে গেলাম। কুলিদের গোলমালে ব্যাপারটা এতক্ষণ বুঝতেই পারিনি। গঙ্গার কলকলধ্বনি শোনা গেল। নদী যে কলকলধ্বনি করে, এ-কথা কেতাবেই পড়েছিলাম, কানে শুনি নি কখনও। কুম্ভকর্ণের বাড়িটা ঠিক গঙ্গার উপরই, তাড়াতাড়ি জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখলাম, যেন একটি তন্বী কিশোরী খিলখিল করে হাসতে হাসতে ছুটে চলেছে। গঙ্গার এমন রূপ আর কখনও দেখি নি। খুব কম চওড়া, নীলাভ জল, অত্যন্ত স্বচ্ছ, নীচের বালি পর্যন্ত দেখা যায়। আর, বড় বড় মাছ নির্ভয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম। হঠাৎ হরিদ্বারের মহিমা যেন চোখে পড়ল, গম্ভীর বিরাট কিছু নয়, সজীব, সতেজ, চিরনবীন।

"খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা কোথা করবেন আপনারা—"

ঘাড় ফিরিয়ে দেখি, বিশ্বাস মশাই ফিরে এসেছেন। নোটটি ভাঙিয়েছেন তিনি, কুলিপিছু দু-আনার বেশী দেন নি, কিছু টাকার খুচরো করে এনেছেন, এমন কি চারআনার আধলা পর্যন্ত সংগ্রহ করেছেন। বললেন, "অনেক ভিকিরিকে দিতে হবে কি না।" পাই পয়সা হিসেব দিলেন, তারপর বললেন, "খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা কী করবেন বলুন—"

"কী ব্যবস্থা আছে এখানে ?"

"দোকান থেকে কিনে খেতে পারেন। লুচি, তরকারি পাওয়া যেতে পারে, ভাতও পাবেন একটা হোটেলে। কিন্তু ও-সব কি আপনারা খেতে পারবেন ? দামও নেবে, তৃপ্তিও পাবেন না।"

আমার স্ত্রী বললেন, "এখানে রান্না করার ব্যবস্থা হয় না ? আমাদের স্টোভ আছে—"

"হ্যাঁ মা, খুব হয়। আমি একটা তোলা উনুনেরও ব্যবস্থা করে দিতে পারি—"

"তাই হক, তা হলে। খিচুড়ি আর কিছু ভাজাভুজি করা যাক, বৃষ্টিও নেবেছে, জমবে ভাল।"

সকলে এই ব্যবস্থাতেই রাজি হয়ে গেল।

আমার শালী প্রশ্ন করলেন, "মুগডাল পাওয়া যাবে ?"

"যেতে পারে। তবে এখানে অড়র, বুটই বেশী চলে। আমি চেষ্টা করে দেখব।"

মুগের ডাল এখানে পাওয়া যায় না বলে বিশ্বাস মশাই কুণ্ঠিত হয়ে পড়লেন। এটা যেন তাঁরই অপরাধ।

"মুগ না পাওয়া গেলে, মুশুরি আনবেন। খাঁড়ি মুশুরি হলেই ভাল হয়—"

"চেষ্টা করব। খুবই চেষ্টা করব।"

"তরকারি কি পাওয়া যায় এখানে ?"

"আলু, নেনুয়া, ঝিঙে। পেঁয়াজও পাওয়া যাবে।"

"পটল ?"

আবার কুণ্ঠিত হলেন বিশ্বাস মশাই।

"না, পটল এখানে পাওয়া যাবে না।"

"বেগুন ?"

আরও কুণ্ঠিত হলেন।

"না, বেগুনও নয়।"

হাত কচলাতে লাগলেন ভদ্রলোক।

"লংকা পাওয়া যাবে নিশ্চয় ?" আমার স্ত্রী প্রশ্ন করলেন।

"তা যাবে, তা যাবে।"

উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তাঁর মুখ।

ফোঁস করে উঠলেন আমার বোনটি।

"লংকা পেয়ে আর কাজ নেই। বৌদি খিচুড়িটি ঝালে পুড়িয়ে দেবে তা হলে।"

"তোকে আমি সাবু করে দেব, তাই খাস।"

কিন্তু-কিন্তু মুখ করে দাঁড়িয়ে রইলেন বিশ্বাস মশাই।

আমি তাঁকে গোটাপাঁচেক টাকা দিয়ে বললাম, "যা পান, কিনে আনুন। আমি ততক্ষণ স্টোভ জ্বেলে চায়ের জলটা চড়িয়ে দিই।"

দুটো ঘর নিয়েছিলাম আমরা। একটা ঘরে বাবা, মা ছিলেন।

মা বেরিয়ে এসে বললেন, "আমার বাবা একটু গঙ্গাজল চাই!"

বিশ্বাস মশাই কখন যে কুঁজো দুটি ভরে এনেছিলেন টের পাই নি। বললেন, "দু-কুঁজো জল আমি এনে রেখে দিয়েছি ও-ঘরে।"

"ও কুঁজো বাবা, শতেক জাতে ছুঁয়েছে। একটু শুদ্ধভাবে যদি—"

"আচ্ছা, আনব মা। নতুন কলসী কিনে ভরে আনি তা হলে—"

বিশ্বাস মশাই চলে গেলেন।

আমি স্টোভ জ্বেলে চায়ের জলটা চড়িয়ে দিলাম।

গিন্নী ছোট ছেলের কপালে হাত দিয়ে বললেন, "এর তো বেশ জ্বর হয়েছে, দেখছি—"

মন্তব্য করলাম, "আগ্রাতেই তো ওর জ্বর হয়েছিল। লাফিয়ে তো চলে এলে।"

"আমি লাফিয়ে এলাম, না তুমি লাফিয়ে এলে? পরের ঘাড়ে দোষ চাপান তোমার কেমন একটা স্বভাব—"

দাম্পত্য-কলহের উপক্রম হল।

ছোট ছেলেই থামিয়ে দিলে সেটা।

"না বাবা, আমার কিছু হয়নি। র‍্যাপার মুড়ে শুয়েছিলাম কিনা, তাই কপালটা গরম হয়েছে—"

"খুব হয়েছে, শুয়ে থাক এখন।"

মায়ের ধমক খেয়ে র‍্যাপার মুড়ি দিয়ে সে আবার শুয়ে পড়ল।

একটু পরেই বিশ্বাস মশাই বাজার থেকে ফিরলেন জিনিসপত্র নিয়ে। দেখলাম, আপাদমস্তক ভিজে গিয়েছেন ভদ্রলোক। আমার শালীর দিকে চেয়ে মুচকি হেসে বললেন, "খাঁটি মুশুরিই পেয়েছি, মা। বেশ ভাল ডাল।"

তাঁর পিছনে দেখলাম, পাণ্ডাদের একটা ছোঁড়া নতুন কলসীতে করে গঙ্গাজলও নিয়ে এসেছে মায়ের জন্যে। বিশ্বাস মশাই আমার কাছে এসে কানে কানে বললেন, "আমিই নিয়ে আসতুম গঙ্গাজলটা, কিন্তু আমি তো ব্রাহ্মণ নই। কর্তা-মা যদি আপত্তি করেন, তাই ওকেই বললাম নিয়ে আসতে। গোটাচারেক পয়সা দিলেই চলবে।"

বিশ্বাস মশাই বাইরে দাঁড়িয়ে তাঁর সপসপে ভিজে কাপড়ের কোঁচাটা নিঙড়ে জল বার করতে লাগলেন। কামিজের সামনের দিকটাও নিঙড়ে ফেললেন।

চা হয়ে গিয়েছিল।

বললাম, "চা খান, বিশ্বাস মশাই।"

"দেবেন? বেশ দিন—"

একটা গ্লাসে চা দিলাম। তিনি একধারে সসংকোচে বসে চা খেলেন।

গিন্নী বাজারের জিনিস দেখে বললেন, "গুঁড়ো হলুদ আর লংকা এনেছেন, কিন্তু ও তো ধুলোয় ভরতি, ওতে খিচুড়ির রং তো ভাল হবে না—"

বিশ্বাস মশাই একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়লেন।

"হ্যাঁ, সে কথা আমারও মনে হয়েছিল। আচ্ছা, দেখছি—"

পাণ্ডার সেই ছেলেটি তখনও দাঁড়িয়েছিল, বিশ্বাস মশাই তার কানে কানে কী বললেন, তারপর তাকে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। একটু পরেই দেখলাম, তিনি ছোট একটি শিল-নোড়া, কিছু গোটা হলুদ আর শুকনো লংকা নিয়ে এসেছেন।

আমার শালী বললেন, "ওরে বাবা, ও সব এখন বাটবে কে?"

"আমি বেটে দিচ্ছি, কতক্ষণ আর লাগবে—"

বিশ্বাস মশাই এক কোণে বসে বাটনা বাটতে লেগে গেলেন।

বাটনা বেটে, তোলা উনুনটা নিয়ে এলেন তিনি। বাজারে যাওয়ার সময়েই সেটাতে আঁচ দিয়ে গিয়েছিলেন। গিন্নী খুশী হলেন খুব। বেশ গনগনে আঁচ উঠেছে।

শালী বললেন, "আমি আলু-ছেঁচকি করব। উষা, তুই ভাই, আলুগুলো কুটে ফেল—। ও হরি, বঁটিই যে নেই—"

"এনে দিচ্ছি—"

বিশ্বাস মশাই পান্ডাদের কাছ থেকে বঁটি যোগাড় করে আনলেন।

আলু কোটা হলে আবিষ্কৃত হল, ছেঁচকি হওয়ার পথে আর একটি অন্তরায় বিদ্যমান। পাঁচ-ফোড়ন নেই। বিশ্বাস মশাই আবার ছুটলেন।

তারপর স্নান করার পালা। গঙ্গার স্রোত এত বেশি যে, সেখানে নেবে দাঁড়ান পর্যন্ত যায় না। একটা শিকল আছে, সেইটে ধরে কোনরকমে একটা কি দুটো ডুব দেওয়া যায়। বিশ্বাস মশাই সবাইকে একে একে নিয়ে গিয়ে স্নান করিয়ে আনলেন। তারপর দল বেঁধে সবাইকে নিয়ে মন্দির, হর কি পৈরি প্রভৃতি দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখিয়ে আনলেন।

এ সব সেরে বেশ ক্ষিধে পেয়ে গেল সকলের। তখনও কিন্তু রান্না চড়ে নি। ঠিক হল, কিছু গরম লুচি-তরকারি খেয়ে নেওয়া যাক জলখাবার হিসেবে। বিশ্বাই মশাই আবার গেলেন সে-সব ভাজিয়ে আনতে। তাঁকে পই-পই করে বলে দেওয়া হল, তিনি যেন নিজের সামনে ভাজিয়ে আনেন সব।

"আজ্ঞে হ্যাঁ, তা আনব বই কি। নিজের সামনে ভাজিয়ে আনব।"

বৃষ্টির বেগটা কমেছিল, কিন্তু টিপ-টিপ করে পড়ছিল তবু। বিশ্বাস মশাই বেশ ভিজেই ফিরলেন।

বললাম, "বিশ্বাস মশাই, আপনি কাপড়টা, জামাটা ছেড়ে ফেলুন না।"

বিশ্বাস মশাই নির্বিকার। খাবারের ঝুড়িটা খুলতে লাগলেন। বললে, "খাঁটি ঘিয়ে ভাজিয়ে এনেছি। আচারও বেশি করে এনেছি একটু—"

"এনেছেন, বেশ করেছেন। কাপড়-জামাটা ছাড়ুন—"

বিশ্বাস মশাই হেসে বললেন, "ও একেবারে রাত্রে শোবার সময় ছাড়ব। শুকনো জামা-কাপড় পরলে আবার এখুনি তো ভিজে যাবে।"

বুঝলাম, এ বিষয়ে তাঁর অভিজ্ঞতা আছে। কারণ, পরমুহূর্তেই বাবা বললেন, তার নস্যি ফুরিয়ে গিয়েছে, এখানে পাওয়া সম্ভব কি?

তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে উঠলেন বিশ্বাস মশাই।

"হ্যাঁ, সম্ভব বই কি। র-মাদ্রাজী, পরিমল দু-রকমই পাওয়া যাবে। কোনটা আনব বলুন—"

বাবা র-মাদ্রাজী আনতে বললেন। র-মাদ্রাজী নস্যি এনে বিশ্বাস মশাই পা-টি মুড়ে যেই বসেছেন, অমনি আমার গিন্নী বললেন, "ছায়া, চিরুনিটা যে তোর হাতে দিলুম, আগ্রা হোটেলে।"

ছায়া আমার শালী। সে ভ্রূকুঞ্চিত করে বললে, "আমার হাতে কখন দিলে আবার। দিয়ে থাকলে ওই অ্যাটাচিতেই রেখেছি—"

"কই, এতে তো নেই!"

বাক্স, সুটকেশ, তোরঙ্গ সব খোঁজা হল। চিরুনি নেই।

সুতরাং, বিশ্বাস মশাই আবার ছুটলেন চিরুনি কিনতে, স্বেচ্ছায় এবং সানন্দে ছুটলেন। আমি তাঁকে কয়েকটা কুইনিন ট্যাবলেট আনতে দিলাম। আমার ছোট ছেলেটার জ্বর যদি বেড়ে যায়, বিপদে পড়ে যাব এই বিদেশে। সবগুলি এনে দিলেন বিশ্বাস মশাই।

খিচুড়ি আর আলুর ছেঁচকি তৈরি হয়ে গিয়েছিল। বিশ্বাস মশাইকেও আমাদের

সঙ্গে খেতে বলেছিলাম। খাওয়ার ঠিক পূর্বমুহূর্তে বিশ্বাস মশাই বললেন, "একটু অপেক্ষা করুন। ভাল ঘি আছে আমার একটু, নিয়ে আসি—।" দৌড়ে চলে গেলেন এবং ভালো গাওয়া ঘি নিয়ে এলেন একটা শিশি করে। বললেন; কলকাতা থেকে এক ভদ্রলোক এসেছিলেন। তিনি দিয়ে গিয়েছেন এটা তাঁকে। বেশ তৃপ্তিসহকারে খাওয়া গেল।

খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়লাম আমরা সবাই। বিশ্বাস মশাই বসে রইলেন একধারে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে।

"আপনিও যান না, একটু বিশ্রাম করে নিন।"

বিশ্বাস মশাই সসংকোচে বললেন, "আপনাদের যদি কোনও দরকার হয়—"

"না, আর কিছু দরকার হবে না। আপনি একটু বিশ্রাম করে নিন গিয়ে। বিকেলে এসে আমাদের সঙ্গে চা খাবেন।"

চলে গেলেন বিশ্বাস মশাই।

বিকেলে এলেন একটি লোক সঙ্গে করে। বললেন, "আপনারা কি হৃষীকেশ, লছমনঝোলা যাবেন। যদি যান, তা হলে বাসে করেই যাওয়া ভাল। ইনি আমার চেনা বাসওলা। একটা ছোট বাস যদি রিজার্ভ করে নেন, ইনি সস্তায় করে দেবেন—"

বললাম, "যেতে তো খুবই লোভ হয়। কিন্তু আমাদের ব্যাপার তো দেখছেন, এখানে আপনি ছিলেন, তাই সামলে দিলেন, কিন্তু সেখানে—"

"যদি বলেন, সেখানেও আমি যাব।"

খবরটি পাওয়ামাত্র চনমন করে উঠলো সবাই।

বাবা বললেন, "এতদূর এসে যদি না দেখে ফিরে যাই, তা হলে আমাদের আর দেখা হবে না। তোমরা হয়ত আবার আসতে পার, কিন্তু আমরা আর পারব না।"

এ যুক্তি অকাট্য। একটা কুইনিনের বড়ি খেয়ে ছেলেটার জ্বরও কমে গিয়েছিল। সুতরাং যাওয়াই স্থির হল।

হৃষীকেশ-লছমনঝোলার বর্ণনা করে সময় নষ্ট করব না, কারণ, তা বর্ণনা করা যাবে না। হৃষীকেশ-লছমনঝোলায় বিশ্বাস মশাই যা করেছিলেন, তা-ও প্রায় অবর্ণনীয়। আমি ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়েছিলাম বলে আমার পা পর্যন্ত টিপে দিয়েছিলেন তিনি। হৃষীকেশের সরাইখানায় বিশ্বাস মশাইকে একটু নির্জনে পেয়েছিলাম রাত্রিবেলা।

জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনার দেশ কোথা, বিশ্বাস মশাই। বাংলাদেশে নিশ্চয় ?"

"হ্যা, বাংলাদেশে বই কি। তবে সে-দেশ ছেলেবেলায় ছেড়ে এসেছি।"

"কোথা বাড়ি ছিল আপনার ?"

"তা আর না-ই শুনলেন। আমি সামান্য লোক—"

কাঁচুমাচু হয়ে থেমে গেলেন বিশ্বাস মশাই।

"না, না, বলুন শুনি।"

"আমার পরিচয়, দেবার মত নয়। আমি বংশের মুখ উজ্জ্বল করতে পারি নি, লেখাপড়া পর্যন্ত শিখি নি, ছেলেবেলায় বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছিলাম।"

সসংকোচে থেমে গেলেন।

"বাংলাদেশের কথা মনে আছে আপনার ?"

"খুব বেশি নেই। তবে একটি ছবি মনে আছে। ছোট একটি পুকুর, পুকুরের পাড়ে তালগাছ, নারকেল গাছ। পুকুরের জল কুচকুচে কালো, সবুজ পানায় ঢাকা, ঘাটে একটি বউ কলসী ভাসিয়ে চান কচ্ছে, টুকটুকে লাল গামছা তার হাতে। হৃষীকেশ, হরিদ্বারের গঙ্গার চেয়েও ও-ছবি আমার বেশি ভাল লাগে—"

"আপনি তো কবি-লোক দেখছি—"

কুণ্ঠিতহাসি হেসে বিশ্বাস মশাই বললেন, "আমি সামান্য লোক। তবে আমার দাদা একজন নামজাদা লোক ছিলেন, তাঁর কথা বলতেও লজ্জা করে আমার। আমি তাঁর ভাই হওয়ার উপযুক্ত নই।"

"কে আপনার দাদা, বলুন তো—"

"কর্ণেল সুরেশ বিশ্বাস। আমি দাদার নামের মর্যাদা রাখতে পারি নি।"

স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। "আপনি কি করেন এখানে—"

"এই যাত্রীদের, বিশেষ করে বাঙালী যাত্রীদের, সেবা করি। এ ছাড়া আর কী করবার যোগ্যতা আছে বলুন। বাসা বলে তো আমার কিছু নেই। ট্রেনগুলো অ্যাটেণ্ড করি, যদি কোনো যাত্রী আসে। প্ল্যাটফর্মেই থাকি অধিকাংশ সময়। আর তা না হলে ওই কুম্ভকর্ণ পাণ্ডার বাড়ির বারান্দায়। যাত্রীদের সেবা করাই কাজ তো—"

পাশের ঘরে আমার ছোট ছেলেটার গলার আওয়াজ পেয়ে উঠে পড়লেন বিশ্বাস মশাই।

"খোকন উঠেছে, ওর জন্যে দুধ যোগাড় করেছি একটু, গরম করে খাইয়ে আসি—"

তাড়াতাড়ি উঠে চলে গেলেন।

ফেরবার সময় হরিদ্বারে বিশ্বাস মশাই এলেন আমাদের ট্রেনে তুলে দেবার জন্য। অনেক রাত হয়েছিল। নিজ হাতে তিনি আমাদের বিছানাপত্র পেতে দিলেন, জিনিসগুলি গুছিয়ে দিলেন। কুঁজোতে জল ভরে দিলেন, রাত্রের খাবার আলাদা করে বেঁধে দিলেন, তারপর প্ল্যাটফর্মে নেমে ম্লানমুখে দাঁড়িয়ে রইলেন অন্যদিকে চেয়ে। মনে হল, তিনি যেন অতি প্রিয় পরিজনদের বিদায় দিতে এসেছেন।

ট্রেন ছাড়বার ঘণ্টা পড়ল, গার্ডসাহেব বাঁশি বাজালেন।

হঠাৎ আমার কী মনে হল, হঠাৎ মুখ বাড়িয়ে ডাকলাম। "বিশ্বাস মশাই, শুনুন—"

বিশ্বাস মশাই এগিয়ে এলেন। "এইটে রেখে দিন, সামান্য কিছু—"

একখানা দশ টাকার নোট বার করে তাঁর হাতে দিলাম।

"অ্যাঁ, এ কী, আপনি আমাকে টাকা দিলেন, টাকা দিলেন !"

ট্রেন তখন চলতে শুরু করেছে।

দেখলাম, বিশ্বাস মশাই নোটটি হাতে করে অসহায়ভাবে চেয়ে রয়েছেন আমাদের গাড়ির দিকে। তাঁর মুখ বিবর্ণ, হাতটা কাঁপছে।

পুত্র

নূতন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব মফঃস্বলে টুর করতে বেরিয়েছেন। এই প্রথম বেরিয়েছেন তিনি। প্রতিভাবান বাঙালী যুবক, অল্প কিছুদিন আগেই বিলেত থেকে আই. সি. এস. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন সসম্মানে। তাঁকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে স্টেশনে এসেছেন প্রবীণ অবাঙালী সাব-ডিভিশনাল অফিসার, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব পুলিস (ইনি খাঁটি সাহেব , থানার দারোগা, কয়েকজন কনেস্টবল। আর এসেছেন জিতেন্দ্রনাথ বসু, সাব-ডিভিশনাল অফিসারের কেরানী একজন। স্টেশনের বাইরে তিনখানি মোটরকার দাঁড়িয়ে আছে। একটি এস-ডি-ও. সাহেবের, একটি এস-পির। তৃতীয় কারটি স্থানীয় ধনী ব্যবসায়ী যুগলরাম মারোয়াড়ীর। এই তৃতীয় কারটি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। কারণ, এটি পত্র-পুষ্পে সুসজ্জিত। সাধারণতঃ বিয়ের সময় বরের গাড়ি যেভাবে সাজানো হয়, এটি সেইভাবে সাজানো। এ গাড়িটি চেয়ে এনেছেন কেরানী জিতেন্দ্রনাথ বসু।

…ট্রেন একটু লেট আসছে। উৎসুক হয়ে অপেক্ষা করছেন সবাই। ছোট শহরে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের আগমনও একটা হৃৎস্পন্দনকর ঘটনা। স্টেশনমাস্টার, টিকিট-কালেক্টার পর্যন্ত একটু যেন সন্ত্রস্ত ও বিচলিত। তখন ইংরেজের আমল, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবরাই তখন দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, বৃটিশ শাসনের প্রতিভূ ও প্রতীক। লাল-পাগড়ি পুলিস, দারোগা, এস-পি, এস-ডি ও এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন যে, প্ল্যাটফর্মে সমবেত যাত্রীরা পর্যন্ত সহজে নিঃশ্বাস নিতে পারছেন না। প্ল্যাটফর্মের একপ্রান্তে আধময়লা জামা-কাপড়-পরা জিতেনবাবু দাঁড়িয়ে আছেন সসঙ্কোচে। তাঁর মনিব সাব-ডিভিশনাল অফিসারের সামনে প্রগলভতা প্রকাশ করতে পারছেন না তিনি। কিন্তু তাঁর নাচতে ইচ্ছে করছে।

ঢং ঢং, ঢং, ঢং—ঘণ্টা পড়ল। ট্রেন আসছে।

দেখতে দেখতে এসে পড়ল ট্রেন। এস-ডি-ও, এস-পি. এগিয়ে গেলেন প্রথম শ্রেণীর কামরার দিকে। জিতেনবাবুও দৌড়ে গেলেন, কিন্তু খুব কাছাকাছি যেতে পারলেন না। মনিবের সঙ্গে সম্মানসূচক দূরত্ব রক্ষা করে একটু দূরেই দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাত কচলাতে লাগলেন।

গাড়ি থেকে নাবলেন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব। কচি মুখ, নেহাৎ ছেলেমানুষ। প্রতিভার দীপ্তি কিন্তু বিচ্ছুরিত হচ্ছে চোখ, মুখ থেকে।

নেবেই এস-ডি-ও. এবং এস-পির সঙ্গে শেক-হ্যাণ্ড করলেন। এগিয়ে আসতে লাগলেন তাদের সঙ্গে গল্প করতে করতে। কিছুদূরে এসেই জিতেনবাবুকে দেখতে পেলেন তিনি এগিয়ে গিয়ে হেঁট হয়ে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলেন তাঁকে। অবাক হয়ে গেল সবাই।

এস-ডি-ওর দিকে ফিরে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বললেন, "ইনি আমার বাবা—।" এস-ডি-ও. এই ধরনের একটা কানাঘুষো শুনেছিলেন বটে, কিন্তু বিশ্বাস করেন নি। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কথা শুনে নমস্কার করলেন জিতেনবাবুকে। কিন্তু নিজের অধীনস্থ কেরানীর কাছে সর্বসমক্ষে মাথা নোয়াতে হল বলে ক্ষুব্ধও হলেন একটু।

খাঁটি সাহেব এস-পি. বাঙালী-মহলে-প্রচারিত এ খবরটা জানতেন না। বেশ

অবাক হলেন। কিন্তু টুপিটা ঈষৎ তুলে শিষ্টাচারসম্মত অভিবাদন জানাতে কসুর করলেন না।

জিতেনবাবু বললেন, "আমি গাড়ি এনেছি—"

"ও—"

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব এগিয়ে যাচ্ছিলেন তাঁর সঙ্গে।

"জাস্ট এ মিনিট সার—"

এস-পি. তাঁকে ইঙ্গিতে ডেকে নিয়ে গেলেন একপাশে। এস-ডি-ও. সাহেবও সঙ্গে সঙ্গে গেলেন।

এস-পি. বললেন, "আপনি আমার ওখানে চলুন। এখানে ভালো ডাকবাংলো নেই। আমার বাংলোতেই সব ব্যবস্থা করেছি আপনার। ডিনার ইজ ওয়েটিং—" এস-ডি-ও বললেন, "এক্সকিউজ মি, আর একটা কথাও বিবেচনা করবার আছে। মিস্টার বোস আমার আপিসের একজন ক্লার্ক। একজন সাব-অর্ডিনেট ক্লার্কের বাড়িতে আপনার ওঠাটা অফিসিয়াল দৃষ্টিতে একটু অশোভন হবে না কি? জানেনই তো, আজ-কাল যিনি কমিশনার, অফিসিয়াল ফর্মের দিকে তাঁর খুব কড়া নজর।"

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব ক্ষণকাল চুপ করে রইলেন। তারপর বাবাকে গিয়ে বললেন সে কথা। জিতেনবাবু বললেন, "ও তাই না কি। তা হলে যাও তুমি ওঁদের সঙ্গেই। কমিশনার সাহেব সত্যিই খুব কড়া লোক। হয়তো—না না, ওদের সঙ্গেই যাও তুমি।"

এস-পি. সাহেবের গাড়িতে চড়ে চলে গেলেন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব।

তাঁর পিছু পিছু এস-ডি-ও সাহেবও গেলেন।

পুষ্পে, পত্রে সজ্জিত যুগল মারোয়াড়ির গাড়িটা দাঁড়িয়ে রইল।

জিতেনবাবু ড্রাইভারকে গিয়ে বললেন, "একটা জরুরি দরকারে ওকে পুলিস সাহেবের সঙ্গে চলে যেতে হল। তোমার গাড়ির আর দরকার হল না। তুমি যাও—"

যুগলবাবুর গাড়িও চলে গেল।

জিতেনবাবু চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন খানিকক্ষণ, তারপর হেঁটে হেঁটেই নিজের বাড়িতে ফিরে গেলেন তিনি।

অতিশয় ছোট বাড়ি তাঁর, গলির গলি, তস্য গলির মধ্যে। তবু এই বাড়িটিকেই যথাসাধ্য সাজিয়েছিলেন তিনি। চুনকাম করিয়েছিলেন। বাড়ির সামনেটা দেবদারু-পাতা আর রঙীন কাগজের শিকল দিয়ে অলংকৃত করেছিলেন। একটা লাল শালুর উপর সাদা অক্ষরে 'স্বাগত' লিখেও টাঙিয়ে দিয়েছিলেন বারান্দার সামনে। দুচারজন অন্তরঙ্গ বন্ধুবান্ধবকেও নিমন্ত্রণ করেছিলেন এই উপলক্ষে।

জিতেনবাবু যখন ফিরে এলেন, তখনও তাঁর নিমন্ত্রিত বন্ধুরা বসেছিলেন।

"সুকু আসতে পারলে না। একটা জরুরি দরকারে পুলিস সায়েব টেনে নিয়ে গেল তাকে।"

"তাই না কি—"

হতাশ হলেন দু-একজন, কেউ কেউ অবাক হলেন, মুখ ফিরিয়ে হাসি গোপন করলেন দু-একজন। তারপর খাওয়াদাওয়া সেরে চলে গেলেন একে একে।

সবাই চলে যাবার পর জিতেনবাবু চুপ করে বসে রইলেন বারান্দার উপর খানিকক্ষণ। তিনি বিপত্নীক। ওই সুকুমারই তাঁর একমাত্র সন্তান। বড় আশা করেছিলেন, সে এসে তার কাছেই উঠবে। কিন্তু এল না।

॥ দুই ॥

গভীর রাত্রি, থমথম করছে চতুর্দিক। জিতেনবাবু ঘুমিয়ে পড়েছেন।

"বাবা—বাবা—"

দুয়ারের কড়া সশব্দে নড়ে উঠল।

তড়াক করে উঠে বসলেন জিতেনবাবু।

এত রাত্রে কপাটে ধাক্কা দিচ্ছে কে! তাড়াতাড়ি গিয়ে কপাটটা খুলে দিলেন।

"এ কি, সুকু—!"

"আমি এইখানেই চলে এলাম। কমিশনার সায়েব যা-ই মনে করুক, আমি তোমার কাছেই থাকব—"

জড়িয়ে ধরলেন তাকে জিতেনবাবু। কেঁদে ফেললেন।

"এত রাত্রে কি করে এলি তুই—"

"হেঁটেই চলে এলাম।"

রূপ-রূপান্তর

কোলকাতা থেকে মনিহারী যাচ্ছি। সাহেবগঞ্জে গাড়ি বদলাতে হবে। সাহেবগঞ্জে ঘাট-গাড়ি পাওয়া যায়, সেই গাড়িতে চড়ে যেতে হবে সকরিগলিঘাট। সেখান থেকে স্টীমারে চড়ে যেতে হবে মনিহারীঘাট। মনিহারীঘাট থেকে মনিহারী যাওয়ার গাড়ি পাওয়া যাবে।

সাহেবগঞ্জে নেবে দেখলাম, ঘাট-গাড়ি তখনও প্ল্যাটফর্মে আসে নি। কুলি বললে, গাড়ি 'সাইডিং'য়ে লাগানো আছে। সেখানে গিয়েই চড়া ভালো, কারণ সবাই সেইখানে গিয়েই চড়ছে। গাড়ি প্ল্যাটফর্মে আসবার আগেই ভরতি হয়ে যাবে। সে আমাকেও সাইডিংয়ে গিয়েই চড়বার পরামর্শ দিলে। গিয়ে দেখলাম, থার্ড ক্লাশ প্রায় ভরতি হয়ে গেছে। একটিমাত্র ইণ্টার ক্লাস (তখন ইণ্টার ক্লাস উঠে যায় নি) আর তার ভিতরে দাড়িওলা ভীষণ-দর্শন লোক বসে আছেন একজন। দ্বিতীয় আর কোনও লোক নেই। কপাট খুলে ঢুকতে গেলাম, কপাট খোলে না।

বললাম, "কপাটটা খুলুন মশাই।"

"আমি তো কপাট লাগাই নি, আমি জানলা গলে ঢুকেছি, আপনিও পারেন তো ঢুকুন।"

মহামুশকিলে পড়ে গেলাম। প্ল্যাটফর্ম নেই, অত নীচু থেকে জানলা গলে ঢোকা অসম্ভব মনে হল আমার পক্ষে। কুলিটা বললে, "আপনি বাবু, আপনার এই ট্রাঙ্ক আর বিছানার উপর দাঁড়িয়ে ওই হাতলটা ধরে ঝুলে পড়ুন। আমি পিছন থেকে আপনাকে ঠেলে দিচ্ছি, ঠিক উঠে যাবেন—"

তাই করেই উঠলাম। কনুয়ের কাছটা একটু ছড়ে গেল। আমি যখন হিঁচড়ে জানলা গলে উঠছিলাম, তখন ওই দাড়িওলা ভদ্রলোক এতটুকু সাহায্য করেন নি, আমাকে যদি একটু ধরতেন, কনুইটা হয়তো জখম হত না। একটি বেঞ্চে নিজের জায়গাটা দখল করে বসে তাঁর দিকে চাইলাম একবার। দেখলাম, তাঁর চক্ষুদুটি অগ্নিবর্ষণ করছে। মনে হল, এ রকম পাজি লোক আর দেখি নি। সমস্ত কামরাটা একলাই দখল করে থাকতে চায়।

একটু পরেই আর একদল যাত্রী এসে হানা দিলে আবার। আমাকে যে কুলিটা তুলে দিয়ে গেছে, দেখলাম, সে-ই এসেছে আবার এদের মাল-পত্র নিয়ে। একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক, তাঁর সঙ্গে একটি অবগুণ্ঠনবতী নারী, সঙ্গে গুটিতিনেক ছোট ছেলে। একটি ছ-সাত বছরের, একটি বছরচারেকের, আর ছোটটি বছরদুয়েকের বেশী হবে না। এদের পক্ষে জানলা গলে ঢোকা একেবারে অসম্ভব। কুলিটা আমার দিকে চেয়ে বললে, "আপনি বাবু, ছেলেদুটোকে তুলে নিন। তারপর আমি ভিতরে ঢুকে এঁদের টেনে তুলছি—"

দাড়িওলা ভদ্রলোক এতক্ষণ জ্বলন্তদৃষ্টি মেলে দেখছিলেন এদের দিকে। হঠাৎ স্বগতোক্তি করলেন—"যত ভাবি, একা থাকব, ততই জড়িয়ে পড়ি। পাপ, পাপ, পূর্ব-জন্মের পাপ সব!"

উঠে এলেন এবং দরজার ফাঁকে যে ছোট ইঁটের টুকরোটি গুঁজে রেখেছিলেন, সেটি খুলে নিজের পকেটে রেখে দিলেন। কপাট খুলে গেল। সেই প্রৌঢ় ভদ্রলোক, ভদ্রমহিলাটি আর ছেলেগুলি উঠে পড়ল গাড়িতে।

ভদ্রলোক এদের সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করলেন, তা আমার আর দেখবার অবসর হল না। কারণ, সঙ্গে সঙ্গে আমার এক বাল্যবন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

"মনিহারী যাচ্ছিস বুঝি—"

"হ্যাঁ--"

"আমার গাড়িতে আয়। তোর সঙ্গে কথা আছে একটু। কেস যোগাড় করেছি তোর জন্যে দুটো—" আমি ইনসিওরেন্সের দালালী করি তখন। কেসের কথা শুনে উৎফুল্ল হয়ে উঠলাম।

"জায়গা আছে তোর গাড়িতে ?"

"আছে।"

সেই কুলিটাকে দিয়েই জিনিসপত্র বইয়ে আবার অন্য একটা কামরায় হাজির হলাম গিয়ে।

সকরিগলিঘাটে গিয়ে আর দাড়িওলা ভদ্রলোকের খোঁজ পাইনি। প্যাসেঞ্জারের ভিড় কে যে কোথায় চলে গেছে, ঠিক নেই।

স্টীমারে উঠে তাঁকে দেখতে পেলাম। দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলাম। দেখলাম, তিনি গঙ্গায় স্নান করছেন, আর ওই তিনটি ছেলেকে স্নান করাচ্ছেন। সকরিগলিতে স্টীমার খানিকক্ষণ থামে, স্নান করে নেওয়ার সময় পাওয়া যায়। দেখলাম, দাড়িওলা ভদ্রলোক খুব স্নেহভরে স্নান করাচ্ছেন ছেলেগুলিকে। গামছা দিয়ে ঘসে ঘসে গায়ের ময়লা তুলছেন, মুখ মুছিয়ে দিচ্ছেন, চোখের কোণ পরিষ্কার করে দিচ্ছেন। ছেলেগুলো আপত্তি করছে, কিন্তু তিনি শুনবেন না। দেখে বেশ অবাক লাগল। এই লোকই কিছুক্ষণ আগে ওদের ট্রেনে উঠতে দিচ্ছিল না!

…স্টীমারে সেই প্রৌঢ় ভদ্রলোকটির সঙ্গে দেখা হল।

জিজ্ঞাসা করলাম—"ওই ভদ্রলোক কি আপনার কোনো আত্মীয় হন?"

"না। এই একটু আগেই ওঁর সঙ্গে আলাপ হল ঘাট-ট্রেনে। উনি হিন্দু, আমি মুসলমান। এ কথা অবশ্য বলি নি ওঁকে। ভদ্রলোকের মাথায় একটু ছিট আছে—"

এই বলে মুচকি হাসলেন।

"ও।"

আর কিছু বললাম না।

ওপারে গিয়ে মনিহারীর ট্রেনে চড়বার সময় দেখলাম, দাড়িওলা ভদ্রলোক সেই ছোট ছেলেটিকে দুহাতে বুকের কাছে তুলে আদর করছেন আর সে মুঠো করে তার দাড়ি চেপে ধরেছে।

"আরে দেবেনবাবু যে, কোথা চলেছেন—"

"দিনাজপুর যাব।"

দেখলাম, মনিহারীঘাটের একজন টিকিট-কালেক্টারের সঙ্গে দাড়িওলা ভদ্রলোকের কথা হচ্ছে। টিকিট-কালেক্টারটি আমারও চেনা। তিনি আমার দিকে ফিরে বললেন, "বাড়ি যাচ্ছেন না কি—"

"হ্যা—"

আমি একটি কামরায় গিয়ে উঠে বসলাম। একটু পরে সেই টিকিট-কালেক্টার ভদ্রলোকও এলেন আমার কামরায়। একথা-সেকথার পর তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম—"আপনি ওই দাড়িওলা ভদ্রলোককে চেনেন না কি!"

"হ্যাঁ, খুব চিনি। পূর্ববঙ্গে আমাদেরই গ্রামে বাড়ি ওর। খুব নামী পরিবারের ছেলে—"

তারপর একটু থেমে বললেন, "গত রায়টে ওঁর সর্বনাশ হয়ে গেছে!"

"কি রকম—"

"ঘর-বাড়ি তো সব গেছেই, পুড়িয়ে দিয়েছে সব। ওঁর স্ত্রী, ছেলেমেয়েগুলোকে পর্যন্ত মেরে ফেলেছে। কেউ নেই—"

নিস্তব্ধ হয়ে রইলাম।

বিনোদ ডাক্তার

বরাবরই ধারণা ছিল, বিনোদ ডাক্তার খুব উঁচুদরের লোক। চিকিৎসক হিসাবে এ অঞ্চলে ওর জোড়া নেই, তা ছাড়া লোক চমৎকার। গরীবের মা-বাপ। বর্ধমানের কাছে এক পাড়াগাঁয়ে ওর বাড়ি। বছরচারেক আগে এখানে এসেছিল প্র্যাকটিশ করতে, এসেই বেশ জমিয়ে ফেলেছে। শহরের মাঝখানে জমি কিনে বাড়ি করতে শুরু করছে। রূপে, গুণে সমান। বেশ সুপুরুষ চেহারা। ইয়া লম্বা, ইয়া বুকের ছাতি। মাথার সামনের দিকটা সামান্য একটু টাক আছে অবশ্য, কিন্তু তাতে কোনো ক্ষতি হয় নি, বরং গাম্ভীর্য যেন বেড়েছে একটু। আমি যখনই খবর পেলাম যে, বিনোদ আমাদের পালটি ঘর, তখন থেকেই ওর সম্বন্ধে আমার কৌতুহল বাড়ল। বোনটির এখনও বিয়ে দিতে পারি

নি। লোকের কাছে বলে বেড়াই বটে কুড়ি, কিন্তু ওর আসল বয়স পঁচিশ। আর বেশী দেরি করলে, চুলে হয়তো পাক ধরে যাবে। কিন্তু বিয়ের বাজারের যা অবস্থা। তার ওপর বোনটি আমার একটু কালো। চোখ, মুখের ছাঁদ খারাপ নয়, লেখাপড়াও শিখিয়েছি, কিন্তু এ পোড়া-দেশে রূপ আর রূপিয়ার যোগাযোগ না ঘটাতে পারলে মেয়ের বিয়ে হয় না। এক জায়গায় প্রায় লেগে গিয়েছিল, কিন্তু কুষ্ঠি বাদ সাধল। ভৌম-দোষ বেরিয়ে গেল। কিন্তু বিনোদ ডাক্তারকে দেখে আমার মনে আশার সঞ্চার হল। শুনলাম, বিয়ে হয় নি, মা-বাবা নেই, কোনও বখেড়াবাজ অভিভাবক নেই। কৌশলে আলাপপ্রসঙ্গে জানতে পারলাম, বিনোদের বয়স পঁয়ত্রিশ। বেশ মানাবে।

সুতরাং, লক্ষ্য স্থির রেখে আধুনিক যুগের কায়দা-অনুযায়ী অগ্রসর হচ্ছিলাম। মেয়েদের সময়ে বিয়ে না দিলে, নানারকম ব্যাধি জোটে শরীরে। বুক ধড়ফড়, মাথা ঘোরা, ফিট। আমার বোন অমিতারও লেগে থাকত একটা না একটা। আমি এতদিন হোমিওপ্যাথি ওষুধই দিতাম, নিজেরই বাক্স ছিল একটা। কিন্তু একদিন মনে হল, এই সূত্রে বিনোদ ডাক্তারের সঙ্গে অমিতার যদি পরিচয়টা করিয়ে দিতে পারি, আর বিনোদ যদি টোপটা গিলে ফেলে, তা হলে আমার কার্যসিদ্ধি হয়ে যাবে।

বুক ধড়ফড় করছিল একদিন অমিতার। বিনোদ ডাক্তারকে ডেকে আনলুম। অনেকক্ষণ ধরে খুব ভালো করে পরীক্ষা করলে সে। তারপর প্রেসকৃপশন লিখে দিলে। ফি দিতে গেলুম, বললে, "আগে ভালো হোক, তারপর ফি নেব।" শুনলাম, মধ্যবিত্ত বা গরীব বাঙালীদের কাছ থেকে সে ফি নেয় না। ওষুধে ফল হল খুব। নিমন্ত্রণ করে খাওয়ালাম একদিন। তারপর থেকে প্রায়ই আসত, যেত। ঘনিষ্ঠতা বাড়তে লাগল ক্রমশঃ। আমার সঙ্গে তো বটেই, অমিতার সঙ্গেও। তারপর একদিন কপাল ঠুকে বিয়ের প্রস্তাবটা করে ফেললুম। শুনে সে চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। মনে হল, মুখটা যেন বিবর্ণ হয়ে গেল ক্ষণিকের জন্য। তারপর হেসে বলল, "না, আমি বিয়ে করব না।"

"কেন!"

"বাধা আছে।"

বলেই এমন গম্ভীর হয়ে গেল যে, আমি আর বলতে সাহস করলাম না যে, বাধাটা অতিক্রম্য কি না। এরপর থেকে সে আমাদের বাড়িতে আসাও বন্ধ করে দিল। ভারি বেকুব হয়ে গেলাম। কি করতে কি হয়ে গেল।

তারপর সসংকোচে গেলাম তার বাড়িতে একদিন। উদ্দেশ্য, পুনরায় তাকে নিমন্ত্রণ করে ভাব-সাব করা। গিয়ে দেখি, একটি অচেনা লোক বসে আসে আর তার সঙ্গে নিম্নলিখিতরূপ কথাবার্তা হচ্ছে।

"আপনাকে যেতেই হবে ডাক্তারবাবু।"

"কোলকাতায় কত বড় বড় ডাক্তার আছেন, সেখানে আমার যাবার তো কোনও দরকার নেই।"

"কিন্তু, তিনি আপনাকে ছাড়া আর কারুকে দিয়ে চিকিৎসা করাবেন না। মুখ দিয়ে রক্ত উঠছে। জ্বর হয় রোজ। কিন্তু, তিনি অন্য কোনো ডাক্তারকে কাছে ঘেঁষতে দেবেন না।"

"এর মানে কি—"

"সে আপনি গেলে হয়তো বুঝতে পারবেন। আমি তো জানি না। আমি চাকরমাত্র—"

"আচ্ছা, ঠিকানাটা রেখে যান। আজ না পারি, কাল যাব।" ভদ্রলোক ঠিকানাটা লিখে দিলেন একখানা কাগজে। আমিও দেখলাম ঠিকানাটা।

দিনসাতেক বিনোদ ডাক্তার আর ফিরলই না।

যখন ফিরল, তখন একটি মেয়ে সংগে করে!

শুধু তাই নয়, মেয়েটির সংগে বাস করতে লাগল!

তাজ্জব বনে গেলাম আমি! গেল রুগী দেখতে, ফিরল একটা মেয়ে সংগে করে। তারপর শুনলুম, মেয়েটাকে নিয়ে ধরমপুর স্যানাটরিয়মে যাচ্ছে। কোথা থেকে ভাগিয়ে নিয়ে এল এই ঘাটের মড়াটাকে? কিন্তু সামনাসামনি এ কথা জিজ্ঞাসা করা যায় না। দিনকয়েক পরে নিজেরই একটা কাজে কোলকাতা যেতে হয়েছিল। সেই ঠিকানাটা মনে হল। গেলাম সেখানে। দেখলাম, প্রকাণ্ড বাড়ি, গেটে দারোয়ান রয়েছে। ভেতরে খবর পাঠালাম যে, বিশেষ প্রয়োজনে একবার দেখা করতে চাই। দারোয়ান আমাকে বৈঠকখানায় নিয়ে গেল। দেখলাম, দিব্যকান্তি একটি ভদ্রলোক বসে আছেন। ধপধপে ফরসা রং, চোখদুটি টকটকে লাল।

"কি চান—"

"আমি বিনোদ ডাক্তারের খবর নিতে এসেছি।"

"কি খবর—"

"আমার বোনের সংগে তার বিয়ের সম্বন্ধ করেছিলাম. কিন্তু—"

"কিন্তু তিনি বিয়ে করেন নি, এই তো?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ—"

"করলে, আমি হাতে স্বর্গ পেতাম।"

"দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, বসুন।" আমি বসতেই ভদ্রলোক ভিতরে চলে গেলেন। একটু পরে একটা চাকর কিছু খাবার আর চা দিয়ে গেল। ভদ্রলোকের দেখা আর পেলাম না। কিন্তু আসল খবরটা যোগাড় করতে বিলম্ব হল না আমার। চা, জলখাবার খেয়ে পাড়াতেই আশেপাশে খোঁজ করলাম। যা শুনলাম, তাতে অবাক হয়ে গেলাম। বিনোদ ডাক্তার বিবাহিত। তাঁর স্ত্রীকে এই ধনীর দুলালটি সম্মোহিত করে ভাগিয়ে এনেছিলেন। দিনকতক পর স্ত্রীটির হল যক্ষ্মা। এত বড় পাপের ফল ফলবে না? এই খবর পেয়ে বিনোদ ডাক্তার এল। এসে নিয়ে গেছে—।

তারপর কি হয়েছে, পাড়ার লোকেরা জানে না।

ফেরবার সময় একখানা খবরের কাগজ কিনেছিলাম। তাতে চোখে পড়ল, একজন লোক তার বিশ্বাসঘাতিনী অসতী স্ত্রীকে গুলি করে মেরে নিজে গিয়ে পুলিসের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে।

কতরকম মানুষই যে আছে এই পৃথিবীতে।

স্মৃতির খেলা

সব শক্তির মতই স্মৃতি-শক্তি ব্যাপারটাও একটু গোলমেলে। কখন যে কি খেলা খেলেন, বলা শক্ত। কখনও কৃপা করেন, কখনও করেন না। সেদিন আমার ভাগ্যে দুরকমই হল এবং দুবারই নাকাল হতে হল আমাকে।

…ফার্স্টক্লাসে বার্থ রিজার্ভ করে যাচ্ছি। গাড়িতে উঠে দেখলাম, আর কোনও যাত্রী নেই। নটা বেজে গেছে, সুতরাং গাড়িটি ভিতর থেকে 'লক্' করে শুয়ে পড়ার কোনো বাধা ছিল না। প্যান্টটি খুলে হুকে ঝুলিয়ে দিলাম, তারপর লুঙ্গিটি পরে শুয়ে পড়লাম। কিন্তু 'লক্' করতে ভুলে গেলাম। ফল যা হল, তা মর্মান্তিক। গভীর রাত্রে দড়াম্ করে একটা শব্দ হল, ধড়মড় করে উঠে বসলাম। আলো জ্বেলে দেখি, সামনের বেঞ্চে আধময়লা কামিজ-পরা এক ভদ্রলোক অপ্রস্তুতমুখে বসে রয়েছেন আর গাড়ির মেঝেতে একটা হাঁড়ি ভেংগে চুরমার হয়ে পড়ে রয়েছে। তার থেকে কালো, চটচটে একটা পদার্থ কামরার চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটকে পড়েছে।

"কে আপনি মশাই, এ কি কাণ্ড!"

হাত কচলাতে কচলাতে ভদ্রলোক বললেন, "আলকাতরার হাঁড়িটা ওই টেবিলটার উপর রেখেছিলাম, কিন্তু ট্রেনটা এমন ঘচাং করে থামল যে, হাঁড়িটা পড়ে গেল—"

আলকাতরা! ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম, আমার ঝোলানো-প্যাণ্টের পা দুটোতে লেগেছে, বেঞ্চির নীচে স্যুটকেসটা ছিল, তাতে লেগেছে আর জুতো-জোড়া তো মাখামাখি হয়ে গেছে একেবারে। আপাদমস্তক রাগে জ্বলে উঠল। জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে গার্ডকে ডাকলাম। দেখলাম, ট্রেন একটা বড় স্টেশনেই দাঁড়িয়েছে।

গার্ডসাহেব এসে সব দেখেশুনে বললেন, "আচ্ছা, আমি একটা মেথর পাঠিয়ে দিচ্ছি, যতটা পারে পরিষ্কার করে দিক—"

গার্ডসাহেব চলে যাবার প্রায় সংগে সংগে টিকিট-কালেকটার এলেন। দেখা গেল, ভদ্রলোকের টিকিট থার্ডক্লাসের।

টিকিট-কালেকটার তাঁকে জিগ্যেস করলেন—"কোথা যাবেন আপনি?"

"এখানেই নামব।"

টিকিট-কালেকটার তখন পকেট থেকে ছোট বই বার করলেন একটি। বইটি দেখে বললেন, "আপনাকে দশ টাকা সাড়ে পনর আনা এক্সেস্ ফেয়ার দিতে হবে।"

"আমার কাছে তো একটি পয়সা নেই। আমি অন্ধকারে বুঝতে পারি নি, এটা কোন্ ক্লাস। আমাদের স্টেশনে ট্রেনও এক মিনিটের বেশী দাঁড়ায় না। সামনে যে গাড়ি পেয়েছি, তাতেই উঠে পড়েছি।"

টিকিট-কালেকটার বললেন, "ও সব কথা জেনে আমার লাভ নেই। এক্সেস্ ফেয়ার আপনাকে দিতেই হবে। আপনি শুধু যে বিনা টিকিটে এসেছেন তা নয়, রাত দুপুরে একজন ফার্স্টক্লাস প্যাসেঞ্জারকে বিরত করে তাঁর গুরুতর ক্ষতি করেছেন। আসুন আমার সংগে।"

টিকিট-কালেকটারের সংগে সংগে ভদ্রলোক চলে গেলেন। দেখা গেল, আলকাতরার হাঁড়িটি ছাড়া তাঁর আর কিছু ছিল না।

তারপর মেথর এল, জল আর ঝাড়ু নিয়ে।

সে সব দেখে শুনে একটি সদুপদেশ দিলে আমাকে।

"পাশের কামরাটাও একদম খালি আছে বাবু। আপনি সেখানেই চলে যান। এ আলকাতরা সাফ করা এখন মুশকিল। কেরোসিন তেল না হলে উঠবে না। আমি আপনার জিনিসপত্রগুলো একটু মুছে-টুছে দিচ্ছি।"

"ট্রেন কতক্ষণ থামবে এখানে?"

"বহুক্ষণ থামবে হুজুর। অনেক মাল আছে। তা ছাড়া আর একটা ট্রেনের সঙ্গে ক্রশিং হবে এখানে। আধঘণ্টা দাঁড়াবে এখানে। ইন্‌জিনও বদলি হবে।"

মেথরটাই একটা কুলি ডেকে এনে পাশের কামরায় সব ব্যবস্থা করে দিলে আমার। বকশিশ দিলাম তাকে।

পাশের কামরায় যখন গুছিয়ে গিয়ে বসলাম, তখন আমার স্মরণ-শক্তি দ্বিতীয় খেলাটি খেললেন।

অনেকদিন আগেকার একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল।

তখন আমি কলেজে পড়ি। ছুটিতে বাড়ি যাচ্ছি। হাওড়া স্টেশনে থার্ডক্লাস কামরায় বসে আছি। যদিও সেদিন ভিড় খুব, তবু ভাল জায়গাই পেয়েছিলাম ভাগ্যক্রমে। জানালার ধারে বসেছিলাম মুখ বাড়িয়ে।

"কিরে, ছুটিতে বাড়ি যাচ্ছিস নাকি—"

ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম, প্রশ্নকর্তা সাহেবি-পোশাক-পরা মুখে-পাইপ একজন প্রৌঢ় ব্যক্তি। সঙ্গে সঙ্গেই চিনতে পারলাম। বাবার বন্ধু একজন। রেলের বড় অফিসার। প্রশ্ন করে আমার দিকে এগিয়ে এলেন তিনি।

"থার্ডক্লাসের টিকিট বুঝি তোর। খুব ভিড় আজকে। ওহে রায়, শোন—"

একটি টিকিট-কালেকটার হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন।

"এই ট্রেনে তুমিই কি সাহেবগঞ্জ পর্যন্ত যাচ্ছ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ—"

তারপর আমাকে দেখিয়ে বললেন, "এ আমার বাল্যবন্ধুর ছেলে। ভিড়ে কষ্ট পাচ্ছে, ওকে ফার্স্টক্লাসে বসিয়ে নিয়ে যাও।"

"যে আজ্ঞে। আসুন আপনি।"

আমি থার্ডক্লাস থেকে নেমে পিতৃবন্ধুকে প্রণাম করলাম, তারপর রায়মশায়ের অনুসরণ করে একটি ফার্স্টক্লাসে গিয়ে চড়লাম।

একেবারে ফাঁকা গাড়ি।

বাবার বন্ধু আবার এলেন আমার কাছে।

"ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে চলে যা। রায় তোকে সাহেবগঞ্জে উঠিয়ে দেবে।"

জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বসে আছি। ট্রেন ছাড়ে-ছাড়ে, প্রথম ঘণ্টা হয়ে গেছে, এমন সময় ছুটতে ছুটতে কানুদা এসে হাজির। হাতে একটা হাঁড়ি।

"ও, তুই যাচ্ছিস এই ট্রেনে, যাক, বাঁচলাম। এই গুড়ের নাগরীটা মামাকে দিয়ে দিস তুই। খেতু আজ যাবে বলেছিল, তার হাত দিয়েই এটা পাঠাব ভেবেছিলাম, কিন্তু সে দেখছি আসে নি, এমন দায়িত্বজ্ঞানহীন আজকালকার ছোকরারা।"

কানুদা কামরায় উঠে গুড়ের নাগরীটি বেঞ্চির নীচে ঢুকিয়ে রেখে দিলেন।

"কোণের দিকে ঠেসিয়ে রেখে দিলাম, খুব সাবধানে নিয়ে যাস—"

গার্ডের হুইসল বাজল, কানুদা লাফিয়ে নেবে গেলেন। আমি শুয়ে পড়লাম লম্বা হয়ে এবং খানিকক্ষণ পরে ঘুমিয়ে পড়লাম।

ঘুম ভাঙল গভীর রাত্রে, এক মেমসাহেবের চিৎকারে। উঠে দেখি, একটি গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। আমার কামরার সামনে ভিড় জমে গেছে একটা। জিগ্যেস করলাম, ব্যাপার কি? শুনলাম, মেমসাহেব নাকি আমার কামরায় ঢোকবার জন্য দরজা খুলে একটি পা ঢুকিয়েছিলেন, কিন্তু সে পা-টি আর তুলতে পারেন নি। তাঁর জুতো কামরার মেঝেতে একেবারে সেঁটে গিয়েছিল। তিনি পা-টি কোনরকমে বার করে নিয়েছেন, কিন্তু জুতোটি উদ্ধার করতে পারেন নি। তাঁর চিৎকারে চেঁচামেচিতে স্টেশনমাস্টার, গার্ড, টিকিট-কালেকটার সবাই এসে জুটে গেছেন। গাড়ির আলো জ্বেলে আমার চক্ষুস্থির হয়ে গেল। কানুদার সেই গুড়ের নাগরী কামরাময় গড়িয়ে গড়িয়ে বেড়িয়েছে আর সমস্ত মেঝেটা চট্‌চটে গুড়ে ভরতি হয়ে গেছে।

স্টেশনমাস্টার জিগ্যেস করলেন, "এ নাগরী কি আপনার?"

"না। আমি কিছু জানি না।"

স্টেশনমাস্টার তখন নিজেই হেঁট হয়ে মেমসাহেবের জুতোটিকে গুড়ের কবল থেকে উদ্ধার করলেন। তারপর গদগদ বিনীতকণ্ঠে মেমসাহেবকে বললেন, "আই অ্যাম রিয়েলি সরি, ম্যাডাম। এ গাড়িতে আপনার বসা চলবে না, পিছনের দিকে আর একটা ফার্স্টক্লাস কামরা আছে, সেইখানে চলুন।"

সাহেব, মেমসাহেবকে নিয়ে স্টেশন মাস্টার, গার্ড সবাই চলে গেলেন।

তখন সেই টিকিট-কালেকটারটি আমার কাছে দাঁড়ালেন এসে।

তাঁকে আমি নিম্নকণ্ঠে জিগ্যেস করলাম, "আমি কি নেবে যাব?"

"না, না, নামবেন কেন, গ্যাঁট হয়ে বসে থাকুন। ওরাই কি টিকিট কিনে যাচ্ছে নাকি। ওরা প্ল্যানটার সাহেব, প্রায়ই যাতায়াত করে। এক নাগড়ী গুড় নষ্ট হল, এইটেই যা দুঃখের। আপনার সঙ্গে যে গুড় ছিল, তা তো জানতাম না—"

বললাম তাঁকে সব কথা।

"ও। তাই বুঝি। আচ্ছা, আমি মেথর থেকে গাড়িটাকে ধুইয়ে দিচ্ছি। তা না হলে আপনার অসুবিধে হবে—"

মেথর এসে কামরাটি পরিষ্কার করে দিয়ে গেল। আমি নির্বিঘ্নে যথাস্থানে পৌঁছে গেলাম।

উক্ত গল্পটি মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে হতে লাগল, সেই সহৃদয় টিকিটকালেকটারটি না থাকলে এ ভদ্রলোকের আজ যে দুর্দশা হয়েছে, আমারও সেই দশা হত। না হয়, ভদ্রলোক ভুল করে ফার্স্টক্লাসে চড়েই পড়েছেন, তা বলে হাজতে যেতে হবে তাঁকে! তাঁর অসহায় মুখচ্ছবিটা চোখের উপর ভাসতে লাগল। খচখচ করতে লাগল মনটা। পকেটে সদ্য-প্রাপ্ত ফি দু'শ টাকা ছিল। ভাবলাম, আমিই না হয় দিয়ে দি ভদ্রলোকের ভাড়াটা। কতদিকে কতই তো বাজে খরচ হয়—আমার স্মৃতিশক্তি অতীতের সেই ঘটনাটিকে বেশ উজ্জ্বল করে ফুটিয়ে তুলতে লাগল আমার মানসপটে।

নেবে পড়লাম।

স্টেশনমাস্টারের কামরার কাছে এসে শুনতে পেলাম, সেই টিকিট-কালেকটার ভদ্রলোক তারস্বরে বলেছেন, "মাপ করবেন মশাই, আমি ছাড়তে পারব না। চাকরি করি, চাকরির আইন মেনে আমাকে চলতেই হবে। হয়, ভাড়া দিয়ে দিন, না হয়, লক্-আপে থাকুন।"

"শুনুন—"

হাতছানি দিয়ে ডাকলাম আমি ভদ্রলোককে।

"কি বলছেন ?"

"ছেড়ে দিন ভদ্রলোককে।"

"মাপ করবেন, তা আমি পারব না।"

"আমি ও'র ভাড়াটা দিয়ে দিচ্ছি।"

"আপনি দেবেন কেন, ও রকম লোককে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়।"

এমন সময় স্টেশনমাস্টার নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

"আবার কি হল ? ঝামেলা মিটিয়ে ফেল না বাপু তাড়াতাড়ি।"

"এই ভদ্রলোক ও'র হয়ে ভাড়াটা দিয়ে দিতে চাইছেন।"

"কে—"

আমার দিকে ঘাড় ফিরিয়েই কিন্তু স্টেশনমাস্টারের মুখের চেহারা বদলে গেল। তাঁর স্মরণ-শক্তি কৃপা করলেন তাঁকে। উদ্ভাসিতমুখে এগিয়ে এসে তিনি আমার পায়ের ধুলো নিলেন।

"ডাক্তারবাবু যে, আপনি কোথা থেকে—"

"একটা রোগী দেখে ফিরছি। এই লোকটিকে ছেড়ে দিন, এ'র ভাড়াটা আমি দিয়ে দিচ্ছি-"

"আরে, ভাড়া দিতে যাবেন কেন ? আপনি ছেড়ে দিতে বলছেন, তাই যথেষ্ট—"

মাস্টারমশাই যখন আমাদের স্টেশনে ছিলেন, তখন তাঁর ছেলের টাইফয়েডের চিকিৎসা করেছিলাম আমি।

"শনটু কেমন আছে আজকাল—"

"ইয়া মোটা হয়েছে। এখন দেখলে চিনতেই পারবেন না।"

ক্লিওপেট্রা

[শ্রীসুরেশ মল্লিকের ভাড়াটে বাড়ির অভ্যন্তর। সাধারণভাবে সজ্জিত। সুরেশ মল্লিক আসিয়া প্রবেশ করিলেন। বয়স ত্রিশ। পরিধানে আধ-ময়লা সাহেবি পোশাক। মুখের ভাব ক্লান্ত। হাতে যে চৌকো চামড়ার ব্যাগটি ছিল, সেটি টেবিলের উপর রাখিয়া এদিক-ওদিক চাহিলেন। কাছে-পিঠে কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া তাঁহার ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হইল। ভিতরের দিকে মুখ ফিরাইয়া ডাক দিলেন।]

সুরেশ। বীণু, বীণু, বীণা [অর্ধস্বগত] আজও আবার কোথাও বেরিয়েছে না কি ? [ভৃত্য হারাধন প্রবেশ করিল]

হারাধন। মা বাইরে গেছেন। চাবিটা রেখে গেছেন। জলখাবার ঢাকা দেওয়া আছে।

সুরেশ। কোথা গেছেন ?

হারাধন। সিনেমা বোধ হয়। ঠিক জানি না। কনকবাবু দুপুরে এসেছিলেন।

সুরেশ। ও! [কোটটা খুলিয়া আলনায় রাখিলেন।]

হারাধন। চায়ের জল চড়াব ?

সুরেশ। চড়িয়ে দে। বীণু কিছু বলে যায় নি তোকে ?

হারাধন। আলুর দম করতে বলে গেছেন। আলু কিন্তু নেই।

সুরেশ। সে কথা তাকে বলতে পার নি ?

হারাধন। বলেছিলুম। তিনি বললেন, আমার কাছে পয়সা নেই, বাবুর কাছে চেয়ে নিও।

[সুরেশ চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন এবং হেঁট হইয়া জুতার ফিতা খুলিতে লাগিলেন। হারাধন চটিজুতো আগাইয়া দিল।]

সুরেশ। আলুর জন্যে ক-পয়সা দিতে হবে ?

হারাধন। চার আনা।

সুরেশ। আর কিছু আনতে হবে ?

হারাধন। না।

[সুরেশ মানিব্যাগ বাহির করিয়া পয়সা দিলেন।]

সুরেশ। আমার খাবারটা ঠিক করে দিয়ে তারপর বাজার যা।

হারাধন। খাবার কি এখানেই আনব ?

[সুরেশের মেজাজ ক্রমশঃই খারাপের দিকে যাইতেছিল, তিনি অকারণে ধমকাইয়া উঠিলেন।]

সুরেশ। এখানে কি আমি খাই !

[হারাধন চলিয়া গেল। বাহিরের দরজায় কড়া-নাড়ার শব্দ হইল। সুরেশ গিয়া কপাট খুলিয়া দিলেন। ফতুয়া-পরা একটি লোক প্রবেশ করিল।]

লোকটি। মুদির দোকানের বিল এনেছি, বাবু। মা এই সময় আসতে বলেছিলেন।

সুরেশ। তিনি এখন বাড়ি নেই।

লোকটি। কখন আসব তা হলে ?

সুরেশ। কাল সকালে এস।

[নমস্কার করিয়া লোকটি চলিয়া গেল। সুরেশ কপাটটা বন্ধ করিয়া দিলেন এবং যদিও ঘরে কেহ ছিল না, তবু কথা বলিতে লাগিলেন।]

আশ্চর্য মেয়ে দেখছি, বীণু। রোজই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবে। রেডিও কিনতে চাইলে, ধার-ধোর করে তা-ও কিনে দিলাম। তবু বাড়িতে মন বসছে না। টো-টো করে ঘুরে বেড়াতে ভালোও লাগে। আশ্চর্য !

[ঘরের এক কোণে রেডিওটা ছিল, সেটার দিকে সুরেশ ক্ষণকাল চাহিয়া

রহিলেন, তাহার পর, কি মনে করিয়া সেটা খুলিয়া দিলেন। সরোদে একটা চটুল গৎ বাজিতে লাগিল। সঙ্গীতের আবহাওয়ায় কামিজটা খুলিয়া তিনি পাশের ঘরে গেলেন। একটু পরেই ফিরিলেন, তখন আর পরনে প্যাণ্ট নাই, লুঙ্গি। দুয়ারে আবার কড়া নাড়িল। কপাট খুলিয়া দিতেই প্রবেশ করিল কনক, সুরেশের সমবয়সী এবং বন্ধু। সুশ্রী চেহারা। মাথার চুল উসকো-খুসকো।]

সুরেশ। সিনেমা শেষ হল ? বীণা কই ?

কনক। সিনেমা যাই নি। রেস খেলতে গিয়েছিলাম। হেরে ভূত হয়ে গেছি। কিছু ধার দিতে পারিস। একেবারে পেনিলেস আজ—

সুরেশ। আমারও ওই অবস্থা, আমার যা কিছু জমানো টাকা ছিল, তা বীণুর দুল কিনতে আর ওই রেডিও কিনতে শেষ হয়ে গেছে। রেডিওর সব দামটাও দিতে পারি নি এখনও। তোমার তবু চাকরি আছে, আমার তাও নেই। কিছুতেই একটা চাকরি জোটাতে পাচ্ছি না। তুমি পাঁচ শ' টাকা মাইনে পাও, তবু তোমার একার কুলোচ্ছে না !

কনক। কুলোচ্ছে কই। খরচ যে অনেক। তোমার বীণাই তো আমাকে আরও ফতুর করলে। আজ থিয়েটার, কাল সিনেমা, পরশু হোটেল—লেগেই আছে একটা না একটা। তুমি ওকে সামলে রাখ ভাই, আমি আর পেরে উঠছি না।

সুরেশ। কুকুর হলে বেঁধে রাখতাম। কিন্তু ও মানুষ, শুধু মানুষ নয়, বিংশ শতাব্দীর আলোক-প্রাপ্তা নারী। ওর স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করবার শক্তি আমার নেই। এদিকে আমার গৃহস্থালীও অচল হয়ে উঠেছে—কিন্তু কি করি বল ?

কনক। তুমি ওকে বিয়ে করতে চাইছ কেন, বল তো। ও রকম বোহিমিয়ান মেয়েকে নিয়ে সংসার করা চলে না, হৈ-হৈ করা চলে।

সুরেশ। ভালোবাসি যে—

কনক। [মৃদু হাসিয়া] ও, বিয়ে না করলে বুঝি ভালোবাসা যায় না ?

সুরেশ। [অধীরভাবে] দেখ, ও সব তর্ক অনেক হয়েছে। আমি ওকে বিয়েই করব, ঠিক করেছি। [সহসা রুক্ষকণ্ঠে] তুমি ওকে প্রশ্রয় দিচ্ছ কেন !

কনক। বাড়িতে এসে হাজির হলে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেব ? দেওয়া যায় কখনও, বিশেষতঃ বীণুর মতো মেয়েকে ? আমিও তো ওর সহপাঠি। তাছাড়া [হাসিয়া] প্রথমে আমিই ওর প্রেমে পড়েছিলাম। আমি যদি ওকে প্রশ্রয় দিতুম, তুমি বুলকে পেতে না।

[ইহাতে সুরেশের আত্মসম্মান বেশ ক্ষুণ্ণ হইল। কিন্তু তাহার আহত আত্মসম্মান ধূল্যবলুণ্ঠিত হইত, যদি তিনি ক্রোধ প্রকাশ করিতেন। কিন্তু, তাহা তিনি করিলেন না।]

সুরেশ। 'যদি ওকে প্রশ্রয় দিতুম' এ কথা বলছ কেন ? প্রশ্রয় তখনও দিয়েছিলে, এখনও দিচ্ছ। আমি যদি ওকে ভাল করে না চিনতাম অন্যরকম সন্দেহ হত। কিন্তু ওকে আমি ভাল করে চিনি, কিন্তু আই মাস্ট সে—

[হঠাৎ থামিয়া গেলেন।]

কনক। চটেছ, মনে হচ্ছে। চললাম, তা হলে। বীণুকে বলে দিও, যে-রঙের শিফনের শাড়ি সে চেয়েছিল, সে রং পাইনি। আচ্ছা, চললুম।

[কনক চলিয়া গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিবেশী রমণীমোহনবাবু প্রবেশ করিলেন। ভদ্রলোক প্রৌঢ়, কিন্তু তবু বেশ ছিমছাম, কবি-কবি ভাব।]

সুরেশ। [ভদ্রতাসহকারে] আসুন রমণীবাবু, কি মনে করে?

রমণী। শ্রীমতী বীণাপাণি দেবী কি ফিরেছেন?

[কথাগুলি ওজন করিয়া খুব মোলায়েমভাবে বলিলেন।]

সুরেশ। না, কোনও দরকার আছে কি?

রমণী। তিনি আমার সাইকেলটা নিয়ে গেছেন কিনা। আমাকে এখন একবার বেরুতে হবে।

সুরেশ। আপনার সাইকেল নিয়ে গেছে না কি! কি অন্যায়! এখনও ফেরে নি তো। সত্যি কি অন্যায়।

রমণী। তাতে কি হয়েছে, আমি না হয় অপেক্ষা করব। দুপুরে তো প্রায়ই নিয়ে যান উনি আমার সাইকেল।

সুরেশ। [বিস্মিত] তাই না কি?

রমণী। তাতে কি হয়েছে, তাতে কি হয়েছে?

[বীণুর প্রবেশ। সঙ্গে একটি আট-দশ বছরের ছেলে। হাফ-প্যাণ্ট, হাফ-শার্ট পরা। সুশ্রী, সজীব চেহারা। তাহার হাতে একটি ব্যাট রহিয়াছে। বীণু তন্বী, রূপসী। বব করা চুল। রং খুব ফরসা নয়, কিন্তু সে যে মোহিনী, তাহাতে সন্দেহ নাই। দেখিবামাত্র আকৃষ্ট হইতে হয়।]

বীণু। [রমণীবাবুকে] ও, আপনি এখানে। আমি আপনার সাইকেল নিচের ঘরে রেখে এলাম। আপনার অসুবিধে হয়েছে বোধ হয়। মাপ চাইছি—দেরি হয়ে গেছে সত্যি। রাগ করেছেন তো?

[রমণীমোহন ভদ্রতার আতিশয্যে গলিয়া পড়িলেন।]

রমণী। না, না, কিছুমাত্র নয়। আমাকে এখুনি একবার একটু বেরুতে হবে, তাই খোঁজ করতে এসেছিলাম, আপনি ফিরেছেন কি না। যদি দরকার হয়, আবার নিতে পারেন, আমি আধ ঘণ্টার মধ্যেই ফিরব। ছেলেটার জন্য ওষুধ আনতে হবে।

বীণু। ও, আপনার ছেলের অসুখ না কি। তা তো জানতুম না। চলুন, দেখে আসি। [যাইতে উদ্যত।]

রমণী। [কৃতার্থ] যাবেন? আচ্ছা, আমি ফিরে আসি, তারপর যাবেন। এখুনি ফিরব।

[রমণীমোহন চলিয়া গেলেন। সুরেশ নিষ্পলকদৃষ্টিতে বীণুর দিকে চাহিয়া ছিলেন। বীণু সেদিকে চাহিয়া একটু মুচকি হাসিল। তাহার পর কথা বলিল।]

বীণু। [ছেলেটিকে দেখাইয়া] আমার নতুন বন্ধুটিকে দেখ।

সুরেশ। ও, নাম কি?

বীণু। তোমার নাম কি বল। ইনিও আমার একজন বন্ধু।

[ছেলেটি নমস্কার করিল।]

ছেলেটি। আমার নাম শ্রীইন্দ্রজিৎ বসু।

বীণু। রাস্তায় একটা রিক্সার সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে আমি সাইকেল থেকে পড়ে গিয়েছিলাম। সবাই আমাকে ঘিরে হৈ-হৈ করতে লাগল, কেবল এ-ই দৌড়ে গিয়ে বাড়ি থেকে টিংচার আইয়োডিন, ছেঁড়া ন্যাকড়া, তুলো নিয়ে এসে পা-টা বেঁধে দিলে। ছড়ে গেছে খানিকটা।

[শাড়ি একটু তুলিয়া পা দেখাইল।]

সুরেশ। তাই না কি। বেশি লাগে নি তো, হাড়-টার —?

বীণু। কিছু না, লাভই হয়েছে বরং। অ্যাকসিডেন্ট না হলে এমন বন্ধুটি কি পেতুম? ওকে একটা ব্যাট কিনে দিয়েছি। ইন্দ্রজিত কিছু খাবে না কি?

ইন্দ্রজিৎ। না, আমার পেট ভরা আছে। আর একদিন আসব। দেরি হলে, মা ভাববে। চললুম এখন।

[এক ছুটে বাহির হইয়া গেল।]

বীণু। চমৎকার ছেলেটি, না?

সুরেশ। ছেলেটি তো চমৎকার। কিন্তু তোমার ব্যাপার কি বল তো। একদিনও বাড়ি ফিরে দেখলাম না যে, তুমি বাড়িতে আছ।

বীণু। [বিস্মিত] তোমার অপেক্ষায় দিন-রাত ঘরে বসে থাকব। তাই তুমি প্রত্যাশা কর না কি। যা কখনও করি নি, তা করব কি করে?

সুরেশ। যদি গৃহস্থালী পাততে চাও—

বীণু। তা হলে বাইরের জগতের সঙ্গে সম্বন্ধ ছিন্ন করতে হবে?

সুরেশ। কনকের ওখানে বড্ড বেশী যাতায়াত করছ।

বীণু। কনকের কাছেও যাব না। [সহসা] আচ্ছা, তুমি কি হয়ে যাচ্ছ বল তো—! আমি কি একটা নির্জীব আসবাব যে, দিন-রাত ঘরের কোণে পড়ে থাকব?

সুরেশ। সাধারণ আসবাব নও। বহুমূল্য রত্ন। যেখানে-সেখানে পড়ে থাকলে টপ করে তুলে নেবে কেউ।

বীণু। ইস্, নিলেই হল। দু-একজন চেষ্টা করেছে অবশ্য। ও, হ্যাঁ, একটা কথা বলতে ভুলেছি। ক্লিওপেট্রার ওপর তুমি যে থীসিসটা লিখেছ, সেটার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করছিলেন প্রফেসার মজুমদার। সত্যি খুব ভাল হয়েছে ওটা [একটু ইতস্ততঃ করিয়া, সহসা] একটা কথা তোমাকে বলব? তোমাকে ছাড়া আর কাকেই বা বলব? কিন্তু, চেঁচিয়ে বলতে লজ্জা করছে। সরে এস, কানে কানে বলি।

[সুরেশের কানে কানে গিয়া বলিতেই সুরেশ চমকাইয়া পিছাইয়া গেলেন। মনে হইল, তাঁহাকে যেন বৃশ্চিক দংশন করিল।]

সুরেশ। আমি সংযম করে আছি, আলাদা ঘরে শুই—আর তুমি বলছ—

বীণু। কি জানি, কোথা দিয়ে, কি করে, কি হয়ে গেল।

সুরেশ। আর সে কথা তুমি আমাকে বলছ!

বীণু। তোমাকে বলব না তো, কাকে বলব। তোমাকে যে আমি ভালবাসি। আমার সমস্ত বিপদ-আপদ, দোষ-ত্রুটি তোমাকেই তো সামলাতে হবে। আর, আমি জানি, তুমি তা পারবে। ক্লিওপেট্রার সম্বন্ধে অমন দরদ দিয়ে যে থীসিস লিখতে পারে সে—

[দুয়ারের কড়া নড়িল। দ্বার খুলিতেই পিওন চিঠি দিয়া গেল।]

সুরেশ। [চিঠিটা পড়িয়া] যাক, এ চাকরিটাও হল না।

বীণু। তুমি কোথায় দরখাস্ত করেছিলে ?

[সুরেশের চিঠিটা লইয়া দেখিল।]

আরে, আমিও যে এখানে দরখাস্ত করেছিলাম। আমি সিলেকটেড্ হয়েছি। আমার ইণ্টারভিউ ছিল আজ। সেখানেই তো গিয়েছিলাম। [লীলাভরে মাথা নাড়িয়া] আমার ফার্স্টক্লাস ছিল মশাই, তোমার সেকেণ্ড ক্লাস—।

[সুরেশ বিবর্ণমুখে চেয়ারটাতে বসিয়া পড়িলেন। বীণু সোজা গিয়া তাহার কোলের উপর বসিল এবং গলা জড়াইয়া ধরিল।]

ও কি, আমার দিকে চাও। অমন করছ কেন ? সমস্যা তো মিটেই গেল, তুমিই চাকরি পাও বা আমিই চাকরি পাই, একই কথা। কালাই চল, বিয়েটা সেরে ফেলা যাক।

সুরেশ। [তিক্ত হাসি হাসিয়া] ফার্স্টক্লাসের সঙ্গে সেকেণ্ড ক্লাসের কি রাজ-যোটক হবে ?

বীণু। কিন্তু, তুমি যে ডক্টরেট পাবে, শুনে এলাম। আমি বই মুখস্থ করে ফার্স্টক্লাস হতে পারি। কিন্তু ক্লিওপেট্রার ওপর অমন থীসিস লিখতে পারি কি ? [সহসা] তুমি আমার অ্যানটনি—

[পরস্পর পরস্পরের দিকে চাহিয়া রহিল। তাঁহার পর সহসা আলিঙ্গনাবদ্ধ হইল।]

রসময়ের অভিজ্ঞতা

বন্ধু রসময় রক্ষিত একটু উত্তেজনাভরেই আমার ক্লিনিকে এসে সেদিন বললেন, "মাপ করবেন, ডাক্তারবাবু, সেদিন তর্কের মুখে আপনাদের বিজ্ঞানকে বুজরুকি বলে ফেলেছিলাম। আজ আমার ভুল ভেঙেগেছে, আমি আমার কথা প্রত্যাহার করতে এসেছি। আর একটা কথাও আপনাকে জানাতে এসেছি, যা আপনিও হয়তো জানেন না, কিংবা হয়তো জানেন, কারণ, আপনারা. ডাক্তাররা সর্বজ্ঞ।

"বসুন, কি কথা ?"

"উঃ, খুব বেঁচে গেছি ডাক্তারবাবু। আর একটু হলে গিন্নির নোয়া, সিঁদুর ঘুচে গিয়েছিল আর কি—"

রক্ষিত মশায় খবরের কাগজটা তুলে নিয়ে হাওয়া করতে লাগলেন নিজেকে।

"আপনি হাজারিবাগ গিয়েছিলেন না ?"

"হ্যাঁ। সেইখানেই তো ওই কাণ্ড। আমার মেয়েটা মানা করেছিল, বাবা জঙ্গলের ভিতর বেড়াতে যাবেন না, ওখানে বাঘ আছে, শুনেছি। কিন্তু, আপনারা ঘাড় ধরে রোজ একঘণ্টা বেড়াতে বলেছেন, আর হাজারিবাগের সিনারিও চমৎকার। হাঁটতে ভালই লাগত বেশ। কিন্তু, একদিন ফ্যাসাদে পড়ে গেলাম, ডাক্তারবাবু।"

"আপনি ইনস্যুলিন নিচ্ছেন আজকাল ?"

"আপনারা তো বলেই খালাস, কিন্তু অত পয়সা কোথায় আমার! ওইজন্যেই না, সেদিন আপনাদের বিজ্ঞানকে এক হাত নিলুম, কিন্তু এবার আমি মশাই, অপদস্থ হয়েছি। ইনস্যুলিন নিই নি ইটে, কিন্তু ওই বিজ্ঞানের জোরেই বেঁচে গেছি সেদিন।"

"কি রকম?"

"আপনার হুকুম-মতো সন্ধ্যাবেলা বেড়াতে বেরিয়েছি সেদিন। মেয়েটা সেদিনও মানা করলে, বাবা বেশীদূর যেও না, সন্ধ্যের আগেই ফিরে এস। কিন্তু কিছদূর গিয়েই মুগ্ধ হয়ে গেলাম! রবি ঠাকুরের গানের লাইনটা গুনগুন করতে লাগল মনের ভিতর—ওরে ভাই, ফাগুন লেগেছে বনে বনে। পলাশে আর কৃষ্ণচূড়ায় চারিদিক লালে লাল। সূর্যাস্ত হচ্ছে, আকাশের মেঘে মেঘে আগুন লেগেছে। 'বউ কথা কও' পাখিও একটা ডাকতে লাগল থেকে থেকে। আর ওই পাখিটাই টেনে নিয়ে গেল আমাকে বনের মধ্যে। পাখিটাকে কখনও দেখি নি। ভাবলুম, যদি দেখতে পাই। ঢুকে পড়লুম জঙ্গলে। জঙ্গলে ঢুকে আবার মুগ্ধ। সেখানে যে কত রকমের ফুল, কত রকমের গাছ, কত রকমের পাতা, কত রকমের লতা, তার ইয়ত্তা নেই। 'বউ কথা কও' পাখিটা যেন আমার সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে লাগল। কখনও মনে হচ্ছে, বাঁ দিক থেকে ডাকছে, কখনও ডান দিক থেকে, কখনও বা সামনে থেকে, কখনও আবার পিছন থেকে। আমি এদিক, ওদিক চাইতে চাইতে এগিয়ে চলেছি, হুঁশ নেই। অদ্ভুত নির্জনতা চারিদিকে, একটা অদ্ভুত গন্ধও পেতে লাগলাম। কাছেপিঠে বোধ হয়, মহুয়া গাছ ছিল। মনে হল, নেশা হয়েছে। নেশার ঘোরে আচ্ছন্নের মতো এগিয়ে যেতে লাগলাম। মনে হল, 'বউ কথা কও' পাখিটা যেন সুরের ইঙ্গিতে স্বপ্নলোকের পথ দেখাচ্ছে আমাকে। ভাবতে লাগলাম, পাখিটা দেখতে কি রকম? নীল কি? ওই কি মেটারলিংকের ব্লু বার্ড? কতক্ষণ চলেছিলাম, মনে নেই, সন্ধ্যার অন্ধকার যে গাঢ়তর হয়ে আসছিল, সেদিকেও খেয়াল ছিল না, হঠাৎ কিন্তু বজ্রপাত হল। চমকে উঠলাম, সামনে দেখি, দুটো বাঘ! একটা প্রকাণ্ড বড়, থলথল করছে চর্বি, আর একটা রোগাগোছের। সম্ভবতঃ, আমি সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলুম। যখন জ্ঞান হল, তখন দেখি, বড় বাঘটা আমার মুখের কাছে মুখ এনে হ্যা হ্যা করে শুঁকছে। ভাবলাম, এইবার মস্তকটি কড়মড়িয়ে চর্বণ করবে। কিন্তু মশাই, করলে না! কি করলে, জানেন?"

"কি?"

"সেই রোগা বাঘটার দিকে চেয়ে পরিষ্কার বাংলা ভাষায় বললে, এর নিঃশ্বাসে বেজায় অ্যাসিটোনের গন্ধ ছাড়ছে যে হে। তার মানে, রক্তে খুব বেশী চিনি আছে। একে খাব?"

রোগা বাঘটা তখন ঘুরে ঘুরে আমাকে দেখলে, সে-ও মুখটা শুঁকলে বারকয়েক। তারপর বললে, "না, খাবেন না। আপনার শুগার কত এখন?"

"পাঁচ পারসেণ্ট।"

"না, খাবেন না। আমারও খাওয়া চলবে না, আমারও তিন পারসেণ্ট আছে আজ। এ তো মানুষ নয়, মোরব্বা দেখছি। চলুন—"

"আমাকে খেলে না, মশাই। হেলে-দুলে চলে গেল দুজনেই! তা হলেই দেখুন,

বিজ্ঞানের কল্যাণেই বেঁচে গেলাম সেদিন। আর একটা কথাও মনে হল। বঙ্গ-বিহার পুনর্মিলনের প্রস্তাবে বেশ ফল হয়েছে, তা না হলে বিহারের বাঘ অমন পরিষ্কার বাংলা বললে কি করে, তার মানে, ওরাও বাই-লিঙ্গুয়াল হয়ে গেছে আর কি—"

কি আর বলব ! হাসিমুখে রসময় রক্ষিতের মুখের দিকে চেয়ে রইলাম।

কাণ্ড

"ওঁকে গাড়িতে তুলে দিয়ে এলেন ?"

"হ্যাঁ, এলুম।"

"কত নিলেন উনি ?"

"পাঁচ হাজার। দৈনিক হাজার টাকাই তো কথা হয়েছিল। পাঁচদিন ছিলেন।"

"আমাকে যদি বলতেন, কিছু সস্তায় করিয়ে দিতে পারতুম।"

"আপনার সঙ্গে আলাপ আছে না কি ?"

"আছে।"

"কি সূত্রে—"

"সেটা আর না-ই শুনলেন।"

গদাধরবাবু মুচকি হাসলেন। তা দেখে ভুরু কুঁচকে গেল ভোম্বল দাসের। পুনরায় প্রশ্ন করলেন গদাধর।

"কেমন হল ? আমি তো ছিলুম না।"

"অবর্ণনীয়।"

"খুব নাচলে, গাইলে—?"

"খুব। মাৎ করে দিলে একেবারে।"

"তা তো দেবেই। ক খানা গান গাইলে—"

"পাঁচদিনে তা কম করে খান কুড়ি হবে।"

"খুব গেয়েছো। আর নাচ ?"

"সকালে, বিকেলে। তার মানে পাঁচ দিনে, দশবার। তা কথক, ভারতনাট্যম্, মণিপুরী, জাভা, এমন কি পোয়ে পর্যন্ত। টাকা উশুল করে নিয়েছি আমরা। দশ হাজার টাকার টিকিট বিক্রি করেছি—"

হঠাৎ ভোম্বল দাস উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন।

"বুঝলেন গদাধরবাবু, মন ভরে গেছে, কানায় কানায় ভরে গেছে, উপচে পড়ছে। ধন্য হয়ে গেছি।"

"কোথা রেখেছিলেন ওকে ? নিজের বাড়িতে ?"

"আরে বাপস, সে সামর্থ্য কি আছে আমার ? ছিলেন উনি যোগেনবাবুর বাগান-বাড়িতে। তবে, ফাইফরমাশ খাটবার জন্যে আমি হামে-হাল মোতায়েন থাকতুম সেখানে ! এ রকম সৌভাগ্য ক জনের হয় বলুন।"

গদাধর ভ্রূকুঞ্চিত করলেন আবার। একটু মৃদুহাসিও ফুটল তাঁর অধরে।

বললেন, "তা বটে—"

"আমার এত বেশী আনন্দ হয়েছে, কেন জানেন ? পয়সার বদলে উনি যা দিয়েছেন, তা সকলে আমরা সমানভাবে ভোগ করেছি। কিন্তু, আমাকে একটু ফাও দিয়েছেন—"

"কি রকম ?"

"যখন গাড়িতে তুলে দিয়ে বললুম, এখন তা হলে আসি দেবি। তখন কি মিষ্টি করেই যে হাসলেন আমার দিকে চেয়ে। ও হাসি আমার মনের মণিকোঠায় অক্ষয় সম্পদ হয়ে থাকবে চিরকাল—"

গদাধর আবার একটু হেসে বললেন, "চলুন, যাওয়া যাক। আপনি—হেঁটে বাড়ি যাবেন না, চলুন, আপনাকে আমি নাবিয়ে দিয়ে যাচ্ছি।"